সীরাতে সরওয়ারে আলম

১ম খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

www.icsbook.info

সীরাতে সরওয়ারে আলম

প্রথম খণ্ড

سیرت سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ ঃ আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.icsbook.info

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১০৮

৪র্থ প্রকাশ

জিলহাজ্জ	১৪২৪
মাঘ	১৪১০
জানুয়ারী	২০০৪

বিনিময় মূল্য ঃ ২২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سيرت سرور عالم-এর বাংলা অনুবাদ

SERAT-E-SARWAR-E-ALAM by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 225.00 Only.

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচনা

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَفِيْهَا نَذِيْرٌ ○ (فاطر : ٢٤)

"এমন কোন জাতি ছিল না যাদের মধ্যে কোন সাবধানকারী আগমন করেনি।"

–(সূরা ফাতের ঃ ২৪)

●

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ج (النحل : ٣٦)

"এবং আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন পয়গম্বর পাঠিয়েছি, যিনি এই বলে আহ্বান জানিয়েছেন, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের আনুগত্য থেকে দূরে থাক।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ৩৬)

●

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ○ (النجم : ٥٦)

"পূর্ববর্তী ভীতি প্রদর্শনকারীদের মধ্যে ইনি একজন ভীতি প্রদর্শনকারী।"

–(সূরা আন নাজম ঃ ৫৬)

●

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○ لا (يس : ٣)

"(হে মুহাম্মদ) তুমি অবশ্যই একজন রসূল।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩)

●

قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ - (احقاف : ٩)

"(হে মুহাম্মদ) বল, আমি কোন অভিনব রসূল তো নই।"

–(সূরা আল আহকাফ ঃ ৯)

●

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط (ال عمران : ١٤٤)

"মুহাম্মদ একজন রসূল ব্যতীত কিছু নন এবং তার আগেও অনেক রসূল অতীত হয়ে গেছেন।" –(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

●

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ
مِّنْهُمْ ۟ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ

"বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপরে এবং ঐ শিক্ষার ওপরে যা আমাদের ওপরে নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ শিক্ষার ওপরে যা নাযিল করা হয়েছিল ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানদের ওপরে এবং যা কিছু দেয়া হয়েছিল মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণের ওপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে, তার ওপরেও ঈমান এনেছি। তাঁদের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য নির্ণয় করি না এবং আমরা আল্লাহর অনুগত। অতএব এরাও যদি এভাবে ঈমান আনে যেমন তোমরা এনেছ, তাহলে তারাও সরল-সঠিক পথে রয়েছে বলা যাবে।"

–(সূরা আল বাকারাহ ঃ ১৩৬-১৩৭)।

●

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

"প্রকৃতপক্ষে ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিরাট মেহরবানী যে, তিনি তাদের জন্য স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে এমন এক রসূলের উত্থান ঘটিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদের তাযকিয়া বা শুদ্ধি করেন, তাদেরকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেন। অন্যথায় তারা তো সুস্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে পড়ে ছিল।" –(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪)।

●

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের ওপর উজাড় করে দিলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামী জীবনবিধান মনোনীত করলাম।"–(সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৩)।

●

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ
الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ (النحل : ٦٣-٦٤)

"খোদার কসম, হে মুহাম্মদ, আমরা তোমার পূর্বে বিভিন্ন উম্মতের জন্যে হেদায়েত পাঠিয়েছি। কিন্তু তারপর শয়তান তাদের দুষ্কৃতিকে তাদের জন্যে আনন্দদায়ক বানিয়ে দিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক হয়ে পড়েছে এবং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির উপযোগী হয়েছে। এবং আমরা তোমার ওপর এ কিতাব নিছক এ জন্যে নাযিল করেছি যে, তুমি তাদের কাছে ঐ সত্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরো—যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। আর এ জন্যেও ঐ কিতাব নাযিল করেছি যাতে করে এ হেদায়েত এবং রহমত হতে পারে তাদের জন্যে যারা এর আনুগত্য স্বীকার করে।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ৬৩-৬৪)।

●

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط قَدْ جَاۤءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○(المائده : ١٥–١٦)

"হে আহলে কিতাব! তোমাদের নিকটে আমাদের রসূল এসে গেছেন, যিনি তোমাদের সামনে সেসব বহু কথা খুলে বলেন যা তোমরা কিতাবের মধ্য থেকে গোপন করো এবং অনেক কিছু তিনি মাফ করে দেন। তোমাদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আলোক এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে যার মাধ্যমে তিনি ঐসব লোককে নিরাপত্তা ও শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর পছন্দ মোতাবেক চলে এবং তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন এবং সঠিক পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন।"–(সূরা আল মায়েদাহ ঃ ১৫-১৬)।

●

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ○ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○(احزاب : ٤٥–٤٦)

"হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষ্য ও সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ করেছি।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৪৫-৪৬)।

●

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ (الاعراف : ١٥٧)

"সে (রসূল) তাদেরকে নেকীর আদেশ করে, পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্য পাক জিনিস হালাল করে এবং নাপাক জিনিস হারাম নির্ধারণ করে। আর তাদের

ওপর থেকে সেসব বোঝা নামিয়ে দেয় এবং ঐসব বন্ধন কর্তন করে যার দ্বারা তারা অবনমিত ও শৃঙ্খলিত ছিল। অতএব যারা তার ওপর ঈমান আনবে, তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং ঐ নূর অনুসরণ করবে যা তার সাথে নাযিল করা হয়েছে, তারাই সাফল্য লাভ করবে।" –(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭)।

●

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ ؕ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًاۙ ○ (النساء : ١٠٥)

"হে মুহাম্মদ! আমরা সত্যসহ এ কিতাব তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি আল্লাহর বর্ণিত পদ্ধতিতে লোকের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতে পার এবং যেন খেয়ানতকারীদের উকিল না হয়ে পড়।" –(সূরা আন নিসা ঃ ১০৫)।

●

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ

"আল্লাহ তায়ালাই সেই সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়েত এবং দ্বীনে হকসহ পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি এ দ্বীনে হক বা সত্য জীবন বিধানকে যাবতীয় জীবন বিধানের ওপর বিজয়ী করতে পারেন।" –(সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৮)।

●

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○ (الاعراف : ١٥٨)

"হে মুহাম্মদ! বলে দাও—হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রসূল, যে আল্লাহ আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, যিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক। অতএব ঈমান আন আল্লাহর ওপর এবং তাঁর সেই উম্মী রসূলের ওপর যে খোদা ও তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর বিশ্বাস রাখে। তোমরা তার আনুগত্য কর যাতে করে সঠিক পথ পেতে পার।"

●

اُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ (الانعام : ١٩)

"এবং বল, আমার প্রতি এ কুরআন অহীর মাধ্যমে পাঠান হয়েছে যাতে করে এর মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ পৌছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।"

●

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ○

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারও পিতা নয় কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং নবীগণের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৪০)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপক্রমনিকা

আল্লাহ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া যে, যে বিরাট কাজে হাত দেয়া হয়েছিল তা বহুলাংশে সম্পন্ন হয়েছে এবং আশা করা যায় যে, তাঁরই সাহায্যে অবশিষ্ট কাজটুকুও সম্পন্ন হবে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাথে আমার যে দলগত সম্পর্ক, তার থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যদি নিষ্ঠার সাথে তাঁর দ্বীনী খেদমতের প্রতি নজর দেয়া হয়, তাহলে কোন অন্ধ শ্রদ্ধাবোধ ব্যতিরেকেই এ অনুভূতি জাগে যে, এ যুগে যে ধরনের শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণের সাথে নতুন প্রকাশভংগিতে এবং যেমন বিশদভাবে তিনি ইসলামের মৌল সত্যতা ও তার পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, তার দৃষ্টান্ত কালের সুদূর দিগন্তেও খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ যুগে পাশ্চাত্যের খোদাহীন ও জড়বাদী চিন্তাধারার প্রবল প্লাবণ প্রতিরোধকল্পে মাওলানা যে অবদান রেখেছেন তার থেকে অসংখ্য লোকের জীবনের পট-পরিবর্তন হয়েছে। আর এ মহান কাজ মাওলানার জন্যে আখেরাতের বিরাট মূলধন হয়ে রয়েছে।

মাওলানার সাথে পরিচিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার যে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তার জন্যে আমার একান্ত বাসনা এই যে, মাওলানার প্রজ্ঞা ও চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের জন্যে বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বন করা হোক। সেই সাথে মাওলানার ব্যক্তিত্ব, তাঁর সুনাম ও সম্পাদিত কাজকর্মকে আমার ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির কাজে লাগাব—এ ধরনের মানসিকতার উর্ধেও আমি রয়েছি।

আজ থেকে দশ-বার বছর আগের কথা। মাওলানা মওদূদী সাহেবের কামরায় আমরা কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বসে আলাপ করছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে আমি বললাম যে, যদি মাওলানা ভাল মনে করেন তাহলে তাঁর প্রবন্ধাদি থেকে নবীর জীবন চরিত সংকলন করা যায়। এতে আমার বন্ধুটি এ কাজের দায়িত্ব তাঁকে দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানান। আমি তাতে রাজি হলাম। কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন আমার বন্ধুটি এ কাজের সুযোগ পেলেন না, তখন আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে পুনরায় বিষয়টি মাওলানার নিকট উত্থাপন করলাম। মাওলানা এ প্রস্তাবিত বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে কাজ করার জন্যও মোটামুটি কিছু সদুপদেশ দেন।

অবশেষে কাজ শুরু করার পর মনে হল নিজের পক্ষ থেকে একটা গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করার চেয়ে মাওলানার গোটা সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে মূল-বচন সংগ্রহ করে গ্রন্থ সংকলনের কাজ বড় কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ। কারণ তাফহীমুল কুরআনের ছ'খণ্ড ছাড়াও তাঁর বহু সাহিত্যে অধ্যয়ন, তার থেকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও উপযোগী মূল-বচন চিহ্নিত করা, অতপর তার অনুলিপি তৈরী করা এবং সর্বশেষে সেগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদভুক্ত করা, বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যস্ত করা প্রভৃতি কাজগুলো এতো দুরূহ ছিল যে, বারবার হিম্মত হারিয়ে ফেলতাম এবং মনে করতাম এ বিরাট পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আমার সাধ্যের অতীত।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ কাজে আমার বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছি। বিশেষ করে মাওলানা আবদুল ওয়াকিল আলীভী এম. এ. প্রায় দেড় বছর ধরে আমার সাথে এমনভাবে কাজ করেছেন যে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ কাজে সবচেয়ে বেশী অবদান তাঁরই ছিল।

নীরবে দেড়-দু'বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজটি শেষ হবার পর যখন তা মাওলানার সামনে পেশ করা হল তখন তিনিও বিস্ময়বোধ করলেন যে, নবী মুস্তফা (সা)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জীবন চরিত সম্পর্কে এত উপকরণ তিনি তাঁর প্রবন্ধাদিতে সঞ্চিত করে রেখেছেন। আমাদের মতো অধম লোকের হাতে প্রায় তিন খণ্ড গ্রন্থের প্রাথমিক সংকলন সমাপ্ত হয়েছে দেখে মাওলানাও সন্তোষ প্রকাশ করেন। মৌল আলোচনা, নবুয়াতের মর্যাদা, অহীর ব্যবস্থাপনা, নবীপাকের আগমন, নবীপূর্ব যুগের পরিবেশ পরিস্থিতি, যে জাতিকে সম্বোধন করে দাওয়াত পেশ করা হয়েছে, তাদের এবং অন্যান্য বিভিন্ন দলের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে নবী মুস্তফা (সা)-এর জন্ম থেকে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত সময়কালের ঘটনাবলী, তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে মদীনায় অতিবাহিত নবীপাকের আন্দোলন-জীবনের চরম মুহূর্তগুলো। চতুর্থ খণ্ড সংকলন বাকী আছে। তার মধ্যে থাকবে নবী (সা)-এর সংস্কার কার্যাবলী, শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনের বিভিন্ন বিভাগের সূচিত পরিবর্তনের চিত্র। আল্লাহ তায়ালা যেন এ খণ্ড সমাপ্ত করার তওফিকও আমাদেরকে দান করেন।

গ্রন্থটি এমনভাবে সংকলিত করা হয়েছে যে, মাওলানার প্রবন্ধাবলী ও বিভিন্ন মূল বচনকে বিভিন্ন শিরোনামায় সুবিন্যস্ত করা হয়েছে, বিষয়বস্তুর বাঁধন মজবুত করা হয়েছে, যার ফলে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিগোচর হয়। অল্প কিছু স্থান এমন আছে যেখানে সংকলকদ্বয়কে নিজের পক্ষ থেকে অথবা অন্য কোন গ্রন্থ থেকে কিছু কথা সন্নিবেশিত করতে হয়েছে এবং তার বরাতও উল্লেখ করা হয়েছে। টীকা দু'ধরনের আছে। এক–যা গ্রন্থাকারের মূল প্রবন্ধে সন্নিবেশিত। দুই–যা সংকলকদ্বয়ের পক্ষ থেকে সংযোজিত করা হয়েছে। এ দু'ধরনের টীকা আলাদা আলাদাভাবে লিখিত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারের প্রবন্ধ থেকে যেসব উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, গ্রন্থের শেষে একত্রে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

আনন্দের বিষয় এই যে, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর অসুস্থতা ও ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের এ সংকলন আগাগোড়া পড়ে স্থানে স্থানে সংশোধনও করেছেন এবং তাঁর কিছু মূল-বচন সংযোজনের জন্যে চিহ্নিতও করে দিয়েছেন। এসব সত্ত্বেও এ গ্রন্থ সংকলনে কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেলে তার জন্যে আমরাই দায়ী হবো।

এখন আমরা যা কিছুই করেছি এবং যেমনভাবেই করেছি তার জন্যে দোয়া করি যেন আল্লাহ তা কবুল করে নেন এবং পাঠকগণ এর থেকে হেদায়েতের আলোক-রশ্মি লাভ করেন। পাঠকবর্গের নিকটে আমরা এ আবেদনও জানাই যে, কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করলে অথবা কোন কিছুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন মনে করলে আমাদেরকে অবহিত করে বাধিত করবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তাঁদের প্রস্তাব-পরামর্শকে অগ্রাধিকার দেব এবং গ্রন্থখানিকে অধিকতর ভাল করার চেষ্টা করব।

—নঈম সিদ্দিকী

সংকলকদ্বয়ের কথা

প্রথম খণ্ড সম্পর্কে বলে রাখা দরকার যে, এতে বুনিয়াদী আলোচ্য বিষয়ের নামে শ্রদ্ধেয় মাওলানার ঐ সব প্রবন্ধ, বক্তৃতা এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংগৃহীত করা হয়েছে যা একদিকে নবুয়াতের পদমর্যাদা, অহীর ব্যবস্থাপনা, দ্বীন সম্পর্কে ধারণা ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে এবং অপরদিকে নবী (সা)-এর আবির্ভাবকাল এবং পূর্ববর্তী সভ্যতার ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্ফুট করে। এ আলোচনা যদিও সরাসরি সীরাতপাক সম্পর্কিত ঘটনাবলী উত্থাপিত করে না, তথাপি নবীপাক (সা)-এর ব্যক্তিত্ব, তাঁর পদমর্যাদা এবং তাঁর সর্বাত্মক সংগ্রাম উপলব্ধির এ সহায়ক হবে। এ জন্যে আমরা প্রয়োজন বোধ করেছি যে, তাঁর জীবনচরিত অধ্যয়ন করার পূর্বে পাঠকবর্গ এসব পথ-নির্দেশক আলোচনার সাথে পরিচিত হবেন।

—সংকলকদ্বয়

ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সেই আন্দোলনের নাম যা এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা-বিশ্বাসের ওপরে মানব-জীবনের গোটা প্রাসাদ নির্মাণ করতে চায়। এ আন্দোলন অতি প্রাচীনকাল থেকে একই ভিত্তির ওপরে এবং একই পদ্ধতিতে চলে আসছে। এর নেতৃত্ব তাঁরা দিয়েছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালার নবী-রসূল বলা হয়। আমাদেরকে যদি এ আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়, তাহলে অনিবার্য-রূপে সেসব নেতৃবৃন্দের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কারণ এছাড়া অন্য কোন কর্মপদ্ধতি এ বিশেষ ধরনের আন্দোলনের জন্যে না আছে, আর না হতে পারে। এ সম্পর্কে যখন আমরা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)-এর পদাংক অনুসন্ধানের চেষ্টা করি, তখন আমরা বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হই। প্রাচীনকালে যেসব নবী তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা বেশী কিছু জানতে পারি না। কুরআনে কিছু সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তার থেকে গোটা পরিকল্পনা উদ্ধার করা যায় না। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে হযরত ঈসা (আ)-এর কিছু অনির্ভরযোগ্য বাণী পাওয়া যায় যা কিছু পরিমাণে একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে এবং তাহলো এই যে, ইসলামী আন্দোলন তার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কিভাবে পরিচালনা করা যায় এবং কি কি সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-কে পরবর্তী পর্যায়ের সম্মুখীন হতে হয়নি এবং সে সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে একটিমাত্র স্থান থেকে আমরা সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ পথ-নির্দেশ পাই এবং তা হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর জীবন। তাঁর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এ পথের চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আমরা বাধ্য। ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে শুধু নবী মুহাম্মদ (সা)-ই একমাত্র নেতা যাঁর জীবনে আমরা এ আন্দোলনের প্রাথমিক দাওয়াত থেকে শুরু করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং অতপর রাষ্ট্রের কাঠামো, সংবিধান, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত এক একটি পর্যায় ও এক একটি দিকের পূর্ণ বিবরণ এবং অতি নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমরা জানতে পারি।[১]

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ ঃ নবুয়াতের মর্মকথা ২৫
মানবতার জন্যে আল্লাহর পথনির্দেশ ২৭
মুসলিম (অনুগত) হয়ে থাকার নির্দেশ ২৭
সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি ২৮
নবুয়াত ও আদি-চুক্তি ২৯
নবুয়াতের ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধির রায় ৩২
নানান জনের নানান মত ৩২
একটি স্বতন্ত্র দাবী ৩৩
বিবেক-বুদ্ধির আদালতে ৩৪
মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অবস্থা ৩৪
একক দাবীদারগণের অবস্থা ৩৫
বিবেক-বুদ্ধির আদালতের রায় ৩৬
নবুয়াতের প্রয়োজন ও তাৎপর্য ৩৯
মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ৩৯
বাধ্যতামূলক হেদায়াতের পরিবর্তে ইসলামী হেদায়াত ৩৯
বৈষয়িক ও নৈতিক জীবনে সৎপথের নিদর্শনের প্রয়োজন ৪০
মানুষের জন্যে সচেতন পথনির্দেশের গুরুত্ব ৪১
নবুয়াত কি ? ৪৩
মানুষের জীবনের চয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ৪৪
রসূলগণের মর্যাদা ৪৪
নবীর চিহ্ন ৪৪
নবীর আনুগত্য ৪৫
নবীদের ওপর ঈমান আনার প্রয়োজন ৪৬
এক নজরে নবুয়াতের ধারাবাহিকতার ইতিহাস ৪৮
নবীদের কাজ ৫০
নবীদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হয় ৫০
নবীদের দাওয়াত ও মর্যাদা ৫২
বিপর্যয় দূর করাই নবীদের কাজ ৫৫
রসূল পাঠাবার উদ্দেশ্য ৫৬
ফায়সালার সময়ের পূর্বে রসূলদের আগমন ৫৭
নবীগণ একই দ্বীনের পতাকাবাহী ৫৮
নবুয়াত লাভের পূর্বে নবীগণের চিন্তাধারা ৫৮
রসূলের ইলমে গায়েব ৬০
নবীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ৬১
প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ ৬১
অস্বাভাবিক শক্তি ৬২
নবীদের মানবিক সত্তা ৬২
নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ ৬২
নবীদের গুণাবলী সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত ৬৩

অধ্যায় ২ ঃ অহী ৭১
অহীর অর্থ, রূপ ও প্রকারভেদ ৭১
শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ৭১
অহীর প্রকারভেদ ৭১
ভুল ধারণা ৭২
বিভিন্ন প্রকার অহী সম্পর্কে আরও কিছু কথা ৭২
স্বপ্নের মধ্যে অহী ৭৪
মৌমাছির প্রতি অহী ৭৪
মূসার মায়ের প্রতি অহী ৭৫
শয়তানের অহী নিজেদের সাথীদের প্রতি ৭৫
রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর অহী কোন অভিনব ঘটনা নয় ৭৫
রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর কুরআনের অহী অবতীর্ণ হওয়া ৭৬
রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি ৭৭
এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা ৭৮
আল্লাহর অহী হবার ব্যাপারে কুরআনে চ্যালেঞ্জ ৮০
বৃষ্টির সাথে অহীর তুলনা ৮৩

রসূলের ওপর অবতীর্ণ অহী
আল্লাহর রহমত ৮৩
রসূলের (সা) অহীর জন্যে রূহ
শব্দের ব্যবহার ৮৪
অহী হিসেবে অবতীর্ণ বাণীর
পক্ষে যুক্তি-প্রমাণাদি ৮৬

অধ্যায় ৩ ঃ নবুয়াতে মুহাম্মদী (সা)-এর
প্রয়োজন ও তার প্রমাণ ৮৭
পূর্ববর্তী নবীগণের পরে রসূলুল্লাহ (সা)-
কে প্রেরণ করার কারণ ৮৯
আরববাসীরা পূর্ব থেকেই একজন নবীর
দাবী জানিয়ে আসছিল ৯০
একটি উজ্জ্বল প্রমাণ
উপস্থাপনের প্রয়োজন ৯০
নবী প্রেরণের স্থান নির্বাচন ৯২
অজ্ঞ জাতির জন্য সর্বোত্তম নেতা ৯৩
রসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াতের
বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ ৯৫
চৌদ্দশ' বছর আগের পৃথিবী ৯৫
আরব দেশের অবস্থা ৯৬
সামনে এলেন এক ব্যক্তি ৯৭
তাঁর কর্মকাণ্ড ৯৭
মানসিক ও আত্মিক পরিবর্তন ৯৮
বিপ্লবের বাণী ৯৯
জাতির প্রতিক্রিয়া ১০০
কষ্ট সহ্য কেন ? ১০০
অবস্থার পরিবর্তনের অপরদিক ১০১
নৈতিক কর্মপদ্ধতি ১০৩
আধুনিক যুগের নির্মাতা ১০৩
সমস্ত উন্নত গুণের সমাহার ১০৫
পরিবেশের উর্ধে ১০৫
ইতিহাস স্রষ্টা ১০৬
পরিপূর্ণ সত্যনিষ্ঠা ১০৭
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতের
স্বপক্ষে কুরআনের যুক্তি ১০৯
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ১০৯
হযরত (সা)-এর নিরক্ষর হওয়াটাই
নবুয়াতের প্রমাণ ১০৯
নবুয়াত-পূর্ব জীবনকে প্রমাণ হিসেবে
উপস্থাপন ১১২
কুরআন একটা অলৌকিক রচনা এবং
নবুয়াতের প্রমাণ ১১৮
বিশ্বনবী সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জিলের
ভবিষ্যদ্বাণী ১২০
হযরত ঈসা (আ)-এর
গুরুত্বপূর্ণ উক্তি ১২০
তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ১২০
ইঞ্জিলে নবুয়াতে মুহাম্মদীর সুসংবাদ ১২২
এক ঃ 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' ১২৩
দুই ঃ হযরত মসিহ, হযরত ইলিয়াস
(আ) এবং 'সেই নবী' ১২৩
তিন ঃ যোহনের ইঞ্জিলের বক্তব্য ১২৪
চার ঃ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর
তাৎপর্য ১২৪
পাঁচ ঃ তিনি সারা দুনিয়ার
নেতা হবেন ১২৬
ছয় ঃ মুনহামান্না ১২৭
সাত ঃ নাজ্জাসীর সাক্ষ্য ১২৭
আট ঃ বারনাবাসের ইঞ্জিল ১২৮
নয় ঃ বারনাবাসের ইঞ্জিল কি ? ১২৯
দশ ঃ খৃষ্টানরা বারনাবাসের ইঞ্জিলের
বিরোধী কেন ? ১৩১
এগার ঃ বারবানাসের ইঞ্জিলের
বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী ১৩৩
দু'টি সন্দেহের জবাব ১৩৬

অধ্যায় ৪ ঃ বিশ্বনেতা ১৩৯
সারা দুনিয়ার সার্বজনীন
উত্তরাধিকার ১৪১
সরওয়ারে আলমের প্রকৃত অবদান ১৪৫
ঈমান একটা কর্মোদ্দীপক শক্তি ১৪৫
সারা জীবনের জন্যে খোদা
পুরস্তির চরিত্র ১৪৬
নবী মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষা ১৪৬

অধ্যায় ৫ ঃ খতমে নবুয়াত ১৫১
খতমে নবুয়াতের তাৎপর্য ও তার যুক্তি ১৫৩
খতমে নবুয়াতের নির্ভুল ব্যাখ্যা ১৫৩
রসূলে করীম (সা)-এর পূর্বের যুগের বিশেষ অবস্থা ১৫৩
দ্বীনের পূর্ণতা ও খতমে নবুয়াত ১৫৪
খতমে নবুয়াতের প্রমাণ ১৫৪
সমগ্র মানবজাতির জন্যে হেদায়াতের উপায় ১৫৬
সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী ১৫৭
সমগ্র মানবজাতির জন্যে আল্লাহর রহমত ১৫৮
সমগ্র মানবজাতির জন্যে রসূল ১৫৮
আল্লাহর শেষ নবী ১৬০
খতমে নবুয়াত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত ১৬০
খতমে নবুয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি আয়াতের যুক্তি ১৬২
শেষ নবীর পর নবুয়াতের দাবী ১৬৬
খতমে নব্যুয়াতের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের আর একটি যুক্তি ১৭০
খতমে নব্যুয়াতের আয়াতের তিনটি যুক্তি ১৭৪
খতমে নবুয়াতের আকীদা সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা ১৭৭
খাতামান নাবীয়্যীন শব্দের আভিধানিক অর্থ ১৭৭
রসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ১৭৯
সহাবীদের ইজমা ১৮৪
আলেম সমাজের ইজমা ১৮৬
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ১৯২
এখন নতুন নবীর প্রয়োজনটা কি ? ১৯৩
নতুন নবুয়াত বর্তমান উম্মতের জন্যে রহমতের বার্তাবহ নয় ১৯৫
হাদীসের আলোকে 'প্রতিশ্রুত মসীহ'-এর তাৎপর্য ১৯৬
হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কিত হাদীস ১৯৬
এ হাদীসগুলো থেকে কি প্রমাণিত হয় ২০৪
কাদিয়ানদের আরও কিছু বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা ২১২
কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ ২১২
গায়ের জোরে প্রমাণ করা ২১২
সূরা আরাফের আয়াতের সঠিক অর্থ ২১৩
সূরা মুমিনুনের আয়াতের অর্থ ২১৪
হাদীস থেকে কাদিয়ানীদের ভুল প্রমাণ উপস্থাপন ২১৫
শেষ কথা ২১৬

অধ্যায় ৬ ঃ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যক্তিগত জীবন ও নবী-জীবন ২১৯
মহানবীর অনুসরণ ও আনুগত্য ২১৯
শিক্ষক, প্রশিক্ষণদাতা ও আদর্শ মানুষ ২১৯
কেবল মাত্র প্রচারক ও বার্তাবাহক নন ২২২
তিনি প্রবৃত্তি ও মনের খেয়াল-খুশী দ্বারা চালিত হতেন না ২২২
সকল অবস্থায় তাঁর অনুসরণ বাধ্যাতামূলক ২২৩
নবী মুহাম্মদ (সা) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার নিযুক্ত আমীর ২২৪
নেতা বা আমীর হিসেবে রসূলের আনুগত্য ২২৪
একটা অদ্ভুত যুক্তি ২২৫
নবীর নেতৃত্বের বিশিষ্ট মর্যাদা ২২৬
আনুগত্যের তিনটি পর্যায় ২২৬
ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টির ভ্রান্ত প্রচেষ্টা ২২৭
নবীর আনুগত্য এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামী ধারণা ২২৯
নির্দেশ দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহর ২২৯

মানুষের ওপর মানুষের
শাসন কর্তৃত্ব ২৩০
নবীর আনুগত্য কি হিসেবে
করতে হবে ২৩০
নিরংকুশ আনুগত্য ২৩১
নবী মানুষকে তাঁর গোলামে
পরিণত করেন না ২৩২
নবী হিসেবে নবীর আনুগত্য ২৩৩
নবীর আনুগত্য আল্লাহর
নির্দেশের অধীন ২৩৪
মহানবীর (সা) জীবনের উদ্দেশ্য
ছিল দু'টি ২৩৪
মতামতের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত
করার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ২৩৫
হযরত যায়েদের ঘটনার তাৎপর্য ২৩৭
চিন্তার স্বাধীনতা সম্পর্কে নবীর শিক্ষা ২৩৮
খেলাফতে রাশেদার পর
চিন্তার স্বাধীনতা ২৩৮
ফকীহ ও ইমামদের চিন্তার স্বাধীনতা ২৩৯
চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত
স্বাধীনতার পতন যুগ ২৪০
রিসালত ও তদসংক্রান্ত
ইসলামী বিধান ২৪২
একটি দলের দৃষ্টিকোণ ২৪২
দ্বিতীয় একটি দলের দৃষ্টিভঙ্গী ২৪৩
তৃতীয় দলের অভিমত ২৪৩
চতুর্থ দলের অভিমত ২৪৩
শৈশবকাল থেকেই নবীদের
তরবিয়তের বিশেষ ব্যবস্থা ২৪৩
অসাধারণ যোগ্যতা ও বিশেষ
কর্মক্ষমতা ২৪৬
নবীদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণে
আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থা ২৪৯
আপেক্ষিক পর্যালোচনা ২৫২
নবী পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম মানবীয়
গুণে ভূষিত ২৫২
প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ ২৫৩
নবী ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ২২৮
নবীর আনুগত্য শর্তহীন ও সীমাহীন ২৫৫
নবীর আনুগত্য সাধারণ মানুষের
আনুগত্যের মত নয় ২৫৬
নবীর পথ নির্দেশের জন্যে অহী
গায়ের-মতলু ২৫৬
নবীর প্রতি অবতীর্ণ গায়ের মতলু অহীর
কতিপয় দৃষ্টান্ত ২৫৭
উল্লেখিত আয়াতগুলোর সারমর্ম ২৫৯
নবীর সত্যনিষ্ঠা পূর্ণনির্ভরযোগ্য ২৬০
নবীর গোটা জীবনই 'উত্তম আদর্শ' ২৬০
ব্যতিক্রমের পরিধি ২৬০
রসূল সার্বক্ষণিক রসূল ২৬২
রিসালাতের আসল উদ্দেশ্যের প্রতি
নবীর দৃষ্টি ২৬২
নবী জীবনের দুই অংশ ২৬৩
নবীর নেতৃত্ব ও অন্য নেতৃত্বে পার্থক্য ২৬৪
রসূল (সা)-এর ব্যক্তি জীবন ও নবী-
জীবনের পর্যালোচনা ২৬৫
এক ঃ আলোচনার তাত্ত্বিক দিক ২৬৬
দুই ঃ বাস্তব ও ব্যবহারিক দিক ২৬৭
কয়েকটি লক্ষ্যণীয় দৃষ্টান্ত ২৬৯
পরবর্তী যুগে নবী-মর্যাদা
নির্ণয়ের উপায় ২৭০
কুরআনের দৃষ্টিতে নবুয়্যাতের
পদ ও দায়িত্ব ২৭১
রসূলের (সা) কাজ চার প্রকারের ২৭১
আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা দানকারী
হিসেবে রসূলের ভূমিকা ২৭২
নেতা ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ
হিসেবে রসূল ২৪৬
আইন প্রণেতা হিসেবে রসূলের
(সা) ভূমিকা ২৭৪
বিচারক হিসেবে রসূল
(সা)-এর ভূমিকা ২৭৫
শাসক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে
রসূলের ভূমিকা ২৭৭
নবী (সা)-এর আমলে বিচার বিভাগের
কার্যপদ্ধতি ২৭৯

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক মূলনীতিতে রসূলের মর্যাদা ২৭৯
নবী (সা)-এর প্রতি কুরআন ছাড়া অতিরিক্ত অহী নাযিল ২৮৪
কেবলা নির্ধারণ ২৮৬
মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ২৮৭
গোপন আলাপ ২৮৮
যয়নবের বিয়ে ২৮৯
গাছ কাটার অনমুতি ২৮৯
বদর যুদ্ধের পূর্বেকার একটি প্রতিশ্রুতি ২৮৯
মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনায় জবাব ২৮৯
আযান ও জুময়ার নামায ২৯০
নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি ২৯১

অধ্যায় ৭ ঃ রসূলের মানবত্ব ২৯৩
নবীত্ব ও মানবত্ব ২৯৫
জাহেলী দৃষ্টিভঙ্গী ঃ পয়গম্বর মানুষ হতে পারে না ২৯৫
মক্কার মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ২৯৫
নবুয়াত ও খোদা-প্রেরিত সম্পর্কে জাহেলী ধ্যান-ধারণা ২৯৫
নবীর মানুষ হওয়া অপরিহার্য কেন ? ২৯৬
মানুষের হেদায়াতের জন্যে মানুষই নবী হতে পারে ২৯৭
নবীদের মানবত্ব ২৯৮
হযরত আদম (আ) মানুষ ছিলেন ২৯৮
হযরত নূহ (আ) মানুষ ছিলেন ২৯৮
হুদ (আ) মানুষ ছিলেন ৩০০
হযরত সালেহ ও শোয়াইব মানুষ ছিলেন ৩০১
হযরত মূসা ও হারুন মানুষ ছিলেন ৩০২
সকল নবীই মানুষ ছিলেন ৩০২
নবী মুহাম্মদ (সা)-ও মানুষ ছিলেন ৩০৩
প্রাচীন জাহেলী ধ্যান-ধারণা ৩০৩
হেদায়াত প্রাপ্তির পথে বাধা ৩০৪
মানুষকেই চিরকাল রসূল বানানো হয়েছে ৩০৫
অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের পার্থক্য ৩০৬
নবীর ফেরেশতা হওয়া উচিত ছিল (?) ৩০৭
নবী হলে তো বড় লোক হবে ৩০৭
নবী (সা)-এর জীবিকা অন্বেষণ নিয়ে প্রশ্ন ৩০৮

অধ্যায় ৮ ঃ দ্বীনে হক ৩১১
ধর্ম সম্পর্কে জাহেলী ধারণা ও ইসলামী ধারণা ৩১৩
দ্বীনের ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীন ধ্যান-ধারণা ৩১৪
একটা বিশেষ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী ৩১৫
মূল্যবোধের সিদ্ধান্তকর মানদণ্ড ৩১৫
মসজিদ থেকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত ৩১৬
বিপ্লবাত্মক মতবাদ ৩১৬
'দ্বীনে হক' কাকে বলে ? ৩১৭
'আদ্দীনের' তাৎপর্য ৩১৮
'আল ইসলাম'-এর তাৎপর্য ৩১৮
কুরআনের দাবী ৩১৯
জীবনপদ্ধতির আবশ্যকতা ৩১৯
মানব জীবন অবিভাজ্য ৩২০
জীবনের ভৌগোলিক ও বংশগত বিভক্তি ৩২১
জীবনের কালগত বিভক্তি ৩২২
মানুষের জন্যে কি ধরনের জীবনব্যবস্থা প্রয়োজন ৩২৪
এরূপ জীবনব্যবস্থা কি মানুষ নিজেই রচনা করতে সক্ষম ৩২৪
'আদ্দীন' বলতে কি বুঝায় ৩২৫
মানুষের উপায়-উপকরণের পর্যালোচনা ৩২৬
এক ঃ ইচ্ছাশক্তি ৩২৭
দুই ঃ বুদ্ধিবৃত্তি ৩২৭
তিন ঃ বিজ্ঞান ৩২৮
চার ঃ ইতিহাস ৩২৯
হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল ৩২৯
একমাত্র আশার আলো ৩৩০

কুরআনের যুক্তি ৩৩১
খোদায়ী বিধান যাঁচাই
করার মাপকাঠি ৩৩২
ঈমানের দাবী ৩৩৪
ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব ৩৩৬
জীবন সম্পর্কে চারটি মতবাদ ৩৩৬
এক ঃ নির্ভেজাল জাহেলিয়াত ৩৩৬
দুই ঃ শির্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াত ৩৩৯
তিন ঃ বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত ৩৪২
চার ঃ ইসলাম ৩৪৪
নবীদের আগমনের উদ্দেশ্য ৩৪৭
কুরআনের দৃষ্টিতে দ্বীন ৩৪৯
আভিধানিক বিশ্লেষণ ৩৪৯
ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা ৩৫১
একটি ভুল ধারণা ৩৫২
দেশের আইন এবং দ্বীন ৩৫৫
দ্বীন স্বীয় শাসনক্ষমতা দাবী করে ৩৫৬
নবী (সা)-এর বাস্তব
ক্রিয়াকর্মের সাক্ষ্য ৩৫৭
দ্বীন একটা সার্বিক ও ব্যাপক
অর্থবোধক পরিভাষা ৩৫৭

অধ্যায় ৯ ঃ মোজেযাসমূহ ৩৬১
মোজেযা সম্পর্কে আলোচনা ৩৬৩
মোজেযা অস্বীকারকারীদের বিভ্রান্তি ৩৬৩
আসল প্রশ্ন ৩৬৩
দু'টো দৃষ্টিভঙ্গী ৩৬৩
মোজেযার সত্যতার প্রমাণ ৩৬৪
প্রাকৃতিক নিয়ম ও আল্লাহর
সর্বোচ্চ ক্ষমতা ৩৬৪
বিশ্ব প্রকৃতিতে অসংখ্য বিস্ময়কর
বস্তুর অস্তিত্ব ৩৬৫
পূর্বতন নবীগণের মোজেযা
পর্যালোচনা ৩৬৬
হযরত সালেহ (আ)-এর
উষ্ট্রীর মোজেযা ৩৬৬
মৃতের পূনর্জীবন সংক্রান্ত মোজেযা ৩৬৭
হযরত আইয়ুবের রোগ
নিরাময়কারী ঝর্ণা ৩৬৮
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর
মোজেযা ৩৬৮
চারটি পাখী জীবিত করার ঘটনা ৩৬৮
বার্ধক্যে হযরত ইবরাহীমের
সন্তান লাভ ৩৬৮
আগুন থেকে হযরত
ইবরাহীমের নিষ্কৃতি ৩৬৯
হযরত মূসা (আ)-এর
মোজেযাসমূহ ৩৬৯
হযরত মূসার লাঠি ৩৬৯
ফেরাউন গোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন
সতর্কতামূলক আযাব ৩৭০
নয়টি নিদর্শন ৩৭১
লাঠি দ্বারা সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করা ৩৭১
'মান্না' ও 'সালওয়া' ৩৭৩
হযরত সুলায়মান (আ)-এর
মোযেজা ৩৭৪
পাখীর ভাষার জ্ঞান ৩৭৪
জ্বিনেরা তাঁর অনুগত ছিল ৩৭৪
সাবার রাণীর সিংহাসন এক নিমিষে
হাযির করা হয়েছিল ৩৭৪
অন্যান্য নবীর মোজেযা ৩৭৪
ইউনুস (আ)-এর ঘটনার
অলৌকিক দিক ৩৭৪
বৃদ্ধা স্ত্রীর গর্ভ থেকে হযরত
যাকারিয়ার সন্তান লাভ ৩৭৫
হযরত ঈসা (আ)-এর মোজেযা ৩৭৫
হযরত ঈসার বিনা বাপে জন্মলভ ৩৭৫
দোলনায় সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর
কথা বলা ৩৭৭
কুরআনে উল্লেখিত অন্যান্য মোজেযা ৩৭৯
নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর
মোজেযাসমূহ ৩৭৯
কুরআনকেই নবুয়াতের প্রমাণ হিসেবে
পেশ করা হয়েছে ৩৭৯
নবী মুহাম্মদ (সা) আপন উদ্যোগে
মোজেযা দেখাতে সক্ষম ছিলেন না ৩৮০

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সবচেয়ে বড় মোজেযা কুরআন ৩৮০
নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বস্তুগত মোজেযার পরিবর্তে জ্ঞানগত মোযেজা দেয়ার কারণ ৩৮২
একটা বড় রকমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোজেযা ৩৮৫
চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাবলী ৩৮৫
বর্ণনাসমূহের সার সংক্ষেপ ৩৮৫
ঘটনাটির আসল ধরন ৩৮৬
কিছু প্রতিবাদ ও তার জবাব ৩৮৭

অধ্যায় ১০ ঃ মাসালায়ে শাফায়াত ৩৮৯
মাসালায়ে শাফায়াতের বিভিন্ন দিক ৩৯১
আল্লাহর ওপর কারও প্রভাব খাটে না ৩৯১
শাস্তিযোগ্য লোকদের জন্যে কোন সুপারিশ নেই ৩৯২
সুপারিশের জন্যে অনুমতির প্রয়োজন ৩৯৪
শাফায়াতের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের কারণ ৩৯৬
মুশরিকদের কল্পিত সুপারিশকারী ৩৯৭
পুত্রের জন্যে হযরত নূহ (আ)-এর দোয়া করার দৃষ্টান্ত ৪০০
পার্থিব জীবনে আল্লাহর কাছে সুপারিশের মুশরিকী ধারণা ৪০১
আল্লাহর ফায়সালা কেউ রুখতে পারে না ৪০৩
কোন্ ক্ষেত্রে সুপারিশের দরজা বন্ধ হয় ৪০৪
হাশরের দিন শাফায়াতকারী হিসেবে নবী মুহাম্মদ (সা) ৪০৫

অধ্যায় ১১ ঃ ভবিষ্যদ্বাণী ৪০৭
নবী পাকের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী ৪০৮
কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ৪০৯
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ৪০৯
দ্বীন বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ৪০৯
উৎকৃষ্ট যুগের নিশ্চয়তাদান ৪১০
বোঝা অপসারণের অর্থ ৪১১
রফ্য়ে যিকর ৪১২
শরহে সদর ৪১৩
কাওসারের সুসংবাদ ৪১৫
কাওসার সুসংবাদের পারলৌকিক দিক ৪১৯
আবু লাহাবের ভয়াবহ পরিণাম ৪২২
নবীকে বহিষ্কার করার জন্য মক্কাবাসীদের শাস্তি ৪২২
কুরাইশ দলের পরাজয় ৪২৩
মক্কা বিজিত হবে ৪২৩
কুরআনের দাওয়াত চারদিকে অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে ৪২৪
নবী পাকের জন্যে উচ্চমর্যাদা ৪২৬
নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যে মাকামে মাহমুদ ৪২৬
পরাজিত রোম সম্রাজ্যের জন্যে জয়লাভের সুসংবাদ ৪২৭
ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণ ৪৩০
ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যাপী হামলা ৪৩১
ইহুদীদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ৪৩২
হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী ৪৩৪
পরিপূর্ণ নিরাপত্তার যুগ ৪৩৪
আরব ও অনারবের ওপর জয়লাভের শর্ত ৪৩৪
কুরাইশদের রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা ৪৩৫
জিহাদ অব্যাহত থাকবে ৪৩৫
মুসলমানদের অধঃপতন ইহুদী ও খৃস্টানদের মতোই হবে ৪৩৫
মিল্লাতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের রূপরেখা ৪৩৫
আমীর-ওমরা ও শাসকদের নৈতিক অধঃপতন ৪৩৬
দ্বীন পুনর্জাগরণের ধারাবাহিকতা ৪৩৭
মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের প্রকাশ ৪৩৮

মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ৪৩৮
বর্ণনাগুলোর মধ্যে সত্য
ও মনগড়া উপাদন ৪৩৮
নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশভঙ্গী ৪৩৯
সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াতগুলোর গরমিল ৪৩৯
কামেল মুজাদ্দিদের মর্যাদা ৪৩৯
মাহদী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ৪৪০
মাহদী সম্পর্কে গ্রন্থকারের ধারণা ৪৪০
মাহদী হওয়াটা দাবী করার বস্তু নয় ৪৪০
মাহদীর কাজের ধরন ৪৪১
হযরত মসীহ (আ)-এর আগমন সম্পর্কে
নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ৪৪১
এতদসম্পর্কিত হাদীসসমূহ ৪৪১
মসীহ (আ)-এর প্রতিরূপ হওয়ার
ধারণা ভ্রান্ত ৪৪৯
দাজ্জাল ও তার আবির্ভাব ৪৪৯
দাজ্জালের আবির্ভাবের সময়কাল
নির্দিষ্ট নেই ৪৪৯
নবী (সা)-এর বিভিন্ন অনুমান ৪৪৯
নবী পাকের এরশাদের দু'টো অংশ ৪৫০
দ্বিতীয় অংশের আলাদা মর্যাদা ৪৫০
নবীর নিজস্ব ব্যাখ্যা থেকে
পথ নির্দেশ ৪৫১
আম্মার বিন ইয়াসেরের
হত্যার ভবিষ্যদ্বাণী ৪৫১
কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার
দশটি আলামত ৪৫২
অধ্যায় ১২ ঃ কুরআন এবং নবী
মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের
তাত্ত্বিক অসাধুতা ৪৫৩
প্রাচ্যবিদগণের অযৌক্তিক
কর্মপদ্ধতি ৪৫৫
সন্যাসী বাহিরার কাহিনী ৪৫৬
নবী (সা)-এর জাতি অভিযোগ
করেনি কেন ? ৪৫৬
মক্কার কাফেরদের অভিযোগ
কি ছিল ? ৪৫৭
প্রথম পর্যালোচনা ৪৫৭
দ্বিতীয় পর্যালোচনা ৪৫৮
তৃতীয় পর্যালোচনা ৪৫৮
চতুর্থ পর্যালোচনা ৪৫৯
কুরআনের তিনটি কাহিনী
আলোচনা ৪৬০
এক ঃ হযরত মূসা (আ)-এর
নদী-সঙ্গম ভ্রমণ ৪৬০
কাহিনীর বিশদ বিবরণ ৪৬০
তালমুদের বর্ণনা ৪৬২
প্রাচ্যবিদদের জেরা করার জন্যে
চারটি প্রশ্ন ৪৬৩
দুই ঃ ফেরাউনের মূসা (আ)-কে হত্যা
করার সংকল্প ৪৬৪
সত্যের দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ
কাহিনীর গুরুত্ব ৪৬৪
তত্ত্বানুসন্ধানের দাবীদারদের
বিভ্রান্তি সৃষ্টি ৪৬৫
তিন ঃ আসহাবে কাহাফের কাহিনী
গুহায় অবস্থানকাল
সম্পর্কে প্রতিবাদ ৪৬৫
গীবনের ধৃষ্টতা ৪৬৫
ঈসায়ী লেখকদের সাক্ষ্য ৪৬৬
দু'টি ভিন্নমুখী বর্ণনার মধ্যে
সামঞ্জস্য ৪৬৬

নির্দেশিকা ৪৬৭

মানচিত্র সূচী

ইসরাইল নেতৃবর্গ যেই ইহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে ২০৮
আসল মসীহ হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের স্থান ২০৯
হযরত মূসা ও খিজির (আ)-এর কিসসা সংক্রান্ত মানচিত্র ৪৬১

গ্রন্থকারের ভূমিকা

সকল যুগে মানুষ ইসলামের নিয়ামত মাত্র দু'টি উপায়ে লাভ করেছে। এক–আল্লাহর কালাম। দুই–নবীগণের ব্যক্তিত্ব। নবীগণকে আল্লাহ তায়ালা শুধু তাঁর বাণী পৌছিয়ে দেয়ার এবং তা শিক্ষা ও উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসেবেই পাঠাননি। বরং সেই সাথে তাঁদেরকে বাস্তব নেতৃত্বদান ও পথপ্রদর্শনের নির্দেশও দিয়েছেন, যাতে করে তাঁরা আল্লাহর বাণীর সঠিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে মানুষ ও সমাজের সংস্কার সংশোধন করতে পারেন এবং বিকৃত সমাজব্যবস্থার সংশোধন করে একটি সৎ ও সুষ্ঠু সমাজ পুনর্গঠিত করে দেখান।

এ দু'টি বিষয় চিরকাল এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে না মানুষ দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, আর না সে হেদায়াত লাভ করতে পেরেছে। আল্লাহর কিতাবকে নবী থেকে আলাদা করলে তা এক কাণ্ডারীবিহীন তরী হয়ে পড়বে। একজন অনভিজ্ঞ মুসাফির তা নিয়ে জীবন সমুদ্রে যতই ঘুরাফেরা করুক না কেন, গন্তব্যস্থলে কিছুতেই পৌছাতে পারবে না আবার নবীকে আল্লাহর কিতাব থেকে আলাদা করুন, তাহলে খোদার পথ পাওয়ার পরিবর্তে মানুষ অখোদাকে খোদা বানাবার বিপদ থেকে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। এ উভয় পরিণাম পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ভোগ করেছে। হিন্দু জাতি তাদের ধর্মপ্রবর্তকদের জীবন-চরিত বিলুপ্ত করেছে এবং শুধু ধর্মগ্রন্থ নিয়ে ক্ষান্ত হয়ে বসে পড়েছে। পরিণাম এই হয়েছে যে, ধর্মগ্রন্থগুলো তাদের জন্যে শাব্দিক গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়েছে। অবশেষে গ্রন্থগুলোও তারা বিলুপ্ত করে দিয়েছে। খৃস্টানগণ কিতাবকে উপেক্ষা করে নবীর আঁচল ও তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে ধরে রইল। পরিণামে তারা আল্লাহর নবীকে আল্লাহর পুত্র, বরং স্বয়ং আল্লাহ বানিয়ে ছাড়ল।

অতীতকালের ন্যায় এ আধুনিক যুগেও মানুষকে ইসলামের নিয়ামত লাভ করতে হলে দু'টি মাধ্যমই অবলম্বন করতে হবে যা আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। এক. আল্লাহর কালাম যা একমাত্র কুরআন পাকের আকারেই পাওয়া যেতে পারে। দুই. নবীর আদর্শ যা এখন শুধুমাত্র আরবের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিতের মধ্যেই সংরক্ষিত আছে। পূর্বের ন্যায় আজও যদি ইসলামের সঠিক জ্ঞানলাভ করতে হয় তাহলে তার একমাত্র পন্থা এই যে, কুরআনকে বুঝতে হবে নবী মুহাম্মদ (সা) থেকে এবং নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝতে হবে কুরআন থেকে। এ দু'টিকে একে অপরের সাহায্যে যে ব্যক্তিই বুঝতে পেরেছে, সে-ই ইসলামকে বুঝতে পেরেছে। অন্যথায় সে দ্বীন উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত রইল এবং পরিণামে হেদায়াত থেকেও বঞ্চিত রইল।

তারপর কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সা) উভয়ের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও বিশেষ কাজ যেহেতু একই, সে জন্যে সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করা যায় তার উপরই সবকিছু নির্ভর করছে। এ বিষয়টি উপেক্ষা করলে দেখা যাবে যে, কুরআন কতকগুলো, শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি এবং নবীর জীবন-চরিত কতকগুলো ঘটনার সমাবেশ বই আর কিছু নয়। অভিধান, বর্ণনা, বিবরণ ও জ্ঞান গবেষণার সাহায্যে তফসিরের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নবী পাকের ব্যক্তিসত্তা ও বর্তমান যুগ সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে কিন্তু দ্বীনের প্রাণশক্তি উপলব্ধি করা যাবে না কারণ, এ উপলব্ধি কুরআনের নিছক মূল বচন ও ঘটনাপঞ্জীর সাথে

নয় বরং ঐ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত যার জন্যে কুরআন নাযিল হয়েছিল এবং যার পতাকা বহনের জন্যে নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা যতটা স্বচ্ছ ও সঠিক হবে, কুরআন ও নবীর জীবন চরিত সম্পর্কে ধারণা ততটা সঠিক হবে। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা ভ্রান্ত হলে কুরআন ও নবী সম্পর্কে ধারণা ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

এটা অতি সত্য যে, কুরআন এবং নবী-চরিত মহাসমুদ্রের ন্যায়। কেউ যদি চায় যে, সে এসবের সকল অর্থ, মর্ম, মঙ্গল ও বরকত লাভ করবে, সে কিছুতেই তা পারবে না। অবশ্যি যতটুকু চেষ্টা করা যেতে পারে তাহল এই যে, সাধ্যমত যত বেশী জ্ঞান তার থেকে লাভ করা যায় এবং তার আলোকে দ্বীনের প্রাণশক্তি যতটা উপলব্ধি করা যায়।

আল্লাহ্ তায়ালার অসীম দয়ার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে, কুরআন পাক উপলব্ধি করাবার যতটুকু চেষ্টা ও শক্তি আমার ছিল তা কাজে লাগাবার জন্যে তিনি তাফহীমুল কুরআন সমাপ্ত করার তওফিক আমাকে দিয়েছেন। তারপর আমার একান্ত বাসনা ছিল যে, নবী পাকের জীবন-চরিতের উপর কলম ধরি। কিন্তু প্রথম কাজটি সমাধা করতে আমার জীবনের ত্রিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এরপর আমার আর এমন শক্তি নেই যে, দ্বিতীয় কাজে হাত দিই, হাত দিতে না পারায় বেদনাটা আমার মনে সর্বদা খচ খচ করছিল, এমন সময় জনাব নঈম সিদ্দিকী ও জনাব আবদুল ওয়াকিল আলভী আমার বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও প্রবন্ধাদি থেকে সীরাতের এ সংকলন সমষ্টি আমার সামনে পেশ করলেন। আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম যে, এ বিরাট বিষয়ের উপর আমার লেখার মধ্যে এত উপকরণ ছিল। সাথে সাথে তাঁদের এ অক্লান্ত শ্রমের জন্যে তাঁদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক মুবারকবাদ জানালাম এবং তাঁদের জন্যে দোয়ায়ে খায়েরও করলাম। এ জন্যে যে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা এ উপকরণগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে সেগুলোকে তাঁরা যথাযথভাবে সংকলিত করেছেন। যদিও এ উপকরণ সমষ্টি সীরাতের উপর একটি চূড়ান্ত গ্রন্থ প্রণয়নের জন্যে যথেষ্ট নয়, তথাপি এ সংকলণে যেসব বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা ইনশাআল্লাহ, নবীপাক (সা)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর বিরাট অবদান উপলব্ধি করার সহায়ক হবে।

অবশ্যি এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ গ্রন্থে যা কিছু সংযোজিত করা হয়েছে তা আমার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠকগণের ইতিপূর্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং চর্বিত চর্বনণ মানুষের কাছে ভালও লাগে না। কিন্তু এ গ্রন্থের পাঠক নিজেই অনুভব করবেন যে, যে কথাগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়েছিল এবং যা বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে লেখা হয়েছিল, সেগুলো এ গ্রন্থে একত্রে একটি সংকলনের আকারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একত্রে সংকলিত গ্রন্থ অধ্যয়নের যে একটা স্বতন্ত্র উপকারিতা রয়েছে, বিক্ষিত প্রবন্ধাদি অধ্যয়নে সে উপকারিতা পাওয়া যায় না।

আল্লাহ্ পাকের কাছে এ দোয়াই করি যেন এ গ্রন্থটি তাঁর বান্দাহদের হেদায়াতের এবং আখেরাতে আমার প্রতিদানের উপায় হয়।

—আবুল আ'লা

লাহোর
১৯শে যিলকদ, ১৩৯২ হিজরী
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ

অধ্যায় ঃ ১

নবুয়াতের মর্মকথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানবতার জন্যে আল্লাহর পথনির্দেশ

বিশ্বজাহানের প্রভু, সমগ্র পৃথিবী, আকাশ ও সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, মালিক ও শাসনকর্তা, তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের এ অংশে—যাকে আমরা পৃথিবী বলে জানি—মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে জানার, চিন্তা করার ও বুঝবার শক্তি দিয়েছেন। ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যাঁচাই-বাছাই-নির্বাচন করার ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিজের এখতিয়ার খাটাবার অধিকার দান করেছেন। মোটকথা, এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন দান করে তাকে পৃথিবীতে নিজের খলীফা বা প্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত করেছেন।

বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ পদে অধিষ্ঠিত করার সময় তার মনে ভালভাবে এ কথা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, তিনিই মানুষ ও সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক, সকল আনুগত্যের অধিকারী ও শাসনকর্তা। তাঁর এ সাম্রাজ্যে মানুষ স্বাধীন নয়, অন্য কারও অধীনও নয় এবং তিনি ছাড়া আর কেউ মানুষের আনুগত্য, দাসত্ব, বন্দেগী ও পূজা-উপসনা লাভের অধিকারীও নয়। দুনিয়ার এ জীবনে মানুষকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে পাঠান হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এ আসলে তার জন্য পরীক্ষার একটি সময়কাল। এ সময়কাল অতিবাহিত হবার পর সকল মানুষকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তাদের কৃতকর্মসমূহ বিচার করে তাদের মধ্যে কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে আর কে ব্যর্থকাম হয়েছে সে সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করবেন। মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র এটি হবে যে, তারা আল্লাহকে তাদের একমাত্র মাবুদ, উপাস্য ও শাসনকর্তা বলে মেনে নেবে। তিনি যে বিধান দেবেন সে অনুযায়ী দুনিয়ায় কাজ করবে এবং দুনিয়াকে পরীক্ষাগার মনে করে এ চেতনা সহকারে জীবনযাপন করবে যে শেষ বিচারের সময় সফলকাম হওয়াই হচ্ছে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে এ থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গিই হবে ভ্রান্তির শিকার। যদি মানুষ প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি অবলম্বন করে (যা অবলম্বন করার স্বাধীনতা অবশ্যি তাদের রয়েছে) তাহলে তারা দুনিয়ায় শান্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা লাভ করবে এবং যখন তাঁর নিকট ফিরে যাবে তখন তিনি তাদেরকে চিরন্তন আনন্দ ও আরাম আয়েশের আবাস জান্নাত দান করবেন। আর মানুষ যদি অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে (যা অবলম্বন করার স্বাধীনতাও তাদের রয়েছে) তাহলে দুনিয়ায় তাদের বিপর্যয় ও অশান্তির সম্মুখীন হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখেরাতের জীবনে পদার্পণ করার পর নিক্ষিপ্ত হবে চিরন্তন দুঃখ, মর্মবেদনা ও বিপদের গর্তে—যার নাম জাহান্নাম।

'মুসলিম' (অনুগত) হয়ে থাকার নির্দেশ

বিশ্বজগতের প্রভু মানুষকে পৃথিবীতে অনুগত হয়ে বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ধরনের আদি মানুষ আদম (আ) ও হাওয়া এবং তাঁদের সন্তান-সন্তুতিদেরকে পৃথিবীতে কিভাবে কাজ করতে হবে সে পথও দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রথম মানুষ তাঁর সৃষ্টিলগ্নে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন না, বরং পৃথিবীতে পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল

পরিবেশে আল্লাহ তাঁর জীবনের সূচনা করেছিলেন। তিনি সত্য অবগত ছিলেন। তাঁকে তাঁর জীবন যাপন করার বিধানও দান করা হয়েছিল আর জীবন পদ্ধতি ছিল আল্লাহর আনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) এবং তিনি নিজের সন্তানদেরকে আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) হয়ে পৃথিবীতে বসবাস করার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন।

সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি

কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মানুষ ধীরে ধীরে সঠিক জীবন পদ্ধতি (দ্বীন) থেকে বিচ্যুত হয়ে ভুল পথে পা বাড়ায়। গাফলতি ও অবহেলা করে তারা এ জীবন পদ্ধতি বিলুপ্ত করে বসে এবং অসৎ মনোভাব ও দুষ্ট কার্যকলাপের মাধ্যমে একে বিকৃতও করে ফেলে। পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন মানবিক, অমানবিক, কাল্পনিক ও বস্তুসত্তাকে তারা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অংশীদারে পরিণত করে। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য জ্ঞানের মধ্যে তারা বিভিন্ন রকমের কল্পনা, ভাববাদ, মতাদর্শ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে নিজেদের প্রবৃত্তি, ঝোঁক প্রবণতা ও একদেশদর্শী মনোভাব অনুযায়ী এমন জীবনবিধান তৈরী করে নেয় যার ফলে আল্লাহর জমিন যুলুমে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আল্লাহ মানুষকে যে সীমিত স্বায়ত্তশাসন দিয়েছেন তারপর এটা কি করে হতে পারে যে তিনি নিজের সৃষ্টিক্ষমতা ব্যবহার করে বিপথগামী লোকদেরকে জোর করে সঠিক পথের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন ? আর তিনি মানুষের বিভিন্ন গোত্র ও জাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্যে যে সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তারপর বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি সকল মানুষকে ধ্বংস করে দেবেন—এটাও ঠিক হয় না। মানব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে মানুষের পথ-প্রদর্শনের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। কাজেই নিজের ওপরে আরোপিত এ দায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি মানুষের মধ্য থেকেই এমন সব লোকদেরকে ব্যবহার করা শুরু করলেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর ইচ্ছা ও আদেশের অনুগত ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর প্রতিনিধি বানালেন। তাদের কাছে নিজের বাণী পাঠালেন। তাদেরকে সত্য জ্ঞান দান করলেন। সঠিক ও নির্ভুল জীবনবিধান দান করলেন। পথভ্রষ্ট আদম সন্তানদেরকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানাবার জন্যে তাদেরকে নিযুক্ত করলেন।

আল্লাহর এ নিয়োজিত পয়গম্বরগণ বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে আবির্ভূত হতে থাকেন। হাজার হাজার বছর ধরে তাদের আগমন চলতে থাকে। সংখ্যায়ও তাঁরা ছিলেন অগণিত। তাদের সবার দ্বীন ছিল একই। অর্থাৎ সেই সত্য-সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনবিধান যা প্রথম দিনেই মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা সবাই একই হেদায়াত বা পথের অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ তারা ছিলেন চরিত্র, নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সেই প্রাথমিক ও চিরন্তন নীতির অনুসারী, যা সৃষ্টির প্রারম্ভেই মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছিল। তাদের সবার একই মিশন ছিল। তাদের মিশন ছিল নিজেদের গোত্র ও জাতিকে এই দ্বীন ও হেদায়াতের দিকে আহ্বান করা অতপর যারা আহ্বান গ্রহণ করে নেবে। তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মত ও দলে পরিণত করা যে নিজে আল্লাহর আইনের অনুগত হবে এবং দুনিয়ায়ও আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করবে এবং এ আইনের বিরোধিতা রোধ করার জন্যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এ পয়গম্বরগণ প্রত্যেকেই নিজেদের

যুগে যথাযথভাবে তাঁদের ওপর আরোপিত মিশনের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে বিপুলসংখ্যক লোক তাঁদের আহ্বান গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। আর যারা এ আহ্বান গ্রহণ করে মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারাও ধীরে ধীর নিজেরাই বিকৃত হতে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কোন কোন উম্মত আল্লাহর হেদায়াতকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে বসে এবং অনেকে আল্লাহর বাণীর মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্ধন ও বিকৃতি ঘটিয়ে তার চেহারাই বদলে দেয়।

অবশেষে বিশ্বজগতের প্রভু আরব দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়ে দেন ঐ একই দায়িত্ব দিয়ে যে দায়িত্ব দিয়ে তিনি ইতিপূর্বে অতীত নবীগণকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আহ্বান জানালেন সাধারণ মানুষকে এবং অতীত নবীগণের পথভ্রষ্ট অনুসারীদেরকেও। সবাইকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সত্য পথের দিকে আহ্বান জানানো, সবার নিকট নতুন করে আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়া এবং যারা এ পথ ও হেদায়াত গ্রহণ করবে তাদেরকে এমন একটি উম্মতে পরিণত করা তাঁর দায়িত্ব ছিল যারা একদিকে আল্লাহর হেদায়াতের ভিত্তিতে নিজেদের জীবন ব্যবস্থা কায়েম করবে এবং অন্যদিকে দুনিয়াবাসীদের সংশোধনের জন্যেও প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।[২]

নবুয়াত ও আদি চুক্তি

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ اَوْتَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَاۤؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ○ (اعراف : ١٧٢-١٧٣)

"আর [হে নবী (সা)]! লোকদেরকে সে সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও যখন তোমার প্রভু বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরকে বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই ?' তার জবাব দিয়েছিল ঃ 'হাঁ অবশ্যি আপনি আমাদের প্রভু। আমরা এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এটা আমি এ জন্যে করেছিলাম যে, তোমরা কিয়ামতের দিন যেন এ কথা বলতে না পার ঃ 'আমরা তো এ কথা জানতাম না।' অথবা এ কথা না বলতে পার ঃ 'শিরকের সূচনা তো আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের পূর্বে করেছিলেন আর আমরা পরে তাদের বংশে জন্মেছি। অতপর আপনি কি আমাদেরকে এমন ভুলের জন্যে পাকড়াও করছেন যা বিভ্রান্ত লোকেরা করেছিল।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭২-১৭৩)

সৃষ্টির আদি যুগে আদমের সমস্ত বংশধরদের নিকট থেকে যে উদ্দেশ্যে স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছিল এ আয়াতে তা বলা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, যেসব মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করবে, তাদের এ অপরাধের জন্যে তারা নিজেরাই পুরোপুরি দায়ী বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে নিজেদের সাফাই গাইতে গিয়ে তারা না জানার ওজর পেশ করার সুযোগ পাবে না এবং নিজেদের ভুলের দায়-দায়িত্ব পূর্ববর্তী বংশধরদের

ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্তও করতে পারবে না। অন্য কথায়, জন্মলগ্নের এই আদি শপথ ও চুক্তিটিকে আল্লাহ তায়ালা এ কথার দলিল হিসেবে গণ্য করেছেন যে, আল্লাহর একমাত্র ইলাহ এবং একমাত্র রব ও প্রভু হবার সাক্ষ্য প্রত্যেকটি মানুষই ব্যক্তিগত ভাবে নিজের মধ্যে বহন করে আসছে এবং একমাত্র এ জন্যেই কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ অজ্ঞতার মধ্যে অথবা বিভ্রান্ত পরিবেশে লালিত পালিত হবার কারণে নিজের ভুল ও পথভ্রষ্টতার দায়িত্ব থেকে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত করতে পারবে—এ কথা বলা ভুল হবে।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, যদি এই আদি চুক্তিটি যথার্থই কার্যকর হয়ে থাকে,তাহলে আমাদের চেতনা ও স্মৃতিতে এটি সংরক্ষিত আছে কি ? আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি এ কথা জানে যে, সৃষ্টির পূর্বলগ্নে তাকে তার আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং তাকে 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই' এ প্রশ্ন করা হয়েছিল আর সে এর জবাবে 'হাঁ' বলেছিল ? জবাব যদি না সূচক হয়ে থাকে তাহলে যে শপথের স্মৃতি আমাদের চেতনা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাকে কেমন করে আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে ?

এর জবাবে বলা যায়, মানুষের চেতনা ও স্মৃতিতে যদি ঐ চুক্তি ও শপথের চিহ্ন তাজা রাখার ব্যবস্থা করা হতো, তাহলে মানুষকে দুনিয়ার বর্তমান পরীক্ষাগারে পাঠানো আদতেই অর্থহীন হয়ে যেত। কারণ প্রশ্ন আউট করার পরে সত্যিই এ ধরনের পরীক্ষার কোন অর্থই থাকত না। কাজেই স্মৃতি ও চেতনায় এর চিহ্ন তাজা হয়নি ঠিকই কিন্তু অবচেতন মনে (Sub-conscious mind) ও অনুভূতিতে (Intuition) তা অবশ্যই সংরক্ষিত আছে! আমাদের অন্যান্য অনুভূতি ও অবচেতনালব্ধ জ্ঞানের যা অবস্থা এর অবস্থাও তাই। মানুষ আজ পর্যন্ত সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে যা কিছু অর্জন করতে পেরেছে তার সবটুকুর সম্ভাবনা আসলে মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। বাইরের শক্তি ও ভেতরের শক্তিগুলো মিলে যা কিছু করতে সক্ষম হয়েছে তা কেবল এতটুকুই যে, যা প্রচ্ছন্ন ছিল তাকে কার্যত উপস্থিত করেছে। এ কথা সত্য, মানুষের মধ্যে যে বস্তু-বিষয়টির সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন নেই কোন শিক্ষা, অনুশীলনী, পরিবেশের প্রভাব ও আভ্যন্তরীন শক্তি তার মধ্যে কোন ক্রমেই সেটির জন্ম দিতে পারে না। অনুরূপভাবে এ শক্তিগুলো হাজার চেষ্টা করেও মানুষের মধ্যে যে বস্তু-বিষয়গুলোর সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাদের একটিও চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা রাখে না। বড় জোর তারা এতটুকু করতে পারে যে, তাকে তার আসল প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত (Pervert) করতে পারে কিন্তু এতদসত্ত্বেও সবরকমের বিকৃতি, বিচ্যুতি ও বিপথগামিতার পরও এ বস্তু বিষয়টি ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকবে, আত্মপ্রকাশ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করতে থাকবে এবং বাইরের আকর্ষণ ও আবেদনের জবাব দেবার জন্যে নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখবে। আমি আগেই বলেছি আমাদের সব রকমের অনুভূতি ও অবচেতনালব্ধ জ্ঞানের ব্যাপারে এই একই কথা বলা যায় ঃ

ওপরে বর্ণিত সবকিছুই আমাদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং কার্যত আমাদের থেকে যা কিছু প্রকাশ পায় তার মাধ্যমেই আমরা ওগুলোর অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাই।

এ সবগুলোর আত্মপ্রকাশের জন্যে বাইরে থেকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, শিক্ষা ও অনুশীলনীর প্রয়োজন। যা কিছু আমাদের থেকে আত্মপ্রকাশ করে তা আসলে বাইরের

আবেদনের জবাব। আর এ জবাবগুলো আসে আমাদের মধ্যকার ক্রিয়াশীল অস্তিত্বগুলোর পক্ষ থেকে।

ভেতরের ভ্রান্ত প্রবৃত্তি ও বাইরের ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া এ সবগুলাকে দমিত, প্রচ্ছন্ন, বিকৃত করে নিশ্চিহ্ন প্রায় করতে পারে কিন্তু পুরোপুরি বিলুপ্ত করতে পারে না। এ কারণে আভ্যন্তরীন অনুভূতি ও বাইরের প্রচেষ্টা উভয়েরই মাধ্যমে সংশোধন ও পরিবর্তন (Conversion) সম্ভবপর।

এ বিশ্বজগতে আমাদের আসল মর্যাদা ও বিশ্ব জগতের স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপার যে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের অধিকারী আমরা হয়েছি তার অবস্থাও ঠিক এই একই পর্যায়ের।

এর অস্তিত্বের প্রমাণ হচ্ছে এই যে, মানব জীবনের সকল যুগে, সর্বকালে, সর্বদেশে, প্রত্যেকটি লোকালয়ে, বংশ, গোত্র ও ব্যষ্টি মানুষের মধ্যে এর উৎপত্তি ও বিকাশ দেখা যায়। কোন যুগে, কোন কালে দুনিয়ার কোন শক্তি একে বিলুপ্ত করতে সক্ষম হয়নি।

যখনই এটি আমাদের জীবনে বাস্তবতঃ কার্যকর হয়েছে তখনই সুফল দানে সক্ষম হয়েছে। এটিই এর সত্যানুযায়ী হবার প্রমাণ।

এর উৎপত্তি, আত্মপ্রকাশ ও বাস্তব আকৃতি লাভের জন্যে সবসময় বাইরের একটি আবেদনের প্রয়োজন দেখা গেছে। এ জন্যেই আল্লাহর নবীগণ আসমানী গ্রন্থসমূহ ও তাদের অনুসারী সত্যের আহবায়কগণ সবাইকে দেখা গেছে এই একই কার্য সম্পাদনে তৎপর। তাই কুরআনে তাদেরকে মুযাক্কির (যে স্মরণ করিয়ে দেয়), যিকির (স্মরণ), তাযকিরাহ (স্মৃতি) এবং তাদের কাজকে তাযকীর (স্বরণ করিয়ে দেয়া) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, নবীগণ, আসমানী গ্রন্থসমূহ ও সত্যের আহবায়কগণ মানুষের মধ্যে কোন নতুন বস্তু বিষয় সৃষ্টি করেন না বরং তাদের অভ্যন্তরদেশে পূর্ব থেকে যে বস্তু বিষয়টি বিদ্যমান ছিল তাকে বিকশিত ও সবীজ করেন মাত্র।[৩]

নবুয়াতের ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধির রায়

বড় বড় শহরে আমরা দেখি বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে শত শত কল-কারখানা চলছে। ট্রাম ও রেলগাড়ি চলছে। রাতে অকস্মাৎ হাজার হাজার বাতি জ্বলে ওঠে, গরমের সময় ঘরে ঘরে মাথার ওপর পাখা ঘোরে। কিন্তু এসব ঘটনা দেখে আমরা একটুও অবাক হই না। এসব জিনিসের উজ্জ্বল ও গতিশীল হবার পেছনে যে কারণ রয়েছে, সে ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত দেখা যায় না। এর কারণ কি ? এর কারণ, যেসব তারের সাথে এ বাতিগুলো সংযুক্ত হয়েছে সেগুলা আমরা স্বচক্ষে দেখি। এ তারগুলো যে বিজলী ঘরের সাথে সংযুক্ত তার অবস্থাও আমরা জানি। এ বিজলী ঘরে যেসব লোক কাজ করে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমরা অবগত আছি। যে ইঞ্জিনিয়ার এ কর্মচারীদের কাজ দেখাশোনা করে তাকেও আমরা জানি। আমরা এও জানি, ঐ ইঞ্জিনিয়ার বিজলীর কাজ জানে, তার কাছে অনেক যন্ত্রপাতি আছে। ঐ যন্ত্রগুলো চালিয়ে সে এ শক্তিটি উৎপন্ন করছে। আর এ উৎপাদিত শক্তিটির সাহায্যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, ট্রাম ও রেলগাড়ী ছুটে চলছে এবং কল-কারখানার চাকা অনবরত ঘুরে চলেছে। কাজেই বিজলীর চিহ্ন দেখে তার কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতবৈষম্য দেখা না দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, এ কার্যকারণগুলোর সমগ্র পর্যায় আমাদের অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত এবং আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। মনে করুন এ বাতিগুলো জ্বলে উঠত, পাখাগুলো বন বন করে ঘুরত, ট্রাম ও রেলগাড়ী ছুটে চলত, কল-কারখানা ও মেশিনের চাকা ঘুরত কিন্তু যে তারগুলোর সাহায্যে এসবগুলোর মধ্যে বিজলী সরবরাহ করা হয় সেগুলো অদৃশ্য থাকত, বিজলী ঘরও আমাদের অনুভূতির নাগালের বাইরে থাকত, বিজলী ঘরে যারা কাজ করছে তাদের সম্পর্কেও আমরা কিছুই জানতে পারতাম না এবং কোন ইঞ্জিনিয়ার নিজের জ্ঞান ও শক্তির সাহায্যে এ কারখানাটি পরিচালনা করছে, এ কথাও আমরা জানতে পারতাম না, তাহলে এ অবস্থায় বিদ্যুতের ঐ চিহ্নগুলো দেখে আমাদের মন কি নিশ্চিত হত ? সে সময় ঐ চিহ্নগুলোর কার্যকারণের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ঐকমত্য থাকত কি ? বলা বাহুল্য, এর জবাব নেতিবাচকই হবে। কেন ? কারণ যখন চিহ্নগুলোর কার্যকারণ প্রচ্ছন্ন থাকে এবং কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব হয় না, তখন মনে বিস্ময়ের সাথে অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়া, মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির এই সুগভীর রহস্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া এবং এ রহস্যটি সম্পর্কে ধারণা, অনুমান ও মতামত বিভিন্ন হওয়া একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

কথাটি আরো একটু স্পষ্ট করে বলা যাক। ইতিপূর্বে যে বিষয়টি নিছক অনুমান করা হয়েছিল, মেনে নিলাম বাস্তবে ও কার্যত সেটির অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ সত্যিই হাজার হাজার লাখো লাখো বিজলী বাতি জ্বলছে, লাখো লাখো বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে, গাড়ী ছুটে চলছে, কারখানা ও মেশিনের চাকা ঘুরে চলছে কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কোন্ শক্তি কাজ করছে এবং তা আসছেই বা কোথা থেকে সে কথা জানার কোন মাধ্যমই আমাদের কাছে নেই। লোকেরা এ চিহ্নগুলো দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

নানানজনের নানান মত

এসবের কারণ অনুসন্ধানে অনেকেই বুদ্ধির ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। কেউ বলে, এগুলো নিজে নিজেই জ্বলে উঠেছে, নিজে নিজেই চলছে। এদের অস্তিত্বের বাইরে এমন কোন বস্তু

নেই যা এদেরকে আলো বা গতি দান করেছে। কেউ বলে, যেসব উপাদানে এগুলো গঠিত হয়েছে সেগুলোর গঠন প্রকৃতিই এসবের মধ্যে আলো ও গতির অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছে। কারো মতে, এ বস্তু জগতের আড়ালে একদল দেবতা আছে তাদের কেউ বাতি জ্বালায় কেউ ট্রাম ও রেলগাড়ী চালায়, কেউ পাখা ঘুরায়, কেউ কারখানা ও মেশিনের চাকা ঘুরায়। আবার, একদল লোক এ ব্যাপারে চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অবশেষে তারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলতে শুরু করেছে আমাদের বুদ্ধি এ তেলেসমাতির গভীরে প্রবেশ করতে অক্ষম। আমরা কেবল এতটুকুই জানি যতটুকু আমরা দেখতে ও অনুভব করতে পারি। এর চাইতে বেশী কিছু আমরা বুঝি না। আর যা কিছু আমরা বুঝি না তাকে আমরা সত্য বলি না আবার মিথ্যাও বলতে পারি না।

এসব লোক নিজেদের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত। কিন্তু নিজেদের চিন্তার স্বপক্ষে এবং অন্যের চিন্তার বিপক্ষে তাদের প্রত্যেকের কাছে ধারণা, আন্দাজ, অনুমান ও কল্পনা ছাড়া জ্ঞানের অন্য কোন মাধ্যম নেই।

একটি স্বতন্ত্র দাবী

এ মতবিরোধ চলছিল এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলেন, তোমাদের সব অভিমত রেখে দাও, আমার কাছে জ্ঞানের এমন একটি মাধ্যম আছে যা তোমাদের নেই। সেই মাধ্যম থেকে আমি জানতে পেরেছি এসব বাতি, পাখা, ঘড়ি, কারখানা ও মেশিন কতিপয় অদৃশ্য তারের সাথে সংযুক্ত, যেগুলো তোমরা অনুভব করছ না। একটি বড় বিদ্যুৎ ঘর থেকে এ তারগুলোর মধ্যে শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে যা আলো ও গতির আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। এ বিদ্যুৎ ঘরে বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি আছে। অসংখ্য কর্মচারী ও কারিগর সেগুলো পরিচালনা করছে। আর এরা সবাই একজন বড় ইঞ্জিনিয়ারের অধীন। ইঞ্জিনিয়ার তাঁর নিজের জ্ঞান ও শক্তির সাহায্যে সমগ্র ব্যবস্থাটা কায়েম করেছেন। তাঁরই নির্দেশ ও পরিচালনাধীনে এসব কাজ চলছে।

এ ব্যক্তি নিজের সমগ্র শক্তি দিয়ে এ দাবী পেশ করেন। লোকেরা তাঁর দাবী মিথ্যা বলতে থাকে। সমস্ত দল এক জোট হয়ে তার বিরোধিতা করে। তাঁকে পাগল আখ্যা দেয়। তারা তাঁকে কষ্ট দিতে থাকে, মারধর করে, ঘর থেকে বের করে দেয় কিন্তু তিনি এতসব শারীরিক ও মানসিক বিপদ সত্ত্বেও নিজের দাবীর ওপর অটল থাকেন। কোন প্রকার ভীতি বা লালসার বশবর্তী হয়ে নিজের দাবীর মধ্যে এক-চুল পরিমাণ সংশোধন করতে প্রস্তুত হন না। যে কোন বড় রকমের বিপদ তাঁর দাবীর মধ্যে সামান্যতম দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁর পত্যেকটি কথা থেকে এ কথা প্রমাণ হতে থাকে যে তাঁর দাবীর সত্যতার ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

এরপর আর এক ব্যক্তি আসেন। তিনিও ঐ একই কথা একই প্রকার দাবী সহকারে পেশ করতে থাকেন। অতপর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যক্তি আসেন। তাঁরাও পূর্ববর্তীদের ন্যায় একই কথা একইভাবে বলতে থাকেন। তারপর আগমনকারীদের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা চলতে থাকে। এমনকি তাঁদের সংখ্যা শত ও হাজারের অংক পেরিয়ে লাখের অংকে পৌছে যায়। তাঁরা সবাই ঐ একই কথা একই দাবী সহকারে পেশ করতে থাকেন। স্থান-কাল-অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের কথা ও দাবীর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। তাঁরা

সবাই বলেন, আমাদের নিকট জ্ঞানের এমন একটি মাধ্যম আছে যা সাধারণ লোকের নিকট নেই। তাদের সবাইকে পাগল আখ্যা দেয়া হয় বিভিন্ন প্রকার জুলুম-নির্যাতনে তাদেরকে জর্জরিত করা হয়। নিজেদের দাবী প্রত্যাহার করার জন্যে তাদেরকে সর্ব প্রকারে বাধ্য করা হয় কিন্তু তাঁরা সবাই নিজেদের দাবীর ওপর অবিচল থাকেন এবং দুনিয়ার কোন শক্তি তাদেরকে নিজেদের স্থান থেকে এক চুল পরিমাণও হঁটাতে পারেনি। এই দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে তাঁদের আরো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁরা কেউ মিথ্যাবাদী, চোর, আত্মসাৎকারী, দুষ্কৃতকারী, জালেম ও হারামখোর ছিলেন না। তাদের বিরোধী ও শত্রুরাও একথা স্বীকার করে। তাঁরা সবাই পবিত্র, কলুষমুক্ত ও অসাধারণ সচ্চরিত্রের অধিকারী মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণের ক্ষেত্রে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে তারা একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁদের মধ্যে পাগলামির কোন লক্ষণও দেখা যায় না, বরং বিপরীত পক্ষে তাঁরা উন্নত নৈতিক চরিত্র, আত্মিক পরিশুদ্ধি, পার্থিব বিষয়াবলির সংস্কারের ক্ষেত্রে এমন সব শিক্ষা, বিধান ও আইন-কানুন প্রণয়ন করেন যার নজীর উপস্থাপন করা তো দূরের কথা বিশ্বের বড় বড় জ্ঞানী, পণ্ডিত তাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞগণ তার গূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্যে নিজেদের সারাজীবন ব্যয় করেন।

বিবেক-বুদ্ধির আদালতে

একদিকে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী চিন্তার অধিকারী মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর দল এবং অন্যদিকে একক দাবীদারগণের দল। বিবেক-বুদ্ধির আদালতে উভয় দলের মোকদ্দমা পেশ করা হয়। বিচারক হিসেবে বিবেক-বুদ্ধির দায়িত্ব হচ্ছে প্রথমে নিজের মর্যাদা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে, তারপর উভয়পক্ষের অবস্থা অনুধাবন করে উভয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনার পর কার কথা অগ্রগণ্য সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বিচারকের নিজের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আসল ব্যাপার জানার কোন মাধ্যম তার নেই। তিনি নিজে সত্য সম্পর্কে অবগত নন। তাঁর সামনে আছে কেবলমাত্র উভয় পক্ষের বক্তব্য, যুক্তি-প্রমাণ, তাদের ব্যক্তিগত অবস্থা এবং বাইরের চিহ্ন ও নিদর্শনাবলী। অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে এগুলো পর্যালোচনা করে কার কথা সত্য হবার সম্ভাবনা অধিকতর, এ সিদ্ধান্ত তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অধিকতর সম্ভাবনার বেশী অন্য কোন সিদ্ধান্ত তিনি দিতে পারেন না। কারণ তাঁর টেবিলে যা কিছু তথ্য বিবরণী আছে তার ভিত্তিতে প্রকৃত সত্যের দ্বারোদ্ঘাটন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। দু'পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের বক্তব্যকে তিনি অগ্রাধিকার দিতে পারেন কিন্তু চূড়ান্ত নিশ্চয়তা সহকারে কোন পক্ষের বক্তব্যকে সত্য ও কোন পক্ষের বক্তব্যকে মিথ্যা বলতে পারেন না।

মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অবস্থা

মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অবস্থা হচ্ছে ঃ

এক ঃ সত্য সম্পর্কে তাদের মতামত বিভিন্ন। কোন একটি বিষয়েও তাদের মধ্যে মতৈক্য নেই। এমনকি একই মতবাদের অনুসারী দলের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও অনেক সময় মতবিরোধ দেখা যায়।

দুই ঃ তারা নিজেরাই স্বীকার করে যে, তাদের কাছে জ্ঞানের কোন অনন্য মাধ্যম নেই। তাদের প্রত্যেকটি দল বড় জোর এ দাবীই পেশ করছে যে, তার অনুমান অন্যের

তুলনায় বেশী শক্তিশালী কিন্তু তারা সবাই নিজেদের অনুমানকে অনুমান বলে স্বীকার করে।

তিন : জর অনুমানের ওপর তাদের বিশ্বাস, ঈমান ও প্রত্যয় অবিচল বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত নয়। তাদের মধ্যে মত পরিবর্তনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা গেছে, তাদের এক ব্যক্তি গতকাল পর্যন্ত অত্যন্ত জোরেশোরে যে মতটি পেশ করছিল, আজ সে নিজেই তার সেই মতের বিরোধিতা করছে এবং অন্য একটি মত পেশ করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়স, বুদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মত পরিবর্তন হতে দেখা যায়।

চার : একক দাবীদারদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে তাদের কাছে একটিই মাত্র যুক্তি রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে তাদের কাছে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তারা সেই অদৃশ্য তার দেখাতে পারেনি যেগুলোর ব্যাপারে তাদের দাবী ছিল যে, সেগুলোর সাথে বাতি ও পাখা সংযুক্ত রয়েছে। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যুতের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাতে পারেনি। তারা কাউকে বিদ্যুত ঘর দেখাতে পারেনি। সেখানকার যন্ত্রপাতি ও মেশিনগুলো দেখাতে পারেনি। সে ঘরে কর্মরত কর্মচারীদের একজনের সাথেও কাউকে সাক্ষাত করাতে পারেনি। এমনকি ইঞ্জিনিয়ারের সাথেও কাউকে দেখা-সাক্ষাত করাতে পারেনি। তাহলে কেমন করে তাদের দাবীকে সত্য বলে মেনে নেয়া যায়?

একক দাবীদারগণের অবস্থা

অন্যদিকে একক দাবীদারগণের অবস্থা হচ্ছে :

এক : তাঁরা সবাই ঐকমত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের দাবীর যাবতীয় মৌলিক বিষয়ে তাদের মধ্যে পূর্ণ ঐকমত্য বিরাজিত।

দুই : তাদের ঐক্যবদ্ধ দাবী হচ্ছে, আমাদের কাছে জ্ঞানের এমন একটি মাধ্যম আছে যা সাধারণ লোকদের কাছে নেই।

তিন : তাদের একজনও বলেননি যে, আন্দাজ অনুমান বা ধারণা কল্পনার ভিত্তিতে তারা এ কথা বলছেন। বরং তারা সবাই সর্বসম্মতভাবে বলেন যে, ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, তার কর্মচারীরা তাদের কাছে আসে, তিনি তাদেরকে নিজের কারখানা ভ্রমণ করিয়ে সবকিছু দেখিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাদের বক্তব্য হচ্ছে তারা যা কিছু বলছেন অনুমান ও কল্পনার ভিত্তিতে নয়, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান ও পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলছেন।

চার : তাদের একজনও নিজেদের বর্ণনার মধ্যে এক চুল পরিমাণ পরিবর্তন করেছেন, এমন কোন নজীর নেই। তাদের প্রত্যেকেই জীবনের প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একই কথা বলে এসেছে।

পাঁচ : তাদের চরিত্র যারপরনাই পবিত্র ও কলুষমুক্ত। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা ও প্রতারণার চিহ্নও সেখানে নেই। যারা জীবনের সমস্ত ব্যাপারে সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ তারা মাত্র

এই একটি বিশেষ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিথ্যা বলবে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই।

ছয় ঃ এ দাবী পেশ করার পেছনে তাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে, এ কথাও প্রমাণিত নয়। তাদের অধিকাংশই এ দাবীর কারণে চূড়ান্ত পর্যায়ের কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেন, বিপদের সম্মুখীন হন, কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন, শারীরিক নির্যাতনে জর্জরিত হন, দেশ থেকে বিতাড়িত হন। অনেককে হত্যাও করা হয়। এমনকি কাউকে 'করাত' দিয়ে দু'টুকরোও করা হয়। মাত্র কয়েকজন ছাড়া কারোর জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের সমাগম দেখা যায়নি। কাজেই কোন প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের অভিযোগে তাদেরকে অভিযুক্ত করা যায় না। বরং এহেন চরম অবস্থায় তাদের নিজেদের একক দাবীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এ কথাই প্রমাণ করে যে, নিজেদের সত্যবাদিতার ওপর তাদের আস্থা ও প্রত্যয় ছিল পর্বত প্রমাণ। তাদের প্রত্যয় এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্যেও তাদের কেউ নিজের দাবী প্রত্যাহার করেননি।

সাত ঃ তাদের পাগল ও বুদ্ধিলোপ হবারও কোন প্রমাণ নেই। জীবনের সকল ব্যাপারে দেখা গেছে তারা সবাই চূড়ান্ত পর্যায়ের জ্ঞানী ও স্থির বুদ্ধির অধিকারী। তাদের বিরোধিরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাহলে কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, বিশেষ করে এই একটি ব্যাপারেই তারা পাগলামির শিকার হয়েছিলেন ? আর বিষয়টির গুরুত্বও দেখতে হবে। এটি তাদের জন্যে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর জন্যে সারা দুনিয়ার মানুষের মুকাবিলা করেছিলেন এবং সংগ্রাম করেছিলেন বছরের পর বছর ধরে। এটি ছিল তাদের সমস্ত জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার মূল যার প্রতি বহু মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরও স্বীকৃতি রয়েছে।

আট ঃ তারা নিজেরা কোনদিন এ কথা বলেননি যে, ইঞ্জিনিয়ার বা তার কর্মচারীদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাত করিয়ে দেবে। অথবা তার গোপন ও অদৃশ্য কারখানা তোমাদেরকে দেখাতে পারি বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে নিজেদের দাবী প্রমাণ করতে পারি। তারা নিজেরাই এ বিষয়টিকে 'গায়েব' বা অদৃশ্য আখ্যা দেন। এ বিষয়ে তারা বলেন, আমাদের ওপর আস্থা রাখো এবং আমরা যা কিছু বলি তা মেনে নাও।

বিবেক-বুদ্ধির আদালতের রায়

দু'পক্ষের অবস্থা ও বক্তব্য পর্যালোচনা করার পর আদালত এবার নিজের রায় প্রদান করে। তার রায়ে বলা হয়, কতিপয় চিহ্ন ও নিদর্শন দেখে তাদের ভেতরের কার্যকারণ অনুসন্ধান উভয় পক্ষই করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে উভয় পক্ষের মত একই রকম মনে হয়। কারণ প্রথমতঃ তাদের কারো মত বুদ্ধিবিরোধী নয়। অর্থাৎ বুদ্ধির আইনের প্রেক্ষিতে তাদের কারো মত সম্পর্কে এ কথা বলা যেতে পারে না যে, তার নির্ভুল হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে তাদের কারোর মতের নির্ভুলতা প্রমাণ করা যেতে পারে না। প্রথম পক্ষের অন্তর্ভুক্ত

কোন দল নিজের মতবাদের স্বপক্ষে এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেশ করতে পারে না যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রত্যেক ব্যক্তিই বাধ্য হয়। দ্বিতীয় পক্ষও এর ক্ষমতা রাখে না এবং তারা এর দাবীদারও নয়। কিন্তু আরও গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করার পর এমন কতকগুলো বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় যার ভিত্তিতে সমস্ত মতবাদের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষের মতবাদটিই অগ্রগণ্য মনে হয়।

প্রথমতঃ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের এত অধিকসংখ্যক লোকের একটি মতবাদের সমর্থনে এমন ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়। তারা সবাই এক বাক্যে একই দাবী করে চলেছেন যে, তাদের নিকট একটি অসাধারণ জ্ঞানের মাধ্যম রয়েছে এবং ঐ মাধ্যমের সাহায্যে তারা সবাই বাইরের চিহ্ন ও নিদর্শনগুলোর আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ জেনে নিয়েছেন। এ বিষয়টি তাদের এ দাবীর সত্যতা মেনে নেয়ার দিকে আমাদেরকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে আমরা দেখি, তারা সবাই যে তথ্য পেশ করেছেন তার মধ্যে সামান্যতম বিরোধও নেই এবং তাদের বিবৃত তথ্য বুদ্ধি বিরোধীও নয়। আবার কিছু লোকের মধ্যে এমন কিছু অস্বাভাবিক শক্তি থাকা যা সাধারণভাবে অন্য লোকদের মধ্যে থাকে না তা বুদ্ধির আইনে কোনক্রমেই অসম্ভব গণ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ বাইরের নিদর্শনগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করলে দ্বিতীয় পক্ষের মতবাদটিই নির্ভুল বলে অধিকতর বিশ্বাস জন্মে। কারণ বাতি, পাখা, গাড়ী ও কারখানা প্রভৃতি নিজে নিজেই উজ্জ্বল বা গতিশীল হয়নি। যদি তাই হতো তাহলে উজ্জ্বল ও গতিশীল হওয়া তাদের নিজেদের ইচ্ছাধীন হত। কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না অথবা তাদের আলো ও গতি যেসব উপাদান দিয়ে তারা গঠিত সেগুলার অবশ্যম্ভাবী ফল নয়। কারণ যখন তারা উজ্জ্বল ও গতিশীল থাকে না তখনও তাদের গঠনাকৃতির মধ্যে এ উপাদানগুলোই মওজুদ থাকে। আবার তারা পৃথক পৃথক শক্তি প্রভাবাধীন এ কথাও যথার্থ মনে হয় না। কারণ দেখা যাচ্ছে, অনেক সময় বাতিতে আলো না থাকলে পাখাও চলে না, ট্রাম গাড়ী থেমে যায় এবং কারখানার চাকাও ঘোরে না। কাজেই বাইরের নিদর্শনগুলোর ব্যাখ্যার ব্যাপারে প্রথম পক্ষ যতগুলো মতবাদ পেশ করেছিলেন বুদ্ধি ও যুক্তির সাথে তাদের কোন দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। এখানে এ কথাটিই অধিকতর নির্ভুল বলে মনে হয় যে, এসব নিদর্শনের মধ্যে কোন একটি শক্তি সক্রিয় রয়েছে এবং তার প্রান্তভাগ এমন একজন জ্ঞানী ও শক্তিশালীর হাতে রয়েছে যিনি একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার অধীনে এ শক্তিকে বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যে ব্যবহার করছেন।

আর সংশয়বাদীদের বক্তব্য যে, এ কথা তাদের বুদ্ধির অগম্য এবং যা তাদের বুদ্ধির অগম্য তারা তাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলতে পারে না—এ কথার জবাবে বলা যায়, বুদ্ধির বিচারে তাও যথার্থ প্রতিপন্ন হয় না। কারণ শ্রোতা কোন ঘটনা শুনে তা বুঝতে পারার ওপরে ঘটনাটির ঘটনা হওয়া নির্ভর করে না। ঘটনাটি সংঘটিত হবার ব্যাপারটির স্বীকৃতি দানের জন্য নির্ভরযোগ্য ও ধারাবাহিক বহু সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যদি আমাদের কাছে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য লোক এসে বলে, আমরা পশ্চিম দেশে লোকদেরকে লোহার গাড়ীতে চড়ে বাতাসে উড়ে বেড়াতে দেখেছি এবং আমরা লণ্ডনে বসে নিজের কানে আমেরিকার গান শুনেছি, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমরা কেবল এতটুকু দেখব যে, লোকগুলো মিথ্যুক ও পরিহাসকারী নয় তো? এ ধরনের কথা বলার সাথে তাদের কোন ব্যক্তিগত

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নেই তো? তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি তো ? যদি এ কথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, মিথ্যুক, পরিহাসকারী বা পাগল নয় এবং এ ব্যাপারটির সাথে তাদের কোন স্বার্থ জড়িত নেই, উপরন্তু যদি আমরা দেখি, বহু সত্যনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান লোক কোনো প্রকার মতদ্বৈততা ছাড়াই পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা সহকারে এ কথা বলে যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যি আমরা তা মেনে নেবো। এখন লোহার তৈরী গাড়ীর বাতাসে উড়ে চলার বা কোনো প্রকার বাস্তব মাধ্যম ছাড়াই এক জায়গার গান হাজার মাইল দূরে অন্য জায়গায় শ্রুত হবার ব্যাপারটি আমাদের বোধগম্য হলেই বা কি আর না হলেই বা কি ?

এ ব্যাপারে এটিই হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের অবস্থা, যাকে ঈমান বলা হয় এভাবে সৃষ্টি হয় না। এ জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে অনুভূতির। এ জন্যে মনের ভেতর থেকে এমন একটি আওয়াজের প্রয়োজন যা মিথ্যা, সংশয় ও দোদুল্যমান অবস্থার অবসান সূচিত করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেবে ঃ লোকদের যাবতীয় আন্দাজ-অনুমান মিথ্যা। সত্য হচ্ছে একমাত্র সেই কথাটির যা সত্যবাদী লোকেরা নিজেদের আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে নয় বরং প্রত্যয় দীপ্ত জ্ঞান ও গভীর অন্তরদৃষ্টির ভিত্তিতে বিবৃত করেছেন।[8]

নবুয়াতের প্রয়োজন ও তাৎপর্য

মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ط (النحل : ٩)

"আর সোজা পথ বলে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর, যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে।"

তাওহীদ, রহমত ও আল্লাহর সমগ্র 'রবুবিয়াতের' স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে এখানে ইঙ্গিতে নবুয়াতের স্বপক্ষে যুক্তিও পেশ করা হয়েছে। এ যুক্তির সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ

দুনিয়ায় মানুষের জন্যে চিন্তা ও কর্মের বহুবিধ পথ সম্ভবপর এবং বাস্তবে তা রয়েছেও। বলা বাহুল্য একই সময় এসব পথের প্রত্যেকটির সত্য হতে পারে না। সত্য মাত্র একটিই হয়ে থাকে। একমাত্র সঠিক জীবন পদ্ধতি তাই হতে পারে যা নির্ভুল জীবন দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এ নির্ভুল মতাদর্শ ও সঠিক পথটি জানা প্রত্যেকটি মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বরং এটিই আসল মৌলিক প্রয়োজন। একটি উচ্চ পর্যায়ের জীব হবার কারণে মানুষের যে সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তার কেবলমাত্র সেই প্রয়োজনগুলোই পূরণ করে কিন্তু এটি এমন একটি প্রয়োজন যা মানুষ হিসেবে তার জন্য অপরিহার্য এ প্রয়োজনটি পূরণ না হবার অর্থই হচ্ছে মানুষের সমগ্র জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যে খোদা মানুষকে অস্তিত্ব দান করার পূর্বে তার জন্যে এতসব উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম যোগাড় করে রেখেছেন এবং তাকে অস্তিত্ব দান করার পর তার জৈব জীবনের প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে এত নিখুঁতভাবে ব্যাপক পর্যায়ে ব্যবস্থা করেছেন, তিনি মানুষের জীবনের সবচেয়ে এই বড় প্রয়োজন ও আসল প্রয়োজনটি পূরণ করার ব্যবস্থা করেননি, এ কথা কি কল্পনা করা যেতে পারে ?

নবুয়াতের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাটিই সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি কেউ নবুয়াতকে অস্বীকার করতে চান তাহলে মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ আর কি ব্যবস্থা করেছেন—একথা অবিশ্যি তাকে বলতে হবে। এর জবাবে এ কথা বলে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারেন না যে, পথ অনুসন্ধান করার জন্যে আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে রেখেছেন। কারণ মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা পূর্বেই অসংখ্য পথ আবিষ্কার করে রেখেছে। এটি তার সরল-সঠিক-সোজা পথের নির্ভুল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অন্যদিকে এ কথা বলাও সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের পথ প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা করেননি। কারণ আল্লাহর ব্যাপারে বোধ হয় এর চেয়ে বড় কুধারণা আর কিছুই হতে পারে না যে, জীব হিসেবে আমাদের প্রতিপালন, বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের পুরোপুরি ব্যবস্থা তিনি করেছেন কিন্তু মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার কোন ব্যবস্থাই তিনি করেননি বরং এক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছে।[৫]

বাধ্যতামূলক হেদায়াতের পরিবর্তে ইসলামী হেদায়াত

وَلَوْ شَاءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥(النحل : ٩)

"আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করতেন।"
–(সূরা আন নাহল ঃ ৯)।

অর্থাৎ যদিও আল্লাহ তায়ালার পক্ষে তাঁর এ দায়িত্ব (বা তিনি নিজে মানুষজাতির হেদায়াতের জন্য নিজের ওপর ন্যস্ত করেছেন) এমনভাবে আদায় করা সম্ভব ছিল, যার ফলে অন্যান্য স্বাধীন ক্ষমতাহীন সৃষ্টির ন্যায় সমস্ত মানুষকে জন্মগতভাবে পদপ্রদর্শন করা যেত, কিন্তু এটি আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করা যে নিজের ইচ্ছা মত ভুল নির্ভুল নির্বিশেষে যে কোন পথ অবলম্বন করার স্বাধীনতা রাখে। এই স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য তাকে জ্ঞানের মাধ্যম দান করা হয়েছে। বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। ইচ্ছা ও সংকল্পের শক্তি দান করা হয়েছে। নিজের ভেতরের ও বাইরের অসংখ্য বস্তু ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ সঙ্গে ভেতরে বাইরে সর্বত্র এমন অসংখ্য কার্যকারণ রেখে দেয়া হয়েছে যা তার জন্যে সৎপথ লাভ ও পথভ্রষ্ট উভয়েরই কারণ হতে পারে। তাকে জন্মগতভাবে সৎপথ অবলম্বনকারী বানিয়ে দিলে এসব কিছুই অর্থহীন হয়ে যেত। তাহলে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না, যা কেবলমাত্র স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই সে লাভ করতে পারে। তাই মানুষের হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা বাধ্যতামূলক হেদায়াতের পন্থা পরিহার করে নবুয়াত ও রিসালাতের পন্থা অবলম্বন করেছেন এভাবে মানুষের স্বাধীনতা বহাল থাকবে, তার পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে এবং সরল-সোজা-সৎপথও যুক্তিগত উপায়ে তার সামনে পেশ করা হবে।[৬]

বৈষয়িক ও নৈতিক জীবনে সৎপথের নিদর্শনের প্রয়োজন

وَعَلٰمٰتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ۝ (النحل : ١٦)

"তিনি পৃথিবীতে পথনিদের্শকারী চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন এবং তারকার সাহায্যেও লোকেরা পথের সন্ধান পায়।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১৬)।

অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীটাকে একই ধরনের তৈরী করেননি। বরং পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকাকে বিভিন্ন প্রকারের ও বিশেষ নিদর্শনাদি (Land Marks) দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এর ফলে মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে। নিজের পথ ও গন্তব্য চিনে নিতে পারছে। এটি এর বিভিন্ন প্রকার উপকারের অন্যতম। আল্লাহর এ নিয়ামত ও দানটির যথার্থ মূল্য মানুষ একমাত্র তখনই অনুধাবন করতে পারে যখন তার এমন কোন মরুময় এলকায় যাওয়ার সুযোগ হয় যেখানে এ ধরনের বিশিষ্ট কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে পথ ভুল করার ভয়ে মানুষ সবসময় উৎকণ্ঠিত থাকে। সামুদ্রিক সফরে মানুষ আল্লাহর এ মহান দানটির মূল্য ও মর্যাদা আরও বেশী করে অনুভব করতে পারে। কারণ সেখানে আদতে কোন পথের চিহ্নই থাকে না। কিন্তু মরুভূমি ও সমুদ্রের মধ্যও আল্লাহ মানুষের পথপ্রদর্শনের একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে, আকাশের তারকারাজি, যার সাহায্যে মানুষ প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত নিজের পথের সন্ধান লাভ করে যাচ্ছে।

এখানে আবার তাওহীদ, রহমত ও 'রবুবিয়াতের' স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে রিসালাতের প্রমাণের প্রতিও সূক্ষ্মতম ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ আয়াতটি পড়ার সময়

মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ঝুঁকে পড়ে যে, যে আল্লাহ মানুষের বৈষয়িক জীবনের পথ নির্দেশের এত ব্যাপক ব্যবস্থা করেছেন তিনি কি মানুষের নৈতিক জীবন সম্পর্কে এতই উদাসীন থাকেন ? মানুষের নৈতিক জীবনের সামান্যতম পথনির্দেশ দেবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন না ? বলা বাহুল্য, বৈষয়িক জীবনে পথ ভুল করার ক্ষতি যত বড়ই হোক না কেন নৈতিক জীবনে এ ধরনের ভুলের ক্ষতি থেকে তা অনেক গুণে কম। আবার যে করুণাময় মহান আল্লাহ মানুষের কল্যাণের প্রতি এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন যে পাহাড়ের মধ্য দিয়েও তাদের জন্যে পথ তৈরী করে রেখেছেন, বিরাট বিস্তীর্ণ ধুধু প্রান্তরের মধ্যেও নিশানী দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, মরুভূমি ও সমুদ্রের মধ্যে দিক ভুল করার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আকাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন, তাঁর সম্পর্কে কেমন করে এ কুধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে, তিনি মানুষের নৈতিক কল্যাণের জন্যে কোন পথের সন্ধান দেননি ? আর সে পথকে সুস্পষ্ট করার জন্যে কোন নিশানী দাঁড় করিয়ে রাখেননি এবং কোন আলো জ্বালিয়ে তাকে উজ্জ্বল করেননি ?[৭]

মানুষের জন্যে সচেতন পথনির্দেশের গুরুত্ব

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيٓ اَعۡطٰى كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهٗ ثُمَّ هَدٰى -(طه : ٥٠)

"মূসা ফেরাউনকে জবাব দিলেন ঃ আমাদের রব হচ্ছেন তিনি যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার গঠনাকৃতি দান করেছেন অতপর তাকে পথনির্দেশ দিয়েছেন।"–(তা-হা ঃ ৫০)

অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তু তিনি তৈরী করেছেন। যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে তৈরী করেছেন। প্রত্যেকটি বস্তুর আকার, আকৃতি, শক্তি, সামর্থ, গুণ, বৈশিষ্ট্য, সবকিছু তিনিই দান করেছেন। যে আকার-আকৃতি লাভ করে হাত দুনিয়ায় কাজ করার উপযোগী হতে পারে সেই আকার-আকৃতি দিয়ে তাকে তৈরী করেছেন। পা-কেও তিনি তার উপযোগী আকৃতি দান করেছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, বাতাস, পানি, আলো ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বস্তু যে ধরনের আকৃতি লাভ করে পৃথিবীতে নিজেদের অংশের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে তা তিনি তাদেরকে দান করেছেন।

আবার তিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে কেবল তার বিশেষ আকৃতি দান করেই ছেড়ে দেননি বরং এই সঙ্গে তাদের চলার জন্যে পথনির্দেশও দিয়েছেন। দুনিয়ায় এমন কোনো বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে না যে বস্তুটি তৈরী করে তাকে বিশেষ আকৃতি দান করার পর তার দেহ সৌষ্ঠবের মাধ্যমে কাজ করে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি তিনি তাকে শেখাননি। কানকে শোনার ও চোখকে দেখার কাজ তিনিই শিখিছেন। মাছকে সাঁতার কাটার, পাখিকে উড়ার, গাছকে ফুল ও ফল দেবার এবং মাটিকে উদ্ভিদ, শাক-সবজি ও ফসল দান করার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। এক কথায় বলা যায়, তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি বস্তুর কেবলমাত্র স্রষ্টাই নন, তাদের শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শকও।

উপরন্তু এ ছোট্ট একটি বাক্যের মধ্যে হযরত মূসা (আ) ইঙ্গিতে রিসালাতের যুক্তিও পেশ করেছেন। অবশ্য ফেরাউন তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। তাঁর যুক্তির মধ্যে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগতের পথপ্রদর্শক, তিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে পথ দেখাচ্ছেন। তাঁর বিশ্বব্যাপী পথনির্দেশকের মর্যাদার

অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের সচেতন জীবনে তার পথপ্রদর্শনের জন্যে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না যা মাছ ও পাখির জন্য উপযোগী হতে পারে। এর সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি হচ্ছে, একজন সচেতন মানুষ তাঁর পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষকে পথ দেখাবার জন্য নিযুক্ত হবেন। তিনি মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান ও সচেতনতার প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে সোজা পথ দেখাবেন।[৮]

নবুয়াত কি ?

দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্যে মানুষের যেসব জিনিসের প্রয়োজন, আল্লাহ্ নিজেই সেসবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সময় তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু সঙ্গে দিয়েই তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। দেখার জন্যে তাকে দেয়া হয় চোখ, শোনার জন্যে কান, ঘ্রাণ ও শ্বাস নেবার জন্যে নাক, অনুভব করার জন্যে শরীরের ত্বকের মধ্যে স্পর্শানুভূতি, চলাফেরা করার জন্যে পা, কাজ করার জন্যে হাত, চিন্তা করার জন্যে মস্তিষ্ক এবং এমনি আরও অসংখ্য জিনিস তার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বাহ্নেই তার ছোট্ট দেহটির সঙ্গে জড়িয়ে রেখে দেয়া হয়। তারপর দুনিয়ার মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই জীবন ধারণের জন্যে এতসব বস্তু সে লাভ করে যা গণনা করেও শেষ করা যায় না। আলো, বাতাস, উত্তাপ, পানি, মাটি সবকিছু তার জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়। মায়ের বুকে দুধের ধারা আগে থেকেই তার জন্যে প্রবাহিত রাখা হয়। মা, বাপ, আত্মীয়-স্বজন এমনকি অন্যদের হৃদয়েও তার জন্যে স্নেহ-প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত করা হয়, এর সাহায্যেই সে লালিত-পালিত হয়। অতপর সে যত বড় হতে থাকে সেই অনুসারে দিনের পর দিন তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যে সবরকম বস্তু সে লাভ করতে থাকে। অবস্থা দেখে মনে হয় পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত শক্তি যেন তার লালন-পালন ও সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

দুনিয়ায় কাজ করার জন্যে যে পরিমাণ যোগ্যতার প্রয়োজন সকল মানুষকে তা দান করা হয়েছে। দৈহিক শক্তি, বুদ্ধি-বিবেক, বাকশক্তি এবং এ ধরনের আরও বহুতর যোগ্যতা কমবেশী প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু এখানে আল্লাহ একটি সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। সমস্ত যোগ্যতা সকল প্রকার মানুষকে সমানভাবে দান করেননি। এমনটি করলে কেউ কারও মুখাপেক্ষী হত না। কেউ কারও পরোয়া করতো না। এ জন্যে আল্লাহ্ সমস্ত মানুষের সামষ্টিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যাবতীয় যোগ্যতার সৃষ্টি মানুষদের মধ্যেই করেছেন ঠিকই কিন্তু এমনভাবে করেছেন যার ফলে এক একজনকে এক একটি যোগ্যতা বেশী করে দিয়েছেন। কেউ কারও তুলনায় শারীরিক প্ররিশ্রমের শক্তি বেশী লাভ করে। অনেক লোকের মধ্যে জন্মগতভাবে কোন বিশেষ পেশা বা শিল্পের যোগ্যতা বেশী থাকে এবং অন্যেরা থাকে তা থেকে বঞ্চিত। অনেক লোকের মধ্যে বুদ্ধি জ্ঞান অন্যের তুলনায় বেশী থাকে। অনেকে হয় জন্মগত সেনাপতি। অনেকের মধ্যে শাসন কর্তৃত্বে বিশেষ যোগ্যতা থাকে। অনেকে অসাধারণ বাগ্মীতার শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের মধ্যে থাকে জন্মগত অসাধারণ লেখনী শক্তি। এমন অনেক ব্যক্তি দেখা গেছে যারা অংকে খুব পাকাপোক্ত। এমনকি এ বিষয়ের জঠিলতম প্রশ্নগুলোর সমাধান তারা এমনভাবে করে যা অন্যের কল্পনাতীত। এক ব্যক্তি অদ্ভূত অদ্ভুত সব জিনিস আবিষ্কার করে। তার আবিষ্কারে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়। আবার এক ব্যক্তিকে দেখা যায় আইনে অসাধারণ পারদর্শী। বছরের পর বছর চিন্তা-ভাবনা করার পর আইনের যেসব জঠিলতম বিষয় অনুধাবন করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে এক নজরেই তার গভীর তলদেশে পৌছে যায়। এসব যোগ্যতা আল্লাহ প্রদত্ত। কোনো ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় নিজের মধ্যে এসব যোগ্যতা* সৃষ্টি করতে

---

* এখানে অসাধারণ যোগ্যতাসমূহের কথা বলা হয়েছে। মানুষের সাধারণ যোগ্যতাগুলো শিক্ষা-অনুশীলন ও অভ্যাসের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করতে পারে। আর অসাধারণ যোগ্যতাগুলো অনেক সময় কোনো প্রকার অনুশীলন ছাড়াই এবং সামান্য নাম মাত্র অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সেগুলোর বিকাশ সাধনের চেষ্টা করলে তা এক দৃষ্টান্তমূলক উন্নতমানে পৌছে যায়।–(সম্পাদক বৃন্দ)

পারে না। এমনকি শিক্ষা ও অনুশীলনের সাহায্যেও এসব সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না। আসলে এগুলো হচ্ছে জন্মগত যোগ্যতা ; আল্লাহ নিজের সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যে যেসব যোগ্যতার বেশী প্রয়োজন হয় সেগুলো বেশী সংখ্যক মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়। আর যেগুলোর প্রয়োজন যত কম সেগুলা সৃষ্টি করা হয় তত কমসংখ্যক মানুষের মধ্যে। সৈনিক বহু জন্মগ্রহণ করে। কৃষক, কর্মকার, তাঁতি এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বহুসংখ্যক জন্মলাভ করে। কিন্তু তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন এবং রাজনীতি ও সেনাপতির যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অতি অল্পই জন্মলাভ করে থাকে। আবার কোন বিশেষ বিষয়ে অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী লোকের সংখ্যা দেখা যায় আরও কম। কারণ তাদের অবদান শত শত বছর ধরে চলে এবং ফলে মানব সমাজ তাদের ন্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনবোধ করে না।

মানুষের জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন

চিন্তার বিষয় হচ্ছে, দুনিয়ায় মানুষের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে কেবল এ প্রয়োজনগুলোই তো যথেষ্ট নয়। মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র প্রকৌশলী, অংকবিদ, বৈজ্ঞানিক, আইনবিদ, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্মই তো যথেষ্ট নয়। এসবের চেয়ে আর একটি বড় প্রয়োজন মানুষের আছে। আর তা হচ্ছে মানুষের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তির জন্ম হতে হবে যে মানুষকে দেখাবে আল্লাহর পথ। অন্য লোকদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র এতটুকুন জানানো যে, দুনিয়ায় মানুষের জন্যে কি কি বস্তু আছে এবং সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এমন একজন ব্যক্তিরও প্রয়োজন যিনি মানুষকে একথা জানাবেন যে, মানুষকে কার জন্যে সৃঠি করা হয়েছে, দুনিয়ায় কে তাকে এতসব সাজসরঞ্জাম দিয়েছে এবং সেই দাতার ইচ্ছা কি—যে ইচ্ছা অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবনযাপন করে সে নিশ্চিত ও চিরন্তন সাফল্য লাভ করতে পারে ? এটি হচ্ছে মানুষের আসল, সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বুদ্ধি এ কথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, আমাদের ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনও যে আল্লাহ পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছেন তিনি আমাদের এতবড় একটি প্রয়োজন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। এটা কখনই সম্ভব নয়।

রসূলগণের মর্যাদা

আল্লাহ যেমন প্রত্যেকটি কাজ এবং প্রত্যেকটি জ্ঞান ও শিল্পের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন লোক সৃষ্টি করেছেন তেমনি এমন মানুষও সৃষ্টি করেছেন যাদের মধ্যে আল্লাহকে চেনার ও জানার উন্নততর যোগ্যতা ছিল। তিনি নিজের নিকট থেকে তাদেরকে দ্বীন—জীবন দর্শন, নৈতকিতা ও শরীয়াতের জ্ঞান দান করেছেন। এই সঙ্গে অন্যান্য লোকদেরকে এসব বিষয়ের শিক্ষা দেবার কাজেও তাঁদেরকে নিযুক্ত করেন। এসব লোককে আমাদের ভাষায় নবী, রসূল বা পয়গম্বর বলা হয়।

নবীর চিহ্ন

অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে পারদর্শী লোকেরা যেমন একটি বিশেষ মন-মস্তিষ্ক ও বিশেষ ধরনের প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অনুরূপভাবে নবীও একটি বিশেষ প্রকৃতি নিয়ে দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

একজন স্বভাব কবির কবিতা শুনেই আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি কাব্য ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা নিয়ে জন্মলাভ করেছেন। কারণ অন্য লোকেরা হাজার চেষ্টা করলেও তার মতো কবিতা লিখতে পারবে না। অনুরূপ একজন স্বভাব বাগ্মী, জন্মগত লেখক, জন্মগত আবিষ্কারক এবং জন্মগত নেতাকেও তাদের কার্যাবলীর মাধ্যমে সহজেই চিনে নেয়া যায়। কারণ তাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজে এমন অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ দেয় যা অন্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। নবীর অবস্থাও অনুরূপ। তাঁর মন-মস্তিষ্কে এমন সব কথার উদয় হয় যা অন্যেরা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারে না। তিনি এমন এমন বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন যা তিনি ছাড়া অন্য কোনো মানুষের পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন সব সূক্ষ্ম কথার গভীরে প্রবেশ করে যেখানে বছরের পর বছর গবেষণা করার পরও অন্যদের দৃষ্টি পৌঁছে না। তিনি যা কিছু বলেন আমাদের বুদ্ধি তা গ্রহণ করে নেয় এবং আমাদের মন তার সাক্ষ্য প্রদান করে, অবশ্যি এমনটিই হওয়া উচিত। দুনিয়ার অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সৃষ্টিজগতের প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের মাধ্যমে তাঁর প্রত্যেকটি কথা সত্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমরা নিজেরা ঐ ধরনের কথা বলতে চাইলেও বলতে পারি না। উপরন্তু তাঁর প্রকৃতি এতই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় যার ফলে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি সত্যনিষ্ঠ ও ভদ্রজনোচিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি কখনও ভুল কথা বলেন না। কোনো খারাপ কাজ করেন না। সবসময় সুকৃতি ও সত্যনিষ্ঠার শিক্ষা দিয়ে যান। অন্যকে যা কিছু বলেন নিজে তার ওপর আমল করে দেখিয়ে দেন। তিনি নিজে যা কিছু বলেন কাজের সময় তার বিরুদ্ধাচরণ করেন এমনটি তাঁর জীবনে কোনো দিন দেখা যায়নি। তাঁর কথায় ও কাজে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত থাকে না। অন্যের ভালোর জন্যে তিনি নিজের ক্ষতি করেন এবং নিজের ভালোর জন্যে অন্যের ক্ষতি করেন না। তাঁর সমগ্র জীবন গঠিত হয় সত্যতা, ভদ্রতা, মানসিক পবিত্রতা, উন্নত চিন্তা ও উচ্চ পর্যায়ের মানবতার আদর্শে। দূরবীন দিয়ে খুঁজলেও তাঁর মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা যাবে না। এসব কিছু দেখে পরিষ্কার চিনে নেয়া যায় যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর সাচ্চা নবী।

নবীর আনুগত্য

কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সত্য নবী হিসেবে জানার পর তাঁর কথা মানা, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাপন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন ব্যক্তিকে নবী বলে স্বীকার করার পর তাঁর কথা না মানা সম্পূর্ণ বুদ্ধিবিরোধী কাজ। কারণ নবী বলে মেনে নেবার অর্থই হচ্ছে আমরা এ কথা স্বীকার করে নিলাম যে, তিনি যা কিছু বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলছেন এবং যা কিছু করছেন আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী করছেন। কাজেই এখন আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বললে বা করলে তা হবে আল্লাহর বিরুদ্ধে বলা ও করা। আর আল্লাহর বিরদ্ধে কোনো কথা বা কাজ কখনও সত্য হতে পারে না। কাজেই কাউকে নবী বলে মেনে নেবার পর তাঁর কথাকেও নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া এবং তাঁর নির্দেশ মাথা পেতে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ নির্দেশের মৌল তাৎপর্য ও সুফল আমাদের বোধগম্য হওয়া না হওয়ার প্রশ্নই এক্ষেত্রে অবান্তর। নবীর পক্ষ থেকে যে কথা বলা হয় তা যে নবী কথিত এটিই তাঁর সত্য হওয়া তাঁর মধ্যে সব রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কল্যাণ ও সুফল নিহিত থাকার যথেষ্ট প্রমাণ। যদি তাঁর কোনো কথার তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য না হয় তাহলে এর অর্থ এ নয় যে সে কথার মধ্যে কোন গলদ রয়ে গেছে, বরং এর অর্থ হচ্ছে আমাদের বুদ্ধি ও অনুধাবন শক্তির মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দিয়েছে।

যে ব্যক্তি কোনো শিল্প-বিশেষজ্ঞ নয় সে ঐ শিল্পের সূক্ষ্মতম বিষয়গুলো বুঝতে সক্ষম হবে না। কিন্তু শিল্প-বিশেষজ্ঞের কথা যদি সে কেবল এ জন্যে না মানে যে তা তার বোধগম্য হচ্ছে না, তাহলে এটা তার জন্যে বিরাট নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে। দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করার পর তার কাজের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা হয় এবং তার কাজে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় না। কাজেই সবাই সব কাজে বিশেষজ্ঞ হতে পারে না এবং দুনিয়ার সব বিষয় ও কাজ বুঝার ক্ষমতাও সবার নেই। কোনো ব্যক্তি শিল্প-বিশেষজ্ঞ কিনা কেবল এতটুকুই আমাদের দেখা উচিত এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ-নিশ্চিন্ততা অর্জনের জন্যেই আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান ও সর্বপ্রকার সতর্কতা নিয়োজিত হতে হবে। তারপর যখন আমরা জেনে নেই যে, সে একজন ভাল শিল্প-বিশেষজ্ঞ তখন তার কাজের ওপর পুরোপুরি ভরসা করা উচত। অতপর তার কাজে হস্তক্ষেপ করা এবং প্রতি পদে পদে একথা বলা যে, প্রথমে আমাকে এটা বুঝিয়ে দাও, না হলে আমি মেনে নিতে প্রস্তুত নই—এটাকে বুদ্ধিমত্তা নয়, নিরেট নির্বুদ্ধিতা বলা যায়। কোনো উকিলের ওপর মামলার ভার দেবার পর তার সাথে এভাবে বিতর্ক করতে থাকলে সে যে এ ধরনের মক্কেলকে তার চেম্বার থেকে বের করে দেবে এতে সন্দেহ নেই। কোনো ডাক্তারের নিকট তার প্রত্যকটি প্রেসক্রিপশনের কারণ ও যুক্তি জানতে চাইলে সে সংশ্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসাই ছেড়ে দেবে। ধর্মের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। আমাদের আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী জীবনযাপন করার পদ্ধতি কি তা আমরা জানতে চাই। এসব জানার মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। কাজেই আল্লাহর সাচ্চা নবীর সন্ধান করা আমাদের কর্তব্য হয়ে পড়ে। নিঃসন্দেহে নবীর সন্ধান করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে। কারণ এমন কোনো ব্যক্তিকে যদি আমরা নবী মেনে নেই যে আসলে নবী নয়, তাহলে সে আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করবে কিন্তু ভালভাবে যাঁচাই পর্যালোচনার পর যখন কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর সাচ্চা নবী বলে আমাদের প্রত্যয় জন্মাবে তখন তাঁর ওপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে হবে এবং তাঁর প্রত্যেক নির্দেশ পালন করতে হবে।

নবীদের ওপর ঈমান আনার প্রয়োজন

যখন আমরা এ কথা জানতে পারি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর নবী যে পথের সন্ধান দেন সেটিই একমাত্র সত্য ও সোজা পথ, তখন এ কথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের বোধগম্য হয় যে, নবীর ওপর ঈমান আনা, তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য এবং যে ব্যক্তি নবীর পথ পরিহার করে নিজের বুদ্ধি-জ্ঞানের সাহায্যে কোনো পথ বের করবে সে নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট হবে।

এ ব্যাপারে লোকেরা মারাত্মক ধরনের ভুল করে থাকে। অনেক লোক নবীদের সত্যতা স্বীকার করে কিন্তু তাদের ওপর ঈমান আনে না এবং তাদের আনুগত্যও করে না। এরা কেবল কাফের নয়, নির্বোধও। যারা জেনে বুঝে মিথ্যার অনুসারী হয় তাদের চেয়ে বড় নির্বোধ আর কে হতে পারে?

অনেকে বলে, আমাদের নবীর আনুগত্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের বুদ্ধির সাহায্যে সত্যপথ জেনে নিতে পারি। এটাও একটা বিরাট ভুল। জ্যামিতি পাঠক মাত্রই জানে, এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা মাত্র একটি হতে

পারে। এছাড়া যত রেখাই টানা হোক না কেন তা সবগুলোই হয় বক্ররেখা হবে আর নয়তো ঐ দ্বিতীয় বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছাবেই না। সত্যপথ যাকে ইসলামের পরিভাষায় সিরাতুল মুস্তাকিম (অর্থাৎ সোজা পথ) বলা হয় তার অবস্থাও অনুরূপ। এপথ মানুষ থেকে শুরু হয়ে আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। জ্যামিতির উল্লেখিত সূত্র অনুসারে এ পথ একটিই হতে পারে। এ একটি পথ ছাড়া বাকি যতগুলো পথ হবে তা হবে বক্র রেখা অথবা তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে না। এখন একটু সোজা পথটির ওপর চিন্তা করা যাক। সোজা পথটি তো নবী বাতলে দিয়েছেন। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ হতেই পারে না। এ একমাত্র পথটি বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি নিজেই কোনো পথের সন্ধান করবে সে অবশ্যি দু'টি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার কোনো পথই সে পাবে না অথবা পেলেও তা হবে অনেক বাঁকা পথ, যা সরল রেখা না হয়ে হবে বক্র রেখা। প্রথম অবস্থাটিতে তার ধ্বংস তো সুস্পষ্ট। আর দ্বিতীয় অবস্থাটিতে তার নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে কোনো প্রকার সংশয়ের অবকাশই থাকতে পারে না। একটি ইতর প্রাণীও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সময় বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথ ধরে। অথচ সৃষ্টির সেরা বুদ্ধিমান সুচতুর মানুষটির ব্যাপার সত্যিই দেখার মতো। আল্লাহর একজন সৎ বান্দাহ তাকে সোজা পথ দেখাচ্ছে আর সে বলে চলছে ঃ না, তোমার দেখানো পথে আমি চলবই না, আমি বাঁকা পথগুলোতেই এগিয়ে যাব, এভাবে পথ ভুল করতে থাকব এবং আমার গন্তব্যের সন্ধান করে যেতে থাকব।

এটা এমন একটা সহজ সত্য কথা যা প্রথম দৃষ্টিতেই যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যাবে যে, নবীর ওপর ঈমান আনতে অস্বীকার করে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবার সোজা বা বাঁকা কোনো পথই পেতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির কথা মেনে নিতে পারছে না তার মস্তিষ্কে নিশ্চয়ই এমন কোনো গলদ দেখা দিয়েছে যার ফলে সে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তার জ্ঞান-বুদ্ধির অভাব হতে পারে, তার মনে অহংকার বাসা বাঁধতে পারে, তার প্রকৃতিই এমন বক্র হতে পারে যার ফলে সৎ ও সত্যতার বাণী গ্রহণ করতে তার মন প্রস্তুত হয় না সে বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে ফলে আগে থেকেই রেওয়াজ হিসেবে যেসব কথা চলে আসছে সেগুলোর বিরুদ্ধে কোনো কথা মানতে প্রস্তুত হয় না অথবা সে প্রবৃত্তির দাস হতে পারে এবং নবীর শিক্ষা মেনে নিতে এ জন্য অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে যে, এরপরে অবৈধ ও পাপ কাজ করার স্বাধীনতা সে হারিয়ে ফেলবে। এ কারণগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটি কারণও যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর পথের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি কোনো একটি কারণও তার মধ্যে না থাকে তাহলে একজন সাচ্চা, সৎ ও নিষ্কলুষ ব্যক্তি একজন সাচ্চা নবীর শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, এটা একেবারেই অসম্ভব।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে থাকেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশও আল্লাহ দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি নবীর প্রতি ঈমান আনে না সে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মানুষ যে সরকারের প্রজা সেই সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রশাসক নিযুক্ত হবে তাকে অবশ্য তার আনুগত্য করতে হবে। যদি সে ঐ ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে এর অর্থ

দাঁড়াবে সে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সরকারকে মেনে নেয়া এবং তার নিযুক্ত প্রশাসককে না মানা—দু'টো কথা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। আল্লাহ ও তার প্রেরিত নবীর দৃষ্টান্তটিও অনুরূপ পর্যায়ের। আল্লাহ মানুষের আসল বাদশাহ। তিনি যে ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন মানুষকে পথ দেখার জন্য এবং তার আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছেন তাঁকে নবী বলে স্বীকার করা এবং সবার আনুগত্য ত্যাগ করে একমাত্র তাঁর আনুগত্য করা প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে সে অবশ্যি অস্বীকারকারী—কাফের। এ ক্ষেত্রে তার আল্লাহকে মেনে নেয়া বা না মানা সবই অর্থহীন।

এক নজরে নবুয়াতের ধারাবাহিকতার ইতিহাস

মানব জাতির মধ্যে কিভাবে নবীদের আগমন শুরু হল এবং কিভাবে উন্নতি করতে করতে শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠতম নবীর ওপর এ ধারা শেষ হল, এবার আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

আল্লাহ সর্বপ্রথম একজন মানুষকে সৃষ্টি করেন। তারপর সে মানুষটি থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেন। অতপর ঐ জোড়ার বংশধারা চালু করেন। শত শত হাজার হাজার বছর ধরে তা চলতে চলতে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীতে যত মানুষ জন্ম নিয়েছে সবাই ঐ প্রথম জোড়াটির সন্তান। সকল জাতির ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বর্ণনা ধারা এক বাক্যে এ কথা ঘোষণা করে যে, একজন মানুষ থেকেই মানব জাতির বংশধারার সূচনা হয়। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান থেকেও এ কথা প্রমাণ হয়নি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক পৃথক মানুষ তৈরী করা হয়েছিল। বরং অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক এ ধারণা পোষণ করেন যে, প্রথমে একজন মানুষই জন্মে থাকবে এবং দুনিয়ার যেখানেই যত মানুষ পাওয়া যায় সবাই ঐ একজন মানুষেরই সন্তান।

ঐ প্রথম মানুষটিকে আমাদের ভাষায় আদম (আ) বলা হয়। এ থেকেই 'আদম সন্তান' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হয় মানুষ জাতি। আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে করেন প্রথম নবী। নিজের সন্তানদেরকে ইসলামের শিক্ষাদান করার জন্যে তাঁকে নির্দেশ দেন। অর্থাৎ তাদেরকে এ কথা জানাবার নির্দেশ দেন ঃ তোমাদের ও সারা দুনিয়ার প্রভু হচ্ছেন এক আল্লাহ। তোমাদেরকে একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করতে হবে। একমাত্র তাঁর সামনে মাথানত করবে। তাঁর কাছে সাহায্য চাইবে। তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী দুনিয়ায় সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবন যাপন করবে। এভাবে চললে তোমরা পরিণামে বিপুল পুরস্কার লাভ করবে। আর তাঁর আনুগত্য থেকে সরে আসলে ভয়াবহ শাস্তির অধিকারী হবে।

হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে যারা ছিল ভাল ও সৎ তারা পিতার নির্দেশিত সোজা পথে চলতে থাকে কিন্তু যারা অসৎ ছিল তারা এ পথ ত্যাগ করে। ধীরে ধীরে সব রকমের অন্যায় ও দুষ্কৃতি জন্ম নেয়। কেউ চাঁদ, সূর্য ও তারকার পূজা করতে থাকে। কেউ বৃক্ষ, পশু ও নদ-নদীর উপাসনায় মগ্ন হয়। আবার অনেকে মনে করতে থাকে বায়ু, পানি, অগ্নি, রোগ, সুস্থতা এবং প্রকৃতির অন্যান্য শক্তিগুলোর আল্লাহ পৃথক। কাজেই এদের প্রত্যেকটিকে পূজা করা উচিত। তাহলে সবার আল্লাহ খুশী হয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে। এ ধরনের মূর্খতার কারণে শিরক ও মূর্তিপূজার বিভিন্ন ধারার প্রচলন হয়, যার ফলে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ঘটে। এ সময় হযরত আদম (আ)-এর বংশধররা দুনিয়ার

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়েছিল। প্রত্যেক জাতি নিজের জন্যে একটা নতুন ধর্ম তৈরী করে নিয়েছিল। প্রত্যেকের রসম-রেওয়াজ, রীতিনীতি আলাদা ছিল। আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ তার আদি পিতা হযরত আদম (আ) তাঁর সন্তানদেরকে যে বিধি-বিধান শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তাও ভুলে যায়। লোকেরা নিজেদের প্রবৃত্তির আনুগত্য শুরু করে দেয়। সব রকমের খারাপ রীতিনীতির প্রচলন শুরু হয়ে যায়। সব ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তার প্রসার ঘটে। ভাল ও মন্দের পার্থক্য করার ব্যাপারে মানুষ ভুল করতে থাকে। অনেক খারাপ জিনিসকে ভাল মনে করে নেয়া হয় এবং অনেক ভাল জিনিসকে খারাপ মনে করে নেয়া হয়।[৯]

এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি নবুয়াতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করে ঃ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ (البقرة : ٢١٣)

"শুরুতে সব মানুষ একই পথে চলছিল। (তারপর এ অবস্থা অব্যাহত থাকল না এবং মতবিরোধ দেখা দিল) অতপর আল্লাহ নবী পাঠালেন। তাঁরা ছিলেন (সত্য-সোজা পথ অবলম্বনকারীদের জন্যে) সুসংবাদদানকারী এবং (বক্র-ভুল পথ অবলম্বনের পরিণাম সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শনকারী। তাঁদের সাথে নাযিল করেন সত্য গ্রন্থ। যাতে সত্যের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে ফায়সালা করা যায়। আর এ মতবিরোধ দেখা দেবার কারণ এটা নয় যে, শুরুতে তাদেরকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। না, মতবিরোধ তারাই করেছে যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট হেদায়াত লাভের পর নিছক এক কারণে সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পথে পা বাড়িয়েছিল যে তারা নিজেদের মধ্যে যুলুম ও বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল।*–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৩)।

অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে 'ধর্মের' ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেন, শিরকের অন্ধকারময় আবর্তে মানুষের ধর্মীয় জীবনের সূত্রপাত হয় অতপর ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে এ অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং আলোর রেখা উজ্জ্বল হতে থাকে। এভাবে অবশেষে মানুষ তাওহীদ বা এক আল্লাহর ধারণায় উপনীত হয়। কুরআন এর সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য পরিবেশন করে বলছে, দুনিয়ায় পরিপূর্ণ আলোকে মানুষের জীবনের সূত্রপাত হয়। আল্লাহ সর্বপ্রথম যে মানুষটিকে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং তার জন্যে সঠিক পথ কোন্‌টি তা বলে দিয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত আদমের বংশধররা সত্য-সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং একই দলভুক্ত থাকে। অতপর লোকেরা নতুন নতুন পথ বের করতে থাকে এবং বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। তাদেরকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি বলে তারা এমনটি করেছিল

* "শুরুতে সব মানুষ একই পথে চলছিলো" এরপর মতবিরোধের উল্লেখ উহ্য রয়ে গেছে। আয়াতের শেষে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তা নয়। বরং এর কারণ ছিল এই যে, সত্য জানা সত্ত্বেও অনেক লোক নিজের বৈধ অধিকারের চেয়ে বেশী লাভ ও সুবিধা আদায় করতে চাচ্ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে যুলুম, নিপীড়ন ও বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারে আগ্রহশীল ছিল। এ ক্রটিগুলো দূর করার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী পাঠাতে শুরু করলেন। এ নবীগণ প্রত্যেকে নিজেদের নামে এক একটি নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এক একটি উম্মত গড়ে তুলবেন—এ জন্যে তাদেরকে পাঠানো হয়নি। বরং তাঁদেরকে পাঠাবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁরা মানুষের সামনে এ হারিয়ে যাওয়া সত্য পথটি আবার সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেন, তাদেরকে পুনর্বার একটি উম্মতে পরিণত করবেন।[১০]

নবীদের কাজ

নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের জাতিকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেন। তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করার শিক্ষা দান করেন। শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে তাদেরকে দূরে রাখেন। তাদের জাহেলী ও অজ্ঞতাপূর্ণ রসম ও রীতি-রেওয়াজগুলো রহিত করেন। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করার পদ্ধতি শেখান এবং নির্ভুল ও সঠিক আইনের প্রচলন করে তা মেনে চলার নির্দেশ দেন। বাংলা-পাক-ভারত, চীন, ইরাক, ইরান, মিসর, আফ্রিকা, ইউরোপ তথা দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সত্য নবী আসেননি। তাঁদের সবার ধর্ম ছিল এক। আমাদের নিজেদের ভাষায় এ ধর্মকে আমরা 'ইসলাম' বলে থাকি।* তবে প্রত্যেকের শিক্ষা পদ্ধতি ও জীবন যাপনের আইন-কানুন কিছুটা বিভিন্ন ছিল। প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেসব মূর্খতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অনাচার ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলো খতম করার ওপর জোর দেয়া হয়। যেসব ভ্রান্ত চিন্তাধারার প্রচলন ছিল সেগুলো সংশোধনের প্রতি বেশী নজর দেয়া হয়। সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে জাতিরা যখন প্রথমিক পর্যায়ে ছিল তখন তাদেরকে সহজ সরল শিক্ষা ও শরীয়ত দান করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে যেমন তারা উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে তেমনি শিক্ষা ও শরীয়তকেও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করা হয়েছে। কিন্তু এ বিরোধ ছিল কেবলমাত্র বাহ্যিক চেহারা-আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। আত্মা ও প্রাণ ছিল সবার এক। অর্থাৎ সবার আকীদা-বিশ্বাস ছিল তাওহীদ নির্ভর এবং আমল বা কর্ম ছিল সততা, সুকৃতি, শান্তি, নিরাপত্তা এবং আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের ওপর প্রত্যয় নির্ভর।

নবীদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়

নবীদের সাথে লোকেরা অদ্ভূত ব্যবহার করে। প্রথমে তাঁদেরকে দৈহিক কষ্ট দেয়া হয়। তাদের সদুপদেশ মানতে অস্বীকার করা হয়। অনেককে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয় অনেককে হত্যা করা হয়। অনেকে সারা জীবন ধরে শিক্ষা ও উপদেশ দানের পর মাত্র পাঁচ দশজন লোককে সত্য ধর্মের অনুসারী করতে সক্ষম হন। কিন্তু আল্লাহর এ প্রিয় বান্দাগণ

* সাধারণত লোকেরা এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, ইসলামের সূচনা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে, এমনকি তাঁকে ইসলাম প্রবর্তক পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। আসলে এটা একটা বড় রকমের ভুল ধারণা। মনের পাতা থেকে এ ধারণা একেবারেই মুছে ফেলতে হবে। একথা ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত যে, ইসলামই হচ্ছে সর্বকালে সর্ব দেশে মানবজাতির একমাত্র ও আসল ধর্ম এবং দুনিয়ার যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নবী এসেছেন সবাই এ ধর্মটিরই বার্তা বহন করে এসেছেন।-(গ্রন্থকার)

নিরলস পরিশ্রম করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন। এমনকি এক সময় তাঁদের শিক্ষা প্রভাব বিস্তার করে। অনেক বড় বড় জাতি তাঁদের অনুসারী হয়। অতপর মানুষের পথভ্রষ্টতা নতুন রূপ ধারণ করে। নবীদের ইন্তেকালের পর তাঁদের উম্মতরা তাঁদের শিক্ষার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। আল্লাহর নিকট থেকে তাঁরা যে গ্রন্থগুলো আনেন উম্মতরা তার মধ্যে সব রকমের চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটায়। ইবাদতের নতুন নতুন পথ উদ্ভাবন করে। অনেকে নিজেরাই নিজেদের নবীর পূজা শুরু করে। অনেকে নিজেদের নবীদেরকে আল্লাহর অবতার (অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই মানুষের বেশ ধরে নেমে এসেছেন) গণ্য করে। অনেকে নিজেদের নবীকে আল্লাহর পুত্র আখ্যা দেয়। অনেকে তাদের নবীকে আল্লাহর কর্তৃত্বের ও সার্বভৌমত্বে অংশীদার বলে ঘোষণা করে। এভাবে বিভিন্ন পন্থায় মানুষের অদ্ভূত ও বিকলাঙ্গ মানসিকতার প্রকাশ ঘটতে থাকে। যাঁরা মূর্তি ভাংতে এসেছিলেন এবং মূর্তি ভেংগেছিলেন তাঁদের মূর্তি গড়ে মানুষ পূজা করতে থাকে। তারপর এ নবীগণ তাঁদের উম্মতদেরকে যে শরীয়াত দিয়ে গিয়েছিলেন তাকেও বিভিন্ন প্রকারে বিকৃত করা হয়। সব রকমের জাহেলী রীতিনীতি, মুখরোচক গল্প ও মিথ্যা বর্ণনা তার সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। তার মধ্যে মানুষের মনগড়া আইন ও বিধানের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। এমনকি মাত্র কয়েকশ' বছরের মধ্যে নবীর আসল শিক্ষা ও শরীয়াত কি ছিল এবং পরবর্তী লোকেরা তার মধ্যে কি কি বিষয় মিশ্রিত করেছে* তা জানার কোনো উপায়ই থাকেনি। নবীদের জীবনের অবস্থাও লোকদের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, তাদের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কিছুই পাওয়া যায় না।

তবুও নবীদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। সব রকমের মিশ্রণ সত্ত্বেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে কিছু না কিছু সত্য রয়ে গেছে। আল্লাহর চিন্তা ও আখেরাতের জীবনের চিন্তা প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোনো না কোনো পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সৎবৃত্তি, সততা, ন্যায় ও নৈতিকতা কতিপয় মূলনীতি সাধারণভাবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সমস্ত জাতি ও গোত্রের নবীগণ আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের জাতিদেরকে এমনভাবে তৈরী করে গেছেন যার ফলে সারা দুনিয়ায় বর্ণ-গোত্র-জাতি নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বমানবতার উপযোগী একটি বিশ্ব-ধর্মের শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভবপর হয়।[১১]

---

* নবীদের উম্মতরা এভাবেই নিজেদের আসল ধর্মকে (অর্থাৎ ইসলাম) বিকৃত করে নতুন নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটায়। দুনিয়ার বুকে বিভিন্ন নামে আজ এগুলোরই অস্তিত্ব বিরাজিত। যেমন হযরত ঈসা (আ) যে ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা আসলে ইসলাম ছিল কিন্তু তাঁর অনুসারীরা নিজেরাই হযরত ঈসাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও শরীয়াতের সাথে নিজেদের মনগড়া অনেক কথা মিশিয়ে দিয়ে এক নতুন ধর্ম তৈরী করেছে, যা আজ খৃষ্ট ধর্ম নামে দুনিয়ায় পরিচিত।–(গ্রন্থকার)

নবীদের দাওয়াত ও মর্যাদা

কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, একের পর এক নবী আসছেন এবং তাঁদের জাতিদেরকে সবাই একই দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۔

"হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহর বন্দগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।"

ব্যবিলনে অথবা সাদুমে, মাদায়েনে অথবা হিজার এলাকায়, নীল নদ উপত্যকায় বা দুনিয়ার যে কোনো দেশে, খৃষ্টপূর্ব চল্লিশ শতক থেকে দশ শতকে বা তার পরে দুনিয়ার দাস, স্বাধীন, অনুন্নত বা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে উন্নীত জাতিদের মধ্যে যখনই যেখানেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী এসেছেন তিনি মানুষকে একই দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁদের সবার দাওয়াত ছিল ঃ আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ (যথার্থ মাবুদ বা খোদা) নেই। হযরত ইবরাহীম (আ) নিজের জাতিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন, যতক্ষণ তোমরা এ মূলনীতিকে স্বীকৃতি না দেবে ততক্ষণ তোমাদের ও আমার মধ্যে কোনো প্রকার সহযোগিতা সম্ভবপর নয়।

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ

অর্থাৎ যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান না আন সে পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চলতে থাকবে এবং হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের নিকট গিয়ে اَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ (বনি ইসরাইলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও)-এ দাবী পেশ করার পূর্বে ঘোষণা করেন اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আমি বিশ্বজগতের প্রভুর নিকট থেকে প্রেরিত) এবং هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى (মূসা বলেন, তুমি কি পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির জন্যে প্রস্তুত এবং আমি কি তোমাকে তোমার প্রভুর পথ দেখাবো যাতে করে তুমি তাঁকে ভয় কর ?) এর দাওয়াত দেন এবং তাকে জানিয়ে দেন যে, তুমি রব ও প্রভু নও বরং যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবাইকে জীবন যাপনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন তিনিই রব এবং প্রভু। رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى (তিনিই আমাদের রব ও প্রভু যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে আকৃতি দান করেছেন অতপর তার চলার পথ নির্ধারণ করেছেন।)* হযরত ঈসা (আ)-এর জাতি

* অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ) একই দায়িত্ব পালন করেন, যা পালন করেন হযরত নূহ (আ) থেকে নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত অন্যান্য নবীগণ। আর এ দায়িত্ব ছিল লোকদেরকে একথা জানানো ও বুঝানো যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে নিজেদের রব ও প্রভু বলে স্বীকার করো এবং এ জীবনের পরে যে জীবন আসছে সেখানে তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডের হিসেব দিতে হবে। কেবল তোমাদের নয় বরং সর্বকালের সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ একমাত্র সকল যুগের নবীগণ প্রদত্ত তাওহীদ ও আখেরাতে বিশ্বাসের দাওয়াত গ্রহণ এবং তারই ভিত্তিতে নিজের জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপরই নির্ভরশীল।–(গ্রন্থকার)১২

রোমানদের শাসনাধীনে পরাধীন জীবনযাপন করছিল। কিন্তু তিনি বনি ইসরাইল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন জাতিকে রোমান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার আমন্ত্রণ জানাননি। বরং তিনি লোকদেরকে দাওয়াত দেন যে, إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ- (বস্তুত আল্লাহ আমার ও তোমাদের রব। কাজেই তাঁর ইবাদাত করো, এটিই সোজা-সরল পথ)। বলাবাহুল্য কুরআনে বর্ণিত এ ঘটনাবলী অন্য কোনো জগতের নয় বরং যে পৃথিবীতে আমাদের বাস সেই মাটির পৃথিবীরই ঘটনা এবং আমাদের ন্যায় রক্ত-মাংসের মানুষদের সাথে এ ঘটনা সম্পর্কিত। এ কথা বলার এখানে কোনো সুযোগই নেই যে—যেসব দেশে ও যেসব জাতির মধ্যে নবীদের আগমন হয়েছিল তাদের কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা ছিল না এবং এ সমস্যাগুলো সমাধানের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেকটি নেতা, প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক যুগে সর্বপ্রকার সাময়িক ও স্থানীয় সমস্যা উপেক্ষা করে একটি মাত্র সমস্যাকে সামনে রেখেছেন এবং এরি পেছনে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন, তখন আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তাঁদের নিকট এটিই ছিল সমস্ত সমস্যার মূল এবং এ সমস্যাটির সমাধানের ওপর তাঁরা জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল বলে মনে করতেন।[১৩]

হযরত ঈসা (আ) বনি ইসরাইলকে সম্বোধন করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ قف فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

"তোমাদের ওপর কিছু জিনিস হারাম করে দেয়া হয়েছে সেগুলোকে হালাল করে দেয়ার জন্যে আমি এসেছি। দেখ, তোমাদের রবের নিকট থেকে আমি তোমাদের জন্যে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তাঁর বন্দেগী করো, এটিই সোজা-সরল পথ।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫০-৫১)

এ থেকে জানা গেল অন্যান্য সকল নবীর ন্যায় হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতের মূল বক্তব্যও ছিল তিনটি বিষয়।*

এক ঃ সার্বভৌমত্ব যা একমাত্র আল্লাহর জন্যে স্বীকৃত। এ জন্যে বন্দেগী তাঁর জন্যে নিবেদিত এবং তাঁরই আনুগত্যের ভিত্তিতে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সমগ্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

দুই ঃ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে নবীর আদেশ মেনে চলতে হবে।

* হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কারণ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে তিনি ছিলেন শেষ নবী এবং তাঁর বাণী, বক্তব্য ও দাওয়াতকে পুরোপুরি বিকৃত করা হয়েছে।—(সংকলক)

তিন ঃ মানুষের জীবনে হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের সীমারেখা একমাত্র আল্লাহর আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে অন্যদের প্রতিষ্ঠিত আইন বাতিল করা হবে।*

আসলে হযরত ঈসা (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত মুহাম্মদ (সা) ও অন্যান্য নবীগণের দাওয়াতের মধ্যে তিলাগ্র পার্থক্য নেই। যারা বিভিন্ন নবীর মিশন বিভিন্ন বলে মনে করেছেন এবং উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির দিক দিয়ে তাঁদের মিশনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন তাঁরা মারাত্মক ভুল করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিজগতের সর্বময় কর্তার নিয়োগপত্র নিয়ে তাঁর প্রজাগণের নিকট যিনিই আসবেন তাঁর আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে, তিনি প্রজাদেরকে নাফরমানি ও স্বায়ত্ব শাসন পরিচালনা করা থেকে বিরত রাখবেন, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করতে (অর্থাৎ সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকের সাথে অংশীদার করা এবং নিজের আনুগত্য ও ইবাদাত-বন্দেগীকেও উভয়ের জন্যে বন্টন করে দেয়া) নিষেধ করবেন এবং একমাত্র আসল প্রভুর বন্দেগী; আনুগত্য, পূজা, উপাসনা ও নির্দেশ মেনে চলার দাওয়াত দেবেন। [১৪]

কুরআন মজীদে নবীদের আগমনের উদ্দেশ্যকে অন্যভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ -

"এ রসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল এ জন্যে যে, তাঁদেরকে পাঠাবার পর লোকদের নিকট আল্লাহর মোকাবিলায় কোনো কিছু বলার না থাকে।–(সূরা আন নিসা ঃ ১৬৫)

অর্থাৎ এসব রসূলদেরকে পাঠাবার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেটি ছিল এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির সামনে তাঁর যুক্তি-প্রমাণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে চাচ্ছিলেন, যাতে শেষ বিচারের দিনে কোনো পথভ্রষ্ট অপরাধী এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, আমরা অনবহিত ছিলাম এবং আপনি আমাদেরকে সত্য ও আসল ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত করার কোনো ব্যবস্থা করেননি। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এ নবীগণ বিপুল সংখ্যক মানুষের নিকট সত্য জ্ঞান পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পরও মানুষের জন্যে আসমানী গ্রন্থসমূহ রেখে গেছেন। এ গ্রন্থগুলোর মধ্য থেকে প্রতিযুগে মানুষের সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্যে কোনো না কোনো গ্রন্থ অবশ্যি দুনিয়ার বুকে রয়ে গেছে। কাজেই এরপরও কোনো ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকলে সেজন্যে আল্লাহ ও তাঁর নবীগণ অভিযুক্ত হবে না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই অভিযুক্ত হবে। কারণ তার নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছেছিল কিন্তু সে তা গ্রহণ করেনি। অথবা সেসব লোক এ জন্যে অভিযুক্ত হবে যারা সত্য-সঠিক পথ জানতো কিন্তু আল্লাহর বান্দাদেরকে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত দেখেও তারা তাদেরকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেয়নি।[১৫]

---

* সূরা আলে ইমরানের ৫১নং আয়াত দ্রষ্টব্য ঃ

إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

নবী ও রসূলগণ সত্যের আহ্বায়ক হওয়ার সাথে সাথে আনুগত্য লাভের অধিকারীও হন। যেমন কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط

"আমি যে রসূলই পাঠিয়েছি তা এ জন্যে পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে তাঁর আনুগত্য করতে হবে।'-(সূরা আন নিসা ঃ ৬৪)

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল এ জন্যে আসেন না যে, কেবল তাঁর রিসালাতের ওপর ঈমান আনতে হবে অতপর ইচ্ছামতো অন্য কারো আনুগত্য করলে চলবে। বরং রসূল আসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে, জীবন যাপনের জন্যে যে বিধান তিনি আনেন, দুনিয়ার যাবতীয় বিধান ত্যাগ করে একামাত্র সেই বিধানেরই আনুগত্য করতে হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যেসব নির্দেশ দেন দুনিয়ার সমস্ত নির্দেশ ত্যাগ করে একমাত্র সেগুলোই কার্যকর করতে হবে। যে ব্যক্তি এভাবে রসূলের আনুগত্য করে না তার রসূলকে নিছক রসূল মেনে নেয়ার কোন অর্থ নেই।[১৬]

দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোও নবীগণের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ٥(التوبة : ٣٣)

"আল্লাহ নিজের রসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্যে।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩)

মূল আয়াতে 'আদ-দ্বীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অনুবাদে আমি লিখেছি 'সমস্ত দ্বীন'। আসলে দ্বীন শব্দটিকে আরবী ভাষায় এমন জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার প্রতিষ্ঠাকারীকে সনদ ও অনুসরণযোগ্য বলে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করা হয়। কাজেই এ আয়াতে রসূল আগমনের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন এনেছেন দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত দ্বীন তথা পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ওপর তাকে বিজয়ী করতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, রসূলকে কখনো এ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় না যে, তিনি যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আসেন তা অন্য কোন জীবন ব্যবস্থায় অধীন ও তার নিকট বিজিত হয়ে তার প্রদত্ত সুযোগসুবিধার মধ্যে মাথা গুঁজে ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটাবেন। বরং তিনি আসেন পৃথিবী ও আকাশের বাদশাহের প্রতিনিধি হয়ে। তিনি নিজের বাদশাহের সত্য ব্যবস্থাকে বিজয়ী দেখতে চান। দুনিয়ায় যদি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার প্রচলন থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার অধীনে তার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ক'টি নিয়ে মাথা গুঁজে থাকতে হবে, যেমন হয় জিজিয়া আদায় করার ক্ষেত্রে যিম্মীদের জীবন ব্যবস্থার অবস্থা।[১৭]

বিপর্যয় দূর করাই নবীদের কাজ

মানুষ যখন আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করে নিজের নফসের বা অন্যদের আনুগত্য শুরু করে এবং আল্লাহর হেদায়েত ও পথনির্দেশ অমান্য করে অন্যের মনগড়া নীতি, আইন

ও বিধানের ভিত্তিতে নিজের নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাঠামো তৈরী করে তখন দুনিয়ার বুকে আসল বিপর্যয় দেখা দেয়, যার ফলে বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়। এ বিপর্যয় রোধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনই কুরআনের উদ্দেশ্য। এ সংগে কুরআন এ সত্যটিরও দ্বারোদ্ঘাটন করে যে, বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপর্যয় আসল নয় এবং সততা, সৎবৃত্তি ও সৎকর্মশীলতা সাময়িকভাবে তাকে স্থানচ্যুত করেনি। বরং এক্ষেত্রে সততা, সৎবৃত্তি ও সৎকর্মশীলতাই হচ্ছে আসল এবং নিছক মানুষের মূর্খতা, অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ির কারণে বিপর্যয় সাময়িকভাবে তার ওপর চেপে বসে। অন্যকথায় বলা যায়, দুনিয়ার মানুষের জীবন মূর্খতা, অজ্ঞতা, বর্বরতা, শির্ক, বিদ্রোহ ও নৈতিক অরাজকতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়নি এবং এগুলো দূর করার জন্যে পরে পর্যায়ক্রমে সংশোধনের কাজ শুরু হয়নি। বরং প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন শুরু হয় সততা ও সৎকর্মশীলতার মাধ্যমে এবং পরবর্তীকালে অসৎ লোকেরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্কর্মের মাধ্যেম এই পবিত্র ব্যবস্থাটিকে পংকিল ও আবিলতাময় করতে থাকে। এই বিপর্যয় দূর করে মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে নতুন করে সংশোধন করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ যুগে যুগে নবীদেরকে পাঠাতে থাকেন। নবীগণ প্রতি যুগে মানুষকে এই একই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন যে, যে সততা, সৎবৃত্তি ও সৎকর্মশীলতার ওপর বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বিরত* থাক। [১৮]

নবুয়াতের দাবীর মধ্যে একথা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে যে, নবী মানুষের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত করে দিতে চান। নিসন্দেহে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তি যখন নিজেকে বিশ্বজগতের প্রভুর প্রতিনিধি হিসেবে পেশ করেন তখন এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে এ কথা স্বীকৃত হয় যে, তিনি মানুষের নিকট নিজের জন্যে পরিপূর্ণ আনুগত্যের দাবী করেন। কারণ বিশ্বজগতের প্রভুর প্রতিনিধি কখনো অন্য কারো অধীন প্রজা ও তার অনুগত হয়ে থাকার জন্যে আসেন না। বরং তিনি আসেন সবাইকে অনুগত করার ও তাদের শাসক ও রক্ষণা-বেক্ষণকারী হবার জন্যে। এক্ষেত্রে কোন কাফেরের শাসন কর্তৃত্বের মর্যাদা স্বীকার করে নেয়া তাঁর রিসালাতের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[২০]

রসূল পাঠাবার উদ্দেশ্য

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِۢمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۝ (القصص : ٤٧)

---

* এ ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভংগী বিবর্তনবাদীদের দৃষ্টিভংগী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিবর্তনবাদীরা একটি সম্পূর্ণ ভুল চিন্তাধারার ভিত্তিতে এ মতবাদের জন্ম দিয়েছে যে, মানুষ অন্ধকার থেকে বের হয়ে পর্যায়ক্রমে আলোকের দিকে এসেছে। তার জীবনের শুরুতে ছিল বিকৃতি ও ভাঙন। তারপর ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তা সুগঠিত হতে যাচ্ছে। বিপরীত পক্ষে কুরআন বলছে, আল্লাহ পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে ছিলেন এবং একটি কল্যাণময় ব্যবস্থার মাধ্যমে তার জীবনের সূচনা করেছিলেন। অতপর মানুষ নিজেই শয়তানের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর বার বার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এ কল্যাণময় ব্যবস্থাকে বার বার বিকৃত করেছে। মানুষকে এ অন্ধকার থেকে আলোকের পথে আনার এবং বিকৃতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকার দাওয়াত দেয়ার জন্যে আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর নবীগণকে পাঠিয়েছেন।[১৯]

"(আর এটা আমি এ জন্যে করেছি যে,) এমন যেন না হয় যে, তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলে যখন তাদের ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা একথা বলতে না পারে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল পাঠাওনি কেন? (রসূল পাঠালে) আমরা তোমার আয়াতের অনুসারী হতাম এবং ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।"–(সূরা আল কাসাস ঃ ৪৭)

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ কথাটিকেই রসূল প্রেরণের কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের এ বর্ণনার প্রেক্ষিতে যদি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এ উদ্দেশ্যে সবসময় সকল স্থানেই একজন রসূল আসা উচিত, তাহলে ভুল করা হবে। কারণ যতদিন দুনিয়ায় কোনো রসূলের বাণী অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে এবং সাধারণ মানুষের নিকট তা পৌঁছুবার মাধ্যমও বিদ্যমান থাকে ততদিন কোনো নতুন রসূলের প্রয়োজন থাকে না। তবে যদি আগের বাণীর মধ্যে কোনো প্রকার বৃদ্ধি বা কোনো নতুন বাণী পাঠাবার প্রয়োজন হয় তাহলে এক্ষেত্রে নতুন রসূলের আগমন ঘটে। কোনো ক্ষেত্রে যদি নবীদের শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যায় বা ভুল শিক্ষার সাথে মিশে গিয়ে সত্য পথপ্রদর্শনের যোগ্যতা হারিয়ে বসে তাহলে সেখানে লোকদের পক্ষে অবশ্যি এ ধরনের ওজর পেশ করার সুযোগ আসে যে, তাদের জন্যে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য অবগত করাবার এবং সঠিক পথ বাতলে দেবার কোনো ব্যবস্থা আদৌ ছিল না, এ অবস্থায় সত্য-সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া তাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভবপর ছিল? এ ওজর দূর করার জন্যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা নবী পাঠিয়ে থাকেন। ফলে এর পরে যে ব্যক্তি ভুল পথ অবলম্ব করবে তার ভুলের জন্যে তাকেই দায়ী করা সম্ভব হবে।২১

আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল এ জন্যে আসেন না যে, কেবল তাঁর রিসালাতের ওপর ঈমান আনতে হবে অতপর নিজের ইচ্ছামত অন্য কারো আনুগত্য করলে চলবে। বরং রসূল আসার উদ্দেশ্যই এ হয়ে থাকে (যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে) যে, জীবনযাপনের জন্যে যে বিধান তিনি নিয়ে আসেন অন্য সমস্ত জীবনবিধান ত্যাগ করে একমাত্র সেই জীবনবিধান অবলম্বন করতে হবে এবং রসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ দান করেন অন্য সব নির্দেশ উপেক্ষা করে একমাত্র সেই নির্দেশ পালন করতে হবে। রসূলকে মেনে নেবার পর কোনো ব্যক্তি যদি এ কাজ না করে তাহলে তার রসূলকে মানাই অর্থহীন হয়ে পড়ে।২২

ফায়সালার সময়ের পূর্বে রসূলদের আগমন

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ

لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْا اٰيٰتِىْ وَمَا اُنْذِرُوْا هُزُوًا ○

"রসূলদেরকে আমি সুসংবাদ দান ও সতর্ক করার কার্য সম্পাদন করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পাঠাই না কিন্তু কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা বাতিলের অস্ত্র নিয়ে হককে বিজিত দেখাবার চেষ্টা করে এবং তারা আমার আয়াতগুলো এবং তাদেরকে যেসব বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সেগুলোকে বিদ্রূপ করে।"–(সূরা কাহাফ ঃ ৫৬)

অর্থাৎ ফায়সালার সময় আসার পূর্বে লোকদেরকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ভাল ও অমান্য করার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার জন্যেই আমি রসূল পাঠাই।২৩

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ (ال عمران : ١٩)

"আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র দ্বীন। যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল তাদের পক্ষে এই দ্বীনকে বাদ দিয়ে অন্যান্য পথ অবলম্বন করার এ ছাড়া আর কোনো কারণ ছিল না যে, তাদের নিকট জ্ঞান এসে যাবার পর তারা পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্যে এমনটি করেছিল।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)

এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার যেখানে যখনই কোনো রসূল এসেছেন তিনি দ্বীন ইসলামের বাণী বহন করে এনেছেন এবং দুনিয়ার কোনো জাতির মধ্যে ভাষায় যখনই কোনো কিতাব নাযিল হয়েছে তা ইসলামেরই শিক্ষা দান করেছে। এ আসল দ্বীনকে বিকৃত করে এবং এর মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করে মানব জাতির মধ্যে যে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভাব ঘটানো হয়েছে তার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, লোকেরা নিজেদের বৈধ অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে আরো অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ লাভ করতে চাচ্ছিল। এ জন্যে তারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত আসল দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাস মূলনীতি ও বিধানের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে।[২৪]

নবীগণ একই দ্বীনের পতাকাবাহী

وَتَقَطَّعُوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۚ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُوْنَ ۝ (الانبياء : ٩٣)

"আর তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের দ্বীনকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল, তাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমার দিকে।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৩)

দুনিয়ায় যত নবীর আগমন ঘটেছে সবাই ছিলেন এই দ্বীনের পতাকাবাহী। সেই আসল দ্বীনটির মর্মকথা ছিল, মানুষের রব ও প্রতিপালক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং একমাত্র তাঁরই বন্দেগী ও উপাসনা করা উচিত। পরবর্তীকালে যতগুলো ধর্মের উদ্ভব হয় সবই ঐ আসল দ্বীনটির বিকৃত রূপ। কেউ তার থেকে একটি কথা নিয়েছে, কেউ অন্য একটি কথা নিয়েছে। কেউ তার একটি বিষয় উঠিয়ে নিয়েছে, কেউ অন্য একটি বিষয়। তারপর তার সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক কিছুই মিশিয়ে দিয়েছে। এভাবে অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি এ কথা বলা হয় যে, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক এবং অমুক নবী অমুক ধর্ম তৈরী করেছেন আর মানব জাতির মধ্যে ধর্মের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে নবীগণই তাদেরকে শতধা বিভক্ত করেছেন, তাহলে একে একটি নির্জলা মিথ্যাই বলা যেতে পারে। কেবলমাত্র এ ধর্মগুলোর বিভিন্ন চেহারা এবং বিভিন্ন যুগে ও দেশে এদের বিভিন্ন নবীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা একথা প্রমাণ করে না যে, ধর্মগুলোর এ বিভিন্নতা নবীদের সৃষ্ট। এক আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ একটির পরিবর্তে একাধিক ধর্ম গঠন করতে এবং এক আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোন প্রভুর বন্দেগী করা শিক্ষা দিতে পারেন না।[২৫]

নবুয়াত লাভের পূর্বে নবীগণের চিন্তাধারা

কুরআন মজীদ থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী অবতরণের পূর্বে নবীগণ যে জ্ঞান রাখতেন তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের তুলনায় কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতো

না। অহী অবতরণের পূর্বে তাঁদের নিকট জ্ঞানের এমন কোনো মাধ্যম ছিল না যা অন্যদের নিকট ছিল না। তাই কুরআন বলে, مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ "তুমি জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি।" (আশ্‌শুরা ঃ ৫২) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى "আর আল্লাহ তোমাকে পেলেন পথহারা হিসেবে তারপর তোমাকে পথের সন্ধান দিলেন।"

এর সাথে কুরআন আমাদেরকে একথাও জানায় যে, অন্যান্য লোকেরা জ্ঞান ও উপলব্ধির যেসব সাধারণ মাধ্যমের অধিকারী নবীগণ নবুয়াত লাভের পূর্বে সেগুলোর সাহায্যেই অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনার স্তর অতিক্রম করে যান। অহীর আগমন তাঁদের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানকে শক্তিশালী করে দেয়। পূর্বে তাঁদের মন যেসব সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে আসছিল অহী সেগুলোর সত্য হবার ব্যাপারে নিশ্চিত ও চূড়ান্ত সাক্ষ্য প্রদান করে। এবং সে সত্যগুলোর সাথে তাঁদের প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়, যার ফলে তাঁরা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দুনিয়ার সামনে সেগুলোর সাক্ষ্য দিতে পারেন। সূরা হুদে এ বিষয়বস্তুটি একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে রসূলে করীম (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ط

"তারপর কি সেই ব্যক্তি যে পূর্বেই তার রবের পক্ষ থেকে একটি উজ্জ্বল প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (অর্থাৎ বুদ্ধিগত ও প্রকৃতিগত হেদায়াতের অধিকারী ছিল) অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাক্ষীও তার নিকট এল (অর্থাৎ কুরআন) এবং এর পূর্বে মূসার কিতাবও পথপ্রদর্শক ও রহমত হিসেবে বিদ্যমান ছিল (এ সত্যটির ব্যাপারে কি তারা সন্দেহ পোষণ করতে পারে ?)।"-(সূরা হুদ ঃ ১৭)

অতপর এ বিষয়বস্তুটি আবার তৃতীয় রুকূ'তে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের মুখে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ط اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ○

"হে আমার জাতির লোকেরা চিন্তা কর, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি উজ্জ্বল প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি এবং তারপর তিনি নিজের পক্ষ থেকে আমার ওপর রহমতও (অহী ও নবুয়াত) বর্ষণ করে থাকেন আর সে বস্তু তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কি জোরপূর্বক তা তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেব ?"-(সূরা হুদ ঃ ২৮)

আবার ষষ্ঠ রুকূ'তে হযরত সালেহ (আ) এবং অষ্টম রুকূ'তে হযরত শো'আইব (আ) এই একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করেছেন। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অহীর মাধ্যমে সরাসরি সত্যজ্ঞান লাভ করার পূর্বে নবীগণ চিন্তা-গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের প্রকৃতিগত যোগ্যতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে (ওপরের আয়াতে যাকে بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ বলা হয়েছে) তাওহীদ ও আখেরাত তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতেন। সত্যের গভীরে

প্রবেশের ক্ষেত্রে তাঁদের এ সাফল্য আল্লাহ প্রদত্ত (وَهبى) নয় বরং এটি হতো তাঁদের সোপার্জিত (كسبى)। এরপর আল্লাহ তাঁদেরকে অহীর জ্ঞান দান করতেন। এটি সোপার্জিত নয় এটি হতো আল্লাহ প্রদত্ত।

এ প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর পর্যবেক্ষণ, চিন্তা, গবেষণা সাধারণ জ্ঞানের (Commonsense) ব্যবহার দার্শনিকদের আন্দাজ, অনুমান ও অনুধ্যান (Speculation) থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের জিনিস। এ জিনিসটি ব্যবহারের দিকে কুরআন মজীদ নিজেই প্রত্যেকটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। কুরআন বার বার বলেছে, চোখ খুলে আল্লাহর প্রাকৃতিক নিদর্শনগুলো দেখ এবং তা থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা কর।২৬

রসূলের ইল্‌মে গায়েব

যতটুকু ইল্‌মে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান মানুষকে পৌছিয়ে দেয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র ততটুকু ইলমে গায়েব রসূলদেরকে দান করা হয়েছিল—এ ধারণা ভুল। এ ধারণা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী। কুরআন মজীদে হযরত ইয়াকুব (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নিজের ছেলেদেরকে তিনি বলেছেন ঃ اِنِّىْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ "আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি এমন সব বিষয় জানি যা তোমরা জান না।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ১১)

এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায়, বিভিন্ন জাতির ওপর শাস্তি প্রেরণের পূর্বে তাদের নবীদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল কিন্তু তাঁরা শাস্তি আসার সময়ও তার বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের জাতিদেরকে অবহিত করেননি। হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে এত পূর্বে শাস্তির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি সে সময়ের মধ্যে জাহাজ বানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের জাতিকে এ কথা বলেননি যে, তাদের ওপর বন্যার শাস্তি আসছে। আবার হাদীস থেকেও এ কথা জানা যায় যে, রসূলে করীম (সা)-কে গায়েবের এমন সব অবস্থা জানানো হয়েছিল যা তিনি উম্মতকে জানিয়ে যাননি। একবার এক ভাষণে রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ

يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا عَلِمْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

"হে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত! আল্লাহর কছম, আমি যা জেনেছি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং বেশী করে কাঁদতে।"–(বুখারী ঃ সাদকা ফিল কাসূফ অধ্যায়)

আর এক সময় রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ لَاَرَاكُمْ مِّنْ وَّرَائِىْ كَمَا اَرَاكُمْ "আমি তোমাদেরকে পেছনে ঠিক তেমনিভাবে দেখি যেমন সামনে দেখি।"–(বুখারী ঃ আযমাতু ইমামিন নাস অধ্যায়)।

মোটকথা এমনি আরো বহু হাদীস ও আয়াত থেকে একথা জানা যায় যে, রসূলদের মাধ্যমে যে পরিমাণ গায়েবের ইল্‌ম বান্দাদের নিকট পৌছেছে তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণ গায়েবের ইল্‌ম তাদেরকে দান করা হয়েছিল। স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধিও এ কথাই

সমর্থন করে। কারণ গায়েবের যে ব্যাপারটুকু ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পর্কিত কেবলমাত্র সেটুকু জানাই সাধারণ মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু রসূলদের কেবলমাত্র এতটুকু গায়েবের ইল্‌ম জানলে চলে না। তাঁদের আরো বহু কিছু জানার প্রয়োজন হয় যা রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের জন্যে সহায়ক হয়। যেমন রাষ্ট্রের নীতি ও তার গোপন রহস্য সম্পর্কে এক বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপ্রধান ও গবর্নরদের জানা থাকা প্রয়োজন। এ রহস্যগুলো সাধারণ প্রজাদের নিকট জানাজানি হয়ে গেলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তেমনিভাবে আল্লাহর রাজ্য ব্যবস্থাপনারও বহু গোপন রহস্য আছে যেগুলো জানেন কেবলমাত্র আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধি ও তাঁর রসূলগণ। সাধারণ প্রজা অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা সে সবের বিন্দুবিসর্গও জানে না। এ গায়েবের ইল্‌ম রসূলদেরকে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে এর কোনো প্রয়োজন নেই এবং তারা এটি বরদাশ্‌ত করারও ক্ষমতা রাখে না। অতি সংক্ষেপে এতটুকু বলা হয় যে, নবীর ইল্‌ম আল্লাহর ইল্‌ম থেকে কম এবং সাধারণ মানুষের ইল্‌ম থেকে বেশী হয়। তবে এ ইল্‌মের পরিমাণ কতটুকু ? কত বেশী বা কত কম ? অবশ্যি এভাবে একে পরিমাপ করার মতো কোনো যন্ত্র আমাদের কাছে নেই।২৭

নবীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি

মানুষের সমাজে নবীগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক মর্যাদার অধিকারী। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে সাধারণ একটি ঘটনা বিশেষ কোন গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু ঐ একই ঘটনা নবীর জীবনে সংঘটিত হলে তা আইনে পরিণত হয়। এজন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের জীবনের প্রতিটি ঘটনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। যার ফলে তাঁদের সামান্যতম কোনো পদক্ষেপ এবং তাঁদের কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজও আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিকূলে সংঘটিত হতে পারে না। নবী যদি কখনো এমন কোনো কাজ করেও থাকেন তাহলে সংগে সংগে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী আইন ও তার মূলনীতিগুলো কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাবেই নয় রবং নবীর উত্তম জীবনাদর্শ হিসেবেও মানুষের নিকট পৌঁছে যাবে এবং এমন সামান্যতম বস্তুও তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না যা আল্লাহর ইচ্ছার অনুসারী নয়।২৮

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ

নবীগণের মধ্যে থেকে প্রত্যেককে আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী পৃথিবী ও আকাশের পরিচালন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়েছেন এবং জড় ও অদৃশ্য জগতের মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে দিয়ে এমন সব গোপন তত্ত্বেরও চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যেগুলোর ওপর সাধারণ মানুষকে ঈমান বিলগায়েব আনার আহ্বান জানাবার জন্যে তাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এভাবে দার্শনিকদের থেকে তাঁদের মর্যাদা পৃথক সত্তায় চিহ্নিত হয়ে গেছে। দার্শনিকরা আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে থাকেন। তাঁরা যদি নিজেদের অবস্থা ও মর্যাদা সঠিক অবগত হতেন তাহলে কখনো নিজেদের কোনো মতের সত্যতার সাক্ষ্য দিতেন না। বিপরীতপক্ষে নবীগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই সব কথা বলে থাকেন। তাঁরা মানুষের সামনে এভাবে সাক্ষ্য দিতে পারেন ঃ আমরা যা কিছু বলছি তা আমারা ভালভাবে জানি এবং আমরা তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।২৯

অস্বাভাবিক শক্তি*

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنَ ـ

"যখন এ কাফেলা (মিসর থেকে) রওয়ানা হলো, তখন তাদের পিতা (কেনানে স্বগৃহে বসে) বললেন ঃ আমি ইউসুফের খোশবু অনুভব করছি তোমরা (গৃহের বাসিন্দারা) যেন আবার এ কথা না বলে বসো যে, বুড়ো হয়ে গিয়ে আমার মতিভ্রম ঘটেছে।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ৯৪)

এ থেকে নবীদের অস্বাভাবিক শক্তি আন্দাজ করা যেতে পরে। কাফেলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামা নিয়ে সবেমাত্র মিসর থেকে যাত্রা করেছে এমন সময় শত শত মাইল দূরে বসে হযরত ইয়াকুব (আ) তার গন্দ পেয়ে গেছেন। কিন্তু এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, এ শক্তি নবীদের নিজস্ব ছিল না। আল্লাহ তাঁদেরকে এ শক্তি দান করেছিলেন। তবে আল্লাহ যখন এবং যে পরিমাণ চাইতেন একমাত্র তখনই তাঁরা সেই পরিমাণ এ শক্তি কাজে লাগাতে পারতেন। হযরত ইউসুফ (আ) বছরের পর বছর মিসরে থাকলেন কিন্তু হযরত ইয়াকুব (আ) কখনো তাঁর খোশবু পেলেন না। আর এখন তাঁর জামা মিসর থেকে চলা শুরু হবার সাথে সাথে হঠাৎ হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ঘ্রাণ শক্তি এত বেড়ে গেলো যে, তিনি তার খোশবু পেতে লাগলেন।৩০

নবীদের মানবিক সত্তা

পূর্ববর্তী সকল নবীই মানুষ* ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর কোনো অভিনব সৃষ্টি ছিলেন না। একজন মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠানো এটা ইতিহাসের কোনো অভিনব ঘটনা নয়।

মুহাম্মদ (সা) এখন যে কাজ করছেন পূর্ববর্তী নবীগণও ঐ একই কাজের জন্যে এসেছিলেন। মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় তাঁদের মিশন ও শিক্ষা একই ছিল।

নবীদের সাথে আল্লাহ বিশেষ ব্যবহার করেছেন। তাঁদের ওপর বড় বড় বিপদ এসেছে। বছরের পর বছর তাঁরা বিপদের মধ্যে অবস্থান করেছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁদের ওপর বিপদ এসেছে আবার শত্রুরাও তাঁদেরকে বিপদে ফেলেছে। কিন্তু অবশেষে তাঁদের জন্যে এসেছে আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা। তাঁর দয়া ও অনুকম্পায় তাঁদেরকে আপ্লুত করেছেন। তাঁদের দো'য়া কুবল করেছেন। তাঁদের কষ্ট দূর করেছেন। তাঁদের শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন এবং অলৌকিকভাবে তাঁদেরকে সাহায্য দান করেছেন।

আল্লাহর প্রিয় ও মনঃপূত হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর পক্ষ থেকে বড় বড় বিস্ময়কর শক্তি লাভ করার পরও তাঁরা ছিলেন আল্লাহর বান্দাহ্ ও মানুষ। তাঁদের একজনও খোদায়ী ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন না।৩১

নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ

নবীরাও মানুষ। কোনো মানুষই মু'মিনের জন্যে নির্ধারিত পূর্ণমানে সর্বক্ষণ অবস্থান করার ক্ষমতা রাখে না। কোনো কোনো সময় কোনো নাজুক আবেগময় পরিস্থিতিতে নবীর

* নবীদের অস্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতা এবং তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে "ব্যক্তি ও নবী হিসেবে রসূলে করীমের মর্যাদা" অধ্যায়ের "রিসালাত ও তার বিধান" অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

* নবীদের মানবিক সত্তা ও বিষয়বস্তুর উপর পরবর্তী আলোচনা একটি অনুচ্ছেদে সংযোজিত হয়েছে।

ন্যায় শ্রেষ্ঠতম মানুষও সামান্যতম সময়ের জন্যে নিজের মানবিক দুর্বলতার নিকট হার মানেন। কিন্তু যখনই তিনি অনুভব করেন বা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করানো হয় যে, তিনি আকাংখিত মানের নীচে চলে যাচ্ছেন, তখনই তিনি তওবা করেন। নিজের ভুলের সংশোধন করার ব্যাপারে তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও ইতস্ততঃ করেন না। হযরত নূহ (আ)-এর চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, তাঁর যুবক পুত্র তাঁর চোখের সামনে অথৈ পানির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য তিনি চোখ দিয়ে দেখছেন, দৃশ্যের ভয়াবহতায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু যখনই আল্লাহ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন যে, যে পুত্র হককে ত্যাগ করে বাতিলকে আঁকড়ে ধরেছে তাকে কেবলমাত্র নিজের ঔরসজাত বলে নিজের মনে করা নিছক একটি জাহেলী আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখনই তিনি মনের গভীর ক্ষতের পরোয়া না করে ইসলামের নির্ধারিত চিন্তাধারার দিকে ফিরে এলেন।৩২

নবীর নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তাঁর নিকট থেকে গুনাহ ও ভুল করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, এমন কি তাঁর দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আর নেই। বরং এর অর্থ হচ্ছে, নবী গুনাহ করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু যাবতীয় মানবিক গুণাবলী, মানবিক আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছা-অভিলাষের অধিকারী হওয়ার পরও তিনি এমনই সৎ ও খোদাভীরু হন যে, কখনো জেনে বুঝে গুনাহের সংকল্প করেন না। তাঁর বিবেকের মধ্যে নিজের প্রতিপালকের এত বিরাট ও শক্তিশালী সাক্ষ্য-প্রমাণ মওজুদ থাকে যার মোকাবিলায় তাঁর প্রবৃত্তির আকাংখা কখনো সফলকাম হতে পারে না। এর পরও তাঁর অজ্ঞাতে যদি কখনো কোনো ভুল হয়েও যায় তাহলে সংগে সংগেই আল্লাহ প্রকাশ্য অহীর মাধ্যমে তাঁর সংশোধন করে দেন। কারণ তাঁর পদস্খলন মাত্র এক ব্যক্তির পদস্খলন নয় বরং একটি উম্মতের পদস্খলন। তিনি সত্যপথ থেকে এক চুল পরিমাণ সরে গেলে সারা দুনিয়া গোমরাহীর পথে কয়েক মাইল দূরে এগিয়ে যায়।৩৩

নবীদের গুণাবলী সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ط اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا○

"আর এ কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা কর নিশ্চয়ই সে ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ও একজন নবী।"-(সূরা মরিয়ম ঃ ৪১)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى ز اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا○وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا○(مريم : ٥١-٥٢)

"আর এ কিতাবে মূসার কথা আলোচনা কর। সে ছিল একজন মনঃপূত ব্যক্তি এবং একজন রসূল-নবী। আর আমি তাকে ডাক দিয়েছি তূরের ডান দিক থেকে এবং গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করেছি।"-(সূরা মরিয়ম ঃ ৫১-৫২)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا○ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا○ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا○ وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا○ (مريم : ٥٤-٥٧)

"আর এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা আলোচনা কর। তিনি ছিলেন ওয়াদা পূরণকারী এবং একজন রসূল-নবী। তিনি নিজের পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং নিজের রবের নিকট তিনি ছিলেন একজন পছন্দনীয় মানুষ। আর এ কিতাবে আলোচনা কর ইদরিসের কথা। অবশ্যি তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ও নবী এবং আমি তাকে উন্নত স্থানে উঠিয়েছিলাম।"-(সূরা মরিয়ম ঃ ৫৪-৫৭)

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآئِيْلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ○ (مريم : ٥٨)

"এ নবীগণকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেন, এরা ছিলেন আদমের বংশজাত আর তাদের বংশজাত যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় উঠিয়েছিলাম এবং ইবরাহীমের বংশজাত ও ইসরাঈলের বংশজাত আর এরা তাদের অন্তর্গত ছিল যাদেরকে আমি হেদায়াত দান করেছিলাম এবং নির্বাচিত করেছিলাম। তাদের অবস্থা ছিল এই যে, যখন রহমানের আয়াত তাদেরকে শুনানো হতো তখন তারা কান্নারত অবস্থায় সিজদায় ঝুঁকে পড়তো।"-(সূরা মরিয়ম ঃ ৫৮)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ○ (الانبياء : ٥١)

"আর এর পূর্বে আমি ইবরাহীমকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছিলাম এবং আমি তাকে খুব ভাল করেই জানতাম।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৫১)

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ○ وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ ط وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ط وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ○ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ○

"আর আমি তাকে ও লূতকে বাঁচিয়ে এমন ভূখণ্ডের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্যে বরকত রেখেছি। আর আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছি তার ওপর আরো অতিরিক্ত এবং তাদের প্রত্যেককে বানিয়েছি সৎ। আর আমি তাদেরকে নেতৃত্বের আসন দিয়েছি, যারা আমার হুকুমে পথ দেখায় এবং আমি তাদেরকে অহীর মাধ্যমে সৎকাজের, নামায কায়েম করার ও যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি। আর তারা ছিল আমার 'ইবাদাতকারী'।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭১-৭৩)

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ○ وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

"আর লূতকে আমি হুকুম ও তত্ত্বজ্ঞান দান করেছি এবং তাকে সেই জনপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছি যার লোকেরা বদকাজ করতো। আসলে তারা অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ের ফাসেক জাতি ছিল। লূতকে আমি আমার রহমত দান করেছি, এ জন্যে যে, সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭৪-৭৫)

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (لانبياء : ٧٦-٧٧)

"আর এই একই নিয়ামত আমি নূহকে দান করেছি। স্মরণ করুন, এসবের আগে সে আমাকে ডেকেছিল আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবাবর্গকে বিরাট মর্ম-বেদনা থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম আর সেই জাতির মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করেছিলাম যে আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তারা ছিল অত্যন্ত বদ লোক। কাজেই তাদের সবাইকে আমি জলমগ্ন করেছিলাম।"

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ۝ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝ (الانبياء : ٧٨-٨٢)

"আর দাউদ ও সুলাইমানকে আমি এই নিয়ামতই দান করেছি। সে সময়কার কথা স্মরণ কর যখন তারা দু'জন একটি ক্ষেতের মামলার মীমাংসা করছিল, যার মধ্যে রাতের বেলা অন্য লোকদের ছাগল ঢুকে পড়েছিল। আর আমি নিজেই তাদের বিচার দেখছিলাম। সে সময় আমি সুলাইমানকে সঠিক বিচার শিখিয়ে দিয়েছিলাম। অথচ দু'জনকে আমি সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও ইল্‌ম দান করেছিলাম। আর দাউদের সাথে আমি পাহাড় ও পক্ষীকূলকে বাধ্যানুগত করে দিয়েছিলাম, যারা তাসবীহ্ করতো। এ কাজটি আমিই করেছিলাম। আর তোমাদের উপকারার্থেই আমি তাকে বর্ম তৈরী করার শিল্পকারিতা শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করা যায়। তাহলে তোমরা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হলে? আর সুলাইমানের জন্যে আমি দ্রুতগতিসম্পন্ন বাতাসকে বাধ্যানুগত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে প্রবাহিত হতো এমন ভূখণ্ডের দিকে যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছিলাম এবং আমি সব জিনিসের জ্ঞান রাখি। আর শয়তানদের মধ্য থেকে এমন অনেককে তার অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার জন্যে ডুবুরির কাজ করতো এবং এছাড়া অন্য কাজও করতো। আমিই ছিলাম এদের সবার রক্ষণাবেক্ষণকারী।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭৮-৮২)

এ প্রসঙ্গে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলাইমান (আ)-এর এ বিশেষ ঘটনার উল্লেখের পেছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা হচ্ছে, এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করানো যে, নবী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও

নবীগণ আসলে মানুষই ছিলেন। খোদায়ী ক্ষমতার নামগন্ধও তাঁদের মধ্যে ছিল না। এ মামলায় অহীর মাধ্যমে হযরত দাউদ (আ)-কে সাহায্য করা হয়নি এবং তিনি রায় দেবার ব্যাপারে ভুল করে ফেলেছিলেন। হযরত সুলাইমান (আ)-কে সাহায্য করা হলো। ফলে তিনি সঠিক রায় দিলেন। অথচ তাঁরা উভয়েই নবী ছিলেন। তাঁদের দু'জনের যেসব গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো বর্ণনার উদ্দেশ্যও হচ্ছে এ কথা বুঝানো যে, এগুলো ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণাবলী এবং এ ধরনের গুণাবলী কাউকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেয় না।৩৪

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝ (الانبياء : ٨٣-٨٤)

"আর এই বস্তুই (বিবেক-বুদ্ধি এবং বিচার শক্তি ও জ্ঞানের নিয়ামত) আমি আইয়ুবকে দিয়েছিলাম। স্মরণ কর যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, 'আমি রোগাক্রান্ত হয়েছি এবং তুমি সবচেয়ে বেশী করুণাশীল।' আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তার কষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম। আর তাকে কেবলমাত্র তার পরিবার-পরিজন দান করেছিলাম তাই নয় বরং এই সংগে সমসংখ্যায় আরো দিয়েছিলাম আমার নিজের বিশেষ রহমত এবং এ জন্যে যে, এটা একটা শিক্ষণীয় বিষয় হবে ইবাদাতকারীদের জন্যে।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৩-৮৪)

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ (الانبياء : ٨٥-٨٦)

"আর এই একই নিয়ামত ইসমাঈল, ইদরিস ও যুলকিফ্‌লকেও দিয়েছিলাম। এরা সবাই ছিল সরকারী এবং এদেরকে আমি নিজেই রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেয়েছিলাম কেননা তারা ছিল সৎকর্মশীল।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৫-৮৬)

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (الانبياء : ٨٧-٨٨)

"আর মৎসধারীকেও আমি আমার দানে ভূষিত করেছিলাম। স্মরণ কর যখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে স্থান ত্যাগ করেছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না। অবেশেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে বলেছিল ঃ 'তুমি ছাড়া আর কোন ইল্লাহ্ নেই, তোমার সত্তা পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমি অপরাধ করেছি।' তখনই আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং মর্মবেদনা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম এবং এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৭-৮৮)

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَاتَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ز وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ط وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝ (الانبياء : ٨٩-٩٠)

"আর যাকারিয়াকে, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল ঃ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না আর তুমি হচ্ছ সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।' কাজেই আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহ্ইয়া দান করেছিলাম আর তার স্ত্রীকে তার জন্যে ক্রটিমুক্ত করে দিয়েছিলাম। তারা সৎকাজে তৎপরতা দেখাত এবং আমাকে ডাকতো ভীতি ও আগ্রহ সহকারে আর আমার সামনে নত ছিল।"—(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৯-৯০)

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনা বর্ননা করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এ কথা বুঝানো যে, এই নবীগণ সবাই ছিলেন নিছক আল্লাহর বান্দাহ্ ও মানুষ। তাঁদের মধ্যে খোদায়ীর নাম-গন্ধও ছিল না। অন্যদেরকে সন্তান দান করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না, বরং তাঁরা নিজেরাই আল্লাহর নিকট সন্তান ভিক্ষা চাইতেন। হযরত ইউনুস (আ)-এর উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, একজন মহিমান্বিত নবীর বিরাট ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও ভুল করার সাথে সাথেই তাঁকে পাকড়াও করা হয়েছে। আর যখন তিনি নিজের প্রতিপালক প্রভুর সামনে নত হয়েছেন তাঁর প্রতি অস্বাভাবিক করুণাও প্রকাশ করা হয়েছে। তাকে মাছের পেট থেকে জীবন্ত অবস্থায় বের করে আনা হয়েছে। হযরত আইয়ুব (আ)-এর প্রসঙ্গ টানার উদ্দেশ্যই হচ্ছে একথা জানানো যে, বিপদাক্রান্ত হওয়া নবীদের জন্যে কোনো অস্বাভিক ব্যাপার নয়। আর নবী যখন বিপদে এবং রোগে আক্রান্ত হন তা থেকে উদ্ধারের জন্যে আল্লাহরই কাছে রোগমুক্তির প্রার্থনা করেন। তাঁরা অন্যকে রোগমুক্ত করতে পারেন না। বরং বিপরীত পক্ষে তাঁরা আল্লাহর নিকট রোগমুক্তি চান। উপরন্তু এসব বর্ণনার আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাস্তব সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যে, নবীদের সকলেই তাওহীদকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সামনে নিজেদের প্রয়োজনের অবতারণা করতেন না। অন্যদিকে এ কথা প্রকাশ করাও এর উদ্দেশ্যের অন্তর্গত যে, আল্লাহ সবসময় তাঁর নবীদেরকে সাহায্য করেছেন অস্বাভাবিকভাবে। শুরুতে তাঁরা যতই পরীক্ষার সম্মুখীন হন না কেন, অবশেষে অলৌকিকভাবে তাঁদের দোয়া কবুল হয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে।৩৫

অধ্যায় ঃ ২

অহী

অহীর অর্থ, রূপ ও প্রকারভেদ

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

অহীর অর্থ হচ্ছে ইশারা করা, ইঙ্গিত করা, মনের মধ্যে কোনো কথা নিক্ষেপ করা গোপনে কোনো কথা বলা বা বাণী পাঠানো।[৩৬] অহীর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে 'ত্বরিত ইশারা' এবং 'গোপন ইশারা'। অর্থাৎ এমন ইশারা যা ত্বরিত বেগে করা হয় এবং এমনভাবে করা হয় যার ফলে তা কেবলমাত্র যে করে এবং যাকে করে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে এমন হেদায়াতের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে যা বিদ্যুৎ শিখার ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কোনো বান্দার মনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

কারও নিকট আল্লাহর স্বয়ং উপস্থিত বা তাঁর নিকট কারও উপস্থিত হয়ে এবং তাঁর সামনাসামনি অবস্থান করে তাঁর সাথে কথা বলার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি জ্ঞানী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মানব সমাজের হেদায়াত বা তাদেরকে পথ দেখাবার জন্যে যখনই তিনি কোনো বান্দার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চান তাঁর ইচ্ছার পথে কোনো বাধা, কোনো প্রকার অসুবিধা দেখা দিতে পারে না। নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে এ কাজের জন্যে তিনি অহীর পথ অবলম্বন করেন।[৩৭]

অহীর প্রকারভেদ

'অহী' শব্দটি যদিও বর্তমানে কেবল নবীগণের নিকট প্রেরিত অহীর জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু কুরআনে এ পারিভাষিক পার্থক্যটি দেখা যায় না। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আকাশের ওপরও অহী নাযিল হয় এবং সেই অনুযায়ী তার সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয় (وَأَوْحَى فِي سَمَاءٍ أَمْرَهَا -حم السجده) জমিনের ওপরও অহী নাযিল হয়, যার ইঙ্গিতে কাল বিলম্ব না করেই সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকে (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا -الزلزال) ফেরেশতাদের ওপরও অহী নাযিল হয় এবং সে অনুযায়ী তারা কাজ করে (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ) মৌমাছিদেরকেও তাদের সমস্ত কাজ অহীর (প্রাকৃতিক শিক্ষা) মাধ্যমে শেখানো হয়। যেমন সূরা নাহালের ৬৮নং আয়াতে বলা হয়েছে। অবশ্যি এ অহী কেবল মৌমাছি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নেই। পানিতে মাছের সাঁতরে বেড়ানো, শূন্যে পাখীদের উড়ে বেড়ানো এবং সদ্যজাত শিশুর দুধ পান করা—এসব শিক্ষা আল্লাহর অহীর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আবার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই একজন মানুষ যে সঠিক কৌশল, নির্ভুল রায় অথবা চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ লাভ করে তাও এ অহীর অন্তর্ভুক্ত (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ - قصص) এ অহী থেকে কোন মানুষও বঞ্চিত নয়। দুনিয়ায় যতগুলো আবিষ্কার হয়েছে, মানুষের কল্যাণার্থে যতগুলো নতুন নতুন বস্তু-বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে, বড় বড় চিন্তাশীল, রাষ্ট্রনায়ক, বিজেতা ও লেখকগণ যে সমস্ত বিরাট ও মহৎ কার্য সম্পাদন করেছেন সে সবের মধ্যে এই অহীর কার্যকারিতা দেখা যায়। বরং সাধারণ মানুষ দিনরাত এ ব্যাপারে বহুতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় বসে বসেই মনের মধ্যে একটি

কথার উদয় হয় অথবা মাথায় কোন নতুন কৌশল ও বুদ্ধি গজায় বা স্বপ্নের মধ্যে কিছু দেখা যায় এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতায় সেটি একটি সঠিক পথ নির্দেশ বলে প্রমাণিত হয়, যা অদৃশ্য থেকে তাকে দেয়া হয়েছিল। এই বহুবিধ অহীর মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের অহী নবী-রসূলগণের ওপর অবতীর্ণ হতো অন্যান্য অহীর সাথে এর পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এখানে যাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হয় তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। এ অহী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ওপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। এ ধরনের অহীর মধ্যে থাকে আকীদা- বিশ্বাস, বিধি-বিধান, আইন-কানুন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধি-নির্দেশ। নবীর মাধ্যমে মানব জাতিকে পথ দেখানোই হয় এর উদ্দেশ্য।[৩৮]

ভুল ধারণা

সূরা শু'রার اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ আয়াতে যে অহীর মাধ্যমে সমস্ত আসমানি গ্রন্থ নবীগণের নিকট পৌছেছে তার আগমনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর একজন ফেরেশতার মাধ্যমে রসূলগণের নিকট অহী পাঠান। কেউ কেউ এ আয়াতটির ভুল মর্ম গ্রহণ করে এর অর্থ করেছেন ঃ 'আল্লাহ কোনো রসূল পাঠান যিনি তাঁর নির্দেশে সাধারণ মানুষদের কাছে তাঁর বাণী পৌছিয়ে দেন।' কিন্তু কুরআনের এ فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ (অতপর সে অর্থাৎ ফেরেশতা অহী অবতীর্ণ করে অথবা পৌছায় —তাঁরই নির্দেশে যা কিছু তিনি চান)। তাঁদের এ অর্থকে সুস্পষ্টরূপে ভুল প্রমাণ করে। সাধারণ মানুষের সামনে নবীদের তাবলীগকে কুরআনের কোথাও 'অহী' বলা হয়নি এবং আরবী ভাষায়ও মানুষের সাথে মানুষের প্রকাশ্যে আলোচনাকে 'অহী' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করার কোনো অবকাশই নেই। অহীর আভিধানিক অর্থই হচ্ছে গোপন ও দ্রুত ইশারা। আরবী ভাষা সম্পর্কে নেহাত অজ্ঞ ব্যক্তিই নবীদের তাবলীগের প্রতিশব্দ হিসেবে এ শব্দটি ব্যবহার করতে পারে।[৩৯]

বিভিন্ন প্রকার অহী সম্পর্কে আরও কিছু কথা

এক প্রকার অহীকে বলা যেতে পারে জিবিল্লী বা তাবিয়ী (প্রাকৃতিক) অহী। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্ট জীবকে তার কাজ শিখিয়ে দেন। এ অহী মানুষের চেয়ে বেশী পশু-পাখীর ওপর এবং সম্ভবতঃ তারও চেয়ে বেশী উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের ওপর অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকারের অহীকে 'জুযয়ী' (আংশিক) অহী বলা যেতে পারে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে জীবন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর মধ্য থেকে কোনো একটি বিষয়ের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান বা হেদায়াত দান করেন অথবা কোনো কৌশল শিক্ষা দেন। এ অহীটি প্রতিদিন সাধারণ মানুষের ওপর অবতীর্ণ হয়। দুনিয়ার যত বড় বড় আবিষ্কার সবই এই অহীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। বড় বড় তাত্ত্বিক উদ্ভাবনে এই অহী মদদ যোগায়। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পেছনে এরই কার্যকারিতা দেখা যায়। দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হঠাৎ একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে গেছে এবং ইতিহাসের গতি প্রবাহের ওপর তা একটি সিদ্ধান্তকরী প্রভাব বিস্তার করেছে। এ ধরনের অহী অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত মূসার মায়ের ওপর। এ দু' ধরনের অহী থেকে আলাদা আর এক প্রকার আছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে গায়েবের (অদৃশ্য

জগতের) নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁকে হেদায়াত দান করেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি এ জ্ঞান ও হেদায়াত সাধারণ মানুষের নিকট পৌছাবেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে আনবেন। এ অহী একমাত্র নবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়। কুরআন থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এ ধরনের জ্ঞানের নাম ইলকা, ইলহাম, কাশ্‌ফ বা পারিভাষিক অর্থে অহী—যাই রাখা হোক না কেন, আম্বিয়া ও রসূল ছাড়া কাউকেই তা দেয়া হয় না। এ পর্যায়ের জ্ঞান নবীদেরকে এমনভাবে দেয়া হয় যার ফলে তাঁরা পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করতে সক্ষম হন যে, এ জ্ঞানটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, শয়তানের অনুপ্রবেশ থেকে এটি সম্পূর্ণ সংরক্ষিত এবং নিজেদের চিন্তা, কল্পনা ও প্রবৃত্তির প্রভাব থেকেও তা পুরোপুরি মুক্ত। উপরন্তু শরীয়াতের পক্ষ থেকে এ জ্ঞানটিই অকাট্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত। এর আনুগত্য করা প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে ফরয এবং সমস্ত মানুষকে এর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়ার দায়িত্বেই নবীগণ নিয়োজিত হন। আবার এ অহীর ওপর ঈমান আনা পরকালীন মুক্তির অপরিহার্য শর্ত এবং একে উপেক্ষা করা চূড়ান্তভাবে ধ্বংসের দিক নির্দেশ করে।

নবীগণ ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে যদি এই তৃতীয় ধরনের অহীর কোনো অংশ দান করা হয় তাহলে তা এমন অস্পষ্ট ইঙ্গিতের পর্যায়ে থাকে যাকে পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্যে নবুয়াতের অহীর আলোকের সাহায্য গ্রহণ করা (অর্থাৎ তাকে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর পেশ করে তার ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটি যাচাই করা এবং অভ্রান্ত হলে তার উদ্দেশ্য নির্ণয় করা) অপরিহার্য হয়। যে ব্যক্তি নিজের ইলহামকে হেদায়াতের একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম মনে করে এবং নবুয়াতের অহীর মানদণ্ডে তাকে যাচাই না করেই নিজে সেই অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে এবং অন্যদেরকে তার অনুসরণ করার আহ্বান জানায়, শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার এহেন কাজের কোন বৈধতা স্বীকৃত হতে পারে না। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সূরা জ্বিনের শেষ আয়াতে এ বিষয়টিকে সব রকমের আড়ষ্ঠতা ও অস্পষ্টতা মুক্ত করে বিবৃত করা হয়েছে ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝ (الجن : ٢٦-٢٨)

"তিনি (আল্লাহ) গায়েব (অদৃশ্য) সম্পর্কে জ্ঞাত। নিজের গায়েব সম্পর্কে কাউকেও জ্ঞাত করেন না, তবে একমাত্র সেই রসূলকে জ্ঞাত করেন যাকে তিনি গায়েবের কোনো জ্ঞান দানের জন্যে পছন্দ করেন। তখন তিনি তার সামনে পেছনে সংরক্ষক নিযুক্ত করেন, যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তারা নিজেদের প্রতিপালকের বাণী পৌছিয়ে দিয়েছে। আর তিনি তাদের সমগ্র পরিবেশ ঘিরে আছেন এবং প্রত্যেকটি বস্তু গুণে রেখেছেন।" —(সূরা জ্বিন ঃ ২৭-২৮)

মুসলমানদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ সৎ ব্যক্তি ও উন্নত পর্যায়ের সমাজ সংস্কারক তাঁদেরকে কেন নবীর সমপর্যায়ের কাশফ ও ইলহাম দেয়া হয়নি এবং কেন তাঁদেরকে এর চেয়ে নিম্নমানের এক ধরনের অনুগত কাশফ ও ইলহাম দেয়া হয়েছে, একটুখানি চিন্তা করলে

সহজেই এর কারণ অনুধাবন করা যায়। প্রথমটি না দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, এটিই নবী ও সাধারণ উম্মতের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা নির্দেশ করে। এ সীমারেখা কোনো-ক্রমেই উঠিয়ে দেয়া যেতে পারে না। আর দ্বিতীয়টি দেয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, যাঁরা নবীর পর তাঁর কাজকে জারী রাখার প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা অবশ্যি দ্বীনের প্রত্যকটি বিষয় সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশ লাভের মুখাপেক্ষী হন। অবশ্যি অবচেতনভাবে দ্বীনের প্রত্যেকটি একনিষ্ঠ ও নির্ভুল চিন্তার অধিকারী খাদেমকে এ জিনিসটি দান করা হয়। আর যদি কাউকে সচেতনভাবে এটি দান করা হয়, তাহলে তা হবে অবশ্যি আল্লাহর পুরস্কার।[৪০]

স্বপ্নের মধ্যে অহী

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط

قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز (الصافات : ١٠٢)

"ছেলেটি যখন তার সাথে ছুটাছুটি করার বয়সে উপনীত হল তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বলল ঃ পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি বল এ ব্যাপারে তুমি কি মনে কর। সে বলল ঃ আব্বাজান, আপনাকে যা হুকুম দেয়া হচ্ছে আপনি তা করে ফেলুন।"–(সূরা আস সাফফাত ঃ ১০২)

এ শব্দগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, নবী-পুত্র পিতার স্বপ্নকে নিছক স্বপ্ন মনে করেননি বরং আল্লাহর নির্দেশ মনে করেছিলেন। আর যদি যথার্থই এটি আল্লাহর নির্দেশ না হ'ত। তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বা অন্তত ইশারা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতেন যে, ইবরাহীম পুত্র ভুলে এটিকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে নিয়েছে। কিন্তু এ আয়াতের পূর্বে বা পরের আলোচনায় এ ধরনের কোনো ইঙ্গিত নেই। এ জন্যে ইসলামে এ আকীদার উদ্ভব হয়েছে যে, নবীদের স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন হয় না বরং তা হয় এক ধরনের অহী। বলা বাহুল্য, যে কথার ভিত্তিতে আল্লাহর শরীয়াতের মধ্যে এতবড় একটি মূলনীতি অনুপ্রবেশ করতে পারে সেটি যদি যথার্থ সত্যভিত্তিক না হ'ত বরং নিছক একটি ভুল ধারণার ভিত্তিতে সেটি গৃহীত হ'ত তাহলে আল্লাহ অবশ্য তার প্রতিবাদ করতেন আল্লাহ এমন কোন ভুল করতে পারেন একথা তাদের পক্ষে মেনে নেয়া কোনোক্রমেই সমার্থক নয় যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করে।[৪১]

মৌমাছির প্রতি অহী

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا ـ(النحل : ٦٨)

"আর দেখ, তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি এই মর্মে অহী অবতীর্ণ করেছেন যে, পাহাড়গুলোর মধ্যে নিজেদের ঘর তৈরী কর।"–(সূরা আন নাহাল ঃ ৬৮)

অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গোপন ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। ইঙ্গিতকারী ও যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ তা অনুভব করে না। এই সঙ্গতিপূর্ণ অর্থের প্রেক্ষিতে এ শব্দটি 'ইলকা' (মনের মধ্যে কথা নিক্ষেপ করা) ও ইলহাম (গোপন শিক্ষা ও নির্দেশ দান) অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে যে শিক্ষা দেন তা যেহেতু কোন শিক্ষায়তনে

দেয়া হয় না বরং এমন সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে দেয়া হয় যার ফলে বাহ্যতঃ একজন শিক্ষা দান করে ও অন্যজন শিক্ষা গ্রহণ করে এমনটি দেখা যায় না, তাই কুরআনে একে অহী, ইলহাম ও ইলকা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে এ তিনটি শব্দ তিনটি পৃথক পারিভাষিক রূপ গ্রহণ করেছে। অহী শব্দটি কেবলমাত্র নবীদের জন্যে এবং ইলহাম অলী আউলিয়া ও বিশেষ বুজর্গানের জন্যে ব্যবহার হয় আর ইলকা তুলনামূলকভাবে সাধারণের জন্যে।[৪২]

মূসার মায়ের প্রতি অহী

اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلَى اُمِّكَ مَا يُوْحَىٰ ۝ (طه : ٣٨)

"সে সময়ের কথা স্মরণ কর যখন আমি তোমার মাকে ইঙ্গিত করেছিলাম এমন ইঙ্গিত যা অহীর মাধ্যমেই করা হয়।"–(সূরা তা-হা ঃ ৩৮)

وَاَوْحَيْنَآ اِلَىٰٓ اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ ـ

"আমি মূসার মাকে ইশারা করলাম, তাকে দুধ পান করাও। তারপর যখন তার প্রাণের ভয় দেখা দেয় তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ কর।"–(সূরা আল কাসাস ঃ ৭)

অর্থাৎ আল্লাহর ইশারায় হযরত মূসা (আ)-এর মা এ কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ পূর্বাহ্নেই তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, এ পথ অবলম্বন করলে কেবল তোমার সন্তানের প্রাণ রক্ষা পাবে না বরং আমি সন্তানকে তোমার কোলে ফিরিয়ে আনব এবং তোমার ছেলে হবে পরবর্তীকালে আমার রসূল।[৪৩]

শয়তানের অহী নিজেদের সাথীদের প্রতি

وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ (الانعام : ١٢١)

"শয়তানরা তাদের সঙ্গীদের মনের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ নিক্ষেপ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১২১)

রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর অহী কোন অভিনব ঘটনা নয়

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ ـ (النساء : ١٦٣)

"হে মুহাম্মদ! আমি তোমার নিকট ঠিক তেমনিভাবে অহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের নিকট পাঠিয়েছিলাম। আর আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানদের ওপরও অহী নাযিল করেছিলাম।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ১৬৩)

একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাইকে জানিয়ে দেয়া যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো নতুন জিনিস আনেননি যা ইতিপূর্বে আর কেউ আনেনি। তিনি একথা দাবী করেননি যে, দুনিয়ার সামনে এ সর্বপ্রথম তিনিই একটি নতুন জিনিস পেশ করেছেন বরং পূর্ববর্তী সকল নবী জ্ঞানের যে উৎস থেকে হেদায়াত লাভ করেছিলেন তিনিও সেই একই উৎস থেকে হেদায়াত লাভ করেছেন। আর দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় যে সকল

নবীর আবির্ভাব ঘটেছে তারা সর্বদা যে সকল সত্য ও ন্যায়ের বাণী পেশ করে এসেছেন তিনিও সেই একই সত্য ও ন্যায়ের বাণীর পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।[৪৪]

রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর কুরআনের অহী অবতীর্ণ হওয়া

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ ط (الانعام : ١٩)

"আর এ কুরআন অহীর মাধ্যমে আমার নিকট পাঠানো হয়েছে, যাতে তোমাদেরকে এবং আর যাদের নিকট এটি পৌঁছে তাদের সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারি।"

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ لا قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ط قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ

"যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেয়া হয় তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে, এটির বদলে অন্য কোনো কুরআন আন অথবা এর মধ্যে কিছু রদবদল করে নাও। হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলে দাও, এর মধ্যে আমার নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আমার কাজ নয়, আমি কেবলমাত্র সেই অহীর অনুগত যা আমার নিকট আসে।"–(সূরা ইউনুস ঃ ১৫)

এখানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর "আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই। বরং অহীর মাধ্যমে এটি আমার নিকট এসেছে এবং এর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার অধিকারই আমার নেই"—এ কথা সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যাপারে সমঝোতা করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। গ্রহণ করতে হলে সমগ্র দ্বীনকে হুবহু যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।[৪৫]

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ -(هود : ١٢)

"কাজেই হে নবী, এমন যেন না হয় যে, তুমি ঐ জিনসগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি ত্যাগ করবে যা তোমার প্রতি অহী হিসেবে অবতীর্ণ করা হচ্ছে এবং তা থেকে তোমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে যাবে।"–(সূরা হূদ ঃ ১২)

অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিকে মূল্য দেয়া যে হবে সৎ এবং যে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে ন্যায়, সততা ও সৎকর্মশীলতার পথে চলবে। কাজেই যে ধরনের সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ, অবহেলা, বিদ্রূপ ও কটাক্ষ এবং যে ধরনের মূর্খতা প্রসূত আপত্তি ও প্রশ্নের মাধ্যমে তোমার মোকাবিলা করা হচ্ছে তার কারণে তোমার দৃঢ়তা ও অবিচলতার মধ্যে যেন কোনো প্রকার পার্থক্য সূচিত না হয়। অহীর মাধ্যমে তোমার সামনে যে সত্য সুস্পষ্ট করা হয়েছে তার প্রকাশ ও ঘোষণা এবং তার পক্ষ থেকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে তোমার কোনো প্রকার ইতস্ততঃ না করা এবং ভীত ও সংকুচিত না হওয়া উচিত। তোমার মনে যেন কখনও এ ধরনের চিন্তার উদ্রেকই না হয় যে, লোকেরা উমুক কথাটি শোনার সাথে সাথেই যখন বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করতে থাকে তখন তা লোকদের সামনে উত্থাপন করিই বা কেমন করে। আর উমুক সত্যটি শোনার জন্যে যখন লোকেরা একেবারে প্রস্তুতই নয় তখন তা তাদের সামনে প্রকাশ করিই বা কেমন করে। কেউ মানুক বা না মানুক তুমি

যাকে সত্য বলে জান তাকে কোনো প্রকার কমবেশী না করে নির্ভীক কণ্ঠে বলে যেতে থাকো। পরে যা কিছু হবে বা ঘটবে তা সম্পূর্ণ তো আল্লাহর হাতে।৪৬

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ (هود : ٤٩)

"হে মুহাম্মদ! এগুলো গায়েবের খবর। অহীর মাধ্যমে আমি এগুলো তোমার নিকট অবতীর্ণ করছি। এর আগে তুমি এগুলো জানতে না এবং তোমার জাতিও জানত না।"–(সূরা হুদ ঃ ৪৯)

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ (يوسف : ١-٢)

"আলিফ-লাম-র। এগুলো সেই কিতাবের আয়াত যে নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। আমি তা নাযিল করেছি কুরআন রূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা (আরববাসীরা) তা ভালভাবে বুঝতে পার। হে মুহাম্মদ! আমি এ কুরআনকে তোমার নিকট অহী হিসেবে অবতীর্ণ করে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তত্ত্ব ও তথ্য তোমার নিকট বর্ণনা করেছি।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ১-২)

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝ (يوسف : ١٠٢)

"হে মুহাম্মদ! এ কাহিনী গায়েবের খবরের অন্তর্ভুক্ত যা আমি তোমার ওপর অহী হিসেবে অবতীর্ণ করছি। আর তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসুফের ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে এক জোট হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ১০২)।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۛ (الرعد : ٣٠)

"হে মুহাম্মদ! এভাবেই আমি তোমাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির মধ্যে যাদের পূর্বে আরও বহু জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে, যাতে তুমি তাদেরকে এমন বাণী শোনাও যা আমি তোমার ওপর অহীর মাধ্যমে নাযিল করছি এমন অবস্থায় যখন তারা নিজেদের করুণাময়ের কুফরী করছে।"–(সূরা আর রা'দ ঃ ৩০)।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۛ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝ (الشورى : ٥١)

"কোনো মানুষের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সামনাসামনি কথা বলবেন। তবে তাঁর কথা হয় অহী (ইশারা) হিসেবে বা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোনো বাণীবাহক (ফেরেশতা) পাঠান আর সে তাঁর নির্দেশক্রমে যা কিছু তিনি চান অহীর মাধ্যমে নাযিল করেন। নিসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী।"–(আশ শূরা ঃ ৫১)

কুরআন ও হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-কে এ তিনটি পদ্ধতিতেই হেদায়াত দান করা হয়।

এক ঃ হাদীসের বর্ণনায় হযরত আয়েশার যে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। (বুখারী ও মুসলিম)। পরবর্তী পর্যায়েও এ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন ছিল হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা)-এর বহু স্বপ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলোর মাধ্যমে তাঁকে শিক্ষাদান করা হয় বা কোনো কথা জানান হয়। কুরআন মজীদেও তাঁর একটি স্বপ্নের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।–সূরা আল ফাতহ ঃ ২৭)। এ ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, উমুক কথাটি আমার দিলে নিক্ষেপ করা হয়েছে, আমাকে জানান হয়েছে অথবা আমাকে এ হুকুম দেয়া হয়েছে বা আমাকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ ধরনের সমস্ত বিষয় প্রথম প্রকারের অহীর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে কুদসীর অধিকাংশই এ শ্রেণীভুক্ত।

দুই ঃ মি'রাজের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-কে দ্বিতীয় প্রকারের অহী দান করা হয়। বিভিন্ন নির্ভুল হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা)-কে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া এবং এ নিয়ে তাঁর বারবার আবেদন-নিবেদন করার ঘটনা যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সে সময় আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ঠিক তেমনি কথাবার্তা হয়েছিল যেমন তূর পাহাড়ে হযরত মূসা (আ) ও আল্লাহর মধ্যে হয়েছিল।

তিনঃ তৃতীয় প্রকারের অহী সম্পর্কে কুরআন নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তা রসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠানো হতো। সূরা বাকারার ৯৭ ও সূরা শূ'আরার ১৯২ থেকে ১৯৫ পর্যন্ত আয়াতে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৭]

এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা

রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর বিভিন্ন উপায়ে অহী আসত। আল্লামা ইবনে কাইয়েম তাঁর 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে এর বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছেন ঃ

এক ঃ সত্য স্বপ্ন ঃ এটি ছিল রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর অহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থা। তিনি যেসব স্বপ্ন দেখতেন তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ছিল।

দুই ঃ তাঁর দিলের মধ্যে ফেরেশতা একটি কথা বদ্ধমূল করে দিত। অথচ তাকে তিনি দেখতে পেতেন না। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়, যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মনের মধ্যে এ কথা নিক্ষেপ করেছে (অথবা ফুঁকে দিয়েছে) যে নিজের অংশের সম্পূর্ণ রেজেক লাভ না করা পর্যন্ত কোনো প্রাণী মরবে না। কাজেই আল্লাহকে ভয় করে কাজ কর এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্যে

ভাল পদ্ধতি অবলম্বন কর। আর খাদ্য লাভের ক্ষেত্রে বিলম্ব দেখে তুমি যেন আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে তা সংগ্রহে উদ্যোগী হয়ো না। কারণ আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে (অর্থাৎ তাঁর পুরস্কার) তা কেবল তাঁর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে।

তিন ঃ ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর সামনে এসে কথা বলত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকত যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার কথা পুরোপুরি মনের মধ্যে গেঁথে নিতে না পারতেন। এ অবস্থায় কখনও সাহাবাগণও ঐ ফেরেশতাকে দেখে নিয়েছেন।

চার ঃ অহী নাযিল হবার পূর্বে তাঁর কানে একটা ঘন্টা বাজতে থাকত এবং এ সঙ্গে ফেরেশতাও কথা বলতে থাকত। এটিই ছিল অহী নাযিলের কঠিনতম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অহী নাযিলের সময় প্রচণ্ড শীতের দিনেও রসূলুল্লাহ (সা)-এর শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ত। তখন তিনি উটের পিঠে চড়ে থাকলে বোজার ভারে উট বসে পড়ত। একবার তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর উরুতে মাথা রেখে শুয়েছিলেন এমন সময় অহী নাযিল হতে থাকে। হযরত যায়েদ (রা)-এর উরুতে এত বেশী চাপ পড়ে যে, তা ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়।

পাঁচ ঃ আল্লাহ যে আকৃতিতে ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি সেই আসল আকৃতিতে তাকে দেখতেন। তারপর আল্লাহ যা কিছু হুকুম করতেন তা তাঁর ওপর অহীর আকারে নাযিল করতেন।

ছয় ঃ সরাসরি আল্লাহ তাঁর ওপর অহী নাযিল করেন। তিনি মি'রাজে আসমানে গেলে এ কার্য সংঘটিত হয়। আল্লাহ সেখানে নামায ফরয করেন এবং অন্যান্য কথাও বলেন।

সাত ঃ ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তাঁর সাথে আলাপ করেন। যেমন মূসা আলাইহিস সালামের সাথে করেছিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর এ মর্যাদা কুরআন থেকে প্রমাণিত। আর রসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপারে এর উল্লেখ মিরাজ সংক্রান্ত হাদীসে পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও কেউ কেউ আর একটি উপায়ও বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে, "আল্লাহ অন্তরাল বিহীন অবস্থায় তাঁর সাথে কথা বলেছেন। এটা হচ্ছে তাদের বক্তব্য যারা বিশ্বাস করেন রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহকে দেখেছিলেন। কিন্তু এ প্রশ্নে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।"–(যাদুল মা'আদ ঃ ১ম খণ্ড, ২৪-২৫ পৃঃ)।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী তাঁর ইতকান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার নীচে দেয়া হল ঃ

"চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবী হলে প্রথম তিন বছর ইসরাফীল তাঁর শিক্ষা প্রশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত থাকেন। তাঁর মাধ্যমে কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হয়নি। অতপর জিবরাঈল অহী আনার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি ২০ বছর পর্যন্ত কুরআন আনতে থাকেন। নিম্নোক্তভাবে অহী আসতে থাকে।

এক ঃ কানে ঘন্টা বাজতে থাকতো, তারপর ফেরেশতার ধ্বনি ভেসে আসতো। এ পদ্ধতির সুবিধে ছিল এই যে, ঘন্টা ধ্বনির সাথে সাথেই রসূলুল্লাহ (সা) সব দিক থেকে দৃষ্টি

ও মন ফিরিয়ে এনে একমাত্র ফেরেশতার ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করতে পারতেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এ পদ্ধতিটি ছিল তাঁর জন্যে সবচেয়ে কঠিন।

দুই ঃ তাঁর মনে ও দিলে একটি কথা বদ্ধমূল করে দেয়া হত, যেমন তিনি নিজে বলেছেন।

তিন ঃ ফেরেশতা মানুষের বেশ ধরে এসে তাঁর সাথে কথা বলতো। নবী করীম (সা) বলেন, অহীর এ পদ্ধতি আমার জন্যে সবচেয়ে সহজ ও হালকা হত।

চার ঃ ফেরেশতা স্বপ্নের মধ্যে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলত।

পাঁচ ঃ আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শয়নে বা জাগরণে যে কোনো অবস্থায় সরাসরি কথা বলতেন।[৪৮]

আল্লাহর অহী হবার ব্যাপারে কুরআনে চ্যালেঞ্জ

নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বের চল্লিশ বছরের জীবনে রসূলুল্লাহ (সা) এমন কোনো শিক্ষা, অনুশীলন ও সংসর্গ লাভ করেননি যার ফলে তিনি তথ্যের বিপুল ভাণ্ডার লাভ করতে পারতেন, যার ঝর্ণাধারা নবুয়াত দাবীর সাথে সাথে হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ থেকে প্রবাহিত হতে শুরু হয়েছিল। এখন কুরআনের একের পর এক সূরায় যেসব বিষয়ের আলোচনা আসছিল লোকেরা ইতিপূর্বে কোনোদিন তাঁকে সেসব বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে, আলোচনা করতে এবং ঐ ধরনের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে দেখেনি। এমনকি এই চল্লিশ বছর বয়ঃসীমায় পৌছে তিনি এখন হঠাৎ যে দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন পুরো চল্লিশ বছরের জীবনে তাঁর কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোনো নিকটাত্মীয়ও তাঁর চালচলন ও কথাবার্তায় এমন কোনো জিনিস অনুভব করেনি যাকে ঐ মহান দাওয়াতের ভূমিকা বা পূর্বাভাস হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন তাঁর নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বরং বাইর থেকে তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল।[৪৯]

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ وَلٰكِنَّا اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ج وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا لا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ○ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

"হে মুহাম্মদ! তুমি সে সময় পশ্চিম কোণে উপস্থিত ছিলে না যখন আমি মূসাকে শরীয়াতের এ ফরমান দিয়েছিলাম। এবং তুমি তা প্রত্যক্ষও করনি। বরং তারপর (তোমার যুগ পর্যন্ত) আমি বহু বংশের উত্থান ঘটিয়েছি এবং তাদের ওপর বহু যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। তুমি মাদায়েনবাসীদের মধ্যেও উপস্থিত ছিলে না যাতে তাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে থাকতে। কিন্তু আমিই (সে সময়ের এসব খবর) প্রেরণকারী আর তুমি তূরের পার্শ্বদেশেও সে সময় ছিলে না, যখন আমি (মূসাকে প্রথমবার) আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু এ হচ্ছে তোমার রবের রহমত (যে তোমাকে এ তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে) যাতে তুমি তাদেরকে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। এর ফলে তাদের জ্ঞান ফিরে আসতে পারে।"

–(সূরা আল কাসাস ঃ ৪৪-৪৬)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াতের প্রমাণ স্বরূপ এ তিনটি কথা পেশ করা হয়েছে। যে সময় এ কথাগুলো বলা হয়েছিল সে সময় মক্কার সরদারগণ ও সাধারণ কাফের সমাজ কোনো না কোনো প্রকারে তাঁকে অ-নবী এবং নাউযুবিল্লাহ নবুয়াতের মিথ্যা দাবীদার প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে ছিল হেজাযের বিভিন্ন স্থানে ইহুদী ওলামা ও ঈসায়ী যাজক সমাজ। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহাশূন্য থেকে এসে এ কুরআন শুনাচ্ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন এ মক্কারই অধিবাসী। তাঁর জীবনের কোনো একটি দিকও তাঁর নিজের শহরের ও গোত্রের লোকদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল না। এ কারণেই যখন রসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াতের প্রমাণ স্বরূপ এ তিনটি কথা পেশ করা হয় তখন মক্কা, হেজায ও সারা আরব উপদ্বীপের কোনো এক ব্যক্তিও আজকের প্রাচ্যবিদদের ন্যায় এ ধরনের বাজে কথা বলার সাহস করেনি। যদিও মিথ্যা বলার ও মনগড়া দাবী উপস্থাপন করার ব্যাপারে তারা এদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না কিন্তু দিনদুপুরে এ ধরনের ডাহা মিথ্যা তারা কেমন করেই বা বলতে পারত, যা এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা কেমন করেই বা বলত, হে মুহাম্মদ, তুমি উমুক ইহুদী আলেম ও খৃস্টান যাজকদের নিকট থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছো। কারণ এ উদ্দেশ্যে সারাদেশ থেকে তারা কোনো এক ব্যক্তির নামও উচ্চারণ করতে পারত না। এ প্রসঙ্গে তারা কারোর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা প্রমাণ হয়ে যেত যে, রসূলুল্লাহ (সা) তার কাছ থেকে কোনো তথ্য জ্ঞান লাভ করেননি। তারা কি এ কথা বলতে পারত, হে মুহাম্মদ! অতীত ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য গ্রন্থাদির একটি বিরাট লাইব্রেরী তোমার নিকট আছে। উক্ত লাইব্রেরীর সংরক্ষিত পুস্তকাদির সাহায্যে তুমি এসব বক্তৃতা দিয়ে চলছ। কারণ লাইব্রেরী তো দূরের কথা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারে কাছে কোথাও একটি কাগজের টুকরাও তারা বের করতে পারত না যাতে এ তথ্যগুলো লিখিত রয়েছে। মক্কার ছেলে-বুড়ো সবাই জানত যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখাপড়া জানেন না। কেউ এ কথাও বলতে পারত না যে, তিনি কয়েকজন দোভাষী রেখেছিলেন, তারা হিব্রু, ল্যাটিন ও সুরইয়ানী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ করে তাঁকে দিত। এমনকি তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে নির্লজ্জ ব্যক্তিও এ দাবী করার সাহস রাখত না যে, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বাণিজ্যিক সফরে তিনি এসব তথ্য সংগ্রহ করে আনতেন। কারণ এ সফরে তিনি একা থাকতেন না। মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলা প্রত্যেক সফরে তাঁর সঙ্গে থাকত। কেউ এ ধরনের কোনো দাবী করলে শত শত জীবিত সাক্ষী মিথ্যা প্রমাণ করত। আর তাঁর ইন্তেকালের মাত্র দু'বছরের মধ্যে মুসলমানরা রোমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। যদি ভুল করেও তিনি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের কোনো খৃস্টান পাদ্রী বা ইহুদী আলেমের সাথে কোনো আলোচনা করে থাকতেন, তাহলে রোমান সরকার তিলকে তাল বানিয়ে সটান অপপ্রচারে নেমে পড়ত এবং এ কথা প্রচার করতে একটুও দ্বিধা করত না যে, নাউযুবিল্লাহ মুহাম্মদ সবকিছু এখান থেকেই শিখে নিয়ে মক্কায় গিয়ে নবীর ভেক ধরেছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে যুগে কুরআনের চ্যালেঞ্জ মুশরিক-কুরাইশদের জন্যে মৃত্যুর পয়গাম বহন করে আনত এবং তাকে মিথ্যা সপ্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান যুগের প্রাচ্যবিদদের তুলনায় তাদের জন্যে ছিল অনেক বেশী, সে যুগে কোনো এক ব্যক্তি কোথাও থেকে এমন কোনো তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারেনি, যা

থেকে একথা প্রমাণ করা যায় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অহী ছাড়া ঐ তথ্যাবলী সংগ্রহ করার দ্বিতীয় কোনো মাধ্যম ছিল এবং সে মাধ্যমটিকে তারা চিহ্নিত করতেও সক্ষম হয়েছিল।

এ কথাও জেনে রাখা উচিত যে, কুরআন মাত্র এই এক জায়গায় এ চ্যালেঞ্জ করেনি। বরং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে এ চ্যালেঞ্জ করেছে। হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত মরিয়ম (আ)-এর কাহিনী বিবৃতি করে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ط وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ص وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ○ (ال عمران : ٤٤)

"এ হচ্ছে গায়েবের খবর, যা আমি তোমাকে দিচ্ছি অহীর মাধ্যমে। তুমি তাদের আশেপাশে কোথাও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা মরিয়মের লালন পালন কে করবে এ ব্যাপারটি স্থিরিকৃত করার জন্যে লটারী করছিল। আর তুমি তখনও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা ঝগড়া করছিল।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৪)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ج وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْآ اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ○ (يوسف : ١٠٢)

"এ হচ্ছে গায়েবের খবর, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাচ্ছি। তুমি তাদের (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইদের) আশেপাশে কোথাও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল এবং যখন তারা নিজেদের কৌশল খাটাচ্ছিল।"

অনুরূপভাবে হযরত নূহের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ج مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ط

"এ হচ্ছে গায়েবের খবর, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাচ্ছি। ইতিপূর্বে তুমি ও তোমার জাতি এ সম্পর্কে কিছুই জানতে না।"–(সূরা হুদ ঃ ৪৯)।

এ বিষয়টি বারবার উল্লেখ করায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন মজীদ নিজের আল্লাহর কিতাব হবার এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহর রসূল হবার স্বপক্ষে যেসব বড় বড় প্রমাণ পেশ করে আসছিল তার মধ্যে একটি প্রমাণ ছিল এই যে, শত শত হাজার হাজার বছর আগেকার ঘটনাবলীর যে বিস্তারিত বিবরণ একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখে শ্রুত হচ্ছে, অহী ছাড়া তাঁর এ তথ্য-জ্ঞানের দ্বিতীয় কোনো মাধ্যম তাঁর কাছে নেই। যেসব কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমসাময়িক লোকেরা তাঁকে আল্লাহর সত্য নবী এবং তাঁর ওপর অহী অবতীর্ণ হয় বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল এটি ছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্যতম। সে যুগে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া কত যে বেশী গুরুত্বের অধিকারী ছিল এবং এর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্যে তারা কোনো প্রকার চেষ্টার

ক্রটি করেনি, একথা যে কেউ সহজেই অনুমান কতে পারে। উপরন্তু এ কথাও সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এ চ্যালেঞ্জের মধ্যে যদি সামান্য কোনো প্রকার দুর্বলতা থাকত তাহলে একে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা সমকালীন লোকদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।৫০

বৃষ্টির সাথে অহীর তুলনা

কুরআনের দু'টি স্থানে নবী করীম (সা)-এর ওপর অবতীর্ণ অহীকে রহমতের বারিধারার সাথে তুলনা করার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ـ(الرعد : ١٧)

"আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন আর প্রত্যেক নদী-নালা নিজের গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে গ্রহণ করে প্রবাহিত হয়েছে।"–(সূরা আর রা'আদ ঃ ১৭)

এ উপমায় রসূলুল্লাহর ওপর অবতীর্ণ অহীকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে আর ঈমান আনয়নকারী ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী লোকদেরকে তুলনা করা হয়েছে এমন সব নদী-নালার সাথে যেগুলো রহমতের বারিধারায় কানায় কানায় ভরপুর হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষীয়রা যে হৈ-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে রেখেছিল তাকে এমন ফেনাপুঞ্জ ও খড়কুটোর সাথে তুলনা করা হয়েছে যা সর্বদা বন্যার প্রবাহের সাথে পানির উপরিভাগে উঠে এসে বিপুল গর্জন সহকারে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দেয়।৫১

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ط

"তুমি কি দেখছ না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে ভূমি সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে ?"–(সূরা আল হাজ্ব ঃ ৬৩)

এখানেও বাহ্যিক অর্থের পেছনে একটি ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে নিছক আল্লাহর কুদরাত বর্ণনা করা। কিন্তু এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ যে বৃষ্টিবর্ষণ করেন তার একটি ফোঁটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই যেমন তোমরা দেখতে পাও শুষ্ক অনাবাদি জমিতে হঠাৎ চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ, ঠিক তেমনি আজ অহীর আকারে আল্লাহর রহমতের যে বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে তা শিগ্রই তোমাদের সামনে এমনই একটি দৃশ্যের অবতারণা করবে। অর্থাৎ আরবের এ শুষ্ক আনুর্বর মরু এলাকা শিঘ্রই জ্ঞান, নৈতিকতা, চরিত্র ও সৎ সংস্কৃতির এমন একটি গুলবাগে পরিণত হবে ইতিপূর্বে মানবেতিহাসে যার কোনো নজীর ছিল না।৫২

রসূলের ওপর অবতীর্ণ অহী আল্লাহর রহমত

قَالَ يٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ ـ

"হে আমার জাতি! ভেবে দেখ, আমি রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, তারপর তিনি নিজের পক্ষ থেকে আমার ওপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেছেন।"–(সূরা হুদ ঃ ২৮)

এ কথাটিই আগের রুকূ'তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে আমি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর নিশানীসমূহ দেখে তাওহীদের নিগূঢ় তত্ত্বের মর্মোদ্ধার করেছিলাম। তারপর আল্লাহ নিজের রহমত (অর্থাৎ অহী) আমার ওপর বর্ষণ করলেন এবং আমার মন-প্রাণ পূর্ব থেকে যেসব সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে আসছিল তিনি আমাকে সরাসরি সেগুলোর জ্ঞানদান করলেন। এ থেকে এ কথাও জানা গেল যে, নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে প্রত্যেক নবী নিজের চিন্তা, অনুসন্ধান ও নিরীক্ষার মাধ্যমে গায়েবের ওপর ঈমান লাভ করতেন। অতপর আল্লাহ তাঁদেরকে নবুয়াতের মর্যাদা দান করার সময় প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুষ ঈমান দান করতেন।[৫৩]

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً ـ(هود : ٦٣)

"সালেহ বললো ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা কি একথা চিন্তা করছ, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রাখতাম এবং তিনি আমার ওপর তাঁর রহমতও বর্ষণ করতেন।"–(সূরা হুদ ঃ ৬৩)।

রসূলের অহীর জন্যে রূহ শব্দের ব্যবহার

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ○(النحل : ٢)

"তিনি এই রূহ বা প্রাণসত্তাকে নিজের যে বান্দার ওপর চান নিজের হুকুমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল করে দেন (এ হেদায়াত সহকারে যে, লোকদেরকে) জানিয়ে দাও, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই, কাজেই তোমরা আমাকে ভয় কর।"–(সূরা আন নাহল ঃ ২)।

ওপরে বর্ণিত রূহের অর্থ নবুয়াতের প্রাণসত্তা, যাতে ভরপুর হয়ে নবী কাজ করেন ও কথা বলেন। এ অহী ও নবুয়াতের প্রাণসত্তা নৈতিক জীবনে এমনি এক গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী যেমন পার্থিব জীবনে প্রাণের গুরুত্ব ও মর্যাদা ঃ এ জন্যে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ অর্থ প্রকাশের জন্যে রূহ ঃ (প্রাণসত্তা) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।[৫৪]

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ○

"এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। (এদেরকে) বলে দাও, রূহ আসে আমার রবের হুকুমে। কিন্তু তোমরা জ্ঞানের অতি অল্প অংশই লাভ করছ।"
–(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৮৫)

সাধারণভাবে মনে করা হয়, এখানে রূহ অর্থ প্রাণ। অর্থাৎ লোকেরা রসূলুল্লাহ (সা)-কে জীব প্রাণের তাৎপর্য জানার জন্যে প্রশ্ন করেছিল। আর এর জবাবে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহর হুকুমে আসে। কিন্তু এ অর্থ মেনে নিতে আমি একেবারেই প্রস্তুত নই। কারণ একমাত্র পূর্বাপর আলোচনা পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ আয়াতটিকে একটি পৃথক ও একক বাক্যরূপে গ্রহণ করার পরই এ অর্থ করা সম্ভব। অন্যথায় যে প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে চলছিল তার মধ্যে রেখে বিচার করলে রূহকে প্রাণশব্দের প্রতিশব্দ অর্থে গ্রহণ

করায় বিপত্তি দেখা দেবে অনেক বেশী। বাক্যের মধ্যে মারাত্মক অসংলগ্নতা দেখা দেবে। যেখানে পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতে কুরআনকে বর্ণনা করা হয়েছে রোগ মুক্তির ব্যবস্থাপত্র হিসেবে এবং কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে জালেম, অকৃতজ্ঞ ও আল্লাহর দান অস্বীকার-কারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে এবং যেখানে আবার পরের আয়াতগুলোতে কুরআনের আল্লাহর কালাম হবার স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সেখানে জীবদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হয় আল্লাহর হুকুমে—এ ধরনের বাক্য হঠাৎ মাঝখানে কিভাবে আসতে পারে ? এর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ অনুধাবন করতে আমি অক্ষম।

বাক্যের পূর্বাপর আলোচনা পরম্পরাকে সামনে রেখে বিচার করলে পরিষ্কার অনুভূত হবে যে, এখানে রূহ অর্থ 'অহী' অথবা 'অহী বহনকারী ফেরেশতা' ছাড়া অন্যকিছুই হতে পারে না। আসলে মুশরিকদের প্রশ্ন ছিল, তোমরা এ কুরআন কোথায় থেকে আনছো ? এর জবাবে আল্লাহ বললেন ঃ হে মুহাম্মদ ! তোমাকে লোকেরা রূহ অর্থাৎ কুরআনের উৎস বা কুরআন লাভের মাধ্যম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তাদেরকে জানিয়ে দাও, এ রূহ আসে আমার রবের নির্দেশে। কিন্তু তোমরা এত স্বল্প পরিমাণ জ্ঞান রাখো, যার ফলে তোমরা মানুষের মুখের কথা ও আল্লাহর অহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত কথার পার্থক্য বুঝতে পারো না এবং আল্লাহর এ কালাম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে থাকো যে, কোনো মানুষ এ কালাম তৈরী করছে।

এ ব্যাখ্যা কেবল এ জন্যেই অগ্রগণ্য নয় যে, পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে আয়াতের সম্পর্ক এখানে এ ব্যাখ্যাই দাবী করে বরং কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এই একই শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা মুমিনে বলা হয়েছে ঃ

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝

"তিনি নিজের হুকুমে নিজের যে বান্দার ওপর চান রূহ নাযিল করেন, যাতে তিনি লোকদেরকে একত্রিত হবার দিনটি সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন।"–(আয়াত ঃ ১৫)

এবং সূরা শূরায় বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ ـ

"আর এভাবেই আমি তোমার দিকে নিজের হুকুমে একটি রূহ পাঠালাম, তুমি জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি।"–(সূরা শূরা ঃ ৫২)

পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ (রা) ও হাসান বসরী (রা) এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর এ বক্তব্যটি কাতাদার বরাত দিয়ে ইবনে আব্বাসের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। কিন্তু তিনি একটি অদ্ভুত কথা লিখেছেন যে, ইবনে আব্বাস এ কথাটি গোপনে বর্ণনা করতেন। রহুল মা'আনী তাফসীর গ্রন্থের লেখক হাসানও কাতাদার এ কথাটি উদ্ধৃতি করেছেন যে, "রূহ বলতে জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। আর প্রশ্ন ছিল, তিনি কেমন করে নাযিল হন এবং কেমন করে নবী সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অহী নাযিল হয়।[৫৫]

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ

"আর এভাবে (হে মুহাম্মদ)! আমি নিজের হুকুমে একটি রূহ তোমার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি।"–(সূরা আশ শূরা ঃ ৫২)

রূহ বলতে এখানে অহী বা এমন শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে যা অহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সা)-কে দান করা হয়েছিল।৫৬

অহী হিসেবে অবতীর্ণ বাণীর পক্ষে যুক্তি-প্রমাণাদি

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে বাণী অবতীর্ণ হয় তা মূলত আল্লাহরই বাণী। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্যে কুরআনের সাক্ষ্য হিসেবে চারটি কথা পেশ করা হয়েছে।

এক ঃ এ গ্রন্থটি বিপুল কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনার্থে এতে সর্বোত্তম নীতি সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে আছে নির্ভুল আকীদা-বিশ্বাসের শিক্ষা। সৎকাজের উদ্দীপনা সৃষ্টি ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বনের নির্দেশ এর অঙ্গীভূত। পুত-পবিত্র জীবনযাপনের বিধান এর বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে মূর্খতা, স্বার্থান্ধতা, সংকীর্ণতা, যুলুম, অন্যায়, অশ্লীলতা ও অন্যান্য অসৎ কাজ—যেগুলো তোমরা পবিত্র আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে স্তূপিকৃত করে রেখে দিয়েছো—সেসব থেকে এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ মুক্ত।

দুই ঃ এর আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হেদায়াতনামা এসেছিল এ গ্রন্থটি তার থেকে আলাদা কোনো হেদায়াত পেশ করে না। বরং সেই আগের গ্রন্থগুলোর মধ্যে যা কিছু পেশ করা হয়েছিল তার সত্যতা প্রমাণ করে বা তার প্রতি সমর্থন যোগায়।

তিন ঃ প্রত্যেক যুগে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী গ্রন্থগুলো নাযিল করা হয়েছিল এ গ্রন্থটিও সেই একই উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ উদ্দেশ্যটি ছিল গাফেল লোকদেরকে সজাগ করে দেয়া এবং ভুল ও বক্র পথে অগ্রসর হবার পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করানো।

চার ঃ এ গ্রন্থটি তার দাওয়াতের মাধ্যমে দুনিয়াপূজারী ও প্রবৃত্তির দাসদেরকে একত্রিত করেনি। বরং এমন সব লোকদেরকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করেছে, যাদের দৃষ্টি পার্থিব জীবনের সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আবার এ গ্রন্থের প্রভাবে তাদের মধ্যে এমন এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে যার সবচেয়ে বড় চিহ্ন হচ্ছে, মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ পরস্তির দিক দিয়ে তারা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। কোনো ভণ্ড ও মিথ্যুকের লেখা গ্রন্থ যা সে নিজে রচনা করে আল্লাহর রচিত বলে দাবী করার মতো জগন্যতম অপরাধ করার দুঃসাহস করে কি কোনো দিন এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও ফলাফলের অধিকারী হতে পারে ?৫৭

অধ্যায় ঃ ৩

নবুয়াতে মুহাম্মদী (সা)-এর প্রয়োজন ও তার প্রমাণ

পূর্ববর্তী নবীগণের পরে রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রেরণ করার কারণ

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

"আর প্রকৃতপক্ষে অতীতের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তারা তার পক্ষ থেকে অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে।"

–(সূরা আশ্ শূরা ঃ ১৪)

প্রত্যেক নবী ও তাঁর নিকটবর্তী তাবেয়ীগণের যুগ অতিক্রান্তের পর পরবর্তী বংশধরদের নিকট আল্লাহর কিতাব পৌঁছলে তারা আস্থা ও প্রত্যয়ের সাথে তা গ্রহণ করেনি। বরং সে সম্পর্কে তারা ভীষণ রকমের সংশয় ও মানসিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের এ অবস্থা সৃষ্টির পেছনে বহুবিধ কারণ ছিল। তাওরাত ও ইঞ্জীলের ব্যাপারে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা অধ্যয়নের পর আমরা এ কারণগুলো অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারি। পূর্ববর্তী বংশধররা এ কিতাব দু'টিকে তাদের আসল ভাষা ও বর্ণনা অপরিবর্তিত রেখে এবং মূল আকারে সংরক্ষিত অবস্থায় পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছায়নি। তার মধ্যে আল্লাহর কালামের সাথে ব্যাখ্যা, ইতিহাস, কানে শুনা বিভিন্ন বর্ণনা ও ফকীহগণ উদ্ভাবিত আনুসংগিক বিষয়াবলীর আকারে মানুষের কথাও মিশ্রিত করে দেয়। তাদের অনুবাদ-গুলোকে এতবেশী ছড়ায় যার ফলে মূল অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কেবল অনুবাদগুলোই লোক সমক্ষে থেকে যায়। এগুলোর ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতাও এমনভাবে নষ্ট করে দেয়া হয় যার ফলে আজ কোনো ব্যক্তি পূর্ণ প্রত্যয় সহকারে এ কথা বলতে পারে না যে, হযরত ঈসা (আ) বা হযরত মূসা (আ)-এর ওপর দুনিয়াবাসীদের জন্যে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল তার হাতে যে কিতাবটি রয়েছে সেটিও সেই আসল কিতাব। তাদের নেতৃবর্গ ও মনীষীবৃন্দ মাঝে মাঝে ধর্ম, আল্লাহ, দর্শন, আইন, দেহ, আত্মা ও সমাজ সম্পর্কে এমন সব আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন এবং এমন সব চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন যার গোলক ধাঁধাঁয় আটকা পড়ে হাজারো জটিল পথগুলোর মধ্য থেকে সত্যের সরল সোজা পথটি বেছে নেয়া মানুষের জন্যে অসম্ভব রকমের কঠিন হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে আল্লাহর কিতাবও তার আসল আকৃতিতে ও নির্ভরযোগ্য অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। কাজেই লোকদের জন্যে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রের দিকেও দৃষ্টিপাত করা সম্ভব ছিল না, যা হককে বাতিল থেকে আলাদা করার জন্যে তাদেরকে সাহায্য করতে পারতো।[৫৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আরব ভূখণ্ডে হযরত হুদ (আ) ও হযরত সালেহ (আ)-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম সত্য দ্বীনের দাওয়াত এসে পৌঁছেছিল। এটা ছিল প্রাক ঐতিহাসিক যুগের ঘটনা। তারপর এলেন হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)। তাঁরা এসেছিলেন রসূলে করীম (সা)-এর আড়াই হাজার বছর আগে। তাঁদের পরে এবং রসূলে করীম (সা)-এর পূর্বে আরব ভূখণ্ডে যে সর্বশেষ নবী এসেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত শোআইব আলাইহিস সালাম।[৫৯]

আরববাসীরা পূর্ব থেকেই একজন নবীর দাবী জানিয়ে আসছিল

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ج

"এরা বড় বড় কসম খেয়ে বলতো যদি কোনো সতর্ককারী তাদের এখানে আসতো, তাহলে তারা দুনিয়ার সকল জাতির চেয়ে বেশী সত্যপথাবলম্বী হতো।"
–(সূরা আল ফাতের ঃ ৪২)

রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়াত লাভের পূর্বে ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিকৃত নৈতিক অবস্থা দেখে আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এবং কুরাইশরা বিশেষভাবে এ কথা বলতো।[৬০]

অনুরূপভাবে সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ص وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ○ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ج

"এ কিতাব আসার পর এখন তোমরা এ কথা বলতে পারো না যে, আমাদের আগের দু'টি দলকে তো কিতাব দেয়া হয়েছিল আর তারা কি পড়তো বা পড়াতো তা আমাদের জানা ছিল না। আর এখন তোমরা এ বাহানাবাজীও করতে পারো না যে, আমাদের ওপর কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের চেয়ে বেশী সত্যপথাবলম্বী প্রমাণিত হতাম।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৫৬-১৫৭)

সূরা আস্ সাফ্ফাতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ○ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ○ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ○ (الصفت : ١٦٧-١٦٩)

"এরা প্রথমে একথা বলে বেড়াতো যে, হায় আমাদের কাছে যদি সেই 'যিক্‌র' থাকতো যা আগের জাতিরা লাভ করেছিল তাহলে আমরা আল্লাহর একান্ত নিষ্ঠাবান বান্দাই হতাম।"–(সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ১৬৭-১৬৯)

একটি উজ্জ্বল প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ○ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً○ (البينه : ١-٢)

"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল (তারা নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত থাকার লোক ছিল না, যতক্ষণ না তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণ আসে (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল আসেন যিনি পবিত্র সহীফা পড়ে শুনান।"–(সূরা আল বাইয়েনাহ ঃ ১-২)

অর্থাৎ একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসে তাদেরকে কুফরীর প্রত্যেকটি অবস্থার ভ্রান্তি ও তার সত্য বিরোধী হবার বিষয়টি বুঝিয়ে দেবে এবং সরল ও নির্ভুল পথটি সুস্পষ্টভাবে ও

যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে তাদের সামনে তুলে ধরবে, এ ছাড়া কুফরীর অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার দ্বিতীয় কোনো পথ তাদের কাছে ছিল না। এর অর্থ এ নয় যে, এই সুস্পষ্ট প্রমাণটি এসে গেলেই তারা সবাই কুফরী পরিহার করবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে এ প্রমাণটির অবর্তমানে তাদের পক্ষে এ অবস্থাটির প্রভাব এড়িয়ে বের হয়ে আসা কোনোক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। আর এখন এর আগমনের পরও তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর ওপর অবিচল থাকবে তার জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী হবে। এরপর তারা আল্লাহর নিকট এ বলে অভিযোগ করতে পারবে না যে, তাদের হেদায়াতের জন্যে তিনি কোনো ব্যবস্থা করেননি। কুরআন মজীদে এ কথাটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আন নাহল-এ বলা হয়েছে وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ "সোজা পথ দেখানো আল্লাহর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।"–(৯ আয়াত) সূরা আল লাইল-এ বলা হয়েছে اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى "পথ দেখানোর দায়িত্ব আমার।"–(১২ আয়াত)

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط (النساء : ١٦٤-١٦٥)

"(হে নবী) আমি তোমার দিকে অহী নাযিল করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি নাযিল করেছিলাম। এ রসূলদেরকে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারীদের দায়িত্ব দেয়া হয়, যাতে রসূলদের আগমনের পর লোকদের জন্যে আল্লাহর নিকট কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করা সম্ভব না হয়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৬৩-১৬৫)

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ط -(مائده : ١٩)

"হে আহলে কিতাব ! রসূলদের আগমনের ধারাবাহিকতা দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রসূল এসে গেছেন সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্যে। যাতে তোমরা এ কথা না বলতে পারো যে, তোমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসেননি। কাজেই দেখ, এখন তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে।"–(সূরা আল মায়েদাহ ঃ ১৯)৬১

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلاَّ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ○

"পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল সত্য পথের বর্ণনা সুস্পষ্ট হবার পরই তাদের মধ্যে বিভেদ এসেছিল।"–(সূরা আল বাইয়েনাহ ঃ ৪)

অর্থাৎ ইতিপূর্বে আহলে কিতাবগণ নানাপ্রকার গোমরাহীর শিকার হয়ে নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহ তাদের পথনির্দেশের জন্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাঠাবার ব্যাপারে কোনো প্রকার প্রচেষ্টার ত্রুটি করেছেন বলেই তাদের এই দশা হয়েছে তা নয়। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশ আসার পর তারা এ নীতি অবলম্বন করেছিল। তাই তাদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী ছিল। কারণ তাদের নিকট সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল। অনুরূপভাবে বর্তমানে যেহেতু তাদের গ্রন্থগুলো অবিকৃত

নেই, সেগুলো নির্ভুল শিক্ষা সম্বলিত নয়, তাই আল্লাহ একটি উজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে নিজের একজন রসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে নির্ভুল শিক্ষা সম্বলিত পবিত্র ও অবিকৃত গ্রন্থ দান করে তাদের নিকট সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কাজেই এর পরও যদি তারা বিভেদে লিপ্ত থাকে তাহলে তার সমস্ত দায়িত্ব তাদের নিজেদের ওপর বর্তাবে। আল্লাহকে তারা কোনো প্রকারে দায়ী করতে পারবে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ কথা বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা বাকারাহ ২১৩ ও ২৫৩ আয়াত, আলে ইমরান ১৯ আয়াত, মায়েদাহ ৪৪-৫০ আয়াত, ইউনুস ৯৩ আয়াত, আশ শূরা ১৩-১৫ আয়াত এবং আল জাসীয়া ১৬-১৮ আয়াত। এ সংগে তাফহীমুল কুরআনে সংশ্লিষ্ট সূরাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে আমি যে টীকা সংযোজন করেছি সেগুলো এক নজর দেখে নিলে বিষয়টি বুঝতে আরও সহজ হবে।[৬২]

রসূল পাঠাবার অবশ্যি প্রয়োজন ছিল। কারণ মুশরিক, আহলি কিতাব নির্বিশেষে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যে ধরনের কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তা থেকে তাদের বের হয়ে আসা একজন নবীর সহযোগিতা ছাড়া কোনোক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। তাদের এমন একজন নবীর সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল যাঁর নিজের অস্তিত্বই হবে তাঁর রিসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি মানুষের সামনে আল্লাহর কিতাবকে আসল, অবিকৃত ও নির্ভুল অবস্থায় উপস্থিত করবেন। ইতিপূর্বেকার আসমানী গ্রন্থগুলোতে যেসব বাতিলের মিশ্রণ ঘটেছিল সেসব থেকে এ গ্রন্থটি হবে মুক্ত। এ গ্রন্থটিতে ঘটবে কেবলমাত্র সঠিক, নির্ভুল ও যথার্থ সত্য শিক্ষার সমাবেশ।[৬৩]

নবী প্রেরণের স্থান নির্বাচন

পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রথম নজরেই ধরা পড়বে যে, সারা দুনিয়ার পয়গম্বরীর জন্যে পৃথিবীর বুকে আরব ভূখণ্ডের চেয়ে উপযোগী দ্বিতীয় আর কোনো স্থান নেই এবং হতেও পারে না। এ দেশটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইউরোপও এখান থেকে অনেক নিকটে। বিশেষ করে সে যুগে ইউরোপের সুসভ্য জাতিগুলোর অধিকাংশের বসতি ছিল এ মহাদেশটির দক্ষিণ অংশে। আর এ অঞ্চলটি আরবের ঠিক ততটা নিকটবর্তী ছিল যেমন ছিল তৎকালীন হিন্দুস্তান।

সেকালের ইতিহাস পড়লেও জানা যাবে, এ নবুয়াতের জন্যে সে যুগে আরব জাতির চেয়ে উপযোগী আর কোনো জাতিই ছিল না। অন্য বড় বড় জাতিরা নিজদের শক্তি-প্রভাব-প্রতিপত্তির চূড়ান্ত প্রকাশের পর নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে আরব জাতি ছিল নতুন প্রাণ বন্যায় ভরপূর। সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতির ফলে অন্যান্য জাতির অভ্যাস ও প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরব তখনো পর্যন্ত কোনো উন্নত সভ্যতার স্পর্শ থেকে দূরে ছিল। যার ফলে এ জাতিটি বিলাসী, আরামপ্রিয় ও নিকৃষ্ট স্বভাবের অধিকারী ছিল না। ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের আরব সমকালীন সভ্য জাতিগুলোর কুপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সভ্যতার আলো থেকে বহুদূরে অবস্থানরত একটি জাতির মধ্যে যতগুলো মৌলিক মানবিক সৎগুণ থাকতে পারে তার সবগুলোই তাদের মধ্যে ছিল। তারা ছিল সাহসী, নির্ভীক, দানশীল, ওয়াদা পালনকারী, স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির অধিকারী ও স্বাধীনচেতা। তারা অন্য কোনো জাতির অধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিল না। নিজের মর্যাদা রক্ষার্থে প্রাণ দিয়ে দেয়া তাদের জন্যে ছিল অত্যন্ত সহজ। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন প্রণালীই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য।

বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তার সাথে কোন সম্পর্কই তাদের ছিল না। নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অনেকগুলো অসৎগুণও ছিল। কারণ আড়াই হাজার বছর থেকে তাদের এলাকায় কোনো নবীর আগমন হয়নি।* এমন কোনো জননায়কের আবির্ভাবও সেখানে হয়নি যিনি তাদের স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করে তাদেরকে একটি সুসভ্য জাতিরূপে গড়ে তুলতে পারতেন। শত শত বছর ধরে দিগন্ত প্রসারী ধূ ধূ মরুভূমির বুকে মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করার কারণে তাদের মধ্যে অজ্ঞতা ও মূর্খতা বিস্তার লাভ করেছিল। তাদের মূর্খতা জমাট বেঁধে এমন শক্ত পাষাণে পরিণত হয়েছিল যে, সে পাষাণ ঘষে মসৃণ করে তাদেরকে মানুষ বানানো কোনো সাধারণ মানুষের কাজ ছিল না। কিন্তু এই সঙ্গে তাদের মধ্যে অবশ্যি এমন যোগ্যতা ছিল যার ফলে কোনো অসাধারণ ব্যক্তি তাদের সংশোধন করে দিলে এবং তাঁর শিক্ষার প্রভাবে কোনো উন্নত জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হলে সারা দুনিয়াকে তারা ওলট-পালট করে দিতে পারতো। বিশ্ব নবীর শিক্ষাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে এমনি জীবন রসে পরিপূর্ণ, যৌবনোদ্দীপ্ত শক্তিশালী জাতির প্রয়োজন ছিল।

এরপর ভাষার আলোচনায় আসলেও দেখা যাবে আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্য সহজে চোখে পড়ার মত। এ ভাষাটি এবং এর সাহিত্য অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, উন্নত চিন্তাকে সহজভাবে প্রকাশ করার, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়গুলো বর্ণনা করার এবং মনের গভীরে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উপযোগী আর কোনো ভাষাই নেই। এ ভাষাটির ছোট্ট একটি বাক্যের মধ্যে বিরাট বিষয়বস্তুকে ধরে রাখা যায়। এরপরও এর অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তির জোরে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে তা বিদ্ধ হয় তীরের মত। আর তার মাধুর্য হয় তুলনাবিহীন। মনে হয় যেন রস উপচিয়ে পড়ছে। সুরের লহরীতে হৃদয়-মন আপ্লুত হয়। কুরআনের ন্যায় কিতাবের জন্যে এমনি একটি ভাষার প্রয়োজন ছিল।

কাজেই বিশ্বনবীর জন্যে আরবের ন্যায় একটি দেশকে নির্বাচিত করার পেছনে আল্লাহর বিরাট উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।[৬৪]

অজ্ঞ জাতির জন্যে সর্বোত্তম নেতা

একটি জাতি শত শত বছর থেকে অজ্ঞতা, মূর্খতা, দুদর্শা ও অবনতির অতল গহ্বরে নেমে যাচ্ছিল। তারপর অকস্মাৎ একদিন তার ওপর বর্ষিত হল মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ। তার মধ্যে তিনি জন্ম দিলেন তাদের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম নেতার। তাদেরকে অজ্ঞতার অতলান্ত গহ্বর থেকে উঠাবার জন্যে ঐ নেতার ওপর অবতীর্ণ করলেন নিজের বাণী। তাদেরকে গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগ্রত করা এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আচ্ছন্নতা মুক্ত করে সত্য-সুন্দর নির্ভুল জীবনের পথে এগিয়ে চলতে সাহায্য করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

কিন্তু জাতির মূর্খ লোকেরা এবং তাদের স্বার্থান্ধ উপজাতীয় সরদাররা নেতার পেছনে উঠেপড়ে লাগে। তাঁকে ব্যর্থ করার জন্যে তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। সময় এগিয়ে চলে। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। এই সংগে তাদের শত্রুতা ও অনিষ্টকারিতাও বেড়ে যেতে থাকে। এমনকি একদিন তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এ অবস্থায় মহান

* হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর যুগ ছিল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। মাঝখানের এ দীর্ঘ সময়ে আরবে আর কোনো নবী জন্মেনি।

আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের বোকামির কারণে আমি কি তোমাদের সংস্কার প্রচেষ্টা রুদ্ধ করে দেবো ? উপদেশ প্রদানের এ ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেবো ? আর অবনতির যে অতল গহ্বরে তোমরা নিমজ্জিত ছিলে সেখানে তোমাদেরকে পড়ে থাকতে দেব ? এটাই কি আমার রহমতের দাবী হওয়া উচিত বলে তোমরা মনে কর ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহর অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করা এবং হক সামনে এসে যাওয়ার পরও বাতিলকে আঁকড়ে ধরার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর পরিণাম কি হতে পারে ? ৬৫

রসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াতের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ

কিছুক্ষণের জন্যে চোখ দু'টি বন্ধ করে একবার চিন্তার জগতে বিচরণ করুন। এক হাজার চারশ' বছর আগের পৃথিবীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখুন। তখনকার পৃথিবীর অবস্থাটা কেমন ছিল?

চৌদ্দশ' বছর আগের পৃথিবী

সে সময় পৃথিবীর মানুষের পরস্পরের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদানের উপায়-উপকরণ ছিল অতি অল্প। দেশ ও জাতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম ছিল অত্যন্ত সীমিত। মানুষের জানার পরিধি ছিল অতি সংকীর্ণ। তার চিন্তা ছিল বড়ই অপরিপক্ক। তার মনোরাজ্যে ছিল কুসংস্কার ও ভীতির রাজত্ব। অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকারের বুকে জ্ঞানের রেখাটি ছিল ক্ষীণতর। আঁধার সমুদ্রের পর্বত প্রমাণ ঢেউগুলোকে সরিয়ে আলোর তরংগটি এগিয়ে যাচ্ছিল অতি কষ্টে। সেদিনের পৃথিবীতে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, রেলগাড়ী ও উড়োজাহাজের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আজকের মত গ্রন্থ প্রকাশনালয় ও ছাপাখানার সন্ধান পাওয়া যেত না। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন প্রকার শিক্ষায়তনের প্রাচুর্য ছিল না। তখন খবরের কাগজ ও সাময়িকী প্রকাশ হত না, গ্রন্থ লেখা হত না এত বিপুল সংখ্যায় এবং সেগুলো প্রকাশেরও কোনো ব্যাপকতর ব্যবস্থা ছিল না। সে যুগের একজন পণ্ডিতের জানার পরিধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আজকের যুগের একজন সাধারণ লোকের তুলনায় কম ছিল। সে যুগের উচ্চ সমাজের এক ব্যক্তি আজকের যুগের একজন মজুরের তুলনায়ও কম রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান ছিল। সে যুগের একজন অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিও আজকের একজন সেকেলের চিন্তার অধিকারী ব্যক্তির চেয়েও অধিক সেকেলে চিন্তার ধারক ছিল। আজকের যুগে যেসব কথা সবাই জানে সে যুগের বছরের পর বছর পরিশ্রম, অনুসন্ধান গবেষণার পর বহু কষ্টে তা জানা সম্ভব হত। আজকের যুগের একটি ছোট্ট শিশু জ্ঞানোদয়ের প্রথম মুহূর্তেই তার চারপাশ থেকে যেসব খবর অনায়াসে জেনে নেয় সেগুলোর জন্যে সে যুগে শত শত মাইল সফর করতে হত। এমনকি অনেক সময় ঐ সামান্য তথ্যটুকু আহরণ করার জন্যে সারা জীবন সাধনা করতে হত। আজকের যুগে যেসব বিষয়কে কুসংস্কার ও উদ্ভট পৌরাণিক গালগল্প মনে করা হয় সে যুগে সেগুলোই ছিল "সত্য"। যেসব কাজকে আজকের যুগে অশালীন ও বর্বর বলা হয় সেগুলোই ছিল সে যুগে সাধারণ কাজ। আজ মানুষের বিবেক যেসব পদ্ধতিকে ঘৃণা করে সে যুগের নৈতিকতায় সেগুলো কেবল বৈধই ছিল না বরং এর বিপরীত আর কোনো পদ্ধতি হতে পারে—এ কথা কেউ কল্পনাই করতে পারতো না। অলৌকিক বিষয়ের প্রতি মানুষের মোহ এত বেশী ছিল যে, কোনো বস্তু-বিষয় যতক্ষণ না অতিপ্রাকৃতিক, অসাধারণ ও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হত, ততক্ষণ মানুষ তার সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুতই হত না। এমনকি মানুষ নিজেকে নিতান্ত দীন, হীন ও তুচ্ছ মনে করত। যার ফলে কোনো মানুষের ওলিআল্লাহ হওয়া বা কোনো ওলিআল্লাহর মানুষ হওয়া তাদের নিকট ছিল অচিন্তনীয় ও কল্পনার অতীত।

আরব দেশের অবস্থা

এই অন্ধকার যুগে পৃথিবীর একটি অংশে অন্ধকার আরও ঘনীভূত ছিল। সে যুগের সভ্যতার মানদণ্ডে দুনিয়ার যেসব দেশ সুসভ্য বলে পরিচিত ছিল তাদের মধ্যবর্তী এলাকায় আরব দেশটি সবার থেকে আলাদা হয়ে নিরালায় একাকী অবস্থান করছিল। তার চারপাশে ইরান, রোম ও মিসরে জ্ঞান, শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কিছু আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কিন্তু বিপুলায়তন মরু সমুদ্রগুলো আরবকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আরব সওদাগরেরা মরুভূমির জাহাজ উটের পিঠে চড়ে মাসের পর মাস সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সেসব দেশে ব্যবসা করতে যেতেন। তারা কেবল পণ্য বিনিময় করেই চলে আসতো। জ্ঞান ও সভ্যতার কোনো আলো সংগে করে আনত না। তাদের দেশে কোনো শিক্ষায়তন ছিল না। পাঠাগার ছিল অকল্পনীয়। দেশের জনগণের মধ্যে ছিল না জ্ঞানের চর্চা বা জ্ঞান ও শিল্পের প্রতি কোনো প্রকার আগ্রহ। সারা দেশে হাতে গোণা কয়েকজন লোক পড়ালেখা জানত। কিন্তু তাদেরও লেখাপড়ার পরিধি এতই সীমিত ছিল যে, সে যুগের জ্ঞান ও শিল্পের সাথে তারা ছিল একেবারেই অপরিচিত। নিঃসন্দেহে তাদের ভাষাটি ছিল উন্নত পর্যায়ের এবং যে কোনো উন্নত চিন্তাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার অসাধারণ ক্ষমতাও তার ছিল। তাদের মধ্যে উন্নত পর্যায়ের সাহিত্য রুচিরও অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তাদের সাহিত্যের যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি, তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, তাদের জানার পরিধি ছিল অত্যন্ত সীমিত। সভ্যতা সংস্কৃতিতে তাদের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। কুসংস্কারে তারা কিভাবে আচ্ছন্ন ছিল! তাদের চিন্তা ও স্বভাব প্রকৃতি ছিল মূর্খতা ও বর্বরতার নগ্ন প্রকাশ। তাদের নৈতিক চিন্তা ছিল একেবারেই বস্তাপচা আস্তাকুঁড়ের সামগ্রী।

সেখানে কোনো নিয়মিত শাসন, শৃংখলা, আইন ও সরকার ছিল না। প্রত্যেক উপজাতি ছিল স্বাধীন। জঙ্গলের আইনই ছিল সেখানে একমাত্র আইন। একজন অপরজনকে বাগে পেলেই মেরে ফেলত। তার ধন-সম্পদ সবকিছু হস্তগত করত। একজন আরব বেদুঈন এ কথা কোনোক্রমেই বুঝতে পারত না যে, যে লোকটি তার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় তাকে কেনো মেরে ফেলা হবে না এবং তার ধন-সম্পদ কেনো হস্তগত করা হবে না?

তারা ছিল নৈতিকতা, শালীনতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নেহাতই নিম্ন পর্যায়ের ও অস্বচ্ছ চিন্তাধারার অধিকারী। পাক-নাপাক, জায়েয-নাজায়েজ, শালীন-অশালীন ইত্যাদির পার্থক্যের সাথে তারা প্রায় অপরিচিত ছিল। তাদের জীবনধারা ছিল বড়ই কলুষতাময়। তাদের চাল-চলন ছিল নিতান্তই বর্বর ও অমানবিক। ব্যভিচার করা, জুয়া খেলা, মদ পান, রাহাজানি, হত্যা, লুণ্ঠন ছিল তাদের জীবনের নিত্যকার কাজ। তারা একজন অন্যজনের সামনে নির্দ্বিধায় উলঙ্গ হয়ে যেত। তাদের মেয়েরাও উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তওয়াফ করত। কোনো ব্যক্তি যেন তার জামাতা না হতে পারে নিছক এই জাহেলী চিন্তার বশবর্তী হয়ে তারা নিজেদের শিশু কন্যাকে স্বহস্তে জীবিত কবর দিত। তারা পিতার মৃত্যুর পর নিজেদের বিমাতাকে বিয়ে করত। খাওয়া-দাওয়া, লেবাস-পোশাক ও পাক-পরিচ্ছন্নতার সামান্য ছোটখাটো রীতি পদ্ধতিও তারা জানত না।

ধর্মের ব্যাপারে সমকালীন বিশ্বের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার তারাও সমান অংশীদার ছিল। মূর্তি পূজা, জ্বিন-ভূত পূজা, নক্ষত্র পূজা, মোটকথা এক আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া সমকালীন বিশ্বের যত প্রকারের পূজার প্রচলন ছিল সবগুলোতেই তারা লিপ্ত ছিল। প্রাচীন যুগের

নবীগণ ও তাঁদের শিক্ষা সম্পর্কে কোনো সঠিক জ্ঞান তাদের নিকট ছিল না। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) তাদের প্রপিতা এতটুকু তারা জানত ঠিকই কিন্তু তাদের পিতা-পুত্রের ধর্ম কি ছিল এবং তারা কার ইবাদাত করত তা তাদের জানা ছিল না। আদ ও সামুদ জাতির কাহিনীও তারা শুনেছিল। কিন্তু আরব ঐতিহাসিকরা তাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়ার পর কোথাও হযরত সালেহ (আ) ও হযরত হুদ (আ)-এর শিক্ষার কোনো নামগন্ধ পাওয়া যাবে না। ইহুদী ও ঈসায়ীদের মাধ্যমে তারা বনী ইসরাঈলের নবীদের কাহিনীও জেনেছিল। কিন্তু সেগুলো কেমনতর কাহিনী ছিল তা জানার জন্য শুধুমাত্র মুসলিম মুফাসসিরগণ লিখিত তফসীর গ্রন্থগুলোয় উদ্ধৃত ইসরাঈলী বর্ণনাগুলো ঘাটলেই বুঝা যাবে। এথেকে জানা যাবে আরববাসীরা এবং বনী ইসরাইলীরা যে নবীদের সম্পর্কে অবগত ছিল তাঁরা কোন্ ধরনের মানুষ ছিলেন। এই সঙ্গে নবুয়াত সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারাও যে কেমন নিম্নপর্যায়ে ছিল তাও জানা যাবে।

সামনে এলেন এক ব্যক্তি

এ সময় এ দেশে জন্ম হল এক ব্যক্তির। শৈশবেই মা, বাপ ও দাদার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলেন তিনি। তাই এহেন শোচনীয় অবস্থায় একটি আরব শিশু স্বাভাবিকভাবে যে শিক্ষা লাভ করতে পারত তাও তিনি পেলেন না। বুদ্ধি-জ্ঞান হবার পর বেদুইন ছেলেদের সাথে ছাগল চরাতে বের হলেন। যৌবনে পৌঁছে ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। চলাফেরা ওঠাবসা সব ঐ আরবদের সাথে—যাদের অবস্থা একটু আগেই বলে এসেছি। শিক্ষার নামগন্ধই নেই সেখানে। এমনকি সামান্য পড়া লেখাটুকুও তারা জানে না। কোনো শিক্ষিত বা জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্যও তারা পায়নি। কারণ সে সময় আরবের কোথাও কোনো শিক্ষিত পণ্ডিত লোকের অস্তিত্বই ছিল না। কয়েকবার আরবের বাইরে যাবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল কিন্তু এ সফর কেবলমাত্র সিরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর তাও ছিল সে যুগের আর দশটি আরব কাফেলার মত নেহাতই ব্যবসায়িক সফর। ধরা যাক এ ধরনের সফরের মধ্যে যদি তিনি কিছু জ্ঞান ও সভ্যতার নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করেও থাকেন এবং কিছু জ্ঞানী, গুণী ও সুসভ্য লোকের সাক্ষাত পেয়েও থাকেন, তাহলেও এ ধরনের বিক্ষিপ্ত সাক্ষাতকার ও পর্যবেক্ষণে কোনো মানুষের জীবন গড়ে ওঠে না। এগুলো কোনো ব্যক্তির ওপর এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না, যার ফলে তিনি নিজের সমাজ-পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও আলাদা হয়ে এক উন্নততর জগতে পৌঁছে যাবেন, যেখানে পৌঁছে যাবার পর তার সাথে তার পরিবেশের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হবে না। এভাবে এমন পর্যায়ের কোনো জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না যা একজন অশিক্ষিত বেদুইনকে কোনো একটি দেশের নয়, সারা দুনিয়ার এবং কোনো এক যুগের নয়, সমস্ত যুগের নেতৃত্বে সমাসীন করে। বাইরের লোকদের থেকে তিনি যদি কোনো রকমের তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করেও থাকেন, তাহলে সে সময় দুনিয়ায় যে তথ্য কারো জানা ছিল না, ধর্ম-নৈতিকতা-সভ্যতা-সংস্কৃতির যে চিন্তাধারা ও নীতির কোথাও কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এবং মানব চরিত্রের যে আদর্শ তদানীন্তন দুনিয়ার কোথাও বিদ্যমান ছিল না, তা লাভ করার কোনো উপায়ই ছিল না।

তাঁর কর্মকাণ্ড

শুধু আরবের নয়, সারা দুনিয়ার অবস্থা ও পরিবেশ সামনে রাখতে হবে। তাহলে দেখা যাবে, এ ব্যক্তি যাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে শৈশব অতিবাহিত করেন,

যাদের সাথে হেসে-খেলে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেন, যাদের সাথে দিনরাত মেলা-মেশা ও লেনদেন করতে থাকেন, শুরু থেকেই স্বভাবে-চরিত্রে-অভ্যাসে-আচরণে তাদের সবার থেকে আলাদা। তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। সমস্ত জাতি তাঁর সত্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। তিনি কখনো মিথ্যা বলেছেন তাঁর ঘোরতর শত্রুও কোনো দিন অপবাদ দেয়নি। তিনি কাউকে কটুকথা বলেননি। তাঁর মুখ থেকে কেউ কোনো দিন গালি বা অশ্লীল কথা শুনেনি। তিনি লোকদের সাথে সব রকমের কায়কারবার করেন কিন্তু কখনো তাঁকে কারো সাথে তিক্ততা সৃষ্টি, কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া করতে দেখা যায়নি। তাঁর কথায় কঠোরতার পরিবর্তে দেখা যায় মাধুর্য। আর এ মাধুর্যে এমন আন্তরিকতার প্রলেপ ছিল যার ফলে যেই তাঁর সাথে মেশে সেই তাঁর ভক্তে-অনুরক্তে পরিণত হয়। তিনি কারও সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি। কারও অধিকার হরণ করেননি। বছরের পর বছর ব্যবসা করার পরও তিনি অবৈধভাবে কারও একটি পয়সাও হস্তগত করেননি। যেসব লোকের সাথে তিনি লেনদেন করেন তারা সবাই তাঁর বিশ্বস্ততার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখত। সমস্ত জাতি তাঁকে 'আল-আমীন'—বিশ্বাসী আখ্যা দেয়। শত্রুরাও তাদের মূল্যবান সম্পদ তাঁর নিকট আমানত রাখত নির্দ্বিধায়। তিনি সেগুলো হেফাজত করতেন পূর্ণ আস্থা সহকারে। নির্লজ্জ লোকদের মধ্যে তিনি এমন লজ্জাশীলতার পরিচয় দেন যে, জ্ঞান হবার পর থেকে কেউ তাঁকে কোনো দিন উলঙ্গ হতে দেখেনি। চারদিকের অসচ্চরিত্র লোকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ পূত চরিত্রের নমুনা পেশ করেন। কেউ কোনো দিন তাঁকে কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতে দেখেনি। মদ ও জুয়ার ধারেকাছেও তিনি কোনো দিন যাননি। অশালীন লোকদের মধ্যে তিনি চরম শালীনতার পরিচয় দেন। সব রকমের অপকর্ম ও অশ্লীল কাজকে ঘৃণা করতেন এবং তাঁর সব কাজে পবিত্রতা ও শালীনতার ছাপ সুস্পষ্ট থাকত। পাষাণ হৃদয় মরুচারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন মূর্তিমান কোমল হৃদয়। প্রত্যেকের অভাব-দুঃখে দেখা যেত তাঁকে সহযোগী হিসেবে। এতিম ও বিধবাদের সাহায্য করতেন। পথচারী ও মুসাফিরদের আথিথেয়তা করতেন। কাউকে তিনি কষ্ট দেননি। বরং অন্যের জন্যে নিজে কষ্টভোগ করতেন। বর্বর বেদুইনদের মধ্যে তিনি ছিলেন একান্ত শান্তিপ্রিয়। নিজের জাতির মধ্যে দাঙ্গা ও রক্তপাত দেখে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। গোত্রীয় ও উপজাতীয় যুদ্ধ থেকে নিজে সরে থাকেন এবং বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে সন্ধি ও আপোষ করার জন্যে সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মূর্তিপূজারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন চরম ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে এমন কোনো জিনিস তিনি খুঁজে পাননি যার পূজা করা যেতে পারে। কোনো সৃষ্টির সামনে তাঁর মাথা নত হয়নি। পূজার প্রসাদও তিনি গ্রহণ করতেন না। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শির্ক ও সৃষ্টি-পূজাকে ঘৃণা করতেন।

এ সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে এ ব্যক্তিকে এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দেখা যায়, যেন মনে হয় নিকষ কালো আঁধারের বুকে একটি উজ্জ্বল প্রদীপ আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে অথবা পাথরের স্তূপের মধ্যে একটি মহামূল্যবান রত্ন চমকাচ্ছে।

মানসিক ও আত্মিক পরিবর্তন

প্রায় চল্লিশ বছরকাল এ ধরনের পূত-পবিত্র-ভদ্র জীবন-যাপন করার পর তাঁর জীবনে আসে এক বিপ্লব। চারদিকের ঘনায়মান নিচ্ছিদ্র অন্ধকার দেখে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। অজ্ঞতা, অসচ্চরিত্রতা, অসৎকর্মশীলতা, নৈরাজ্য, বিশৃংখলা, শির্ক ও মূর্তিপূজার এ ভয়ংকর

সমুদ্র থেকে তিনি বের হয়ে আসতে চান। এ পরিবেশে কোনো একটি বস্তুও তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে হয়নি। সবার থেকে আলাদা হয়ে জনবসতি থেকে দূরে পাহাড়ের একান্তে বসে চিন্তা করতে থাকেন তিনি। নির্জনে গভীর প্রশান্তির মধ্যে কেটে যায় একাধারে কয়েকদিন। রোজা রেখে নিজের আত্মা-মন-মস্তিষ্ককে আরো বেশী পাক-পবিত্র করেন। তিনি চিন্তা-ভাবনা করে যেতে থাকেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। এমন কোনো আলোর সন্ধান করতে থাকেন, যা এ চারদিকের ঘনায়মান আঁধার দূর করতে সক্ষম। এমন কোনো শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন, যা এই বিপথে পরিচালিত বিশ্বকে ভেঙ্গে-চুরে আবার নতুন করে গড়তে ও সুসজ্জিত করতে পারে।

বিপ্লবের বাণী

অকস্মাৎ তাঁর অবস্থার মধ্যে দেখা দেয় বিরাট পরিবর্তন। তাঁর মনে হঠাৎ এমন এক আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে আগে কোথাও যার লেশমাত্রও ছিল না। ইতিপূর্বে তাঁর মধ্যে যে শক্তির কোনো চিহ্নই ছিল না অকস্মাৎ তা কোথা থেকে এসে তাঁর সমগ্র সত্তাকে ভরে দেয়। গুহার নির্জনতা ছেড়ে তিনি বের হয়ে আসেন। হাজির হন নিজের জাতির সামনে। তাদেরকে বলতে থাকেন, তোমরা এ যেসব মূর্তির পূজা করে চলছো এগুলোর কোনো প্রভাব ক্ষমতা নেই। এদের পূজা কর না। এমন কোনো মানুষ, গাছ, পাথর, আত্মা এবং কোনো নক্ষত্র নেই যার পূজা ও আরাধনা করা যেতে পারে, যার সামনে মাথা নত করা যেতে পারে এবং যার আনুগত্য করা যেতে পারে। এ চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী এ নক্ষত্র এবং এ পৃথিবী ও আকাশের মধ্যকার যাবতীয় বস্তু এক আল্লাহর সৃষ্টি। তিনিই তোমাদেরকে এবং সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জীবন দান করেন। মৃত্যু দান করার ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই হাতে। একমাত্র তাঁরই বন্দেগী কর। তাঁর হুকুম মেনে চল। তাঁর সামনে মাথা নত কর। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন, হত্যা, যুলুম-নির্যাতন যা তোমরা করে চলছো—সব গুণাহের কাজ। এগুলো পরিহার কর। আল্লাহ এসব পছন্দ করেন না। সত্য কথা বল। ইনসাফ কর। কাউকে হত্যা কর না। কারো ধন-সম্পদ লুঠ কর না। কিছু নিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে নাও। কিছু দিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে দাও। তোমরা সবাই মানুষ। সব মানুষ সমান। লাঞ্ছনার কলংক চিহ্ন কপালে এঁকে কেউ জন্মেনি। আবার সম্মান ও মর্যাদার মুকুট মাথায় দিয়েও কেউ দুনিয়ায় পদার্পণ করেনি। শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও আভিজাত্য বংশের মধ্যে নিহিত নেই। এগুলো নিহিত রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য, সৎকর্মশীলতা ও পবিত্রতার মধ্যে। যে আল্লাহকে ভয় করে সে সৎকর্মশীল ও পবিত্র। সে শ্রেষ্ঠতম মানব সন্তান। অন্যথায় সে কিছুই নয়। মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কর্মকাণ্ডের জন্যে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এমন আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে যিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন। তোমরা তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকাতে পারবে না। তোমাদের জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড তাঁর সামনে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে পেশ করা হবে। এ কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে তিনি তোমাদের পরিণাম নির্ধারণ করবেন। সেই যথার্থ ন্যায় বিচারকের কাছে কোনো রকম সুপারিশ বা উৎকোচ কাজে লাগবে না। তিনি কারও বংশ পরিচয় নেবেন না। সেখানে একমাত্র ঈমান ও সৎকাজের কথা জিজ্ঞেস করা হবে। যার কাছে এ সম্পদ থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যার কাছে এর কিছুই থাকবে না সে ব্যর্থতার ডালি মাথায়

করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। ইহাই ছিল সেই পয়গাম যা তিনি গুহা থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

জাতির প্রতিক্রিয়া

অজ্ঞ জাতি তাঁর শত্রু হয়ে যায়। তাঁকে গালাগালি করতে থাকে। তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করে। একদিন দু'দিন নয়, একাধারে তের বছর তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। অবশেষে তাঁকে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করে। তাঁকে শুধু দেশান্তরী করেই ক্ষান্ত হয়নি, যেখানে গিয়ে তিনি আশ্রয় নেন সেখানেও তারা তাঁর পেছনে ধাওয়া করে। তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দেয়। সমগ্র আরবদেশকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয়। পূর্ণ আট বছর ধরে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে থাকে। এসব কষ্ট তিনি হাসিমুখে বরদাশত করে যান কিন্তু নিজের সংকল্প ও মিশন থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হন না।

জাতি তাঁর শত্রু হল কেন ? এখানে কি জমি ও ভূখণ্ড দখলের কোনো ব্যাপার ছিল ? কোনো রক্তের প্রতিশোধের প্রশ্ন ছিল ? তিনি কি তাদের কাছে কোনো পার্থিব বস্তুর দাবী জানাচ্ছিলেন ? না, তা নয়। সমস্ত বিরোধের মূলে ছিল—তিনি আল্লাহর ইবাদাত, সততা, সত্যনিষ্ঠা ও সৎকর্মশীলতার শিক্ষা দিচ্ছেন কেন ? মূর্তি পূজা, শির্ক ও অসৎকর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছেন কেন ? পূজারী ও পুরোহিতদের নেতৃত্বের ওপর আঘাত হানছেন কেন ? সরদারদের সরদারীর বিভ্রম থেকে জনগণকে সতর্ক করছেন কেন ? মানুষের পরস্পরের মধ্য থেকে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ খতম করতে চাচ্ছেন কেন ? গোত্র ও বংশ প্রীতিকে জাহেলিয়াত বলে গণ্য করেছেন কেন ? প্রাচীন যুগ থেকে যে সামাজিক ব্যবস্থা চলে আসছে তাকে ভাংগতে চান কেন ? তাঁর জাতি বলে চলছিল, তুমি যা কিছু বলছ, সব আমাদের জাতীয় পদ্ধতি ও বংশীয় ঐহিত্যের পরিপন্থী, কাজেই এসব পরিত্যাগ কর, নয়তো আমরা তোমার জীবন ধারণ কঠিন করে দেব।

কষ্ট সহ্য কেন

ঐ ব্যক্তি এতসব কষ্ট সহ্য করলেন কেন ? তাঁর জাতি তাঁকে বাদশাহী দান করতে প্রস্তুত ছিল। সম্পদের স্তূপ তাঁর পদতলে জমা করতে চাইছিল। তবে এ জন্যে শর্ত ছিল, তাঁকে ঐ শিক্ষাগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজের শিক্ষার বিনিময়ে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হওয়া পছন্দ করেন। এসব মেনে নেন কেন ? তাঁর জাতির লোকের সৎকর্মশীল ও আল্লাহর অনুগত হয়ে যাওয়ার মধ্যে তাঁর নিজের কি কোন স্বার্থ ছিল ? এর মধ্যে কি তাঁর বৃহত্তর কোনো স্বার্থ নিহিত ছিল, যার মোকাবিলায় নেতৃত্ব, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, অর্থ-সম্পদ ও আয়েশ-আরামের লোভ ছিল নিতান্তই তুচ্ছ ? অথবা এমন কোনো লাভের সন্ধান এখানে ছিল যার জন্যে এক ব্যক্তি একাধিক্রমে একশ' বছর ধরে কঠোরতম শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে প্রস্তুত হতে পারে ? এক ব্যক্তি নিজের কোনো স্বার্থে নয় বরং অন্যের স্বার্থে ও কল্যাণার্থে নিজে কষ্ট স্বীকার করে যাবেন—মানব জাতির জন্যে সৎবৃত্তি, ত্যাগ ও সহানুভূতির এর চেয়ে উন্নততর আর কোনো আদর্শের কথা চিন্তা করা যায় কি ? যাদের কল্যাণার্থে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারাই তাঁকে গালিগালাজ করে, তাঁর ওপর পাথর মারে এবং তাঁকে গৃহহারা ও দেশান্তরী করে। বিদেশেও তারা তাঁর পেছনে ধাওয়া করে। এতসব সত্ত্বেও তিনি তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত হন না।

কোনো মিথ্যাবাদী কোনো ভিত্তিহীন বিষয়ের জন্যে কি এ ধরনের বিপদ সহ্য করতে পারে? নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে কোনো ব্যক্তি নিজের সংকল্পে এতটা দৃঢ় ও অবিচল থাকতে পারে কি যার ফলে তার ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লেও সারা দেশ ও সারা দুনিয়া তার বিরুদ্ধে ওঠে পড়ে লাগলেও এবং দুনিয়ার বৃহত্তম সেনাবাহিনী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও সে নিজের সংকল্প থেকে এক চুল পরিমাণ সরে যেতে রাজি হয় না? এ অবিচলতা ও দৃঢ় সংকল্পই এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, নিজের সত্যতার ওপর তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। যদি তার মনে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ ও সংশয় থাকতো তাহলে একাধিক্রমে একুশ বছর বিপদের পর বিপদের মোকাবিলা করা তার পক্ষে সম্ভবপর হত না।

এ ছিল তাঁর অবস্থার পরিবর্তনের একটি দিক। এর অপর দিকটি ছিল এর চেয়েও বিস্ময়কর।

অবস্থার পরিবর্তনের অপর দিক

চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন সাধারণ আরবদের মতই একজন আরব। এ সময় এ সওদাগরটিকে একজন অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে কেউ জানত না। কেউ তাঁকে দেখেনি ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, আইন, রাজনীতি ও সমাজনীতির ওপর আলোচনা করতে। তাঁর কাছ থেকে কেউ শুনেনি আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থাবলী, পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতগণ এবং কিয়ামত, মৃত্যু পরের জীবন ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে একটি কথাও। তিনি লোকদের সাথে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করতেন, তাঁর চালচলন ছিল অত্যন্ত শালীন ও মধুর এবং যুগের শ্রেষ্ঠ উন্নত নৈতিক চরিত্রেরও তিনি অধিকারী ছিলেন—এ কথা ঠিক। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তার মধ্যে এমন কোনো অস্বাভাবিক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি যার ফলে লোকেরা এ ধারণা করতে পারতো যে, এবার তিনি একটা কিছু হয়ে যাবেন। এ পর্যন্ত লোকেরা তাঁকে একজন নীরব শান্তিপ্রিয় এবং অত্যন্ত ভদ্র ও শালীন ব্যক্তি হিসেবেই জানত। কিন্তু চল্লিশ বছর পর তিনি যখন বের হলেন একটি গুহা থেকে, তখন অকস্মাৎ দেখা গেল তাঁর চেহারাই বদলে গেছে।

এখন তিনি একটি বিস্ময়কর বাণী শুনাচ্ছিলেন। এ বাণী শুনে সমস্ত আরববাসী অভিভূত হয়ে গেল। এর অন্তরভেদী প্রভাবের ফলে এর ঘোরতর শত্রুও নিছক এটি শুনতেও ভয় পাচ্ছিল; এ বাণী একবার কানে পড়লে কি জানি কখন মনের মধ্যে গেঁথে বসবে, এ ভয়েই তারা ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। এর অলংকারিত্ব ও বর্ণনা মাধুর্য ছিল তুলনাবিহীন। তদানীন্তন আরবের বড় বড় কবি, বাগ্মী ও ভাষাতত্ত্বের দাবীদারদের উপস্থিতিতে এ বাণী সমগ্র আরববাসীদের সামনে চ্যালেঞ্জ দিল এবং বার বার এ চ্যালেঞ্জ দিল যে, তোমরা সবাই মিলে এর যে কোনো একটি বাক্যের মতো বাক্য রচনা করে আন। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সাহস কেউ দেখাতে পারলো না। এমন অতুলনীয় বাণী কোনো আরব কোনো দিন শুনেইনি।

এখন রাতারাতি তিনি একজন অতুলনীয় জ্ঞানী, অসাধারণ সমাজ সংস্কারক ও নৈতিক চরিত্র গঠক, একজন বিস্ময়কর রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ও আইন প্রণেতা, একজন উন্নত পর্যায়ের বিচারক ও নজীরবিহীন সিপাহসালার রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। সেই নিরক্ষর

মরুচারী এমন সব জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কথা বলে যেতে লাগলেন, যা ইতিপূর্বে কেউ বলেনি এবং এর পরেও বলতে পারেনি। এ নিরক্ষর ব্যক্তিটি আল্লাহ এবং অদৃশ্য জগতের ওপর পরম নিশ্চিন্তে বক্তৃতা করে যেতে থাকলেন। জাতিদের ইতিহাস থেকে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের দর্শন শুনাতে থাকলেন, প্রাচীন সংস্কারকদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের সমালোচনা ও জাতিদের বিরোধ নিস্পন্ন করতে থাকলেন। চরিত্র, নৈতিকতা, শালীনতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে লাগলেন।

তিনি সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থ ব্যবস্থা, পারস্পরিক লেনদেন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে আইন প্রণয়ন শুরু করলেন। এমন উচ্চাঙ্গের আইন রচনা করলেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী ও পণ্ডিত সমাজ বছরের পর বছর বরং সারা জীবন গবেষণা ও অনুসন্ধানের পরই যার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। আর দুনিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা যতই এগিয়ে যেতে থাকলো ততই এর সত্য উজ্জ্বলতর হয়ে ধরা দিতে থাকলো।

এ নীরব শান্তিপ্রিয় সওদাগরটি জীবনে কোনো দিন তরবারি চালাননি, কোনো দিন সামরিক শিক্ষা পাননি, এমনকি জীবনে মাত্র একটি যুদ্ধে একজন নীরব দর্শক হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন। অথচ এখন তিনি একজন বীর সৈনিক হয়ে গেলেন। সংকটপূর্ণ মহাসমর ক্ষেত্রে কোনোদিন তাঁর পা একচুলও নড়েনি। তিনি এখন একজন মহা-পরাক্রমশালী সেনানায়ক হয়ে গেলেন। মাত্র নয় বছরের মধ্যে সমস্ত আরব দেশ জয় করে ফেললেন। তিনি এখন একজন শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক ও সমরবিদ হয়ে গেলেন। তাঁর সৃষ্ট সামরিক সংগঠন ও যুদ্ধ প্রেরণার প্রভাবে কপর্দকহীন ও যুদ্ধ সরঞ্জামের অভাব পীড়িত আরবরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের দু'টি বৃহৎ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দিল।

এ নির্জনবাসী শান্তিপ্রিয় মানুষটির মধ্যে চল্লিশটি বছর পর্যন্ত কেউ রাজনীতি-প্রিয়তার গন্ধ পায়নি। হঠাৎ আজ তিনি বিরাট সংস্কারক ও রাষ্ট্রনায়করূপে আবির্ভূত হলেন। তেইশ বছরের মধ্যে বার লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় বিস্তৃত মরুভূর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশৃংখল, যুদ্ধপ্রিয়, মূর্খ, অরাজক, অসভ্য বর্বর, পরস্পর দ্বন্দ্বে সদা লিপ্ত উপজাতিদেরকে আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ থেকে দূরে রেলগাড়ী, টেলিফোন, রেডিও ও মুদ্রণযন্ত্রের সহযোগিতা ছাড়াই এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি, এক আইন ও এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন করে দিলেন। তিনি তাদের চিন্তাধারার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তাদের চরিত্র বদলে দিলেন। তাদের শালীনতা বিবর্জিত জীবনধারাকে উন্নত শ্রেণীর শালীনতায় পরিপূর্ণ করে দিলেন। তাদের বর্বরতা ও অসভ্যতাকে পরিশীলিত নাগরিক জীবনে রূপান্তরিত করলেন। তাদের অসৎবৃত্তি ও অসৎ চরিত্রকে রূপান্তরিত করলেন সৎবৃত্তি, তাকওয়া ও উন্নত নৈতিক চরিত্রে। তাদের অরাজকতা ও নৈরাজ্যকে চূড়ান্ত পর্যায়ের আইনানুগত্য ও নেতার নির্দেশ পালনে সর্বাধিক তৎপর সুশৃংখল জীবন ধারায় পরিবর্তিত করলেন। এ জাতিটি এমনই বন্ধ্যা ছিল যে, শত শত বছরে এর উদরে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জন্ম হয়নি। কিন্তু এ নির্জনবাসী মানুষটি তাকে এমনই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জন্মদাতায় পরিণত করে দিলেন যে, এখন সেখানে হাজার হাজার ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হল। দুনিয়াবাসীকে দ্বীন ও নৈতিকতার শিক্ষা দান করার জন্যে তারা দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন।

নৈতিক কর্মপদ্ধতি

এ কাজ তিনি যুলুম, নির্যাতন, ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে সম্পন্ন করেননি। বরং করেছিলেন হৃদয়জয়ী সদ্ব্যবহার, ভদ্রতা ও মনোমুগ্ধকর শিক্ষার মাধ্যমে। সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করেন। স্নেহ ও অনুগ্রহের দ্বারা মন বিগলিত করেন। ইনসাফ ও ন্যায়ের মাধ্যমে দেশ শাসন করেন। সত্য ও সততা থেকে কখনো এক চুলও সরে যাননি। যুদ্ধক্ষেত্রে কারও সাথে প্রতারণা করেননি। নিজের প্রাণের শত্রুদের ওপরও যুলুম করেননি। যারা ছিল তাঁর রক্তপিপাসু, যারা তাঁকে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, তাঁকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র আরবকে শত্রু হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল, এমনকি শত্রুতা ও আক্রোশের আতিশয্যে তাঁর চাচার কলিজা বের করে চিবিয়েছিল, তাদের ওপর বিজয় লাভ করার পরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের সাথে অন্যায় ব্যবহারের কারণে তিনি কারও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

এসব সত্ত্বেও তাঁর আত্মসংযম ছিল তুলনাবিহীন। পার্থিব স্বার্থের প্রতি তাঁর নির্মোহ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সারা দেশের বাদশাহ হবার পরও তিনি আগের মতো ফকিরই রয়ে গেলেন। ঘাস-পাতার ছাউনিতে থাকতেন। চাটাই ছিল বিছানা। মোটা পোশাক পরতেন। গরীবের খাবার খেতেন। অনেক সময় অনাহারে থাকতেন। সারারাত আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য ও সেবা করতেন। একজন শ্রমিকের মতো কায়িক পরিশ্রম করতে ইতস্তত করতেন না কখনো। শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর মধ্যে রাজকীয় শান-শওকত বিত্তশালীদের জৌলুস ও বড়লোকদের অহংকারের সামান্যতম গন্ধ পাওয়া যায়নি। একজন সাধারণ লোকের মতো তিনি সবার সাথে মেলামেশা করতেন। তাদের বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টে শরীক হতেন। সাধারণ লোকদের মধ্যে এমনভাবে বসতেন যাতে বাইরে থেকে আগত লোকের পক্ষে ঐ মাহফিলে জাতির নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানকে খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ত। এত বিরাট ব্যক্তি হবার পরও সামান্য নগণ্য লোকদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন যেন মনে হত তারাও তাঁরই মত। সারা জীবন সংগ্রাম সাধনার পর তিনি নিজের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। নিজের সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তি জাতির জন্যে ওয়াকফ করে গেছেন। নিজের অনুসারীদের ওপর নিজের বা নিজের সন্তানদের কিছু মাত্র অধিকার কায়েম করেননি। এমনকি ভবিষ্যতে তাঁর অনুসারীরা সমস্ত যাকাত তাঁর সন্তানদেরকেই না দিয়ে দেয় এ ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে যাকাত গ্রহণ করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছেন।

আধুনিক যুগের নির্মাতা

এ মহান ব্যক্তির মহান কার্যাবলীর শেষ নেই। তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করার জন্যে বিশ্ব ইতিহাসের ওপর সামগ্রিকভাবে একবার নজর দিতে হবে। সেখানে দেখা যাবে আরব মরুর এ নিরক্ষর ব্যক্তিটি, চৌদ্দশ' বছর আগে অন্ধকার যুগে যার জন্ম, আসলে আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা ও সারা দুনিয়ার নেতা। তিনি কেবল তাদের নেতা নন যারা তাঁকে নেতা বলে মানে বরং তাদেরও নেতা যারা তাঁকে নেতা বলে মানে না। তাদের এ অনুভূতিই নেই যে, যার বিরুদ্ধে তারা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর নেতৃত্ব কিভাবে তাদের চিন্তাধারা, জীবন পদ্ধতি, কর্মনীতি এবং তাদের আধুনিক যুগের প্রাণ সত্তায় জড়িত রয়েছে।

এ ব্যক্তিই বিশ্ববাসীর চিন্তাধারার মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তাদেরকে ভাববাদিতা, কুসংস্কার, বিস্ময়কর বস্তুর পূজা ও বৈরাগ্যবাদ থেকে যুক্তিবাদ, বাস্তববাদ ও যথার্থ আল্লাহ ভীতি ভিত্তিক ধার্মিকতার দিকে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি অনুভূত অলৌকিক ঘটনাবলীর দাবী উত্থাপনকারী বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক অলৌকিকত্বকে অনুধাবন করার এবং তাকেই সত্যের মানদণ্ড হিসেবে মেনে নেবার প্রবণতার জন্ম দিয়েছেন। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন অনুসন্ধানকারীদের চোখ খুলে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহের (Natural Phenomena) মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন দেখার অভ্যাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি কল্পনা বিলাসীদেরকে অনুধ্যানের (Speculation) পরিবর্তে যুক্তিবাদিতা, চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পথে অগ্রসর করেছেন। তিনি মানুষকে জানিয়েছেন বুদ্ধি ও অনুভূতির পার্থক্যকারী সীমারেখা। বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। ধর্মের সাথে জ্ঞান ও কর্মের এবং জ্ঞান ও কর্মের সাথে ধর্মের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। ধর্মীয় শক্তির সাহায্যে দুনিয়ায় বৈজ্ঞানিক শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে যথার্থ ধার্মিকতা সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি পূজা ও শির্কের ভিত্তিমূল উৎপাটিত করেছেন এবং জ্ঞান-শক্তি বলে তাওহীদ বিশ্বাসকে এমন মজবুত করে কায়েম করেছেন যার ফলে মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদের ধর্ম ও একাত্মবাদের রঙ্গে রঙ্গীন হতে বাধ্য হয়েছে। তিনি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মৌলিক ধারণাগুলোই বদলে দিয়েছেন। যারা বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধনাকে যথার্থ নৈতিকতা মনে করতো, যাদের মতে দেহ ও প্রবৃত্তির হক আদায় করলে এবং পার্থিব জীবনের বিষয়াবলীতে অংশ নিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরকালীন মুক্তি সম্ভব নয়, তাদেরকে তিনিই সমাজ-সংস্কৃতি ও পার্থিব কর্মজীবনের মধ্যে নৈতিকতার মাহাত্ম্য, আধ্যাত্মিকতার উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তিনিই মানুষকে তার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করেছেন। যারা ভগবান, অবতার ও আল্লাহর পুত্রকে ছাড়া অন্য কাউকে হেদায়াতদানকারী ও নেতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না তাদেরকে তিনিই জানিয়েছেন যে, তাদেরই মতো মানুষ আসমানী সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি এবং বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর খলীফা হতে পারে। যারা প্রত্যেক শক্তিশালী ব্যক্তিকে নিজেদের খোদা মনে করতো তাদেরকে তিনিই বুঝিয়েছেন যে, মানুষ নিছক মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন ব্যক্তি জন্মগতভাবে পবিত্রতা, শাসন কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকার নিয়ে আসেনি। কেউ অপবিত্রতা, গোলামী, দাসত্ব ও অধীনতার কলংক নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। এ শিক্ষাই বিশ্বে মানবতার একাত্মতা, সাম্য, গণতন্ত্র ও চিন্তার স্বাধীনতার জন্মদাতা।

চিন্তাধারার জগত থেকে বাইরে আসলে দেখা যাবে এ নিরক্ষর ব্যক্তির নেতৃত্বের বাস্তব ও কার্যকর ফলশ্রুতি দুনিয়ার আইন, পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যাপক ও সীমাহীন। নৈতিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি শালীনতা, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতার অসংখ্য নীতি ও পদ্ধতি আর শিক্ষা থেকে বের হয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি যে সামাজিক বিধি প্রবর্তন করেছিলেন সারা দুনিয়া তাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে এবং এখনো গ্রহণ করে চলেছে। তিনি যে অর্থনৈতিক বিধান দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে দুনিয়ায় বহু অর্থনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে ও এখনো হচ্ছে। তিনি যে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কতগুলো বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে এবং এখনো হয়ে চলছে। ইনসাফ ও আইনের যেসব মূলনীতি তিনি

রচনা করেছিলেন, সেগুলো বিশ্বের বিচার ব্যবস্থা ও আইন চিন্তাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এখনো তার প্রভাব নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। যুদ্ধ, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুসভ্য রীতি ও ব্যবস্থা বাস্তবে তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন। যুদ্ধের আবার কোনো সুসভ্য রীতি ও নীতি থাকতে পারে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মানবতার ভিত্তিতে সম্পর্ক কায়েম ও লেনদেন হতে পারে, তাঁর পূর্বে দুনিয়া এ সম্পর্কে অবগতই ছিল না।

সমস্ত উন্নত গুণের সমাহার

বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে এ অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিটির উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এত বেশী সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে, শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আগত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে—যাদেরকে লোকেরা মনীষী (Heroes) আখ্যায়িত করেছে—তাঁর মোকাবিলায় দাঁড় করালে তাঁর সামনে তাদেরকে খুদে বামুনটি মনে হবে। বিশ্ব মনীষীবৃন্দের মধ্যে একজনও এমন নেই যার শ্রেষ্ঠ উন্নত গুণাবলী জীবনের একটি বা দু'টি বিভাগ ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত হতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কেউ কেউ মতবাদ পেশ করেছেন কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা তার ছিল না। কেউ কর্মে সুপটু কিন্তু চিন্তায় দুর্বল। কারও কৃতিত্ব রাজনৈতিক গুণাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেউ নিছক সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী। কারও দৃষ্টি সমাজ জীবনের একটি দিকের এত গভীরে প্রসারিত যার ফলে অন্য দিকগুলো সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে। কেউ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে গেছেন আর অর্থনীতি ও রাজনীতিকে একেবারেই উপেক্ষা করেছেন। কেউ অর্থনীতি ও রাজনীতির পথে এগিয়েছেন এবং নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে একেবারেই দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন। মোটকথা ইতিহাসে কেবল এক তরফা মনীষীই দেখা যায়। কিন্তু এই ব্যক্তিই এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম। তাঁর মধ্যে সমস্ত গুণাবলীই একত্রিত হয়েছে। তিনি নিজেই দার্শনিক ও পণ্ডিত। নিজের দর্শনকে তিনি নিজেই বাস্তব জীবনে কার্যকর করেন। তিনি রাষ্ট্রনায়ক আবার সমরনায়কও। তিনি আইন প্রণেতা আবার নৈতিকতার শিক্ষকও। অন্যদিকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাও। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয় মানুষের জীবনের সমস্ত দিকের ওপর, জীবনের ছোট ছোট বিষয়কেও তা উপেক্ষা করে না। পানাহারের আদব ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতার পদ্ধতি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে তিনি বিধান ও নির্দেশ দেন। নিজের মতবাদের ভিত্তিতে একটি সভ্যতার (Civilization) জন্ম দেন এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগে নির্ভুল ভারসাম্য (equilibrium) কায়েম করেন। কোথাও প্রান্তিকতার নামগন্ধই পাওয়া যায় না। এ ধরনের সর্বগুণের অধিকারী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির নাম ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

পরিবেশের উর্ধ্বে

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের একজনও এমন নেই যিনি কমবেশী নিজের পরিবেশের সৃষ্টি নন। কিন্তু এ ব্যক্তিটির অবস্থা সবার থেকে আলাদা। তাঁর পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করেনি। কোনো যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে এ কথা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না যে, আরবের ক্ষেত্র ও পরিবেশ সে সময় ঐতিহাসিকভাবে এমন এক ব্যক্তির জন্মদানের জন্যে প্রস্তুত ছিল। অনেক টেনে হিঁচড়ে বড়জোর এতটুকু বলা যায় যে, ঐতিহাসিক কারণে আরবে সেকালে এমনি একজন নেতার প্রয়োজন ছিল। তিনি উপজাতীয় বিশৃংখলা ও অরাজকতা খতম করে তাদেরকে এক জাতিত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করতেন

এবং দেশের পর দেশ জয় করে আরববাসীদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের পথ প্রশস্ত করতেন। অর্থাৎ এমন একজন জাতীয়তাবাদী আরব নেতা, যিনি হতেন সেকালের সবরকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যুলুম, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, রক্তপাত, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা তথা সম্ভাব্য যাবতীয় কৌশল খাটিয়ে নিজের জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করতেন। একটি সাম্রাজ্য গঠন করে নিজের অনুন্নত দেশবাসীর জন্যে রেখে যেতেন। এ ছাড়া সে যুগের আরব ইতিহাসের আর কোনো চাহিদাই প্রমাণ করা যাবে না। হেগেলের ইতিহাস দর্শন ও মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে বড় জোর এ কথা বলা যেতে পারে যে, আরবের তদানীন্তন পরিবেশে জাতি গঠন ও সাম্রাজ্য স্থাপন করার যোগ্যতাসম্পন্ন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়ার প্রয়োজন ছিল অথবা আবির্ভাব হওয়া সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আসলে যা ঘটে গেল হেগেলীয় ও মার্কসীয় দর্শন তার কি ব্যাখ্যা দেবে? সে সময় এ পরিবেশে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হলো যিনি সর্বোত্তম নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন, মানবতাকে সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত করেছেন, আত্মার পরিশুদ্ধি করেছেন, জাহেলী কুসংস্কার, ভাববাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ নির্মূল করেছেন। যার দৃষ্টি বংশ-গোত্র-জাতি-দেশের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র বিশ্ব-মানবতার ওপর পরিব্যাপ্ত হয়েছে। যিনি কেবল নিজের জাতির জন্যে নয় বরং বিশ্ব-মানবতার জন্যে একটি নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরী করেছেন। যিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-বিধান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কল্পনার জগতে নয় বাস্তবে নৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের এমন ভারসাম্য মিশ্রণ ঘটিয়েছেন যা সেদিনের ন্যায় আজও জ্ঞান ও বিচক্ষণতার শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এমন এক ব্যক্তিত্বকে কি তদানীন্তন আরবের জাহেলী পরিবেশের সৃষ্টি বলা যেতে পারে?

ইতিহাস স্রষ্টা

এ ব্যক্তি কেবল তার পরিবেশের সৃষ্টি নয় বরং তাঁর কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি স্থান-কালের সীমানা ও প্রভাব মুক্ত। তাঁর দৃষ্টি সময় ও অবস্থার বাঁধন ছিন্ন করে শতাব্দী ও সহস্রাব্দের (Millenniuns) সীমানা পেরিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছে। তিনি মানুষকে দেখেছেন সকল যুগ ও পরিবেশের আলোকে। এই সংগে তার জীবন যাপনের জন্যে এমন সব নৈতিক ও কার্যকর নির্দেশ দিয়েছেন, যা সর্বাবস্থায় যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যায়। ইতিহাস যাদেরকে প্রাচীনদের তালিকাভুক্ত করেছে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁর যথার্থ পরিচয় কেবল এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, তিনি তাদের যুগের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন সবার থেকে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যময়। তিনি মানবতার এমন নেত ছিলেন যাঁর নেতৃত্ব ইতিহাসের চলমান ধারার সাথে গতিশীল (March) হয় এবং প্রত্যেক যুগে তেমনি আধুনিক দেখা যায় যেমন তার পূর্বের যুগে ছিল।

যাদেরকে ঢালাওভাবে ইতিহাস স্রষ্টা বলা হয়ে থাকে তারা আসলে ইতিহাসের সৃষ্টি। মানবতার সমগ্র ইতিহাসে প্রকৃত ইতিহাস স্রষ্টা মাত্র এই একজনই পাওয়া যাবে। ইতিহাসে যারাই বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে সে সময় আগে থেকেই বিপ্লবের উপাদানগুলো তৈরী হচ্ছিল। এ উপাদানগুলোই তাদের চাহিদামত বিপ্লবের দিক ও পথ নির্ণয় করছিল। বিপ্লবী নেতা এ ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা পালন করেছেন? তিনি অবস্থা ও পরিবেশের চাহিদাকে বাস্তবে রূপায়িত করার

জন্যে এমন একজন অভিনেতার ভূমিকা পালন করেছেন যার জন্য মঞ্চ ও অভিনয়ের যাবতীয় কাজ আগে থেকেই তৈরী ও নির্দিষ্ট হয়েই ছিল। কিন্তু ইতিহাস ও বিপ্লব সৃষ্টিকারীদলের মধ্যে তিনি একাই ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর জন্যে বিপ্লবের উপাদান ও কারণগুলো অনুপস্থিত ছিল। সেক্ষেত্রে তিনি নিজেই বিপ্লবের উপাদান ও কারণগুলো উদ্ভাবন ও প্রস্তুত করেন। যেখানে লোকদের মধ্যে বিপ্লবের প্রাণসত্তা ও কার্যকর যোগ্যতা পাওয়া যেতো না সেখানে তিনি নিজের প্রচেষ্টায় বিপ্লব সৃষ্টির উপযোগী জনশক্তি গড়ে তোলেন। নিজের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকে দ্রবীভূত করে হাজার হাজার লোকের মনের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজের মনের মতো বানিয়ে নিয়েছেন। তার ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তিই বিপ্লবের যাবতীয় উপাদান তৈরী করেছে, তার আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে এবং নিজের সংকল্পের জোরে তিনি অবস্থার গতি পরিবর্তন করে তাকে নিজের অভীষ্টপথে পরিচালিত করেছেন। এমনি একজন ইতিহাস স্রষ্টা এবং এ ধরনের বিপ্লবী দুনিয়ার কোথাও কোনো যুগে পাওয়া গেছে কি ?

পরিপূর্ণ সত্যনিষ্ঠা

চৌদ্দশো বছরের আগের অন্ধকার পৃথিবীতে, আরবের মতো একটি ঘনান্ধকার দেশের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে একজন মরুচারী নিরক্ষর মেষপালক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে অকস্মাৎ এত বিপুল পরিমাণ জ্ঞান, আলো, শক্তি ও উন্নত গুণাবলী এবং এত উন্নত পর্যায়ের অনুশীলিত শক্তির পাহাড় সৃষ্টি হবার কি উপায় ছিল ? বলা হয় এগুলো সবই তাঁর মন ও মস্তিষ্কের সৃষ্টি। আমি বলবো, এগুলো যদি তাঁর মন ও মস্তিষ্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর উচিত ছিল নবুয়াতের নয়, খোদায়ীর দাবী করা। যদি তিনি সত্যিই এমন দাবী করতেন তাহলে তাঁর মতো সর্ব গুণান্বিত ব্যক্তিকে খোদা বলে মেনে নিতে এক ধরনের লোকেরা মোটেই অস্বীকার করতো না। কারণ তারা ইতিপূর্বে রামকে খোদা বানিয়েছে, শ্রী কৃষ্ণকে ভগবান বলে মেনে নিতে ইতস্ততঃ করেনি, গৌতম বুদ্ধকে নিজেরাই খোদার আসনে বসিয়েছে, ঈসা আলাইহিস সালামকে স্বেচ্ছায় আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে, তারা অগ্নি, পানি এবং বায়ুরও পূজা করেছে। কিন্তু তিনি নিজে কি বলেছেন তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিজের এ সমস্ত গুণের জন্যে কোনো প্রকার কৃতিত্বের দাবীদার নন। তিনি বলেন, আমি একজন মানুষ, তোমাদের মতো মানুষ। আমার যা কিছু আছে তার কোনোটাই আমার নিজের নয়, সবই আল্লাহর এবং সবই তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে দান করা হয়েছে। আমি যে বাণী এনেছি, সমগ্র বিশ্বমানবতা যার নজীর আনতে অক্ষম, তাও আমার নিজের নয়, আমার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার ফলশ্রুতি নয়। এর প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে এসেছে। এ জন্যে একমাত্র আল্লাহ প্রশংসা লাভের যোগ্য। আমি যা কিছু কৃতিত্ব দেখিয়েছি, যা কিছু আইন প্রণয়ন করেছি, যা কিছু নীতি-নৈতিকতা মানুষকে শিখিয়েছি, তার মধ্যে কোনো একটিও আমি নিজে তৈরী করিনি। নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা থেকে কোনো কিছু পেশ করার শক্তি আমার নেই। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আমি আল্লাহর নেতৃত্ব ও নির্দেশ দানের মুখাপেক্ষী। ওদিক থেকে যা ইংগিত আসে আমি তা-ই বলি এবং তা-ই করি।

কী বিস্ময়কর সত্য! কেমন অত্যাশ্চর্য আমানতদারী ও সত্যবাদিতা! মিথ্যুকরা বড় হবার জন্যে অন্যদের শ্রেষ্ঠ কার্যাবলীকে নিজেদের কৃতিত্বের খাতায় লিখিয়ে নিতে একটুও

ইতস্ততঃ করে না। অথচ সেগুলোর মূলের সন্ধান পেতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। কিন্তু এ ব্যক্তি এমন সব গুণাবলীকেও নিজের বলে দাবী করছেন না যেগুলোকে নিজের কৃতিত্ব বললে কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারতো না। কারণ সেগুলোর মূলের সন্ধান করার কোনো উপায়ই কারো জানা নেই। সত্যবাদিতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে ? যে ব্যক্তি কোনো একটি অত্যন্ত গোপন উৎস থেকে এমন নজীরবিহীন গুণাবলী লাভ করেছেন এবং তিনি নির্দ্বিধায় নিজের আসল উৎসের সন্ধান জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে হতে পারে ? তাঁকে আমরা সত্যবাদী বলবো না তো আর কাকে বলবো ?[৬৬]

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতের স্বপক্ষে কুরআনের যুক্তি

কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ যুক্তি*

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا الَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ـ(العنكبوت : ٤٨ـ٤٩)

"হে নবী ! তুমি এর আগে কোনো বই-কিতাব পড়তেও না এবং নিজ হাতে লিখতেও না। তা যদি হতো তাহলে বাতিলপন্থীরা সন্দেহে পড়ে যেতে পারতো। আসলে এ হলো জ্ঞানীদের অন্তরে উজ্জ্বল নির্শনাবলী।"–(সূরা আল অনকাবুত ঃ ৪৮-৪৯)

এ আয়াতে বর্ণিত যুক্তির মূল সূত্র এই যে, হযরত (সা) নিরপেক্ষ ছিলেন। তার দেশবাসী, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও স্বগোত্রীয় লোকেরা হযরতকে ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে 'যৌবনকাল'পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখেছে। তিনি যে সারা জীবনে কোনো বই পড়েননি এবং কখনো কলম ধরেননি, তা তারা ভাল করেই জানতো।

হযরত (সা)-এর নিরক্ষর হওয়াটাই নবুয়াতের প্রমাণ

তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন সেই বাস্তব ব্যাপারটার উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ এ থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালের আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা, সাবেক নবীদের জীবনকাহিনী, অতীতের বিভিন্ন ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস, আদিম জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত এবং অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও নৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত যে গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানরাশী এ নিরক্ষর নবীর মুখ দিয়ে বের হচ্ছে, তা অহী ছাড়া আর কোন উপায়ে তার আয়ত্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর যদি লেখাপড়া জানা থাকতো এবং লোকেরা তাকে বই-কিতাব পড়তে এবং গবেষণা ও তত্বানুসন্ধান করতে দেখে থাকতো তাহলে বাতিলপন্থী লোকদের এমন সন্দেহ করার একটা ভিত্তি হয়তো থাকতো যে, এ বিপুল জ্ঞানসম্ভার অহীর মাধ্যমে না হয়ে লেখাপড়া ও জ্ঞানান্বেষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু নবীর নিরেট নিরক্ষরতা এ ধরনের কোনো সন্দেহের আদৌ কোনো অবকাশ থাকতে দেয়নি।** এরপরও যদি কেউ তাঁর নবুয়াতকে অস্বীকার করে তবে নিরেট হঠকারিতা ছাড়া তার আর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।[৬৮]

---

* নবুয়াতে মুহাম্মদী সম্পর্কে কুরআনে যে আলোচনা ও যুক্তি-তর্ক সন্নিবেশিত হয়েছে তা এত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী যে, একটিমাত্র নিবন্ধে তা সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কুরআনের যুক্তি-তর্কের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মওলানা মওদূদী করেছেন, তাকে একত্র করলে সেটা একটা আলাদা পুস্তকের রূপ নেবে। এসব দিক বিবেচনা করে আমরা কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি নিয়ে মাওলানার সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে এখানে উদ্ধৃত করছি।

–(সংকলক)

** কুরআনের এরূপ দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা ও নিখুঁত যুক্তি প্রদর্শনের পরও যারা হযরত (সা)-কে শিক্ষিত প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাদের ধৃষ্টতায় অবাক না হয়ে পারা যায় না। অথচ এখানে কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় হযরত (সা)-এর নিরক্ষরতাকে তার নবুয়াতের স্বপক্ষে একটা অকাট্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। যেসব রেওয়ায়াতের ওপর নির্ভর করে বলা হয় যে, হযরত (সা) শিক্ষিত ছিলেন বা পরে লেখাপড়া শিখেছেন, প্রথমতঃ তা গোড়াতেই

একজন নিরক্ষর মানুষের কুরআনের মতো একখানা কিতাব এনে দেয়া এবং বাহ্যতঃ কোনো রকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই অসাধারণ প্রতিভা ও পরিপক্কতার পরিচয় দেয়া নিসন্দেহে অস্বাভাবিক ব্যাপার। জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান লোকদের জন্যে এগুলো ঐ নিরক্ষর ব্যক্তির

প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য। কেননা কুরআনের পরিপন্থী কোনো রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তা ছাড়া সেগুলো এত দুর্বল যে, সেগুলোকে যুক্তির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণই করা যায় না। এর মধ্যে একটা হলো হোদায়বিয়ার সন্ধি সংক্রান্ত বুখারীর বর্ণনা। এতে বলা হয়েছে যে, সন্ধির চুক্তি লেখার সময় মক্কার কাফেরদের প্রতিনিধি হযরত (সা)-এর নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটা লেখায় আপত্তি জানায়. এতে তিনি সন্ধিপত্রের লেখক [হযরত আলী (রা)]-কে বললেন, মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ' থেকে 'রসূলুল্লাহ' কেটে দিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ) লিখে দাও। হযরত আলী 'রসূলুল্লাহ' শব্দটা কাটতে রাজী হলেন না। তখন হযরত (সা) সন্ধি পত্রটা তার হাত থেকে নিয়ে নিজেই ঐ শব্দটা কেটে দিলেন এবং 'মুহাম্মদ 'বিন আবদুল্লাহ' লিখে দিলেন। সাহাবী বারা ইবনে আজেবের বরাত দিয়ে বর্ণিত এই হাদীসটা বুখারীতে চার জায়গায় এবং মুসলিমে দু' জায়গায় উদ্বৃত হয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গায় এর পার্থক্য রয়েছে। এক বুখারীর সন্ধিসংক্রান্ত অধ্যায়ে এক বর্ণনার ভাষা এ রকম ঃ

قال لعلى امحه فقال على ما انا بالذى امحاة فمحاه رسول الله بيده ـ

"হযরত রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ এ কথাটা কেটে দাও। হযরত আলী (রা) বললেন, ওটা আমি কাটতে পারবো না। অবশেষে হযরত নিজ হাতেই তা কেটে দিলেন।

দুই ঃ বুখারীর অন্য রেওয়ায়াতের ভাষা এ রকম ঃ

ثم قال لعلى امح رسول الله قال لا ولله امحوك ابد افاخذ رسول الله الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله ـ

"অতপর হযরত আলী (রা)-কে তিনি বললেন! রসূলুল্লাহ শব্দটা কেটে দাও। আলী (রা) বললেন ঃ না, খোদার কছম, আপনার নাম আমি কখনো কাটবো না। অতপর হযরত (সা) সন্ধি পত্র নিয়ে নিলেন এবং তাতে লিখলেন ঃ এটা আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদের সম্পাদিত চুক্তি।"

তিন ঃ বারা ইবনে আজেবের বরাত দিয়ে জিজিয়া অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে বুখারীর তৃতীয় বর্ণনা। তাতে বলা হয়েছে ঃ

وكان لا يكتب فقال لعلى امح رسول الله فقال على والله امحاه ابدا قال فارينه قال فاراه اياه فمحاه النبى صلى الله عليه وسلم بيده ـ

"হযরত (সা) নিজে লিখতে জানতেন না। তিনি হযরত আলী (রা)-কে বললেন 'রসূলুল্লাহ' শব্দটা কেটে দাও। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমি ওটা কখনো কাটবো না তখন হযরত (সা) বললেন ঃ তাহলে যেখানে শব্দটা লেখা আছে, সে জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দাও। তিনি হযরত (সা)-কে জায়গাটা দেখালেন। তখন হযরত (সা) নিজ হাতে শব্দটা কেটে দিলেন।

চার ঃ বুখারীর চতুর্থ বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে কিতাবুল মাগাজীতে (যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে)। সেটা এই ঃ

فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله ـ

"তখন হযরত (সা) সন্ধিপত্র হাতে নিলেন। অথচ তিনি লিখতে পারতেন না। তিনি লিখলেন ঃ এটা আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদের সম্পাদিত চুক্তি।"

পাঁচ ঃ বারা ইবনে আজেব থেকে মুসলিমের কিতাবুল জিহাদে আরো একটা বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আলী (রা) অস্বীকার করায় হযরত নিজ হাতে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটা কেটে দেন।

ছয় ঃ মুসলিম শরীফের অপর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত আলী (রা)-কে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'রসূলুল্লাহ' শব্দটা কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। হযরত আলী (রা) জায়গাটা দেখালেন। তখন হযরত সেই শব্দটা কেটে

নবুয়াতের উজ্জ্বলতম নিদর্শন* দুনিয়ার যে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনী পর্যালোচনা করে দেখা হোক, তার ব্যক্তিত্ব গঠনে ও তার প্রতিভার বিকাশের যে কার্যকারণ নিহিত থাকে তার পরিবেশেই সে কার্যকারণের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তার ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানগুলো ও তার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সুস্পষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যক্তিত্বে যে বিস্ময়কর গুণাবলী ও যে অসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল, তার কোনো উৎস তাঁর পারিপার্শ্বিকতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। আরবীয় সমাজে তো নয়ই। আশপাশের যেসব দেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক ছিল, তাদের সমাজের কোনো দূরবর্তী পরিবেশেও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলোর সাথে সামান্য মিল আছে—এমন উপাদানের সন্ধান মেলে না। এ বাস্তব সত্যের প্রেক্ষাপটেই উপরোল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যক্তিত্বে একটা নয়। অনেকগুলো উজ্জ্বল নিদর্শনের সমাবেশ ঘটেছে।** অজ্ঞ লোকেরা তাঁর ভেতরে কোনো নিদর্শনের সন্ধান না পেলেও কিছু আসে যায় না। তবে যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা এসব নিদর্শন দেখে বুঝতে পেরেছেন যে, যিনি এ অভূতপূর্ব প্রতিভার অধিকারী, তিনি একজন নবী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।৬৯

দিয়ে সেখানে লিখলেন 'আবদুল্লাহ'র ছেলে। রেওয়ায়াত সমূহের ভাষায় এ তারতম্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মাঝখানের বর্ণনাকারীরা হযরত বারা ইবনে আজেবের বক্তব্য অবিকলভাবে উদ্ধৃত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ জন্যে এসব বর্ণনার কোনো একটার ওপরও নির্ভর করে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে, 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ' শব্দটা হযরত নিজ হাতেই লিখেছিলেন। আসল ঘটনা এমনও হয়ে থাকতে পারে যে, হযরত আলী (রা) যখন 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটা কাটতে অস্বীকার করেন তখন হযরত সেই জাগয়া কোনটা তা হযরত আলী (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে নিজ হাতে কেটে দেন এবং তারপর হযরত আলী (রা) বা অন্য কোনো লেখককে দিয়ে "ইবনে আবদুল্লাহ" লিখিয়ে নিয়েছেন। অন্যান্য রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আলী ও মুহাম্মদ ইবনে মাস্‌লামা (রা) এ দু'জন লেখক সন্ধিপত্র লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। (ফাতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭) সুতরাং একজন লেখক যে কাজ করতে রাজী হননি, সে কাজ অন্য লেখককে দিয়ে করিয়ে নেয়া হয়ে থাকলে সেটা বিচিত্র কিছু নয়।

মুজাহেদের বরাত দিয়ে ইবনে আবি শায়বা ও আমর ইবনে শায়বার উদ্ধৃত অন্য একটি বর্ণনার ভিত্তিতে হযরত রসূলুল্লাহ (সা) লেখাপড়া জানতেন বলে দাবী করা হয়ে থাকে। সেই বর্ণনাটি এই ঃ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرء "হযরত রসূলুল্লাহ (সা) ইন্তেকালের পূর্বে লেখাপড়া শিখে নিয়েছিলেন।" কিন্তু সনদের বিচারে এ বর্ণনা খুবই দুর্বল। হাফেজ ইবনে কাছীর এ বর্ণনাকে ভিত্তিহীন ও দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ হযরত (সা) যদি সত্যিই পরবর্তীকালে লেখাপড়া শিখে থাকতেন তাহলে কথাটা ব্যাপক জানাজানি হত। অনেক ছাহাবী এর বর্ণনা দিতেন, হযরত (সা) কার কার কাছ থেকে লেখাপড়া শিখলেন তাও প্রকাশ পেত। কিন্তু একমাত্র আওন ইবনে আবদুল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ বর্ণনা দেননি। আওনের কাছ থেকে এটা জানতে পারেন মুজাহিদ। আওনও ছাহাবী নন, একজন তাবেয়ী (সাহাবীদের অব্যবহিত উত্তর পুরুষ) এবং তিনিও নিশ্চিয় করে জানাননি যে, কোন্ ছাহাবী বা ছাহাবীদের কাছ থেকে তিনি এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এদিক থেকেও এ বর্ণনায় দুর্বলতা স্পষ্ট। এমন দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে সর্বজনবিদিত বাস্তব ঘটনাকে খণ্ডনকারী কোনো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।৬৭

* "ব্যক্তির কষ্টি পাথরে নবুয়াতে মুহাম্মদী" শীর্ষক নিবন্ধেও এ যুক্তি আলোচিত হয়েছে। তবে সেখানে কুরআনের যুক্তি বিশ্লেষণ না করেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।-(সংকলক)

** এখানে কুরআন সেসব অভিযোগকারীদের জবাব দিচ্ছে, যারা মহানবী (সা)-এর নবুয়াতকে মেনে নিতে পূর্বশর্ত হিসেবে মোজিজা দেখানোর দাবী করত।-(সংকলক)

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ (العنكبوت : ٥٠-٥١)

"তারা বলে থাকে যে, এ ব্যক্তির ওপর তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী নেমে এল না কেন ? তুমি বল ঃ নিদর্শনাবলী কেবল আল্লাহর কাছেই থাকে। আমি কেবল পুংখানুপুংখভাবে সতর্ক করতে এসেছি। আমি যে, তোমার কাছে কিতাব নাযিল করেছি এবং তা পড়ে পড়ে তাদেরকে শোনানো হচ্ছে—এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় ? বস্তুত এতে রয়েছে করুণা এবং মুমিনদের জন্যে উপদেশ।"

–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৫০-৫১)

অর্থাৎ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তোমার ওপর কুরআনের মত একখানা কিতাব নাযিল হওয়াটাই কি একটা বড় মো'জেজা নয় ? এটাই কি তোমার নবুয়াতের ওপর ঈমান আনার জন্যে যথেষ্ট নয় ? এরপরও কি আর কোনো মো'জেযার প্রয়োজন থেকে যায় ? অন্যান্য মো'জেযার ধরণ আলাদা। সেগুলো যারা দেখেছে কেবল তাদের কাছেই তা মো'জেযা। কিন্তু এ মো'জেজা সবসময়ই তোমাদের সামনে থেকে যাচ্ছে। তোমাদেরকে পড়িয়ে শোনানো হচ্ছে এবং হবে। তোমরা সবসময়ই তা দেখতে পার।৭০

নবুয়াত-পূর্ব জীবনকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ط (يونس : ١٦)

"আমি ইতিপূর্বে জীবনের একটা অংশ তোমাদের সাথেই কাটিয়েছি।"

–(সূরা ইউনুছ ঃ ১৬)

কুরাইশ পৌত্তলিকদের ধারণা ছিল যে, কুরআন মুহাম্মদ (সা)-এর একটা মনগড়া রচনা। একে তিনি অহেতুক আল্লাহ প্রদত্ত বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। অপর দিকে মুহাম্মদ (সা)-এর দাবী ছিল এই যে, এটা তাঁর রচনা করা কিতাব নয় বরং আল্লাহর তরফ থেকে অহীযোগে তাঁর কাছে এসেছে। ওপরের আয়াতটা পৌত্তলিকদের ঐ ধারণা খণ্ডনে এবং হযরতের এ দাবীর সমর্থনে একটা শক্তিশালী যুক্তি পেশ করেছে। অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণ না হয় বাদই গেল। কিন্তু হযরত (সা)-এর বাস্তব জীবনটা তো তাদের চোখের সামনেই রয়েছে। নবুয়াতের আগে তিনি পুরো চল্লিশটা বছর তাদের সাথেই কাটিয়েছেন। তাদেরই শহরে জন্মেছেন। কৈশর-যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌছেছেন তাদেরই চোখের সামনে। তাঁর ওঠা-বসা, থাকা-খাওয়া, মেলামেশা, লেন-দেন, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল। তাঁর জীবনের কোনো ব্যাপারই তাদের অজানা বা অগোচর ছিল না। এমন জানাশোনা ও চাক্ষুষ প্রমাণের চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কি হতে পারে! তাঁর এ জীবনে দু'টো জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল এবং প্রত্যেক মক্কাবাসীই তা জানতো।

প্রথমতঃ নবুয়াতের আগের পুরো চল্লিশ বছরের জীবনে তিনি এমন কোনো শিক্ষাদীক্ষা বা সাহচর্য পাননি—যার মধ্যে নবুয়াতের দাবী করার অব্যবহিত পরে তিনি যে বহুমুখী

জ্ঞানের পরিচয় দেন তার কোনো উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। কুরআনের সূরাগুলোতে যেসব বিষয় ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে, কুরআন নাযিলের আগে তাঁকে কখনো সেসব বিষয়ে মাথা ঘামাতে, কথা বলতে ও মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এমনকি চল্লিশ বছরে পদার্পণ করা মাত্রই হঠাৎ তিনি যে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন, তার কোনো আয়োজন বা প্রস্তুতির কোনো চিহ্ন তাঁর চালচলন ও কথাবার্তায় পুরো চল্লিশ বছরের মধ্যেও তাঁর কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু বা ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের চোখে পড়েনি। এ থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন তাঁর মস্তিষ্কের ফসল নয় বরং বাইরে কোথাও তার উৎপত্তি ঘটেছে এবং তা তাঁর ভেতরে আমদানি হয়েছে। কেননা মানুষের মস্তিষ্ক জীবনের কোনো স্তরে গিয়ে হঠাৎ কোনো জিনিস উপস্থাপিত করতে সক্ষম নয়। যে স্তরে গিয়েই কোনো কিছু উপস্থাপিত করুক না কেন, তার পূর্ববর্তী স্তরে তার প্রস্তুতি ও বিকাশ-বৃদ্ধির লক্ষণসমূহ দেখা যাবেই। এ জন্যেই মক্কার কোনো কোনো চতুর লোক বুঝতে পেরেছিল যে, কুরআনের উৎপত্তি হযরত (সা)-এর মস্তিষ্ক থেকে ঘটেছে—এমন কথা বলা একেবারেই বালখিল্যতার শামিল হবে। তাই তারা ভোল পাল্টিয়ে বলতে শুরু করে দিল যে, নেপথ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি অবশ্যই রয়েছে যে মুহাম্মদ (সা)-কে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। কিন্তু এ কথা আগেকার কথার চেয়েও বাজে কথা সাব্যস্ত হল। কেননা মক্কা তো দূরের কথা, সারা আরবে এমন যোগ্যতার অধিকারী মানুষ একজনও ছিল না। যাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলা চলে যে, অমুক এসব বাণী রচনা করেছে বা রচনা করতে সক্ষম। আসলে এমন যোগ্যতা যার থাকে সে কোনো সমাজেই অজানা অচেনা থাকতে পারে না।

হযরত (সা)-এর নবুয়াত পূর্ব জীবনের দ্বিতীয় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যটা এই ছিল যে, মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজী, ঠকামি, হীনতা ও ইতরামির পর্যায়ের কোনো দোষ নামমাত্রও তাঁর চরিত্রে পাওয়া যেত না। গোটা সমাজে এমন কথা বলার মত কেউ ছিল না যে, এ দীর্ঘ চল্লিশ বছরের মেলামেশাকালে তাঁর আচরণে এ জাতীয় কোনো দোষত্রুটি দেখতে পেয়েছে। বরঞ্চ যে ব্যক্তিই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সে তাঁকে একজন পরম সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ, সচ্চরিত্র ও বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবেই দেখেছে। নবুয়াতের মাত্র পাঁচ বছর আগেই কা'বা শরীফ মেরামতকালে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটে। পবিত্র হাজরে আসওয়াদ কালোপাথর সরিয়ে যথাস্থানে কে নিয়ে রাখবে, তাই নিয়ে কুরাইশ বংশের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা এ বলে আপোষ রফা করে যে, কাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপথম হেরেম শরীফে ঢুকবে তাকেই সালিস মানা হবে। পরদিন দেখা গেল হেরেম শরীফে মুহাম্মদ (সা)-ই প্রথম প্রবেশ করেছেন। তাঁকে দেখা মাত্রই হৈ-চৈ করে উঠলো ঃ "এ তো সেই ন্যায়পরায়ণ মানুষটা! আমরা রাজী। এ হলো মুহাম্মদ!" এভাবে নবীর পদে নিয়োগের আগেই আল্লাহ তায়ালা গোটা কুরাইশ বংশের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ন্যায়পরায়ণতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য নিয়ে নেন। এরপর সেই 'আল-আমীন' আর কখনো অন্যায় ও অসত্যের আশ্রয় নিতে পারেন, তা ভাবার অবকাশ কি করে থাকতে পারে? যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনো কোনো সামান্য ব্যাপারেও মিথ্যার আশ্রয় নেননি ধোঁকাবাজি--ফেরেববাজি করেননি, সে হঠাৎ করে নিজের মনগড়া কয়টা কথা মানুষকে শুনিয়ে দিয়ে তাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেয়ার মত এত বড় মিথ্যা এবং এমন ভয়ঙ্কর প্রতারণার আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে দেবে, এটা কি করে সম্ভব?৭১

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ۔

"আর হে মুহাম্মদ! এভাবেই আমি তোমার কাছে আপন নির্দেশে একটা রূহ অহী করে পাঠিয়েছি। তা না হলে কিতাব কি আর ঈমান কাকে বলে, সে সম্পর্কে তুমি কিছুই জানতে না।"−(সূরা আশ্ শূরা ঃ ৫২)

বস্তুত নবুয়াত পাওয়ার আগে কখনো হযরত রসূলুল্লাহ (সা) কল্পনাও করতে পারেননি যে, কোনো একখানা কিতাব তাঁর পাওয়া উচিত বা পাওয়া আসন্ন। এমনকি আসমানী কিতাবসমূহ ও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর আদৌ কিছু জানাই ছিল না। অনুরূপভাবে আল্লাহর ওপর তাঁর ঈমান ছিল সত্য। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, সেই সাথে ফেরেশতা, নবুয়াত, আসমানী কিতাব ও আখেরাত সম্পর্কেও অনেক কিছু বিশ্বাস করতে হয়। মক্কাবাসীর কাছেও তাঁর নবুয়াতের ঘোষণা ছিল একেবারেই আকস্মিক ও অভাবনীয়। সেই আকস্মিক ঘোষণার আগে তাঁর মুখে কেউ কখনো আল্লাহর কিতাব বা অমুক অমুক জিনিসের ওপর ঈমান আনা উচিত বলে কোনো কথা শুনেছে, এমন সাক্ষ্য কেউ দিতে সমর্থ ছিল না। বলা বাহুল্য, কোনো ব্যক্তি যদি আগে থেকে নিজে নিজে নবী সাজার আয়োজন করতে থাকে তবে সে তাঁর নবুয়াত নিয়ে এত উদাসীন হতে পারে না যে, চল্লিশ বছর ধরে যারা তাঁর সাথে দিনরাত মেলামেশা করে তারা তাঁর মুখ থেকে কিতাব ও ঈমান সম্পর্কে একটা কথাও শুনবে না আর ঠিক চল্লিশ বছর পূর্ণ হতেই হঠাৎ ঐসব বিষয়ে সে অনর্গল বক্তৃতা দিতে শুরু করবে।৭২

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝ (القصص : ٨٦)

"তোমার ওপর কিতাব নাযিল করা হবে—এটা তুমি কখনো আশা করতে পারনি। শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই (তা নাযিল হয়েছে) সুতরাং কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।"−(সূরা কাসাস ঃ ৮৬)

মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতের প্রমাণ হিসেবে এ কথা বলা হচ্ছে। হযরত মূসা (আ)-এর ব্যাপারটাই আগে দেখা যাক। তিনি যে নবী হতে যাচ্ছেন এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হতে চলেছেন, তা তিনি ঘুর্ণাক্ষরেও জানতেন না। নবী হওয়ার ইচ্ছা বা আকাংখা তো দূরের কথা, তার সম্ভাবনার ধারণাও তাঁর মনের কোণে কখনোও উঁকি মারেনি। হঠাৎ রাস্তা থেকে ডেকে এনে তাঁকে নবী বানানো হয় এবং তাঁকে দিয়ে এমন বিস্ময়কর কাজ সম্পন্ন করা হয় যার সাথে তাঁর অতীত জীবনের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। অবিকল এটাই ঘটেছিল মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনে। হেরার গুহা থেকে নবুয়াতের ঘোষণা নিয়ে নেমে আসার একদিন আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনধারা কি রকম ছিল, তিনি কি কাজ করতেন এবং কি ধরনের কথাবার্তা বলতেন, কি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং তাঁর তৎপরতা ও প্রবণতা কি ধরনের ছিল, মক্কার লোকেরা তা ভালো করেই জানতো। তাঁর জীবনের ঐ অংশটা পুরোপুরিভাবেই সততা, সত্যবাদিতা বিশ্বস্ততা ও সচ্চরিত্রতার জ্বলন্ত নিদর্শন ছিল সে কথা সত্য। তা ছিল একজন অতিশয় ভদ্র, নিতান্ত শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ, ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষায় অটল, অন্যের অধিকার ও পাওনা দিয়ে দেয়ার

ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান এবং একজন অসাধারণ পরোপকারী ব্যক্তির জীবন। এগুলো তাঁর জীবনের প্রধানতম এবং অসাধারণ গুরুত্ববহ বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ভেতরে এমন কোনো জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না যা দেখে কারও কল্পনায়ও আসতে পারে যে, এ সাধু-সজ্জন লোকটি অতি শীঘ্রই নবুয়াতের দাবী করে বসবেন। তাঁর সাথে যারা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতো, যারা তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাদের মধ্যে কেউ বলতে পারত না যে, তিনি আগে থেকেই নবী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হেরা গুহার সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুহূর্তটার পর পরই আকস্মিকভাবে তিনি যেসব বিষয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছিলেন, সেসব বিষয়ে তাঁর আগে তাঁর মুখ থেকে কেউ একটা শব্দও শোনেনি। কুরআনের আকারে লোকেরা তাঁর কাছ থেকে যে বিশেষ ধরনের ভাষা পরিভাষা ও শব্দ শুনতে আরম্ভ করে তা আগে কেউ তাঁর কাছে শোনেনি। কখনো তিনি কোনো ওয়াজ-নসিহত বা বক্তৃতা করতে দাঁড়াননি। কখনো কোনো আন্দোলন বা দাওয়াত নিয়েও মাঠে নামেননি। তাঁর কোনো তৎপরতা থেকে এমন আভাসও পাওয়া যায়নি যে, তিনি সামাজিক জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান অথবা ধর্মীয় বা নৈতিক সংস্কারের কোনো কর্মসূচী হাতে নেয়ার পরিকল্পনা করছেন। সেই বিপ্লবাত্মক মুহূর্তটার একদিন আগে পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল বৈধ পন্থায় জীবিকা উপার্জনকারী একজন সাদাসিদে ব্যবসায়ীর জীবন—যিনি নিজের সন্তানাদি নিয়ে হাসিখুশীভাবে সময় কাটান, অতিথির যত্ন করেন, গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করেন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচার করেন এবং সময় সময় নিভৃতে গিয়ে ইবাদাত করেন। এমন একজন নিরীহ ভদ্রলোকের সহসা দুনিয়া কাঁপানো এক ঘোষণা দিয়ে জনতার সামনে হাজির হওয়া, এক বিপ্লবাত্মক দাওয়াত দিতে শুরু করা, এক অতুলনীয় সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টি করা এবং সারা দুনিয়ার প্রচলিত মত ও পথ থেকে আলাদা এক অভিনব জীবন দর্শন, চিন্তা-পদ্ধতি এবং এক নতুন নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে উপস্থিত হওয়া নিসন্দেহে একটা অতীব চাঞ্চল্যকর ও অসাধারণ ঘটনা। একজন মানুষের জীবনে এটা এত বড় পরিবর্তন যে, মানবীয় মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে কোনো বানাওট, কোনো পদ্ধতি বা আয়োজন এবং কোনো স্বেচ্ছাভিত্তিক উদ্যোগ বা চেষ্টার ফলে তা কখনো দেখা দিতে পারে না। কারণ এ ধরনের যে কোনো চেষ্টা, উদ্যোগ-আয়োজন বা প্রস্তুতিকে অনিবার্যভাবে ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের স্তরসমূহ অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে হবে। আর সেসব স্তর কখনো কোনো মানুষের সার্বক্ষণিক সঙ্গী-সহচরদের কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে না। হযরত (সা)-এর জীবন যদি এসব স্তর অতিক্রম করে এগুতো তাহলে মক্কায় শত শত লোক বলে উঠতো ঃ আমরা জানতাম লোকটা একদিন কোনো না কোনো চাঞ্চল্যকর দাবী তুলবেই। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, মক্কাবাসী হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে আর যত অভিযোগই করুক—এ অভিযোগটা কেউ কখনো উত্থাপন করেনি।

পক্ষান্তরে হযরত (সা) নিজে যে নবুয়াত লাভে ইচ্ছুক, তার প্রত্যাশী বা তার জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন না, বরং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয়ভাবে হঠাৎ এ ব্যাপারটার সম্মুখীন হন, অহীর সূচনাকালীন অবস্থার বিবরণ সম্বলিত হাদীসগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জিবরাঈল (আ)-এর সাথে প্রথম দেখা হওয়া এবং সূরা আলাকের প্রথম ক'টা আয়াত নাযিলের মাধ্যমে নবুয়াতের উদ্বোধন সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত (সা) হেরা গুহা থেকে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী উপস্থিত হন। অতপর পরিবার-পরিজনকে বলেন ঃ "আমাকে ঢেকে দাও। আমাকে ঢেকে দাও।" কিছুক্ষণ পর যখন ভয় পাওয়ার অবস্থা একটু কেটে

গেল, তখন তাঁর জীবনসঙ্গিনী খাদিজা (রা)-কে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বললেন ঃ "আমার আশংকা হচ্ছে যে, মরে যাবো।" খাদিজা (রা) তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ "কখনো নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনো কষ্টে ফেলবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করে থাকেন, অসহায় ও কপর্দকহীনকে সাহায্য করেন, অতিথির সমাদর করেন এবং প্রত্যেক ভালো কাজে সহযোগিতা করার জন্যে প্রস্তুত থাকেন। তারপর তিনি হযরত (সা)-কে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা ছিলেন খাদিজা (রা)-এর চাচাতো ভাই এবং আহলে কিতাবের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি হযরত (সা)-এর কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে নির্বিকারভাবে বলেন ঃ "ইনি সেই বিশিষ্ট ফেরেশতা, যিনি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসতেন। হায়! আমি যদি আজ যুবক হতাম এবং সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম যখন আপনার জাতি আপনাকে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করে দেবে।" হযরত (সা) বললেন ঃ "বলেন কি ? এরা আমাকে এখান থেকে বের করে দেবে নাকি ?" ওয়ারাকা জবাব দেন ঃ "হ্যাঁ, আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন, অতীতে তা নিয়ে যখনই কেউ এসেছে, অমনি দেশবাসী তার শত্রু হয়ে গেছে।"

একজন সাদাসিদে মানুষ যখন অপ্রত্যাশিতভাবে এক অত্যন্ত অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ঘটনার সম্মুখীন হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তার যে ভাবান্তর ঘটতে পারে, এ ঘটনাটার মধ্যে তার একটা নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর যদি আগে থেকেই নবী হওয়ার মতলব থাকতো নিজের সম্পর্কে যদি ভাবতেন যে, তাঁর মত মানুষের নবী হওয়া উচিত, আর সেই নবুয়াতের অপেক্ষায় নিভৃত ধ্যানে মগ্ন হয়ে এ ভাবনায় অস্থির থাকতেন যে, কখন ফেরেশতা আসবে এবং তাঁর কাছে বার্তা বয়ে আনবে, তাহলে হেরা গুহার ঘটনাটা ঘটতেই তিনি খুশীতে লাফিয়ে উঠতেন, আনন্দ ও গর্বে উৎফুল্ল হয়ে পাহাড় থেকে নেমে সোজা জনগণের কাছে পৌঁছে যেতেন এবং বড় গলায় নিজের নবুয়াতের কথা ঘোষণা করে দিতেন। কিন্তু কোথায় সেই খুশী আর কোথায় সেই বড় গলা! তিনি সেখানে যা দেখলেন তাতে বরং হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে উপস্থিত হলেন অতপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। মন একটু শান্ত হলে স্ত্রীকে কানে কানে সব কথা বললেন। তিনি জানালেন, 'আজ হেরা গুহায় নির্জনে আমি এ দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম। জানি না আমার কি হবে। আমার জীবন বিপন্ন মনে হচ্ছে।" নবুয়াতের একজন উমেদারের যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা, এটা যে তা থেকে কতখানি ভিন্ন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্বামীর জীবন, তাঁর স্বভাব ও চিন্তাধারা সম্পর্কে স্ত্রীর চেয়ে বেশী কেউ জানতে পারে না। তাঁর যদি আগে থেকে জানা থাকতো যে, স্বামী নবুয়াতের অভিলাষী এবং কখন ফেরেশতা আসবে, তার অপেক্ষায় সর্বদা প্রহর গুণছেন, তাহলে হযরত খাদিজা (রা) এ ধরনের জবাব দিতেন না। দিতেন অন্য রকম। তিনি বলতেন, ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন ? এতদিন ধরে যে জিনিসের সাধ ছিল তা হাতে পেয়েছেন। এখন যান, পীর-মুরিদীর ব্যবসা জুড়ে দিন। নজরনেয়াজ যা আসবে, তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রস্তুতি আমি নিচ্ছি। কিন্তু পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে হযরত (সা)-এর জীবনের যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এমন সৎ ও নিঃস্বার্থ মানুষের কাছে আর যেই আসুক, শয়তান আসতে পারে না কিংবা আল্লাহ তাঁকে কোনো কঠিন মুসিবতেও ফেলতে পারেন না। বস্তুত তিনি যা দেখেছেন.তা সম্পূর্ণ সত্য।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের অবস্থাও ছিল সেই রকম। তিনি তাঁদের পর ছিলেন না। হযরত (সা)-এর জ্ঞাতি এবং খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় শ্যালক ছিলেন। একজন খৃষ্টান পণ্ডিত হিসেবে নবুয়াত, কিতাব ও অহী কাকে বলে তা তিনি জানতেন এবং কৃত্রিম ও মনগড়া জিনিস থেকে আসল জিনিস বেছে বের করার ক্ষমতা রাখতেন। বয়সে হযরত (সা)-এর চেয়ে কয়েক বছরের বড় হওয়ায় শৈশব থেকে তাঁর পুরো জীবনটা তিনি দেখেছিলেন। তিনিও তাঁর মুখে হেরার ঘটনা শুনে তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন ঃ এই আগন্তুক নিশ্চয়ই সেই ফেরেশতা যিনি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে অহী নিয়ে আসতেন। কেননা এখানেও হযরত মূসা (আ)-এর মত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। সম্পূর্ণ নিখুঁত ও নিষ্কলুষ চরিত্রের একজন সাদাসিদে মানুষ। সর্বতোভাবে স্বচ্ছ ও মুক্ত মন তাঁর। তাঁর মধ্যে নবুয়াতের অভিলাষ থাকা তো দূরের কথা নবুয়াত লাভের কল্পনাও তিনি কখনো করেননি। সহসা তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ও সচেতন অবস্থায় প্রকাশ্যে এ অভূতপূর্ব ঘটনার সম্মুখীন হন। এ জন্যেই ওয়ারাকা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হন যে, এখানে প্রবৃত্তির কোনো প্রবঞ্চনা বা শয়তানের কোনো প্রতারণার হাত নেই। বরং চির চেনা এ সৎ সত্যবাদী মানুষটা নিজের ইচ্ছা বা অভিলাষমুক্ত অবস্থায় যা দেখেছে তা ঠিকই দেখেছে, প্রকৃত সত্যের দর্শনই সে লাভ করেছে। ওয়ারাকার এ সিদ্ধান্ত ছিল গাণিতিক হিসেবের মতই নির্ভুল ও অকাট্য।

বস্তুত নবুয়াত পূর্ব জীবনের সর্বাত্মক সততা, সত্যবাদিতা ও নিরেট নিরক্ষরতার প্রেক্ষাপটে এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে অহী নাযিল হওয়া নবুয়াতের সত্যতার এমন এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ, যাকে অস্বীকার করা যে কোনো বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কুরআনে একাধিক স্থানে একে নবুয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুসে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰكُمْ بِهٖ زِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ
قَبْلِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ০(يونس : ١٦)

"হে নবী! তুমি বল ঃ আল্লাহর ইচ্ছা না হলে আমি তোমাদেরকে কখনো এ কুরআন পড়ে শোনাতে পারতাম না এবং এর খবরও তোমাদেরকে দিতে পারতাম না। জীবনের একটা (উল্লেখযোগ্য) অংশ তো আমি তোমাদের ভেতরেই কাটিয়েছি। এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝতে পার না?"–(আয়াত ঃ ১৬)

সূরা আশ শূরায় আল্লাহ বলেন ঃ

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِنَا ط (الشورى : ٥٢)

"হে নবী! তুমি আদৌ জানতে না কিতাব কি জিনিস আর ঈমান কাকে বলে। তবে এই অহীকে আমি একটা জ্যোতিতে পরিণত করেছি। এ জ্যোতি দিয়ে আমি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী সঠিক পথের সন্ধান দেই।"–(আয়াত ঃ ৫২)

তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুছ, টীকা-২১, আনকাবুত টীকা-৮৮-৯২, শূরা টীকা-৮৪তে এ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।৭৩

রসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র নিষ্কলুষ জীবন, সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের ওপর তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার বিস্ময়কর প্রভাব এবং কুরআনের উচ্চাঙ্গ আলোচ্য বিষয়সমূহ—এসব অত্যন্ত উজ্জ্বল নিদর্শন। যে ব্যক্তি নবীদের জীবনবৃত্তান্ত এবং আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তাঁর পক্ষে এসব নিদর্শন দেখার পর হযরত (সা)-এর নবুয়াতে সন্দেহ পোষণ করা অত্যন্ত কঠিন।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ○ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ○ (البينة : ٢-٣)

"(তিনি) আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত এমন এক দূত, যিনি পবিত্র গ্রন্থসমূহ পড়ে শুনান। সেসব গ্রন্থে রয়েছে সত্য ও সঠিক রচনাবলী।"–(সূরা আল বাইয়েনা ঃ ২-৩)

এখানে রসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তি সত্তাকে একটা উজ্জ্বল প্রমাণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা তাঁর নবুয়াতের পূর্বাপর জীবন, নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের মত গ্রন্থ উপস্থাপন, তাঁর শিক্ষা ও সাহচর্যের প্রভাবে মুমিনদের জীবনে অস্বাভাবিক বিপ্লব দেখা দেয়া, সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত আকীদা-বিশ্বাস, অত্যন্ত নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ইবাদাত, উৎকৃষ্টতম নির্মল চরিত্র এবং মানবজীবনের জন্যে সর্বোত্তম নীতিমালা ও বিধান শিক্ষা দান। হযরত (সা)-এর কথা ও কাজে পরিপূর্ণ সংগতি ও সামঞ্জস্য এবং সব রকমের বিরোধিতা ও বাধাবিপত্তির মোকাবিলায় অটুট মনোবল ও অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে নিজের দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখা—এসব অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর আল্লাহর রসূল হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন।৭৪

কুরআন একটা অলৌকিক রচনা এবং নবুয়াতের প্রমাণ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ج بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ـ (السجدة : ٢-٣)

"নিসন্দেহে বিশ্ব প্রতিপালকের কাছ থেকেই এ কিতাব নাযিল হয়েছে। তারা কি বলে যে, এটা ঐ ব্যক্তির মনগড়া জিনিস? না। বরং এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা পরম সত্য।"–(সূরা আস-সাজদাহ ঃ ২-৩)

এখানে শুধু এ কথা বলা হয়নি যে, এ কিতাব বিশ্ব প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আরো জোর দিয়ে সেই সাথে বলা হয়েছে, নিসন্দেহে এটা আল্লাহর কিতাব। এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এ নিশ্চয়তাসূচক বাক্যটাকে কুরআন অবতারণের বাস্তব প্রেক্ষাপটে এবং স্বয়ং কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার আলোকে যদি পড়ে দেখা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, এতে একই সাথে একটা দাবী উত্থাপন এবং তার প্রমাণ দেখানো হয়েছে। যে মক্কাবাসীর সামনে এ দাবী উত্থাপন করা হয়েছে, তাদের কাছে এ প্রমাণ অজানা ছিল না। যিনি এ কিতাব পড়ে শোনালেন তার গোটা জীবন কিভাবে পড়ে শোনানোর আগের ও পরের জীবন দু'টোই তাদের জানা। এ কিতাবের যে ভাষা ও বাচনভঙ্গী তার সাথে মুহাম্মদ (সা)-এর নিজের ভাষা ও বাচনভঙ্গীর সুস্পষ্ট পার্থক্য তারা দেখতে পেত। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারত যে,

একই ব্যক্তির দুই রকম বাচনভঙ্গী এত ব্যবধানসহ হতে পারে না। তারা এ কিতাবের পরম অলৌকিক সাহিত্য-সন্দৌর্য লক্ষ্য করছিল। এবং আরবের সমস্ত কবি সাহিত্যিক যে এর সমকক্ষ সাহিত্য সৃষ্টি করতে অক্ষম, তা একই ভাষাভাষী হওয়ার কারণে তারা দিব্য চোখেই দেখতে পাচ্ছিল।* আরবের কবি-সাহিত্যিক, বক্তা ও ধর্মযাজকদের ভাষা এবং কুরআনের ভাষার মধ্যে যে কত বড় পার্থক্য এবং কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তু যে কত উচ্চমানের তাও তাদের অজানা ছিল না। একজন মিথ্যাদাবীদারের সাহিত্যে ও কাজে যে স্বার্থপরতা নিহিত থাকে, কুরআনের সাহিত্য ও তার বাহকের দাওয়াতে সে স্বার্থ পরতার নামগন্ধও তারা দেখতে পায়নি। অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েও তাঁরা খুঁজে বের করতে সমর্থ ছিল না নবুয়াতের দাবী করে হযরত (সা) নিজের, নিজ পরিবারের, গোত্রের বা জাতির কোন স্বার্থ উদ্ধার বা কি ফায়দা হাসিল করতে চাচ্ছিলেন। আর হযরত (সা)-এর সে দাওয়াতের দিকে জাতির মধ্য থেকে কি ধরনের লোকেরা আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তাদের জীবনে কত বড় বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে,তা তারা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছিল। এসব কিছুই ছিল নবুয়াতের দাবীর স্বপক্ষে একটা অকাট্য প্রমাণ। এ পটভূমিতে শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট ছিল যে, এ কিতাব রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই যে নাযিল হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।৭৫

---

* কুরআনকে উপস্থাপন করাই হয়েছে এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে ঃ فَاتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ "পার তো এর সমকক্ষ একটা সূরা নিয়ে এস।" এ চ্যালেঞ্জ কুরআনের অলৌকিকত্বকে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে অক্ষম প্রতিপক্ষ নীরবে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, এ সাহিত্য মানব রচিত নয়। কুরআনের এই অলৌকিকত্বকে আল্লাহ হযরত (সা)-এর নবুয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

–(সংকলক বৃন্দ)

বিশ্বনবী সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত ঈসা (আ)-এর গুরুত্বপূর্ণ উক্তি

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ -(الصف : ٦)

"মরিয়মের ছেলে ঈসার কথাটা মনে কর। তিনি বলেছিলেন ঃ হে ইসরাঈলের বংশধর! আমি তোমাদের কাছে রসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার আগে যে তাওরাত এসে রয়েছে, আমি তার সত্যতা ঘোষণা করতে এসেছি।"-(সূরা আছ্-ছাফ্ ঃ ৬)

এ কথাটার তিন রকম ব্যাখ্যা হতে পারে এবং তিনটি ব্যাখ্যাই সঠিক। প্রথম ব্যাখ্যা এই যে, আমি কোনো আলাদা ও অভিনব ধর্ম নিয়ে আসিনি। হযরত মূসা (আ) যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন আমিও সেটাই নিয়ে এসেছি। আমি তাওরাতকে খণ্ডন করতে আসিনি বরং তাকে সমর্থন ও তার সত্যতা ঘোষণা করছি। আল্লাহর প্রত্যেক রসূলেরই চিরন্তন রীতি পূর্ববর্তী রসূলের সমর্থন করা ও তার সত্যতা ঘোষণা করা। আমিও সেই রীতি মেনে চলছি। সুতরাং আমার রসূল হওয়াকে স্বীকার করে নিতে তোমাদের ইতস্তত করার কোনো কারণ নেই।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, তাওরাতে আমার রসূল হয়ে আসা সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে আমার রিসালাত দ্বারা তা সত্যায়িত বা পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং আমার বিরেধিতা করার পরিবর্তে তোমাদের বরং এ বলে আমাকে স্বাগত জানানো উচিত যে, আগেকার নবীরা যে নবীর আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন সে নবী এসে গেছে।

কুরআনের আলোচ্য কথাটাকে এর পরবর্তী কথার সাথে মিলিয়ে পড়লে এর তৃতীয় যে ব্যাখ্যা দাঁড়ায় তা হলো এই যে, আমি আল্লাহর রসূল আহ্মদ (সা)-এর শুভাগমন সম্পর্কে তাওরাতের দেয়া ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে ঘোষণা করছি এবং নিজেও তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করছি। হযরত মূসা (আ) স্বজাতিকে সম্বোধন করে বিশ্বনবীর আবির্ভাব সম্পর্কে যে আগাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন, এ তৃতীয় ব্যাখ্যার আলোকে হযরত ঈসা (আ)-এর এ উক্তি সেই সুসংবাদেরই সমর্থন ও সত্যায়নের শামিল হয়ে দাঁড়ায়।

তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী

জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সেই ভাষণে হযরত মূসা (আ) বলেন ঃ "তোমার প্রভু তোমার জন্যে তোমারই মধ্য থেকে অর্থাৎ তোমারই ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত একজন নবীর আবির্ভাব ঘটাবেন। তোমরা তাঁর কথা শুন। 'হাওরেবে' থাকাকালে সম্মেলনের দিন তুমি তোমার প্রভুর কাছে যে, আবেদন জানিয়েছিলে, সে অনুসারেই এ আবির্ভাব ঘটবে। তুমি বলেছিলে ঃ আমার প্রভুর সম্বোধন যেন আমাকে আর শুনতে না হয় আর এমন ভয়াবহ আগুনও দেখতে না হয় যার দরুন আমার মরারও ফুরসত হয় না। প্রভু আমাকে বলেছেন, ওরা যা বলে ঠিকই বলে। আমি তাদের জন্যে তাদের ভাইদের মধ্যে থেকেই একজন নবী পাঠাবো, আমার কথাই তাঁর মুখ দিয়ে প্রচারিত করবো এবং আমি যা বলতে

বলবো সে শুধু তাই বলবে। সে আমার নাম নিয়ে আমার যে কথাগুলো বলবে তা যে, শুনবে না আমি তার কাছ থেকে তার হিসেব নেব।"–(ব্যতিক্রম পস্তুক, অধ্যায় ১৮, আয়াত ১৫-১৯)

এটা তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। মুহাম্মদ (সা) ছাড়া আর কারও বেলায় এটা খাটে না। এতে হযরত মূসা (আ) তাঁর জাতিকে আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি জানিয়ে দিচ্ছেন যে, "আমি তোমার জন্যে তোমার ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবী পাঠাবো। এটা জানা কথা যে, একটা জাতির 'ভাইয়েরা' বলতে সে জাতিরই কোনো পরিবার বা গোত্র বুঝায় না। জাতির ভাই বলতে সেই জাতির সমবংশীর অন্য একটা জাতিকে বুঝায়। এ কথার মর্ম যদি এ হতো যে, বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেই কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটবে তাহলে বলা হত 'আমি তোমাদের জন্যে স্বয়ং তোমাদের মধ্য হতেই একজন নবী পাঠাবো।" সুতারাং বনী ইসরাঈলের ভাই অর্থ অনিবার্যভাবে বনী ইসমাঈলই হতে পারে। কেননা সেটা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বশংধর হওয়ার কারণে বনী ইসরাঈলের সমবংশীয়। তাছাড়া এ ভবিষ্যদ্বাণী বনী ইসরাঈলের কোনো নবীর ওপর যে প্রযোজ্য হতে পারে না তার আরো একটা কারণ রয়েছে। সেটা এই যে, হযরত মূসা (আ)-এর পর বনী ইসরাঈলে একজন নবী আসেননি, বহুসংখ্যক নবী এসেছেন। সারা বাইবেলে সেই নবীদের বিবরণ রয়েছে।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়। যে নবী আসবেন তিনি হযরত মূসা (আ)-এর মতোই নবী হবেন। বলাবাহুল্য, এর অর্থ আকার-আকৃতি বা জীবনেতিহাসের সাদৃশ্য নয়। কেননা এদিক দিয়ে কোনো ব্যক্তিই অন্য ব্যক্তির মতো হয় না। শুধু মাত্র নবী হওয়ার দিক দিয়ে সাদৃশ্য এ দ্বারা বুঝায় না। কেননা হযরত মূসা (আ)-এর পরে যত নবী এসেছেন, তাদের সাথে এদিক দিয়ে সাদৃশ্য ছিল। তাই হযরত মূসা (আ)-এর মত হওয়ার বৈশিষ্ট্যের দাবীদার কোনো বিশেষ একজন নবী হতে পারেন না। সাদৃশ্যের এ দু'টো দিক সম্পর্কে নেতিবাচক সিদ্ধান্তের পর সাদৃশ্যের যে দিকটা অবশিষ্ট থাকে এবং যা পরবর্তী নবীর বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য, সেটা হলো, শুধু পৃথক শরীয়াত তথা পৃথক আইন ব্যবস্থা। যে নবী আসবেন তিনি হযরত মূসা (আ)-এর মত আলাদা আইন ব্যবস্থা নিয়ে আসবেন—এটাই তার ভবিষ্যদ্বাণীর মর্মকথা। মুহাম্মদ (সা) ছাড়া আর কেউ এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন। কেননা তার আগে বনী ইসরাঈলে যত নবী এসেছেন তারা হযরত মূসা (আ)-এর আনীত আইন ব্যবস্থারই অনুসারী ছিলেন। আলাদা আইন ব্যবস্থা নিয়ে কেউ আসেননি।

তাওরাতের উক্তির এ ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা পরবর্তী উক্তি থেকে আরো বেশী করে প্রতিপন্ন হয়। "হাওরেবে থাকাকালে সম্মেলনের দিন তুমি তোমার প্রভুর কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলে সে অনুসারেইঐ নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তুমি বলেছিলে ঃ আমার প্রভুর সম্বোধন যেন আমাকে আর শুনতে না হয় আর এমন ভয়াবহ আগুনও আর দেখতে না হয় —যার দরুন আমার মরারও ফুরসত হয় না। প্রভূ আমাকে বলেছেন ঃ ওরা যা বলে ঠিকই বলে। আমি তাদের জন্যে তাদের ভাইদের মধ্য থেকেই একজন নবী পাঠাবো। আমার কথাই তার মুখ দিয়ে প্রচারিত করবো। আমি যা বলতে বলবো সে শুধু তাই বলবে।" হযরত মূসা (আ)-কে সর্বপ্রথম শীরয়াতের বিধান দেয়া হয় যে পাহাড়ের পাদদেশে হাওরেব বলতে তাকেই বুঝানো হয়েছে। আর বনী ইসরাঈলের যে আবেদনের কথা এখানে বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য এই যে, ভবিষ্যতে যদি আমাদেরকে কোনো শরীয়াত তথা আইন ব্যবস্থা দেয়া হয় তাহলে সেই ভয়ংকর অবস্থায় যেন দেয়া না হয় যে অবস্থার

বিবরণ কুরআনেও আছে, বাইবেলেও আছে। (দেখুন সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৬৩; সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৫৫-১৭১ ; বাইবেল নির্গমন পুস্তক ১৯ ঃ ১৭-১৮)-এর জবাবে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে জানান যে, আল্লাহ্ তোমাদের এ আবেদন ম ুর করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি তাদের জন্যে এমন নবী পাঠাবো যার মুখ দিয়ে আমার কথা প্রচার করবো। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আইন ব্যবস্থা দেয়ার সময় হাওরেব পাহাড়ের উপত্যকায় যে ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা আর হবে না। বরং এখন যে নবীকে এ দায়িত্ব দেয়া হবে তাকেই শুধু আল্লাহর বাণী কণ্ঠস্থ করিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি তা মানুষকে শুনিয়ে দেবেন। এ সুস্পষ্ট ঘোষণাটা একটু তলিয়ে দেখলে নিসন্দেহে বলা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই এ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব লক্ষ্য। হযরত মূসার পর স্বতন্ত্র শরীয়াতের অধিকারী কেবল তিনিই হয়েছিলেন। হাওরেব পাহাড়ের পাদদেশে শরীয়াত প্রদানের সময় বনী ইসরাঈলীদের যে বড় গণ-জমায়েত হয়েছিল, মুহাম্মদ (সা)-কে শরীয়াত প্রদান করার সময় তেমন কোনো সম্মেলন হয়নি। আর সেখানে যে ধরনের অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, শরীয়াতের নির্দেশ জারী করার সময় তেমন অবস্থা আর কখনো হয়নি।[৭৬]

ইঞ্জিলে নবুয়াতে মুহাম্মদীর সুসংবাদ

হযরত ঈসা (আ) নবুয়াতে মুহাম্মদীর যে সুসংবাদ দেন কুরআনে তার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَ ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ط فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ-(الصف : ٦)

"মরিয়মের ছেলে ঈসার সেই কথাটা মনে কর। তিনি বলেছিলেন ঃ হে ইসরাঈলের বংশধর! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল হয়ে এসেছি। আমি সেই তাওরাতের সত্যতা স্বীকারকারী যা আগে থেকেই এসে রয়েছে। আর আমার পরে আহমদ নামক যে রসূল আসবেন তার সুসংবাদ দিতে এসেছি।"-(সূরা আছ্ ছাফ্ ঃ ৬)

এটা কুরআনের একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এ আয়াত নিয়ে ইসলাম বিরোধীরা অনেক বাকবিতণ্ডা করেছে। আবার অপরাধমূলক অপব্যাখ্যার চেষ্টাও করেছে। কেননা এতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন।* এ জন্যে এ বিষয়টা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

---

* এ ছাড়াও সামগ্রিকভাবে বাইবেলের নানা জায়গায় হযরত (সা)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে এক কথায় বলা হয়েছে ঃ

يجدونه تكتوا عند هم فى التوراة والانجيل

"আহলে কিতাব তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাঁর কথা লিখিত দেখতে পায়।"-(সূরা আরাফ ঃ ১৪৭)
উদাহরণ স্বরূপ তাওরাত ও ইঞ্জিলের নিম্নলিখিত স্থানগুলোতে মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে সুস্পষ্ট পুর্বাভাস লক্ষ্যণীয়। ব্যতিক্রম পুস্তক, অধ্যায় ১৮, আয়াত ১৫-১৯ ; মথি পুস্তক, অধ্যায় ২১, আয়াত ৩৩-৪৬ ; যোহন পুস্তক, অধ্যায় ১, আয়াত ১০-২১ ; যোহন পুস্তক, অধ্যায় ১৪, আয়াত, ১৫-১৭, ২৫-৩০ ; যোহন, অধ্যায় ১৫, আয়াত ২৫, ২৬ ; যোহন অধ্যায় ১৬, আয়াত ৭-১৫।৭৭-গ্রন্থকার ও সংকলক বৃন্দ।

এক ঃ "মুহাম্মদ"ও "আহমদ"ঃ এ আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম আহমদ উল্লেখ করা হয়েছে। আহমদের দুই অর্থ ঃ সর্বাধিক প্রশংসাকারী ও সর্বাধিক প্রশংসিত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক প্রশংসনীয়। বিশুদ্ধ হাদীস থেকে জানা যায় যে, এটাও হযরত (সা)-এর অন্যতম নাম ছিল। মুসলিম ও আবু দাউদ তিয়ালিসীর হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত (সা) বলেছেন ঃ انا محمد وانا احمد والحاشر ...... "আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ এবং আমি হাশের (সমবেতকারী) এ মর্মে হযরত জোবাইর ইবনে মোতয়েমের সূত্রে বর্ণিত একাধিক হাদীস ইমাম মালেক, বুখারী, মুসলিম, দারামী 'তিরমিজী' নাসায়ী নিজ নিজ হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত (সা)-এর এ নাম সাহাবীদের মধ্যেও প্রচলিত ও জানা ছিল। হাস্‌সান বিন সাবিতের কবিতার একটি চরণ নিম্নরূপ ঃ

صلى الا له ومن يحف يعرشه ـ والطيبون على المبارك احمد ـ

"কল্যাণময় আহমদের ওপর আল্লাহ, তার আরশের চারপাশে ভীড় করে থাকা ফেরেশতারা এবং পবিত্র ব্যক্তিগণ দরূদ পাঠিয়েছেন।" ইতিহাস থেকেও জানা যায়, হযরত মুহাম্মদ (সা) শুধু এ নামেই পরিচিত ছিলেন না বরং তাঁর আহমদ নামও সকলের জানা ছিল। আরব জাতির সমগ্র সাহিত্য ভাণ্ডারে হযরত (সা)-এর আগে আর কেউ আহমদ নামে পরিচিত ছিল বলে জানা যায় না। আর হযরত (সা)-এর পরে অসংখ্য লোকের নাম আহমদ ও গোলাম আহমদ রাখা হয়েছে। নবুয়াত যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র উম্মতের কাছে যে এ নামটা সুপরিচিত ও সুবিদিত রয়েছে, সেটাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ নাম যদি হযরত (সা)-এর না হতো তাহলে যারা নিজেদের ছেলেদের নাম গোলাম আহমদ রেখেছে, তারা সেই ছেলেদেরকে কোন্ আহমদের গোলাম বলে মনে করেন ?

দুই ঃ হযরত মসিহ, হযরত ইলিয়াস (আ) এবং "সেই নবী"ঃ যোহনের (ইউহান্না) ইঞ্জিল সাক্ষী যে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের সময় বনী ইসরাঈল তিন ব্যক্তির প্রতিক্ষায় ছিল। তাঁরা হলেন, মসিহ, ইলিয়াহ [অর্থ্যাৎ হযরত ইলিয়াস (আ)-এর পুনরাবির্ভাব] এবং 'সেই নবী'।

"এবং ইউহান্না [হযরত ইয়াহিয়া (আ)] সাক্ষ্য দেন যে, ইহুদীরা যখন জেরুজালেম থেকে তার কাছে যাজকদের পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কে, তখন তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না। তিনি স্বীকার করলেন যে, আমি মসিহ্ নই। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে তুমি কে ? তুমি কি ইলিয়াহ ? তিনি বলেন, না। তবে কি তুমি 'সেই নবী' ? তিনি জবাব দিলেন, না। তখন তারা বললো, তাহলে তুমি কে ? তিনি বললেন, আমি মরুভূমিতে একজন আহ্বায়কের এ আহ্বান যে, তুমি আল্লাহর পথ সুগম কর। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, তুমি যদি মসিহ না হয়ে থাক, ইলিয়াহও না হয়ে থাক এবং সেই নবীও না হয়ে থাক তবে তুমি নবুয়াত দাবী কর কেন ?–(১ ঃ ১৯-২৫)

এ কথাগুলো থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝা যায় যে, হযরত মসীহ (আ) (ঈসা) এবং হযরত ইলিয়াস (আ) ছাড়াও বনী ইসরাঈল আরো একজন নবীর অপেক্ষায় ছিল এবং সে নবী হযরত ইয়াহিয়া (আ) নন। সেই নবী যে আসবেন এ বিশ্বাস বনী ইসরাঈলের মধ্যে এত

প্রচলিত ছিল যে, শুধু 'সেই নবী 'বললেই সবাই বুঝে নিত। "যার আগাম খবর তাওরাতে দেয়া হয়েছে" এ কথা না বললেও চলতো। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যে নবী সম্পর্কে তারা ইশারা-ইঙ্গিত করছিল তার আগমন অকাট্যভাবে প্রমাণিত ছিল। কেননা হযরত ইয়াহিয়া (আ)-কে যখন এসব প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি এ কথা বলেননি যে, আর তো কোনো নবীই আসবেন না। তোমরা কোন্ নবীর কথা জিজ্ঞাসা করছ ?

তিন ঃ যোহনের ইঞ্জিলের বক্তব্য ঃ এবার যোহনের (ইউহান্না বা ইয়াহিয়া) ইঞ্জিলে ১৪শ' অধ্যায় থেকে ১৬শ' অধ্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো দেখুন ঃ

"এবং আমি পিতার কাছে আবেদন করবো যেন তোমাদের জন্যে আর একজন সাহায্যকারী পাঠান যিনি তোমাদের সাথে অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন, অর্থাৎ সত্যের আত্মা, যাঁকে দুনিয়াবাসী অর্জন করতে পারে না। কেননা তারা তাকে দেখতেও পায় না চিনেও না তোমরা তাঁকে চিন। কেননা তিনি তোমাদের সঙ্গেই থাকেন এবং তোমাদের মধ্যেই আছেন।"-(১৪ঃ ১৬-১৭)

"আমি এ কথাগুলো তোমাদের সাথে থেকেই তোমাদেরকে বলেছি। কিন্তু সাহায্যকারী অর্থাৎ মহিমান্বিত আত্মা যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন তিনি তোমাদেরকে সব কথা শিখাবেন। আর আমি যা কিছু তোমাদেরকে বলেছি তিনি সেসব তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবেন।"-(১৪ঃ ২৫-২৬)

"এরপর আমি তোমাদেরকে বেশী কথা বলবো না। কেননা দুনিয়ার নেতা আসছেন। আমার মধ্যে তাঁর কোনো কিছুই নেই।"-(১৪ ঃ ৩০)

"কিন্তু যখন সেই সাহায্যকারী আসবেন যাঁকে আমি পিতার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাবো অর্থাৎ সত্যের আত্মা—যা পিতার কাছ থেকে প্রকাশিত হয়—তখন তিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।"-(১৫ ঃ ২৬)

"কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি যে, আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্যে কল্যাণকর কেননা আমি যদি না যাই তবে সেই সাহায্যকারী আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।"-(১৬ ঃ ৭)

"তোমাদেরকে আমার আরো অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু তখন তোমরা তা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু যখন তিনি অর্থাৎ সত্যের আত্মা আসবেন তখন তোমাদেরকে সমস্ত সত্যের পথ দেখাবেন। কেননা তিনি মনগড়া কথা বলবেন না। কেবল যা শুনবেন তাই বলবেন এবং তোমাদেরকে ভবিষ্যতের খবর জানাবেন। তিনি আমার পরাক্রম প্রকাশ করবেন। কেননা আমার কাছ থেকে পেয়েই তিনি তোমাদেরকে খবর জানাবেন। পিতার যা কিছু রয়েছে তা সবই আমার। এ জন্যেই আমি বললাম যে তিনি আমার কাছ থেকে জানবেন এবং তোমাদেরকে খবর জানাবেন।"-(১৬ ঃ ১২-১৫)

চার ঃ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী গুলোর তাৎপর্য ঃ উপরোক্ত কথাগুলোর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে জানা দরকার যে, হযরত ঈসা (আ) ও তার সমসাময়িক ফিলিস্তিনবাসী আরামী ভাষার আঞ্চলিক রূপ সুরিয়ানীতে কথা বলতেন। হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের দুই-আড়াইশো বছর আগেই সেলুকী রাজবংশের শাসনকালে ঐ অঞ্চল

থেকে ইবরানী ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার জায়গায় সুরিয়ানী ভাষা চালু হয়। এ কথা সত্য যে, সেলুকী ও তার পরবর্তী রোম সম্রাটদের শাসনের প্রভাবে এ এলাকায় গ্রীস ভাষারও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কিন্তু সেটা একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যারা সরকারী প্রশাসনে বিভিন্ন পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হতে চায় এবং সে জন্যে অতিমাত্রায় গ্রীসঘেষা হয়ে গেছে, কেবল তারাই গ্রীসভাষা চর্চা করতো। ফিলিস্তিনের সাধারণ লোকেরা সুরিয়ানীর একটা বিশেষ আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ব্যবহার করতো। সে ভাষা আজকাল দামেস্ক অঞ্চলে প্রচলিত সুরিয়ানী থেকে ভিন্ন রকমের ছিল। ফিলিস্তিনবাসী গ্রীস ভাষা সম্পর্কে এত অজ্ঞ ছিল যে, ৭০ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেম দখল করার পর রোমক সেনাপতি তাইতুস যখন জেরুজালেমবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন তখন সুরিয়ানী ভাষায় তার অনুবাদ করতে হয়েছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ) তার শিষ্যদেরকে যা কিছু বলে ছিলেন তা সুরিয়ানী ভাষাতেই বলেছিলেন।

দ্বিতীয় যে কথা জানা দরকার তা হলো এই যে, বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত চারটে ইঞ্জিলের সব ক'টাই হযরত ঈসা (আ)-এর তীরোভাবের পর খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারী গ্রীস ভাষাভাষীদের লেখা। হযরত ঈসা (আ)-এর কথা ও কার্যকলাপের বিবরণ সুরিয়ানী ভাষাভাষী খৃষ্টানদের কাছ থেকে তাদের গোচরে আসে এবং তা লিখিতভাবে নয়—মৌখিক বর্ণনার আকারে তাদের কাছে পৌঁছে। এসব সুরিয়ানী বর্ণনাগুলোকে তারা ভাষান্তরিত করে লিপিবদ্ধ করে রাখে। এর মধ্যে কোনো একটা ইঞ্জিলও ৭০ খৃষ্টাব্দের আগের লেখা নয়। বিশেষত যোহনের ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আ)-এর এক শতাব্দী পর সম্ভবত মধ্য এশিয়ার আফসুস্ নগরীতে বসে লেখা হয়। তাছাড়া যে গ্রীস ভাষায় এ ইঞ্জিলগুলো প্রথম লেখা হয় তার কোনো আসল কপি রক্ষিত নেই। ছাপাখানা অবিষ্কারের আগের যতগুলো গ্রীক পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার কোনো একটাও চতুর্থ শতকের আগের নয়। এ জন্যে তিনশো বছরের মধ্যে ঐ ইঞ্জিলগুলোতে কত কি রদবদল হয়ে গেছে, তা বলা কঠিন। তাছাড়া খৃষ্টানরা ইঞ্জিলগুলোতে নিজেদের ইচ্ছামত রদবদল করাকে যেভাবে বৈধ মনে করে আসছে, তাতে করে ব্যাপারটা আরো বেশী সংশয়পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার "বাইবেল" শীর্ষক নিবন্ধের লেখক বলেন ঃ

"ইঞ্জিলগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যেমন কোনো কোনো জায়গায় অন্য কোনো উৎস থেকে অনেকখানি কথা হুবহু ইঞ্জিলের অন্তর্ভুক্ত করা দেয়া হয়েছে। .... এসব পরিবর্তন ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে। যারা মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে কোথাও কোনো কথা পেয়েছে এবং যে কথা গ্রন্থের মান উন্নত করে বা তাকে আরো শিক্ষাবহ করে তোলে, তাকে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার নিজেদের রয়েছে বলে মনে করতে অভ্যস্ত ছিল তারাই এ ধরনের পরিবর্তন করছে। বেশ কিছু বাড়তি কথা দ্বিতীয় শতাব্দীতেই সংযোজিত হয়েছিল। তবে সেগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল তা জানা যায়নি।"

এ প্রেক্ষাপটে ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ)-এর যে কথাগুলো আমরা পাই তা অবিকলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল কিনা এবং তাতে কোনো রদবদল ঘটেছে কিনা, নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই যে, ফিলিস্তিনে মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও প্রায় তিনশো বছর পর্যন্ত সেখানকার খৃষ্টানদের ভাষা সুরিয়ানী ছিল। খৃষ্টীয় নবম

শতাব্দীরতে সুরিয়ানীর বদলে আরবী চালু হয়। এ সুরিয়ানী ভাষাভাষী ফিলিস্তিনবাসীর মাধ্যমে খৃষ্টীয় ধর্ম সম্পর্কে প্রথম তিন শতাব্দীর মুসলমান পণ্ডিতগণ যে তত্যাদি লাভ করেন, তা যারা সুরিয়ানী থেকে গ্রীক অতপর গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষায় দফায় দফায় ভাষান্তরিত তথ্য লাভ করেছেন তাদের তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কেননা হযরত ঈসা (আ)-এর মুখ নিঃসৃত আসল সুরিয়ানী কথাগুলো তাদের কাছে অবিকৃত অবস্থায় থাকার সম্ভবনা অনেক বেশী।

পাঁচ ঃ তিনি সারা দুনিয়ার নেতা হবেন ঃ উপরোক্ত অনস্বীকার্য তথ্যগুলোর আলোকে এ কথা বিবেচনা করা দরকার যে, যোহনের ইঞ্জিলের উল্লিখিত উক্তিগুলোতে হযরত ঈসা (আ) তাঁর পরে আগমনকারী এক নবীর খবর দিচ্ছেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি সারা দুনিয়ার নেতা' হবেন·'অনন্তকাল তিনি থাকবেন' সত্যের সকল পথ তিনি দেখাবেন, এবং স্বয়ং তাঁর [হযরত ঈসা (আ)-এর] পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। যোহনের এ উক্তিগুলোতে 'মহিমান্বিত আত্মা', 'সত্যের আত্মা' প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ করে আসল বক্তব্যকে জটিল করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ উক্তিগুলোকে গভীর মনোযোগের সাথে পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে আগমনকারীর পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে তা কোনো আত্মা নয়, বরং একজন মানুষ এবং এক বিশেষ ব্যক্তি। সে ব্যক্তির শিক্ষা হবে বিশ্বজনীন, সর্বব্যাপী এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। সে বিশেষ ব্যক্তির জন্যে উর্দূ অনুবাদ 'মদদগার' (সাহায্যকারী) শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। আর যোহনের মূল ইঞ্জিলে গ্রীক ভাষার যে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে খৃষ্টানরা জোর দিয়ে বলে থাকেন যে, সেটা হলো Paracletus তবে এর মর্ম উদ্ধারে খোদ্ খৃষ্টান পণ্ডিতেরাই বিভ্রাটে পড়েছেন। মূল গ্রীক ভাষায় Paraclete শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যথা ঃ কোনো জায়গার দিকে ডাকা, সাহায্যের জন্যে ডাকা, ভয় দেখানো বা হুশিয়ার করা, উদ্বুদ্ধ করা, অনুপ্রাণিত করা, মিনতি করা, ফরিয়াদ করা, প্রার্থনা করা। তাছাড়া এ শব্দটার হেলেনিক (Helenic) অর্থও রয়েছে একাধিক। যথা ঃ সান্ত্বনা দেয়া, শান্ত করা, উৎসাহ দেয়া। বাইবেলে এ শব্দটা যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেসব জায়গায় এর কোনো অর্থই খাপ খায় না। বাইবেল বিশারদ ওরাইজেন (Origen) কোথাও এর অনুবাদ করেছেন Consolator কোথাও Deprecator কিন্তু বাইবেলের অন্যান্য টীকারকা উভয় অনুবাদ নাকচ করে দিয়েছেন। কেননা প্রথমতঃ এ অর্থ গ্রীস ব্যাকরণের দৃষ্টিতে শুদ্ধ নয়। দ্বিতীয়তঃ যেসব বাক্যে এ শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এ অর্থ অচল। অন্য কয়েকজন অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন Teacher। অথচ গ্রীস ভাষার প্রয়োগ থেকে এ অর্থটাও গ্রহণ করা যায় না। তারতোলিয়ান ও আগস্টাইন এর অনুবাদ করেছেন Advocate, অন্যান্যরা কেউবা অনুবাদ করেছেন Assistant, কেউবা Comforter, আবার কেউবা Consoler, (দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিকাল লিটারেচার ঃ প্যারাক্লেটস শব্দ)।

এখন মজার ব্যাপার এই যে, গ্রীক ভাষাতেই আর একটা শব্দ রয়েছে, এর Periclytos-অর্থ হলো 'প্রশংসিত'। এটা অবিকল 'মুহাম্মদ' এর প্রতিশব্দ। উচ্চারণে Paractetus -এর সাথে এ শব্দের চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যেসব খৃষ্টীয় পণ্ডিত তাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে নিজেদের খেয়ালখুশী মত অবাধে রদবদল করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তারা যোহনের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর এ শব্দটাকে নিজেদের আকিদা-বিশ্বাসের বিপরীত দেখে তার বানানে এই একটু খানি হেরফের করে দিয়ে থাকলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এটা

পরীক্ষা করে দেখার জন্যে যোহনের লেখা সেই আদি গ্রীক ইঞ্জিল কোথাও নেই যে, তাতে এ দু'টো শব্দের মধ্যে আসলে কোন্‌টা ব্যবহার করা হয়েছিল তা খুঁজে দেখা যেতে পারে।

ছয় ঃ মুনহামান্না ঃ কিন্তু যোহন গ্রীক ভাষায় আসলে কোন্ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন তা জানতে পারলেও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যেত না। কেননা তিনি যা-ই লিখুন সেটাও অনুবাদ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমরা আগেই বলেছি, হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষা ছিল ফিলিস্তিনী সুরিয়ানী। তাই তিনি নিজের ভবিষ্যদ্বাণীতে যে শব্দই ব্যবহার করে থাকেন না কেন, তা সুরিয়ানী শব্দই হওয়ার কথা। সৌভাগ্যবশতঃ সেই মূল সুরিয়ানী শব্দটা আমরা ইবনে হিশামের সীরাত গ্রন্থে পেয়েছি। সেই সাথে এর গ্রীক প্রতিশব্দ কি তাও আমরা ইবনে হিশাম থেকে জানতে পেরেছি। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের সূত্রের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম ইউহান্নাস (ইউহান্না তথা যোহন) এর ইঞ্জিলের ১৫শ' অধ্যায়ের ২৩শ' থেকে ২৭শ' আয়াত এবং ১৬শ' অধ্যায়ের ১ম আয়াতের পূর্ণ অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে গ্রীক 'ফারাক্লিত' শব্দের পরিবর্তে সুরিয়ানী ভাষার সুনহামান্না শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অতপর ইবনে ইসহাক বা ইবনে হিশাম তার এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, সুরিয়ানী শব্দ মুনহামান্নার অর্থ আরবীতে মুহাম্মদ ও গ্রীক ভাষায় প্যারাক্লেটাস।–(ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪৮)।

উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক দিক থেকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত সুরিয়ানীই ছিল ফিলিস্তিনবাসীর সাধারণ ভাষা। এ অঞ্চলটা ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই ইসলামী শাসনাধীন ছিল। ইবনে ইসহাক ৭৬৮ খৃষ্টব্দে এবং ইবনে হিশাম ৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ উভয়ের আমলেই ফিলিস্তিনের খৃষ্টানরা সুরিয়ানী ভাষায় কথা বলতো এবং তাদের উভয়ের পক্ষেই নিজ দেশের খৃষ্টান অধিবাসীদের সাথে যোগাযোগ করতে কোনোই অসুবিধা ছিল না। তাছাড়া সে সময়ে লক্ষ লক্ষ গ্রীকভাষাভাষী খৃষ্টানও মুসলিম অধিকৃত এলাকাগুলোতে বসবাস করতো। এ জন্যে গ্রীক ভাষার কোন্ শব্দ সুরিয়ানী ভাষার কোন্ শব্দের সমার্থক, তা জানাও তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। এখন যদি ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃত অনুবাদে সুরিয়ানী শব্দ মুনহামান্না ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং ইবনে ইসহাক বা ইবনে হিশাম যদি তার এই ব্যাখ্যা করে থাকেন যে, আরবীতে এর প্রতিশব্দ মুহাম্মদ এবং গ্রীক ভাষায় প্যারাক্লেটাস, তাহলে হযরত ঈসা (আ) মুহাম্মদ (সা)-এর নাম উচ্চারণ করে তাঁরই আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সেই সাথে এ কথাও জানা হয়ে যায় যে, যোহনের গ্রীক ইঞ্জিলে আসলে Pariclytos শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণ তাকে Paracletus এ পরিবর্তিত করে দিয়েছেন।

সাত ঃ নাজ্জাসীর সাক্ষ্য ঃ এর চেয়েও পুরানো ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা সংক্রান্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা। নাজ্জাসী যখন আবিসিনিয়ায় আগত মুসলিম মোহাজেরদেরকে দরবারে ডাকলেন এবং আবু তালেবের ছেলে হযরত জাফর (রা)-এর মুখে রসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন তখন বললেন ঃ

مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده ، اشهد انه رسول الله وانه الذى نجد فى الانجيل وانه الذى بشربه عيسى ابن مريم ـ(مسند احمد)

"তোমাদেরকে এবং যে মহানব্যক্তির নিকট থেকে তোমরা এসেছ তাঁকে মুবারকবাদ জানাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল। তিনি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমরা ইঞ্জিলে উল্লেখ পাই এবং যার সম্পর্কে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।" বিভিন্ন হাদীসে হযরত জাফর (রা) এবং উম্মে সালমা (রা) থেকেও এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর সেই সূচনাকালেই নাজ্জাসী জানতেন যে হযরত ঈসা (আ) একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এ থেকে আরো জানা যায় যে, ইঞ্জিলে ভবিষ্যতে সেই নবীর এমন স্পষ্ট পরিচয় দেয়া ছিল যার কারণে মুহাম্মদ (সা)-ই যে সেই নবী, তা বুঝতে নাজ্জাসীর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করতে হয়নি। তবে যোহনের ইঞ্জিলের মাধ্যমেই নাজ্জাসী হযরত ঈসা (আ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানতে পেরেছিলেন, না সে সময়ে এ কথা জানার আর কোনো মাধ্যম ছিল তা এই বর্ণনা থেকে জানা যায় না।

আট ঃ বারনাবাসের ইঞ্জিল ঃ যে চারটে ইঞ্জিলকে খৃষ্টীয় গীর্জা নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত ইঞ্জিল (Council gospels) বলে স্থির করে রেখেছে আসলে যে চার ইঞ্জিল হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী জানার তো নয়ই, এমনকি খোদ্ হযরত ঈসা (আ)-এর জীবন বৃত্তান্ত এবং তাঁর প্রকৃত শিক্ষা ও নীতি কি ছিল তা জানারও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম নয়। বরং খৃষ্টীয় গীর্জা যাকে বে-আইনী ও সন্দেহভাজন ইঞ্জিল বলে আখ্যায়িত করে থাকে সেই বারনাবাসের ইঞ্জিলেই এর অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মাধ্যম। খৃষ্টানরা এ কিতাবখানিকে গোপন রাখার জন্যে অনেক ব্যবস্থা নিয়েছে। শত শত বছর যাবত এটা দুনিয়া থেকে লুপ্ত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এর ইটালীয় অনুবাদের মাত্র একটা কপি পোপ সিক্সটাসের (Sixtus) লাইব্রেরীতে ছিল। তবে সেটা কাউকে পড়ার অনুমতি দেয়া হতো না। ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে তা জনটোল্যাণ্ড নামক এক ব্যক্তির হাতে পড়ে। তারপর তা একজন থেকে আর একজনের কাছে হস্তান্তর হতে হতে ১৭৩৮ সালে ভিয়েনার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে উপনীত হয়। ১৯০৭ সালে অক্সফোর্ডের ক্লেরিণ্ডন প্রেস থেকে সেই অনুলিপির ইংরেজী অনুবাদ ছাপা হয়। কিন্তু ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় খৃষ্টান জগৎ বুঝতে পেরেছিলে যে, এ কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর নামে প্রবর্তিত ধর্মটার মূলোচ্ছেদ করতে চলেছে। এ জন্যে সেই ছাপানো অনুলিপিগুলো বিশেষ ফন্দি করে উধাও করে দেয়া হয়। অতপর সে ইঞ্জিলখানা আর প্রকাশিত হতে পারেনি। একই ইটালীয় অনুলিপির স্পেনীয় ভাষান্তরিত আর একটা কপি ১৮শ' শতাব্দীতে কোথাও কোথাও পাওয়া যেত। জর্জ সেল তার ইংরেজী অনুদিত কুরআনের ভূমিকায় ঐ অনুলিপির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটা কোথাও উধাও করে দেয়া হয়। আজ তারও কোনো হদীস নেই। আমি অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদের একটা ফটোস্টেট কপি দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং তা পুংখানুপুংখ পড়ে দেখেছি। আমার অনুভূতি এই যে, এটা একটা অমূল্য সম্পদ। কিন্তু খৃষ্টানরা কেবল জিদ ও হঠকারিতার বশে তা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছে।

খৃষ্টীয় বই-পুস্তকে যেখানেই এ ইঞ্জিলের প্রসঙ্গ এসেছে, একে ভূয়া ও বানোয়াট এবং সম্ভবতঃ কোনো মুসলমান তা রচনা করে মিথ্যামিথ্যি বারনাবাসের নামে চালিয়ে দিয়েছে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কিন্তু এটা একটা নির্জলা মিথ্যা কথা। এ ইঞ্জিলের স্থানে

স্থানে মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে পরিষ্কার ভবিষ্যদ্বাণী থাকার কারণেই এ মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ এ ইঞ্জিল পড়লেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ কিতাব কোনো মুসলমান কর্তৃক রচিত হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এটা কোনো মুসলমানের লেখা হয়ে থাকলে মুসলিম সমাজে এর ব্যাপক প্রচলন হতো এবং মুসলিম বিদ্বানদের বই-পুস্তকে এর বহু উল্লেখ থাকতো। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, জর্জ সেলের ইংরেজী অনুদিত কুরআনের ভূমিকা প্রকাশের আগে মুসলমানদের জানাই ছিল না যে, এমন একটা ইঞ্জিলের কখনো অস্তিত্ব ছিল। তাবারী, ইয়াকুবী, মাসউদা, আলবেরুনী, ইবনে হামজা, ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ গ্রন্থকারগণ মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। অথচ এদের কারো রচনায় খৃষ্টীয় ধর্মমত সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বারনাবাসের ইঞ্জিল সম্পর্কে সামান্যতম আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মুসলিম জাহানের লাইব্রেরীগুলোতে যেসব বই-কিতাব মজুদ ছিল, তার বিশ্বস্ততম তালিকা হলো ইবনে নাদিমের 'আলফিহ্‌রিস্ত' এবং হাজী খলিফার 'কাশফুজ জুনুন'। অথচ এ দু'টোতেও তার কোনো উল্লেখ নেই। ঊনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত কোনো মুসলিম পণ্ডিত বারনাবাসের ইঞ্জিলের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। এর মিথ্যা হওয়ার তৃতীয় ও সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মেরও ৭৫ বছর আগে পোপ প্রথম গ্লাসিয়াসের আমলে খারাপ আকীদা-বিশ্বাস সম্বলিত ও বিভ্রান্তিকর ধর্মগ্রন্থসমূহের যে তালিকা তৈরী করা হয় এবং একটা যাজকীয় ফতোয়ার মাধ্যমে যা পড়া নিষিদ্ধ করা হয়, বারনাবাসের ইঞ্জিলও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন ওঠে যে, সে সময় এ ভূয়া ইঞ্জিল তৈরী করতে মুসলমান কোত্থেকে এসেছিল?

নয় ঃ বারনাবাসের ইঞ্জিল কি ঃ বারনাবাসের ইঞ্জিল থেকে হযরত রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো উদ্ধৃত করার আগে এ ইঞ্জিলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া দরকার যাতে করে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং খৃষ্টানরা এ ইঞ্জিলের ওপর এত বিরূপ কেন তাও বুঝা যায়।

যে চারটি ইঞ্জিলকে আইনসম্মত ও বিশ্বস্ত বলে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার কোনো একটারও লেখক হযরত ঈসা (আ)-এর সাহাবী ছিলেন না। এমন কি হযরত ঈসা (আ)-এর সাহাবীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কিতাবে শামিল করা হয়েছে—এমন দাবীও কোনো ইঞ্জিলের লেখক করেননি। তারা কোন্ কোন্ সূত্রে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তারও কোনো বর্ণনা তারা দেননি। ফলে যাদের কাছ থেকে তারা তথ্য সংগ্রহ করেছেন তারা স্বয়ং বর্ণিত রচনাবলীর দর্শক ও কথাগুলোর শ্রোতা ছিলেন, না অন্য কোনো মাধ্যমে তা তাদের গোচরে এসেছে সেটা জানা যায় না। পক্ষান্তরে বারনাবাসের ইঞ্জিলের লেখক বলেন যে, আমি হযরত ঈসা (আ)-এর প্রবীণতম ১২জন সহচরের অন্যতম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলাম এবং যা আমি নিজ কানে শুনেছি ও যা নিজ চোখে দেখেছি এ কিতাবে তাই লিপিবদ্ধ করছি। শুধু তাই নয়। গ্রন্থের উপসংহারে তিনি বলেন ঃ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় হযরত ঈসা (আ) আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা এবং প্রকৃত ঘটনাগুলো মানুষকে জানানো আমার দায়িত্ব।

এই বারনাবাস কে ? বাইবেলের কর্ম-পুস্তকে এ নামের সাইপ্রাসীয় ইহুদী বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তির কথা বার বার উল্লেখিত হয়েছে। খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের সাহায্য-সহযোগিতায় তার অবদানের খুবই প্রশংসা করা হয়েছে। তবে সে কখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে তা কোথাও বলা হয়নি এবং প্রবীণতম ১২জন সহচরের যে তালিকা তিনটে ইঞ্জিলে দেয়া হয়েছে, তাতেও তার নাম নেই। তাই বাইবেলের সেই বারনাবাসই এ ইঞ্জিলের রচয়িতা না আর কেউ, তা বলা সম্ভব নয়। মথি ও মিরকাস ১' সহচরের যে তালিকা দিয়েছেন, তার সাথে বারনাবাসের দেয়া তালিকার মাত্র দু'টো নাে গরমিল। তার একজন হলো তুমা। বারনাবাস এর বদলে নিজের নাম দিয়েছে। দ্বিতী' জন শামঊন কানানী। বারনাবাস এর জায়গায় ইহুদাহ ইবনে ইয়াকুবের নাম উল্লে' করেছে। লূকের ইঞ্জিলে এ দ্বিতীয় নামটাও রয়েছে। এ জন্যে যদি অনুমান করা হয় যে পরে কোনো এক সময় শুধু বারনাবাসকে ১২ সহচরের তালিকা থেকে বের করার জন্যে তুমার নাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তবে তা ভুল হবে না। কেননা এতে করে বারনাবাসে ইঞ্জিলকে উপেক্ষা করার পথ সুগম হবে। বস্তুত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে এ ধরনের হেরফের ক' খৃষ্টীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে কোনো অবৈধ কাজ ছিল না।

বারনাবাসের এ ইঞ্জিলকে যদি কেউ বিদ্বেষমুক্ত মন নিয়ে উদার দৃষ্টিতে পড়ে এব' প্রচলিত চার ইঞ্জিলের সাথে মিলিয়ে দেখে তাহলে এটাকে ঐ চার ইঞ্জিলের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মনে না করে পারবে না। এতে হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনবৃত্তান্ত আরো বিস্তারিত- ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে বর্ণনাভঙ্গী থেকে মনে হয়, কেউ সেখানে সত্যি সত্যি স' ঘটনা স্বচক্ষে দেখছিল এবং সেসব ঘটনায় সে স্বয়ং কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিল চার ইঞ্জিলের খাপছাড়া কাহিনীগুলোর তুলনায় এর ঐতিহাসিক বিবরণ অধিকতর সুশৃঙ্খ ও সুবিন্যস্ত। এতে করে ঘটনা পরম্পরাকে বুঝতেও আরো বেশী সুবিধা হয়। হযরত ঈ' (আ)-এর উপদেশগুলোও এ ইঞ্জিলে অন্য চারটি ইঞ্জিল অপেক্ষা অনেক বেশী স্পষ্ট, বি' ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরা হয়েছে। তাওহিদের শিক্ষা, শির্ক খণ্ডন, আল্লাহর গুণাবলী ইবাদাতের প্রেরণা এবং মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী সংক্রান্ত আলোচনাগুলো এতে খুবই জোরদার, যুক্তিসমৃদ্ধ ও বিস্তারিত। যেসব শিক্ষাপ্রদ উপমার প্রেক্ষাপটে হযরত ঈসা (আ) এসব আলোচনা করেছেন, তার এক শতাংশও অন্য চারটি ইঞ্জিলে নেই। হযরত ঈসা (আ) তাঁর শিষ্যদেরকে কিরূপ বিচক্ষণতা ও নৈপুণ্যের সাথে আল্লাহর দ্বীনের শিক্ষা ও তার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতেন সেটাও খুবই বিস্তারিতভাবে জানা যায় এ ইঞ্জিল থেকে। হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী এবং স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে যার কিছুমাত্র জানা আছে, সে এ ইঞ্জিল পড়ে মানতে বাধ্য হবে যে, এটা পরবর্তী কোনো লোকের মনগড়া কাহিনী নয় বরং এতে হযরত ঈসা (আ) নিজের আসল স্বরূপ প্রচলিত চার ইঞ্জিল অপেক্ষা অনেক বেশী স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। আর চার ইঞ্জিল তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়, এ ইঞ্জিলে তার নামগন্ধও নেই।

এ ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁর উপদেশমালা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা যথার্থ একজন নবীর জীবন ও শিক্ষার মতই মনে হয়। তিনি নিজেকে একজন নবী হিসেবে পেশ করেছেন। অতীতের সকল নবী ও কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, নবীদের শিক্ষা ছাড়া সত্যোপলব্ধির আর কোনো পথ নেই।

যে ব্যক্তি নবীদেরকে উপেক্ষা করে সে আসলে আল্লাহকেই উপেক্ষা করে। তিনি তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে অন্য সকল নবীর অনুরূপ আকিদা-বিশ্বাসই প্রচার করেছেন। নামায, রোযা ও যাকাতের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর নামায সম্পর্কে বারনাবাস বারংবার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে, আমাদের এ যুগের মতই তিনি ফযর, যোহর, আসর, মাগরেব, এশা ও তাহাজ্জুদের সময়ে নামায পড়তেন এবং সবসময়ই নামাযের আগে ওজু করতেন। অন্যান্য নবীদের সাথে সাথে তিনি হযরত দাঊদ (আ) এবং সোলায়মান (আ)-কেও নবী বলে ঘোষণা করেন। অথচ ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ দু'জনকে নবীদের তালিকার বাইরে রেখে দিয়েছে। এ ইঞ্জিল অনুসারে হযরত ইসমাঈল (আ)-কে তিনি জবীহ (যিনি জবাই হয়ে কুরবানী হতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন) বলে স্বীকার করেছেন এবং জনৈক ইহুদী পণ্ডিতকে স্বীকার করিয়ে ছাড়েন যে, বনী ইসরাঈল অনর্থক হযরত ইসহাক (আ)-কে জবীহ সাব্যস্ত করতে গিয়ে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে। অথচ আসলে হযরত ইসমাঈল (আ)-ই জবীহ। আখেরাত, কেয়ামত ও বেহেশ্‌ত্‌-দোযখ সম্পর্কে তাঁর যে শিক্ষা এ ইঞ্জিলে ব্যক্ত হয়েছে, তা কুরআনের শিক্ষারই কাছাকাছি।

দশ ঃ খৃষ্টানরা বারনাবাসের ইঞ্জিলের বিরোধী কেন ঃ বারনাবাসের ইঞ্জিলে ঘন ঘন রসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী থাকাই এর প্রতি খৃষ্টানদের বিরূপ হয়ে ওঠার একমাত্র কারণ নয়। কেননা তারা হযরত (সা)-এর জন্মের অনেক আগেই এ ইঞ্জিলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর প্রতি তাদের অসন্তোষের আসল কারণ কি তা বুঝতে হলে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রাথমিক অনুসারীরা তাঁকে শুধু নবী মানতো। তাঁরা হযরত মূসা (আ)-এর আনীত আইন ব্যবস্থার (শরীয়াত) অনুসরণ করতো। আকীদা, ইবাদাত ও বিধি-নিষেধের ব্যাপারে তারা বনী ইসরাঈলের অন্যান্যদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন মনে করতো না। ইহুদীদের সাথে তাদের শুধু এতটুকু মতভেদ ছিল যে, তারা হযরত ঈসা (আ)-কে নবী মানার সাথে সাথে মসীহ (বিশেষ মর্যদাসম্পন্ন নবী) বলেও মানতো। কিন্তু ইহুদীরা তাকে মসীহ বলে মানতে চাইতো না। পরে যখন সেন্টপল এ দলভুক্ত হন তখন তিনি রোমক, গ্রীক এবং অন্যান্য অ-ইহুদী ও অ-ইসরাঈলীদের মধ্যেও এ ধর্মপ্রচার করতে শুরু করে দেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর প্রচারিত ধর্মের আকীদা, বিধিনিষেধ ও মূলনীতি পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ অভিনব এক ধর্ম তৈরী করেন। এ ব্যক্তি কখনো হযরত ঈসা (আ)-এর সাহচর্য পাননি। বরং তার জীবদ্দশায় তাঁর কট্টর বিরোধী ছিলেন। এবং তাঁর ইন্তেকালের পর কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর সহচরদের দুশমন ছিলেন। তারপর যখন এ দলে ঢুকে তিনি একটা নতুন ধর্ম বানাতে শুরু করলেন তখনও তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর কোনো উক্তিকে এর ভিত্তি হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরেননি। কেবল নিজের খেয়াল ও কল্পনাকে তার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এ নতুন ধর্ম তৈরীর পেছনে তার শুধু এ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল যে, এমন একটা ধর্ম হওয়া দরকার যা দুনিয়ার সমস্ত অ-ইহুদীরা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে। তিনি ঘোষণা করেন যে, হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা ইহুদী শরীয়াতের সমস্ত বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত। পানাহারের ব্যাপারে তিনি হালাল-হারামের ভেদাভেদ বিলুপ্ত করেন। অ-ইহুদীরা যে জিনিসটা বিশেষভাবে অপছন্দ করতো সেই খাতনার প্রথা রহিত করেন। এমনকি হযরত ঈসা (আ) একজন উপাস্য ও

আল্লাহর ছেলে এবং ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে তিনি সমগ্র মানবজাতির আজন্ম পাপের প্রায়শ্চিত করেছেন—এ কথা বিশ্বাস করাকে তিনি ঈমানী কর্তব্য বলে নির্দেশ করেন। কেননা সাধারণ মোশরেকরা এসবের দিকেই ঝোঁকপ্রবণ হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আ)-এর প্রবীণতম সহচরগণ এসব নয়া আমদানী করা ধ্যানধারণার কঠোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু সেন্টপল একবার যে দরজা খোলেন সে খোলা দরজা দিয়ে অ-ইহুদী খৃষ্টানদের এক বিরাট ও প্রবল জনস্রোত খৃষ্টধর্মে ঢুকে পড়ে। ঐমুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক কোনোক্রমেই সে জনস্রোতকে রোধ করতে পারেনি। তবুও খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ নাগাদ হযরত ঈসা (আ)-কে উপাস্য মানতো না এমন লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে (৩২৫খৃঃ) নিকাইয়ার (Nicaea) পরিষদ সেন্টপলের প্রচারিত ধর্মমতকে চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত খৃষ্টধর্ম বলে ঘোষণা করে। এরপর খোদ্ রোম সামাজ্য খৃষ্টান হয়ে যায়। সিজার থিওডোসিয়াসের আমলে এ ধর্মমত সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্মে পরিণত হয়। এর পর এ রাষ্ট্রীয়ধর্মের পরিপন্থী সমস্ত বই-পুস্তক যে প্রত্যাখ্যাত হবে এবং এ ধর্মমতের অনুসারী বই-পুস্তকই যে গ্রহণযোগ্য হবে, এটাই স্বাভাবিক। ৩৬৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আথানাসিয়াস (Athanasius)-এর এক চিঠিতে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত বই-পুস্তকের একটা তালিকা ঘোষণা করা হয়। অতপর ৩৮২খৃষ্টাব্দে পোপ ডামাসিয়াসের (Damasius)-এর সভাপতিত্বে একটা পরিষদ এ তালিকার মঞ্জুরী দেন। অতপর পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে পোপ গ্লাসিয়াস (Gelasius) এ তালিকাকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে প্রত্যাখ্যাত বই-পুস্তকেরও একটা তালিকা ঘোষণা করেন। অথচ সেন্টপল প্রচারিত যে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে ধর্মগ্রন্থগুলোর গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, সেসব আকীদা-বিশ্বাসের কোনো একটারও শিক্ষা হযরত ঈসা (আ) নিজে দিয়েছেন বলে কোনো খৃষ্টান পণ্ডিত কখনো দাবী করতে পারেনি। এমনকি গ্রহণযোগ্য ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে যে ক'টা ইঞ্জিল রয়েছে, তার মধ্যেও হযরত ঈসা (আ)-এর নিজের কোনো কথা থেকে এসব ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় না। বারনাবাসের ইঞ্জিল খৃষ্টবাদ সংক্রান্ত এই সরকারী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়ার কারণেই প্রত্যাখ্যাত হয়। এর লেখক গ্রন্থের শুরুতেই ঐ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য এরূপ বর্ণনা করেন ঃ "যারা শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে ইয়াসু'কে আল্লাহর ছেল বলে আখ্যায়িত করে তাদের ভ্রান্তধারণা খণ্ডন করা, যারা খাত্নাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে এবং হারাম খাদ্যকে হালাল করে দেয় তাদেরও সংশোধন করা। সেন্টপলও এ শয়তানী প্রবঞ্চনার একজন অন্যতম শিকার।" বারনাবাস বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর জীবিতাবস্থায় তাঁর মোজেযাগুলো দেখে সর্বপ্রথম অংশীবাদী রোমক সৈন্যদের মধ্যে কেউবা তাকে খোদা, কেউবা খোদার পুত্র বলতে আরম্ভ করে দেয়। ক্রমে তা সংক্রামক ব্যাধির মত সমগ্র বনী ইসরাঈলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতে হযরত ঈসা (আ) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন। তিনি নিজের সম্পর্কে এ ভুল ধারণার বারংবার কঠোর প্রতিবাদ করেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় নিজে যাওয়ার পরিবর্তে শিষ্যদের পাঠান এবং তার দোয়ায় শিষ্যদের দ্বারাও স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-এর মত মোজেযা সংঘটিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যে, লোকেরা যেন মোজেযা সংগঠনকারীকে খোদা বা খোদার ছেলে মনে করা থেকে বিরত থাকে। এ প্রসঙ্গে বারনাবাস ঐ ভ্রান্ত ও আকীদার বিরুদ্ধে হযরত ঈসা (আ)-এর দেয়া সুদীর্ঘ ভাষণগুলোকে উদ্ধৃত করেছেন এবং এই বিভ্রান্তি ও গোমরাহী ছড়িয়ে পড়ায় হযরত ঈসা (আ) কতখানি

বিব্রত বোধ করতেন বিভিন্ন জায়গায় তা ব্যক্ত করেছেন। হযরত ঈসা (আ)-এর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে ইন্তেকাল করা সম্পর্কে সেন্টপল যে মতবাদ প্রচার করেছেন, বারনাবাস সুস্পষ্টভাবে তা খণ্ডন করেন। তিনি নিজের চোখে দেখা ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, ইহুদা স্ক্রিউতি যখন ইহুদীদের প্রধান ধর্মযাজকের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে হযরত ঈসা (আ)-কে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে সিপাইদের সাথে করে নিয়ে আসে তখন আল্লাহর হুকুমে চারজন ফেরেশতা তাঁকে ওপরে তুলে নিয়ে যায়। সেই সাথে স্বয়ং ইহুদী স্ক্রিউতির আকৃতি ও গলার স্বর অবিকল হযরত ঈসা (আ)-এর মত করে দেয়া হয়। ফলে হযরত ঈসা (আ)-এর পরিবর্তে সে নিজেই ক্রুশবিদ্ধ হয়। এভাবে বারনাবাসের ইঞ্জিল সেন্টপলের গড়া খৃষ্ট ধর্মের ভিত্তিই চুরমার করে দেয় এবং কুরআনের বর্ণনাকে পুরোপুরি সমর্থন করে। অথচ কুরআন নাযিল হওয়ার একশো পনেরো বছর আগেই বরনাবাসের ইঞ্জিলে এসব কথা প্রকাশিত হয় এবং সে কারণেই তাকে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকরা প্রত্যাখ্যান করে।

এগার ঃ বারনাবাসের ইঞ্জিলের বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী ঃ এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বারনাবাসের ইঞ্জিল আসলে প্রচলিত চার ইঞ্জিলের চেয়ে অধিকতর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিল। এতে হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা, জীবনবৃত্তান্ত ও উক্তিসমূহের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। এ ইঞ্জিল দ্বারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসকে সংশোধন করা ও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা অবগত হওয়ায় যে দুর্লভ সুযোগ খৃষ্টনরা পেয়েছিল, তা শুধুমাত্র জিদ ও হঠকারিতার বসে তারা হারিয়ে ফেলে। বস্তুত এটা তাদের চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। যা হোক, বারনাবাস হযরত রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ)-এর যেসব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করেছেন, এবার আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তার উদ্ধৃতি দিতে পারি। এসব ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা (আ)-কে কোথাও হযরত (সা)-এর নাম উচ্চারণ করতে দেখা যায়, কোথাও তিনি শুধু 'রসূলুল্লাহ' বলেন, কোথাও 'মসী' শব্দ প্রয়োগ করেন, কোথাও তাকে 'প্রশংসনীয়' (Admirable) বলে অভিহিত করেন, আবার কোথাও পরিষ্কারভাবে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'র সমার্থক বাক্য উচ্চারণ করেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সব ক'টা উদ্ধৃত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তার সংখ্যা এতবেশী এবং কোথাও কোথাও তা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও পূর্বাপর বর্ণনার সাথে যুক্ত হয়ে এতটা বিরাট আকার ধারণ করেছে যে, তার সবগুলো একত্র করলে বেশ একটা মস্তবড় গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে। আমি এখানে নমুনাস্বরূপ তার কয়েকটা মাত্র উদ্ধৃত করছি ঃ

> "আল্লাহর প্রেরিত নবীদের সংখ্যা ছিল এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার। তাঁরা সবাই সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্টভাবে কথা বলে গেছেন। কিন্তু আমার পরে আসবেন সকল নবী ও পুণ্যাত্মাদের আলোকবর্তিকা। নবীদের যেসব কথায় অস্পষ্টতা ছিল তিনি তা সুস্পষ্ট করে দেবেন। কেননা তিনি আল্লাহর রসূল।"–(অধ্যায় ঃ ১৭)

> "ফারিসী ও লাভীরা বলল ঃ তুমি যদি মসীহ, ইলিয়াস বা অন্য কোনো নবীও না হয়ে থাক, তাহলে নতুন আদর্শ শিক্ষা দাও কেন এবং নিজেকে মসীহের চেয়েও বড় করে জাহির কর কেন ? ইয়াসু [হযরত ঈসা (আ)] জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ যেসব মোজেযা আমার দ্বারা প্রকাশ করেন তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন আমি কেবল তাই বলি। নচেৎ আসলে আমি নিজেকে তাঁর (মসীহের) চেয়ে বড় বলে গণ্য করার যোগ্য মনে করে করি না, যেমন তোমরা বলছ। আমি আল্লাহর সেই

রসূলের মোজার বাঁধন বা জুতোর ফিতে খুলে দেয়ারও যোগ্য নই—যাকে তোমরা মসীহ বলে থাক। তিনি আমার আগের সৃষ্টি অথচ আসবেন আমার পরে। তিনি সত্য বাণী নিয়ে আসবেন যাতে তাঁর ধর্মের বিস্তৃতির কোনো সীমা না থাকে।"–(অধ্যায় ঃ ৪২)।

"আমি তোমাদেরকে সুনিশ্চিতভাবে বলছি ঃ এ যাবত যে নবীই এসেছেন, তিনি কেবল একটা জাতির জন্যে আল্লাহর করুণার নিদর্শন হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ জন্যে সেসব নবীর বাণী যে জাতির কাছে তারা প্রেরিত তাদের বাইরে ছড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহর রসূল (সা) যখন আসবেন তখন আল্লাহ বলতে গেলে তাঁকে নিজের হাতের মোহর দিয়ে দেবেন। ফলে তাঁর শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত দুনিয়ার সকল জাতিকে তিনি আল্লাহর রহমত পৌঁছিয়ে দেবেন এবং মুক্তির পথ দেখাবেন। খোদাবিমুখ লোকদের ওপর তিনি পরাক্রান্ত ও ক্ষমতাশালী হয়ে আসবেন এবং পৌত্তলিকতাকে তিনি এমন-ভাবে নিশ্চিহ্ন করবেন যে, শয়তান অস্থির হয়ে উঠবে।" [এরপর শিষ্যদের সাথে এক দীর্ঘ কথোপকথনে হযরত ইসা (আ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন]।–(অধ্যায় ঃ ৪৩)।

"এ জন্যেই তোমাদেরকে আমি বলি যে, আল্লাহর সে রসূল এমন এক প্রদীপ্ত জ্যোতি, যাঁর কাছ থেকে আল্লাহর সৃষ্টি প্রতিটি বস্তু আনন্দ লাভ করবে। কেননা বুদ্ধিমত্তা ও উপদেশ, প্রজ্ঞা এবং শক্তি, ভয় ও ভালবাসা, দৃঢ়তা এবং সংযম এগুলো হবে তাঁর চরিত্রের ভূষণ ও প্রেরণার উৎস। তিনি হবেন দানশীলতা ও দয়া, ন্যায়বিচার, খোদাভীতি এবং ভদ্রতা ও সহিষ্ণুতার উজ্জীবনী শক্তিতে বলীয়ান। আল্লাহ তাঁর অন্য যেসব সৃষ্টিকে এসব গুণে ভূষিত করেছেন, তিনি এসব গুণ তাদের তিনগুণ পেয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের যুগটা যে কত কল্যাণময় হবে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তোমরা নিশ্চিত জেনে রাখ, আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি যেমন প্রত্যেক নবীই তাঁকে দেখেছেন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁর আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই আল্লাহ তাঁকে নবুয়াত দান করলেন। আমি যখন তাঁকে দেখলাম, তখন আমার আত্মা প্রশান্তিতে ভরে উঠল। তখন বললাম, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তোমার সহায় হোন এবং আমাকে তোমার জুতোর ফিতে বাঁধার যোগ্য করে দিন। কেননা আমি এতটুকু মর্যাদা পেলেও একজন বড় নবী ও আল্লাহর একজন পুণ্যাত্মায় পরিগণিত হব।"–(অধ্যায় ঃ ৪৪)।

"আমি চলে যাওয়ায় তোমরা মর্মাহত হয়ো না এবং ভীত হয়ো না। কেননা আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি। বরং আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা খোদা—যিনি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আর আমার কথা ভাবছো ? আমি এ সময়ে দুনিয়ায় এসেছি দুনিয়াবাসীর মুক্তির দিশারী সেই রসূলে খোদার জন্যে পথ সুগম করতে। .... ইন্দিরিয়াস বলল, "হে ওস্তাদ! আমাদেরকে তাঁর নিদর্শন জানিয়ে দাও যেন আমরা তাঁকে চিনতে পারি।' ইয়াসু জবাব দিলেন ঃ তোমাদের জীবিতকালে তিনি আসবেন না। তোমাদের কিছুকাল পরে আসবেন। তিনি এমন সময় আসবেন যখন আমার ইঞ্জিল বিকৃত হয়ে যাওয়ার দরুন কোনো রকমে ত্রিশ জন মুমিন অবশিষ্ট থাকবে। সে অবস্থায় আল্লাহ দুনিয়ার ওপর করুণা করবেন।

তিনি আপন রসূলকে পাঠাবেন যার মাথার ওপর সাদা মেঘ ছায়া ফেলবে এবং তা দিয়েই তাঁকে আল্লাহর মনোনীত বান্দা বলে চেনা যাবে। তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াবাসী আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করবে। তিনি খোদাবিমুখ লোকদের প্রবল শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করবেন এবং দুনিয়া থেকে পৌত্তলিকতাকে নির্মূল করবেন। আমি এ জন্যে খুবই আনন্দিত। কেননা তাঁর মাধ্যমে আমাদের খোদার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে, তাঁর মহিমা ঘোষিত হবে এবং দুনিয়াবাসী জানবে যে, আমি যা বলেছি সত্য ও সঠিক বলেছি। আমাকে যারা মানুষের চেয়ে বড় কিছু মনে করবে তাদের থেকে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। ..... তিনি এমন এক সত্যতা নিয়ে আসবেন যা অন্য সব নবীর আনীত সত্যতা থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট।"-(অধ্যায় ঃ ৭২)।

"আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছিল জেরুজালেমে সোলায়মানের মসজিদে—অন্য কোথাও নয়। তবে আমার কথা বিশ্বাস কর যে, সেদিন একদিন আসবে যখন খোদা অন্য একটা শহরে তাঁর রহমত বর্ষণ করবেন। তারপর সব জায়গায় তার সঠিক ইবাদাত সম্ভব হবে এবং আল্লাহ আপন অনুগ্রহে সব জায়গায় সত্যিকার নামায কবুল করবেন।......... আমি আসলে ইসরাঈলের বংশধরের কাছে ত্রাণকর্তা নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি কিন্তু আমার পরে খোদার প্রেরিতমসীহ আসবেন সারা দুনিয়াবাসীর কাছে। তাঁরই জন্যে খোদা এই সমগ্র দুনিয়াটা তৈরী করেছেন। তখন সারা দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদাত চলবে এবং তাঁর রহমত বর্ষিত হবে।"-(অধ্যায় ঃ ৮৩)।

"(ইয়াসু প্রধান যাজককে বললেন) সেই চিরঞ্জীব খোদার কসম যার জন্যে আমি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছি—দুনিয়ার সকল জাতি যে মসীহের জন্যে অপেক্ষমান, আমি সে মসীহ নই। আমাদের পিতা ইবরাহীমের কাছে আল্লাহ সেই মসীহ সম্পর্কে এ বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 'তোমার সন্তানের অসিলায় দুনিয়ার সকল জাতি বরকত লাভ করবে।' (আবির্ভাব অধ্যায় ২২ ঃ ১৮)। কিন্তু আল্লাহ যখন আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাবেন তখন শয়তান আবার এমন বিদ্রোহ করবে যে দুরাচার লোকেরা আমাকে খোদা ও খোদার ছেলে বলে মানবে। সে কারণে আমার কথা ও শিক্ষাগুলোকে এতদূর বিকৃত করে দেয়া হবে যে ত্রিশজন মুমিন অবশিষ্ট থাকাও কঠিন হয়ে পড়বে। সেই সময় আল্লাহ দুনিয়ার ওপর করুণা করবেন এবং সেই রসূলকে পাঠাবেন যাঁর জন্যে তিনি দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তিনি দক্ষিণ দিক থেকে প্রবল শক্তি নিয়ে আসবেন এবং মূর্তিগুলোকে মূর্তিপূজারী সমেত ধ্বংস করে দেবেন। যে ক্ষমতার দাপট নিয়ে শয়তান মানুষের ওপর জেঁকে বসেছে, তিনি তা শয়তানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন। তাঁর ওপর যারা ঈমান আনবে, তিনি তাদের মুক্তির জন্যে আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে আসবেন। যারা তাঁর কথা মত চলে তারাই ভাগ্যবান।"-(অধ্যায় ঃ ১৬)।

"প্রধান যাজক জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহর সেই রসূলের পরও কি আর কোনো নবী আসবে ? ইয়াসু বললেন ঃ যথার্থ নবী আর আসবেন না। তবে অনেক মিথ্যা নবী আসবে। আমি সে জন্যে খুবই উদ্বিগ্ন। কেননা আল্লাহর ন্যায়সঙ্গত ফয়সালার কারণে শয়তান তাদেরকে মাঠে নামাবে এবং তারা আমার ইঞ্জিলের পর্দায় নিজেদেরকে লুকাবে।"-(অধ্যায় ঃ ১৭)।

"প্রধান যাজক জিজ্ঞেস করল ঃ সেই মসীহ্ কি নামে পরিচিত হবেন এবং তাঁর আবির্ভাব কোন্ কোন্ নিদর্শন দেখে বুঝা যাবে ? ইয়াসু বললেন ঃ সেই মসীহের নাম 'প্রশংসনীয়'। কেননা আল্লাহ যখন তার আত্মাকে সৃষ্টি করেন তখন তাঁর এ নাম তিনি নিজেই রাখেন এবং সেখানে তাঁকে একটা উর্ধ-জাগতিক মর্যাদায় রাখা হয়। আল্লাহ তখন তাঁকে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি অপেক্ষা কর। কেননা তোমারই জন্যে আমি বেহেশত, দুনিয়া এবং আরও বহু কিছু সৃষ্টি করব এবং তোমাকে সেসব উপহার দেব। অতপর যে ব্যক্তি তোমার জন্যে কল্যাণ কামনা করবে তার কল্যাণ সাধিত হবে আর যে ব্যক্তি তোমার ওপর অভিসম্পাৎ পাঠাবে তার ওপর অভিসম্পাৎ পাঠান হবে। যখন তোমাকে আমি দুনিয়ায় পাঠাব তখন আমি তোমাকে ত্রাণকর্তা নবী হিসেবে পাঠাব। তোমার কথাই সত্য হবে। আকাশ এবং পৃথিবী অটল থাকবে না। কিন্তু তোমার দ্বীন অটল থাকবে। তাঁর পবিত্র নাম হল মুহাম্মদ।-(অধ্যায় ঃ ৯৭)।

বারনাবাস লিখেছেন যে, একবার শিষ্যদের কাছে হযরত ঈসা (আ) বলেন, আমারই একজন শিষ্য ইহুদা স্ক্রিউতি আমাকে ত্রিশটি মুদ্রার বিনিময়ে শত্রুদের কাছে বিক্রি করে দেবে। অতপর হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ

"আমি নিশ্চিত যে, এরপর যে ব্যক্তি আমাকে বিক্রি করবে, আমার নামে তাকেই হত্যা করা হবে। কেননা আল্লাহ আমাকে পৃথিবীর ওপরে তুলে নেবেন এবং সেই বিশ্বাসঘাতকের চেহারা এমনভাবে পাল্টে দেবেন যে প্রত্যেকে মনে করবে আমিই সেই ব্যক্তি। তবুও তার অপমৃত্যু ঘটার পর কিছুদিন যাবত আমারই অবমাননা করা হবে কিন্তু যখন আল্লাহর পবিত্র রসূল মুহাম্মদ আসবেন তখন আমার সে দুর্নাম ঘুচে যাবে। আমি সেই মসীহের সত্যতা ঘোষণা করেছি বলেই আল্লাহ এ ব্যবস্থা করবেন। আমাকে এ পুরস্কার দেবেন যে, আমি যে জীবিত আছি এবং ঐ অপমৃত্যুর সাথে আমার যে কোনো সম্পর্ক নেই সে কথা লোকেরা জানতে পারবে।-(অধ্যায় ঃ ১১৩)।

[শিষ্যদেরকে হযরত ঈসা (আ) বললেন ঃ] "আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের বলছি যে, মূসার কিতাব থেকে সত্যকে যদি মুছে ফেলা না হত তাহলে আল্লাহ আমাদের পিতা দাউদকে আর একখানা কিতাব দিতেন না! আর যদি দাউদের কিতাবকে বিকৃত করা না হত তাহলে আল্লাহ আমাকে ইঞ্জিল দিতেন না। কেননা আমাদের খাদা পরিবর্তনশীল নন। তাই সবাইকে তিনি একই কথা বলেছেন। সুতরাং যখন আল্লাহর রসূল আসবেন তখন খোদাবিমুখ লোকের দ্বারা কলুষিত আমার কিতাবকে তিনি কলুষমুক্ত করবেন।"-(অধ্যায় ঃ ১২৪)।

দু'টি সন্দেহের জবাব

সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে মাত্র তিনটি জিনিস এমন রয়েছে যা বাহ্য দৃষ্টিতে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ এ উদ্ধৃতিগুলোতে এবং বারনাবাসের ইঞ্জিলের আরও বহু স্থানে হযরত ঈসা (আ) নিজের মসীহ হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়তঃ শুধু এ উদ্ধৃতিগুলোতেই নয়, বরং বারনাবাসের ইঞ্জিলের আরও বহু জায়গায় হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর আসল আরবী নাম 'মুহাম্মদ' (সা) লেখা হয়েছে। অথচ ভবিষ্যতের কোনো নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে তার আসল নাম উল্লেখ করা

নবীদের প্রচলিত রীতি নয়। তৃতীয়তঃ এতে হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-কে মসীহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

প্রথম সন্দেহের জবাব এই যে, শুধু বারনাবাসের ইঞ্জিলেই নয়, লূকের ইঞ্জিলেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁকে মসীহ বলতে শিষ্যদেরকে নিষেধ করেছিলেন। লূকের (৯ ঃ ২০-২১) উদ্ধৃতি লক্ষণীয় ঃ

"তিনি তাদেরকে বললেন ঃ কিন্তু তোমরা আমাকে কি বল ? পিটার্স বললেন ঃ আল্লাহর মসীহ। তখন তিনি তাদেরকে কড়া আদেশ দিলেন যে, এ কথা কাউকে বল না।"

এর কারণ হয়ত এই ছিল যে, বনী ইসরাঈল যে মসীহের অপেক্ষায় ছিল তার সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি তরবারীর জোরে শত্রুদের পরাস্ত করবেন। এ জন্যে হযরত ঈসা (আ) বললেন যে, আমি সে মসীহ নই বরং তিনি আমার পরে আসবেন।

দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব এই যে, বারনাবাসের ইঞ্জিলের যে ইটালীর অনুবাদ বর্তমানে দুনিয়ায় পাওয়া যায় তাতে অবশ্যই হযরত (সা)-এর নাম মুহাম্মদ লেখা রয়েছে। কিন্তু এ কিতাব কোন্ কোন্ ভাষা থেকে অনুবাদের পর অনুবাদের মাধ্যমে ইটালীয় ভাষায় উপনীত হয়েছে, তা কেউ জানে না। বলা নিস্প্রয়োজন যে, বারনাবাসের মূল ইঞ্জিল সুরিয়ানী ভাষাতেই হওয়ার কথা। কেননা সেটা হযরত ঈসা (আ) ও তার সহচরদের ভাষা ছিল। সেই আসল কিতাব পাওয়া গেলে দেখা যেত যে তাতে হযরত (সা)-এর নাম কি লেখা হয়েছে। তা যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন কেবল এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে, আসলে হযরত ঈসা (আ) হয়ত 'মুনহামান্না' শব্দটাই ব্যবহার করে থাকবেন। যোহনের ইঞ্জিল থেকে ইবনে ইসহাকের যে বর্ণনার বরাত আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি, তাতেও এ শব্দটারই উল্লেখ পাওয়া গেছে। হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক মুনহামান্না শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার পর বিভিন্ন অনুবাদক তার অনুবাদ করেছেন। আর ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ভাবী নবীর নাম অবিকল 'মুহাম্মদ' শব্দেরই সমর্থক দেখে পরবর্তীকালের কোন অনুবাদক হয়ত এ নামটাই লিখে দিয়েছেন। তাই বলে এ নামটা পরিষ্কারভাবে লেখা থাকাতেই এরূপ সন্দেহ করা চলে না যে, বারনাবাসের গোটা ইঞ্জিলটাই কোন মুসলমানের বানোয়াট রচনা।

তৃতীয় সন্দেহের জবাব এই যে, 'মসীহ' শব্দটা একটা ইসরাইলী পরিভাষা। পবিত্র কুরআনে এটা সুনির্দিষ্টভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর নামে ব্যবহৃত হওয়ার কারণ শুধু এই যে, ইহুদীরা তাকে 'মসীহ' বলে স্বীকার করত না। নচেত এটা কুরআনের পরিভাষাও নয় এবং কুরআনের কোথাও একে ইসরাঈলী পরিভাষার সমার্থক শব্দ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং হযরত ঈসা (আ) যদি রসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে মসীহ শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন এবং কুরআনে তা না করা হয়ে থাকে তবে তার অর্থ এ দাঁড়ায় না যে, বারনাবাসের ইঞ্জিল হযরত (সা)-কে এমন একটা বিশেষণে ভূষিত করছে যা কুরআন অস্বীকার করে। আসলে বনী ইসরাঈলের প্রাচীন রীতি ছিল এই যে, কোনো জিনিস বা ব্যক্তিকে যখন কোন ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হত তখন সেই জিনিসের ওপর বা সেই ব্যক্তির মাথায় তেল মর্দন করে তাকে পবিত্র (Consecrate) করা হত। ইবরানী ভাষায় এই তেল মর্দনকে 'মসহ' বলা হত এবং যার ওপর মর্দন করা হত তাকে বলা হত 'মসীহ'।

ইবাদাতগাহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে এভাবে তৈল মর্দন করে ইবাদাতগাহের নামে ওয়াকফ করে দেয়া হত। যাজকদেরকে যাজকতার কাজে নিয়োগ করার সময়ও এভাবে 'মসহ' করা হত। রাজা বা নবীও যখন আল্লাহর তরফ থেকে রাজত্ব বা নবুয়াতের পদে মনোনীত হতেন তখন তাকে 'মসহ' করা হত। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে বনী ইসরাঈলে একাধিক 'মসীহ' আবির্ভূত হতে দেখা যায়। হযরত হারুন (আ) যাজক হিসেবে মসীহ ছিলেন। হযরত মূসা (আ) যাজক ও নবী হিসেবে, তালুত রাজা হিসেবে, হযরত দাউদ (আ) রাজা ও নবী হিসেবে, মালিক ছাদাক রাজা ও যাজক হিসেবে এবং হযরত আল-ইয়াসা নবী হিসেবে মসীহ ছিলেন। পরে অবশ্য কাউকে নিয়োগ করার ব্যাপারে তেল মর্দনের বাধ্যবাধকতা ছিল না। কেবল আল্লাহর মনোনীত হওয়াই মসীহ হওয়ার শামিল ছিল। উদাহরণ স্বরূপ এক—সম্রাট পুস্তকের ১৯শ' অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ হযরত ইলিয়াস (আ)-কে (ইলিয়াহ) নির্দেশ দেন, হাজাইলকে মসহ কর যেন এরেমের রাজা হয়, নিমসির ছেলে ইয়ানুকে মসহ কর যেন ইসরাঈলের রাজা হয় এবং আল-ইয়াসকে মসহ কর যেন তোমার জায়গায় নবী হয়। এঁদের কারও মাথায় তেল মর্দন করা হয়নি। কেবল আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেয়াতেই মসহ করা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ইসরাঈলীদের ধারণা অনুসারে 'মসীহ' আসলে 'আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত' শব্দের সামর্থক। এ অর্থেই হযরত ঈসা (আ) হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-কে মসীহ বলে অভিহিত করেছিলেন। (মসীহ শব্দের ইসরাইলী তাৎপর্যের ব্যাখ্যার জন্যে দেখুন সাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিকাল লিটারেচার, 'মেসিয়াহ' শব্দ)।[৭৮]

অধ্যায় ঃ ৪

বিশ্বনেতা

বিশ্বনেতা*

(সারা দুনিয়ার সার্বজনীন উত্তরাধিকার)

আমরা মুসলমানরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বিশ্বনেতা বলে থাকি। সরল ভাষায় এর অর্থ হল দুনিয়ার সরদার। হিন্দী ভাষায় এর অনুবাদ হবে জগতগুরু। ইংরেজিতে Leader of the world দৃশ্যতঃ এটা একটা বিরাট উপাধি। তবে যে মহান ব্যক্তিকে এ উপাধি দেয়া হয়েছে তাঁর কর্মকাণ্ড সত্যিই এমন যে তাঁকে বিশ্বনেতা বললে এতটুকু অতিরঞ্জিত হবে না। বরং একেবারে তা হবে বাস্তব সত্য।

চিন্তা করে দেখুন, কোনো ব্যক্তিকে দুনিয়ার নেতা বলে মেনে নেয়ার পয়লা শর্ত এই যে, তিনি কোনো বিশেষ জাতি বর্ণ বা শ্রেণীর কল্যাণের জন্যে নয় বরং সারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করেছেন। একজন দেশপ্রেমিক বা জাতীয়তাবাদী নেতা আপন জাতির সেবা করেছেন বলে তাঁকে যত খুশী শ্রদ্ধা জানাতে পারেন কিন্তু আপনি যদি তার দেশ ও জাতির লোক না হন তাহলে তিনি কিছুতেই আপনার নেতা হতে পারে না। যে ব্যক্তির সমস্ত ভালবাসা, মঙ্গল কামনা ও সমস্ত জনকল্যাণমূলক তৎপরতা কেবল চীন স্পেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তার সাথে একজন ভারতবাসীর কি সম্পর্ক যে তাকে নেতা বলে মেনে নেবে ? সে যদি নিজের জাতিকে অন্যান্য জাতির চেয়ে উত্তম মনে করে এবং অন্যান্য জাতিকে পদানত করে নিজের জাতিকে সমৃদ্ধশালী করতে চায় তাহলে তো অন্যান্য জাতির লোক তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য হবে। সকল জাতির লোক কোনো এক ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা বলে মানতে পারে কেবল তখন, যখন তিনি সকল মানুষ ও সকল জাতিকে একচোখে দেখেন, সকলের সমান কল্যাণকামী হন এবং হিতকামনায় কিছুতেই এক জাতিকে অন্য জাতির ওপর প্রাধান্য দেন না।

সারা দুনিয়ার মানুষের নেতা হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত এই যে, তাঁর দেয়া আদর্শ ও মূলনীতিসমূহ যেন সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শক হয় এবং তাতে মানব জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান নিহিত থাকে। নেতা শব্দের মানেই হল দিশারী বা পথপ্রদর্শক। নেতার প্রয়োজন এ জন্যেই হয় যে, কোন্ পথে চললে কল্যাণ ও মঙ্গল হবে তা তিনি দেখাবেন। কাজেই যিনি সারা বিশ্বের মানুষকে তাদের সবার কল্যাণের পথ বলে দিতে পারেন তিনিই হতে পারেন বিশ্বনেতা।

বিশ্বনেতা হওয়ার তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত হল, তার পথনির্দেশনা যেন কোনো বিশেষ সময় বা কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ না হয়, বরং সকল অবস্থায় ও সকল যুগে তার উপযোগিতা ও স্বার্থকতা একই রকম থাকে, একই রকম নির্ভুল ও সঠিক সাব্যস্ত হয় এবং একই রকম অনুকরণযোগ্য হয়। যে নেতার নেতৃত্ব এক সময়ে উপযোগী ও অন্য সময় অনুপযোগী হয় —এক সময় চালু এবং অন্য সময়ে অচল হয়ে যায়, তাঁকে বিশ্বনেতা বলা যায় না। বিশ্বনেতা শুধুমাত্র তিনিই হতে পারেন যাঁর নেতৃত্ব ততদিন কার্যকর থাকবে বিশ্বজগত যতদিন টিকে থাকবে।

---

* এটা একটা বেতার ভাষণ। দেশ বিভাগের কয়েক বছর আগে ১৯৪১ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে এটা প্রচার করা হয়। এ ভাষণের শ্রোতা শুধু মুসলমানরা ছিল না। হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান এবং পারসিকরাও ছিল।–(সংকলকবৃন্দ)

চতুর্থ এবং সবচেয়ে জরুরী শর্ত এই যে, তিনি যেন শুধু আদর্শ দিয়েই ক্ষ্যান্ত না থাকেন বরং নিজের দেয়া আদর্শকে বাস্তব জীবনে কার্যকর করে দেখিয়ে দেন এবং তার ভিত্তিতে একটা প্রাণবন্ত ও জাগ্রত সমাজ গঠন করেন। কেবল আদর্শ দিয়েই যিনি কর্তব্য সমাধা করেন তিনি বড়জোর একজন চিন্তাবিদ হতে পারেন ; নেতা হতে পারেন না। নেতা হতে হলে আদর্শকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেয়া অপরিহার্য।

এবার দেখা যাক, যে ব্যক্তিকে আমরা বিশ্বনেতা বলে থাকি, এ চারটি শর্ত তাঁর মধ্যে কতদূর পূর্ণ রয়েছে ঃ

প্রথমে পয়লা শর্ত নিয়ে ভেবে দেখুন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী পড়ে দেখলে এক নজরেই বুঝতে পারা যায় যে, এ কোনো জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমিকের জীবনী নয় —বরং একজন মানবপ্রেমিক ও একটা বিশ্বজনীন মতবাদের প্রবক্তার জীবনী। তাঁর দৃষ্টিতে সকল মানুষ ছিল সমান। কোনো বিশেষ বংশ, শ্রেণী, জাতি, বর্ণ অথবা দেশের বিশেষ স্বার্থ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। ধনী-গরীব, বড়লোক-ছোটলোক, সাদা-কালো, আরব-অনারব, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, আর্য-অনার্য এসবের কোনো ভেদাভেদ তিনি মানতেন না। এসবকে তিনি একই মানব জাতির সদস্য মনে করতেন। তাঁর মুখ থেকে সারাজীবনেও এমন একটা শব্দ বা বাক্যও কেউ শোনেনি আর জীবনে তিনি এমন একটা কাজও কখনও করেননি যার দ্বারা সন্দেহ হতে পারে যে সমগ্র মানবজাতির পরিবর্তে একটা বিশেষ মানব শ্রেণীর স্বার্থের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ কারণেই তাঁর জীবিতকালেই আরবদের মত হাবশী, ইরানী, রোমক, মিসরীয় এবং ইসরাঈলীরাও তাঁর সহযোগী ও সহকর্মী হয়। আর তাঁর ইন্তিকালের পর পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে প্রত্যেক বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে তাদের স্বজাতির মতই নিজেদের নেতারূপে গ্রহণ করেছে। তাঁর সেই নির্ভেজাল মানবতাবাদের কল্যাণেই আজ একজন সুদূর ভারতবাসীর* মুখেও লোকে সহস্রাধিক বছর পূর্বে আরবে জন্মগ্রহণকারী সেই মানুষটির প্রশংসা শুনতে পায়।

এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত দু'টো একত্রে বিচার করা যাক। হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশেষ জাতি ও বিশেষ দেশসমূহের সাময়িক ও আঞ্চলিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করেননি। তার পরিবর্তে তিনি দুনিয়ার মানবজাতির যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, তার সমাধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। কেননা সেই বড় সমস্যাটার সমাধান হলেই সকল মানুষের যাবতীয় খুঁটিনাটি সমস্যার আপনাআপনিই সমাধান হয়ে যায়। সেই বড় সমস্যাটা হলো এই ঃ

“বিশ্বজগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকৃতপক্ষে যে নীতি অনুসারে চলছে, মানুষের জীবনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাও ঠিক সেই নীতি অনুসারেই চলা উচিত। কেননা মানুষ বিশ্বজগতেরই একটা অংশ। অংশ যদি সমষ্টির বিরুদ্ধে চলে তাহলে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে পড়ে।”

এ কথাটা ভাল করে বুঝবার সহজ পন্থা হচ্ছে, নিজের দৃষ্টিকে একটু প্রসারিত করে স্থান ও কালের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। গোটা পৃথিবীটার ওপর ব্যাপকভাবে নজর দিয়ে কল্পনা করতে হবে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত

* এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভাষণ যখন প্রচারিত হয় তখন ভারত বিভক্ত হয়নি।–(সংকলকবৃন্দ)

এবং ভবিষ্যতে অনন্তকাল পর্যন্ত দুনিয়ায় বসবাসকারী সকল মানুষ যেন চোখের সামনে রয়েছে। তারপর ভাবতে হবে, মানুষের জীবনে যত আপদ-বালাই ও বিপর্যয় আসে, বা আসতে পারে, তার মূল কারণ কি এবং কি হতে পারে। এ প্রশ্ন নিয়ে যতই চিন্তা করা যাবে এবং যত বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করা যাবে, তার একটা উত্তরই পাওয়া যাবে। সে উত্তর হল ঃ

"স্রষ্টার বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতাই সমস্ত বিপদ-আপদ ও বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার মূল কারণ।"

কেননা স্রষ্টার অবাধ্য হওয়ার পর মানুষের সামনে দু'টো পথ খোলা থাকে। এ দু'টোর কোনো না কোনো একটা সে গ্রহণ না করে পারে না। হয় সে নিজেকে স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন ভেবে যা খুশী তাই করে এবং এ কারণে সে হয়ে যায় যালেম। অথবা সে স্রষ্টা বাদে অন্যান্য শক্তির আনুগত্য করে এবং এতে করে দুনিয়াতে অসংখ্য রকমের বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার উদ্ভব ঘটে। উভয় অবস্থাতেই এমন খারাপ পরিণতি দেখা দেয় কেন? এর সরল ও সুস্পষ্ট জবাব এই যে, এ রকম করা যেহেতু বাস্তবতার পরিপন্থী, তাই অনিবার্যভাবেই এর খারাপ পরিণতি দেখা দেয়। এ বিশ্বজগত বাস্তবিকপক্ষে খোদারই সাম্রাজ্য। পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ, বাতাস, পানি, আলো—এসব কিছুরই মালিক তিনি। মানুষ তাঁর এ সাম্রাজ্যে জন্মগত প্রজা ও দাস (Born Subject)। এ গোটা সাম্রাজ্য যে নিয়মে চলছে, তারই একটা অংশ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যদি সেই নিয়মের বিরুদ্ধে চলে তাহলে তার এ আচরণের ধ্বংসাত্মক পরিণতি দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী। সে যদি মনে করে যে, তার ওপর কোনো কর্তৃত্বশীল সত্তা নেই এবং কারও কাছে সে দায়ীও নয়, তবে তার এ ধারণা হবে প্রকৃত অবস্থার পরিপন্থী। তাই সে যখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে দায়িত্বহীনভাবে কাজ করে এবং নিজের জীবন কোন্ নিয়মে চালাবে তা সে নিজেই ঠিক করে, তখন অনিবার্যভাবে তার ফল খারাপ হয়ে দেখা দেয়। ঠিক একইভাবে স্রষ্টা ছাড়া অন্য কাউকে ক্ষমতাশালী ও কর্তৃত্বশীল মেনে নেয়া, তাকে ভয় করা বা তার কাছ থেকে কিছু লাভ করার লালসা পোষণ করা এবং তার প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের সামনে মাথা নত করাও প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী। কেননা আসলেই স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ এ মর্যাদার অধিকারী নয়। তাই এর ফলাফলও বিষময় হয়ে দেখা দেয়। সঠিক ও কল্যাণকর ফল পেতে হলে তার একমাত্র উপায় এই যে, আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে যে সত্যিকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার সামনে মানুষকে মাথা নত করতে হবে, নিজের আমিত্ব ও স্বকীয়তা তার সামনে বিসর্জন দিতে হবে। আনুগত্য ও দাসত্বকে শুধুমাত্র তার জন্যে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং নিজের জীবনের নীতি ও বিধান নিজে নিজেই রচনা করা বা অন্যের দ্বারা রচিত করার পরিবর্তে সেই কর্তৃত্বের মালিকের কাছ থেকেই নিতে হবে।

মানব জীবনের জন্যে মুহাম্মদ (সা) এ মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাবই পেশ করেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বন্ধন থেকে এ মুক্ত পৃথিবীতে যেখানে যেখানে মানুষের বসতি রয়েছে। এ একটা মাত্র সংস্কারমূলক প্রস্তাবনা তাদের জীবনের সমস্ত বিকল ও বিশৃঙ্খল তৎপরতা শুধরে দিতে পারে। এ প্রস্তাবনা অতীত ও ভবিষ্যতের বন্ধন থেকেও মুক্ত। দেড় হাজার বছর আগে এটা যতখানি বিশুদ্ধ ও কার্যকর ছিল ততখানি আজও আছে এবং দশ হাজার বছর পরেও থাকবে।

এখন রইল সর্বশেষ শর্তটি। এ এক ঐতিহাসিক সত্য যে, মুহাম্মদ (সা) শুধু একটা কাল্পনিক আদর্শের রূপরেখা পেশ করেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং সেই রূপরেখার ভিত্তিতে একটা জীবন্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে লাখ লাখ মানুষকে খোদার কর্তৃত্বের অনুগত ও বাধ্য হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে আপন প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং খোদা ছাড়া অন্যান্য সত্তার আনুগত্য থেকে মুক্ত করেছেন। অতপর তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে খোদার একক আনুগত্য ও দাসত্বের ভিত্তিতে একটা নতুন নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পত্তন করেছেন। এভাবে সারা দুনিয়ার মানুষকে তিনি বাস্তব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তার দেয়া নীতি ও কর্মসূচী অনুসারে কি ধরনের জীবনধারা গড়ে ওঠে এবং সে জীবনধারা অন্যান্য নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জীবনধারার তুলনায় কত ভাল, কত পবিত্র ও কত ন্যায়নিষ্ঠ।

এ হল নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সুমহান অবদান। এ অবদান রেখে গেছেন বলেই তাঁকে আমরা বিশ্বনেতা বা সারা দুনিয়ার সরদার বলে মানি। তাঁর এ অবদান কোনো বিশেষ জাতির জন্যে ছিল না, ছিল সমগ্র মানবজাতির জন্যে। এটা সমগ্র মানবজাতির সম্মিলিত উত্তরাধিকার। এতে কারও অধিকার কারও চেয়ে কম বা বেশী নয়। এ উত্তরাধিকার থেকে যে কেউ লাভবান হতে পারে। এর বিরুদ্ধে কারও বিদ্বেষ পোষণের কি কারণ থাকতে পারে তা আমি বুঝি না।[৭৯]

সরওয়ারে আলমের প্রকৃত অবদান*

এ কথা সারা দুনিয়ার মানুষ জানে যে, আল্লাহর মনোনীত যে দলটি আদিম যুগ থেকে মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত, আনুগত্য এবং সৎ চরিত্রের শিক্ষা দেয়ার জন্যে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে এসেছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সে দলেরই একজন। এক আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব এবং পরিচ্ছন্ন নৈতিক জীবন যাপনের যে শিক্ষা চিরদিন দুনিয়ার নবীগণ ও মুনি-ঋষিগণ দিয়ে এসেছেন, হযরত (সা)ও সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি খোদা সম্পর্কে কোনো অভিনব তত্ত্ব পেশ করেননি এবং পূর্ববর্তী নবীরা নৈতিকতার যে শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আলাদা অভিনব কোনো চরিত্রের শিক্ষাও তিনি দেননি। তা যখন দেননি তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তাঁর সেই আসল অবদানটা কি—যার জন্যে আমরা তাঁকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানব বলে অভিহিত করে থাকি ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, নবী মুহাম্মদের পূর্বে মানুষ খোদার অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে অবশ্যই অবগত ছিল। তবে এ দার্শনিক তত্ত্বের সাথে মানুষের চরিত্রের সম্পর্ক কি তা তাদের জানা ছিল না। তবে সে সময় চরিত্রের উত্তম মূলনীতিগুলো সম্পর্কে মানুষ ওয়াকিফহাল ছিল কিন্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব চারিত্রিক মূলনীতির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন কিভাবে হওয়া উচিত তা কারও ভাল করে জানা ছিল না। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, চারিত্রিক মূলনীতি ও মানুষের বাস্তব জীবন এ তিনটি জিনিস ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এর একটার সাথে অন্যটার কোনো বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র, কোনো নিবিড় সম্পর্ক এবং কোনো কার্যকর বন্ধন ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (সা) এ তিনটি জিনিসকে একটা একক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসেন। এ তিনটির সমন্বয়ে তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও তামাদ্দুন গড়ে তোলেন। সে সভ্যতা ও তামাদ্দুনের রূপরেখা তিনি শুধু কল্পনার জগতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তিনি বাস্তব জগতেও তা কায়েম করে রেখেছেন।

ঈমান একটা কর্মোদ্দীপক শক্তি

নবী মুহাম্মদ (সা) বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান শুধু একটা দার্শনিক তত্ত্ব মেনে নেয়ার নাম নয়, বরং সে ঈমান আপন উৎপত্তিগত দিক দিয়ে স্বভাবতই এক বিশেষ ধরনের চরিত্র দাবী করে। মানুষের বাস্তব জীবনের আচরণে এ চরিত্রের প্রতিফলন ঘটা উচিত। ঈমান একটা বীজস্বরূপ। মানুষের মনে যখনই সে বীজ অংকুরিত হয় তখনই আপন স্বভাবের তাগিদে সে একটা বিশেষ ধরনের কর্মজীবনের গাছ জন্মাতে শুরু করে দেয়। সে গাছের কাণ্ড থেকে আরম্ভ করে প্রতিটা শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবে ঐ বীজ থেকে নির্গত জীবনরস সঞ্চারিত হয়। মাটিতে আমের আঁটি রোপণ করলে তা থেকে লেবু গাছ হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি মানুষের মনে আল্লাহর দাসত্বের বীজ রোপণ করা হবে এবং তা থেকে চরিত্রহীনতায় কলুষিত বস্তুবাদী জীবন গড়ে উঠবে এটাও সম্ভব নয়। আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে যে চরিত্রের উৎপত্তি হয় তা এবং শিরক, নাস্তিকতা বা বৈরাগ্যবাদ থেকে যে চরিত্র গড়ে ওঠে তা সমান হতে পারে না। মানব জীবন সংক্রান্ত এসব মতবাদের মেজাজ ও স্বভাব প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রত্যেকটার প্রকৃতি অন্যটা থেকে আলাদা ধরনের চরিত্র দাবী করে।

---

* এটা দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত একটা বেতার ভাষণ।

সারা জীবনের জন্যে খোদাপুরস্তির চরিত্র

খোদার আনুগত্য থেকে যে চরিত্র সৃষ্টি হয় তা শুধু বিশেষ অলী-দরবেশ শ্রেণীর জন্যেই নির্দিষ্ট নয় যে, শুধুমাত্র খানকা ও ধ্যান-তপস্যার নির্জন কক্ষেই সে চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হতে পারবে, বরং ব্যাপকভাবে সমগ্র মানব জীবনে ও তার প্রতিটি দিকে সে চরিত্রের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। একজন ব্যবসায়ী যদি খোদাভক্ত হয় তাহলে তার ব্যবসায়ে খোদাভীতিমূলক চরিত্রের প্রকাশ না ঘটার কোনো কারণ নেই। একজন বিচারক যদি খোদাভক্ত হয় তাহলে আদালতের বিচারকক্ষে এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল যদি খোদাভক্ত হয় তাহলে থানায় বা ফাঁড়িতে তার কাছ থেকে খোদাবিমুখ চরিত্র জাহির হবে — এমনটা আশা করা যেতে পারে না। এমনিভাবে কোনো জাতি যদি খোদাভীরু ও খোদা প্রেমিক হয় তাহলে তাদের নগর বা পৌর জীবনে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এবং যুদ্ধে ও সন্ধিতে খোদানুগত্যমূলক চরিত্রের প্রকাশ ঘটা স্বাভাবিক। নতুবা সে জাতির আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকার কোনো অর্থ হতে পারে না।

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষা

এখন কথা হচ্ছে এই যে, খোদাপুরস্তি কোন্ ধরনের চরিত্র দাবী করে এবং মানুষের বাস্তব জীবনে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধ্যান-ধারণায় সে নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ কিভাবে হতে পারে, তা এমন এক ব্যাপক আলোচ্য বিষয় যা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তবে আমি নমুনা হিসেবে হযরত (সা)-এর কয়েকটা বাণী উদ্ধৃত করছি। এ বাণীগুলো থেকে বুঝা যাবে হযরত (সা) যে জীবনব্যবস্থা দিয়ে গেছেন তাতে ঈমান, আমল ও আখলাখের মধ্যে কত সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। হযরত (সা) বলেন ঃ

الايمان بضع وسبعون شعبة افضلها قول لا اله الا اللّه وادناها ام طة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان-

"ঈমানের অনেক শাখা রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ না মানা হল এর মূল। আর শেষ শাখা হল পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সারিয়ে দেয়া। আর লজ্জাও ঈমানেরই একটা বিভাগ।"

الطهور شطر الايمان "শরীর ও পোশাকের পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

المؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم

"মুমিন হল সেই ব্যক্তি যার থেকে লোকের জান-মালের কোনো আশংকা থাকে না।"

لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له

"যার মধ্যে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা নেই তার ঈমান নেই এবং যে ব্যক্তি ওয়াদা ঠিক রাখে না তার ধর্ম নেই।"

اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئاتك فانت مؤمن-

"যখন ভাল কাজে তোমার আনন্দ হবে এবং মন্দ কাজে অনুশোচনা হবে তখন (বুঝবে যে) তুমি ঈমানদার।"

الايمان الصبر والسماحة "ধৈর্য ও উদারতাকেই ঈমান বলা হয়।"

افضل الايمان ان تحب الله وتبغض الله وتعمل لسانك فى ذكر الله وان تحب للناس ماتحب لنفسك وتكره لهم ماتكره لنفسك -

"সর্বোত্তম ঈমানদারী হল এই যে, তোমার শত্রুতা ও মিত্রতা হবে আল্লাহর ওয়াস্তে, তোমার মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হতে থাকবে এবং তুমি নিজের জন্যে যা পছন্দ কর অন্যের জন্যেও তাই পছন্দ করবে। আর নিজের জন্যে যা অপছন্দ কর অন্যের জন্যেও তা অপছন্দ করবে।"

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله -

"মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঈমান হল সেই ব্যক্তির যার স্বভাব-চরিত্র সবচেয়ে ভাল এবং যে আপন পরিবার-পরিজনের সাথে সবচেয়ে বেশী সদাচারণ করে।"

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ولا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে তার উচিত অতিথির যত্ন করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া। আর যদি তার কিছু বলতেই হয় তবে যেন ভাল কথা বলে অথবা যেন চুপ থাকে।"

ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذى -

"মু'মিন কখনও অপবাদ ও অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও কটুভাষী হয় না।"

يطبع المؤمن على الخصال كلها الا الخيانه والكذب -

"মু'মিন আর সবকিছুই হতে পারে কিন্তু আত্মসাতকারী ও মিথ্যাবাদী হতে পারে না।"

وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ والله لايؤمن والله لايؤمن الذى لايَامَنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ -

"আল্লাহর কছম সে মু'মিন নয়! আল্লাহর কসম সে মু'মিন নয়!! আল্লাহর কছম সে মু'মিন নয়!!! যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ -

"প্রতিবেশী অভুক্ত থাকতে যে নিজে পেট ভরে খায় সে মুমিন নয়।"

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وهو يَقْدِرُ عَلٰى ان ينفذه مَلاَءَ الله قلبه اَمْنًا وَاِيْمَانًا -

"ক্রোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সংযত করে আল্লাহ তার মনকে ঈমান ও নিশ্চিন্ততায় পরিপূর্ণ করে দেন।"

مَنْ صَلّٰى يُرائِى فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرائِى فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَايِئُ فَقَدْ اَشْرَكَ

"যে ব্যক্তি লোক দেখান নামায পড়ে সে শিরক করে, যে ব্যক্তি লোক দেখান রোযা রাখে সে শিরক করে এবং যে ব্যক্তি লোক দেখান দান-খয়রাত করে সেও শিরক করে।"

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ـ إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

"চারটি দোষ যার ভেতরে থাকে সে পুরোপুরি মোনাফেক। আমানত খেয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায়।"

عدلت الشَّهَادَةَ الزُّوْرَ بِالْاِ شْرَاكِ بِاللّٰهِ ـ

"মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এত বড় গুনাহ যে, তা শিরকের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।"

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য বজায় রাখতে গিয়ে নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে সে-ই হল আসল মুজাহিদ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো ত্যাগ করে সে-ই হল আসল মুহাজির।"

اَتَدْرُوْنَ مَنِ السَّابِقُوْنَ اِلٰى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ـ قَالَ الَّذِيْنَ اِذَا اُعْطُوْا الْحَقَّ قَبِلُوْاهُ وَاِذَا سُئِلُوْهُ ـ بَذَلُوْهُ وَحَكَمُوْا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِاَنْفُسِهِمْ ـ

"তোমরা কি জান কারা কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর ছায়ায় স্থান পাবে? শ্রোতারা বলল, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। তখন হযরত (সা) বললেন, যাদের সামনে সত্য পেশ করা হলে তা গ্রহণ করে, অধিকার দাবী করলে মুক্ত মনে তা দিয়ে দেয়, আর নিজেদের ব্যাপারে যেমন ফায়সালা তারা কামনা করত, অন্যদের বেলায়ও তেমনি ফায়সালা করে।"

اَضْمِنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمِنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ ـ اَصْدِقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ ـ وَاَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُمْ ـ وَاَدُّوْا اِذَا ائْتُمِنْتُمْ ـ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ ـ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ ـ

"তোমরা আমাকে ছয়টা জিনিসের নিশ্চয়তা দিলে আমি তোমাদেরকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দেব। কথা বললে সত্য বলবে, ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করবে, তোমাদের কারও কাছে আমানত রাখা হলে তা পালন করবে ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবে, কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এবং যুলুম থেকে নিবৃত্ত থাকবে।"

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ ـ

"ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও দান করে যে বলে বেড়ায় এ ধরনের লোক বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهِ ـ

"হারাম খাদ্য থেকে তৈরী গোশত বেহেশতে যাবে না। যে গোশত হারাম খাদ্যের দ্বারা প্রতিপালিত তার জন্যে আগুন বা জাহান্নামই উপযোগী।"

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهِ لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللّٰهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ -

"যে ব্যক্তি দোষযুক্ত জিনিস বিক্রি করে এবং খরিদ্দারকে তার দোষের কথা জানিয়ে দেয় না, তার ওপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ থাকেন এবং ফেরশতারা তাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে।"

لَوْ اَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَقْضٰى دَيْنَهُ -

"কোনো ব্যক্তি যদি বারবার জীবনধারণ করে ও বারবার আল্লাহর পথে শহীদ হয় তথাপি সে বেহেশতে যেতে পারবে না যদি সে তার ঋণ পরিশোধ না করে।"

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ -

"পুরুষ কিংবা স্ত্রী যে হোক না কেন জীবনের ষাট বছরও যদি আল্লাহর আনুগত্য করে কাটায় কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে এলে কারও হক নষ্ট করে ওছিয়ত করে, তাহলে উভয়ের দোযখে যাওয়া অবধারিত।"

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ -

"অধীনস্থদের সাথে খারাপ আচরণকারীরা বেহেশতে যাবে না।"

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ ؟ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَاِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ -

"রোযা, নামায ও দান-খয়রাতের চেয়েও ভাল কাজ কি জান ? সেটা হল পারস্পরিক বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেয়া। আর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা এমন মারাত্মক কাজ যে, তার দ্বারা মানুষের সমস্ত নেক কাজ নষ্ট হয়ে যায়।"

اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّاتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَّزَكٰوةٍ وَيَاْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يَقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ -

"প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব তাকে বলে যে কেয়ামতের দিন প্রচুর পরিমাণ নামায, রোযা ও যাকাত সাথে নিয়ে আসবে কিন্তু সেই সাথে কাউকে গালী দিয়ে এসেছে, কাউকে অপবাদ দিয়ে এসেছে, কারও মাল আত্মসাৎ করে এসেছে, কারও রক্তপাত করে এসেছে কিংবা কাউকে প্রহার করে এসেছে। অতপর খোদা তার এক একটি নেকী ঐসব মজলুমদের মধ্যে বন্টন করেন। তারপরও তার ঋণ পরিশোধ হল না বলে তাদের গোনাহ তার ওপর চাপান হল এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হল।"

لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتّٰى يُعْذِرُوْا مِنْ اَنْفُسِهِمْ -

"নাজাত থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না—যদি সে মন্দ কাজের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করে নিজের মনকে নিশ্চিন্ত না করে।"

المحتكر ملعون-

"যে ব্যবসায়ী দাম বাড়ানোর জন্যে জিনিসপত্র আটকে রাখে সে অভিশপ্ত।"

من احتكر طعاما اربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله-

"মূল্য বৃদ্ধির আশায় যে ব্যক্তি ৪০ দিন খাদ্যদ্রব্য আটকে রাখে, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই।"

من احتكر طعاما اربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة-

"খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন আটকে রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয়, তবুও আটকে রাখার গুনাহ মাফ হবে না।

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বহু উক্তির মধ্যে কয়েকটি পেশ করা হল। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত (সা) ঈমানের সাথে চরিত্রের এবং চরিত্রের সাথে জীবনের সকল বিভাগের সম্পর্ক কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন যে, হযরত (সা)-এর এসব উক্তি কেবল কথার কথাই ছিল না, বরং বাস্তব জগতে একটি গোটা দেশের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি তারই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এই হচ্ছে তাঁর সেই বিরাট অবদান যার জন্যে তিনি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।[৮০]

অধ্যায় ঃ ৫

খতমে নবুয়াত

খতমে নবুয়াতের তাৎপর্য ও তার যুক্তি

খতমে নবুয়াতের নির্ভুল ব্যাখ্যা

যতদিন পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি এমন এক সীমায় উপনীত হয়নি, যাতে করে কোনো নবীর বাণী ব্যাপকভাবে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এমন কোনো মানবগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়নি যারা নবীর বাণী, তাঁর শিক্ষা ও চারিত্রিক আদর্শ সংরক্ষিত করে তাকে বিশ্বের সকল এলাকায় ছড়িয়ে দিতে পারে, ততদিন পর্যন্ত নবুয়াতের ধারাবাহিকতা জারী থাকে। বিভিন্ন দেশে ও জাতির মধ্যে নবী প্রেরিত হতে থাকেন। কিন্তু যখন একদিকে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়, যার ফলে একজন নবীর বাণী দুনিয়া জোড়া রূপ নিতে সক্ষম হয় এবং অন্যদিকে সত্য-নির্দেশ গ্রহণকারী এমন একটি মানবগোষ্ঠী সংগঠিত হয় যে, আল্লাহর কিতাব এবং কিতাব বহনকারী নবীর জীবন ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ কার্যকর নেতৃত্বকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত করার যোগ্যতা অর্জন করে, তখন নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে আর কোনো নবী প্রেরণের প্রয়োজন* থাকেনি।[৮১]

রসূলে করীম (সা)-এর পূর্বের যুগের বিশেষ অবস্থা

প্রথমদিকে প্রত্যেক জাতির মধ্যে আলাদা আলাদা নবী আসতেন। তাদের শিক্ষা তাদের জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। এর কারণ সে সময় দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি পরস্পর থেকে আলাদা ছিল। তাদের মধ্যে বেশী মেলামেশা ছিল না। প্রত্যেক জাতি যেন তার নিজের স্বদেশের সীমার মধ্যে বন্দী ছিল। এ অবস্থায় কোনো সাধারণ শিক্ষা সকল জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করা কঠিন ছিল। এছাড়া বিভিন্ন জাতির অবস্থাও সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। অজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। এ অজ্ঞতার কারণে আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্রের মধ্যে যেসব ত্রুটি জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন স্থানে তার আকৃতি ছিল বিভিন্ন। এ জন্যে প্রয়োজন ছিল আল্লাহর নবী প্রত্যেক জাতিকে পৃথক পৃথক শিক্ষা ও হেদায়াত দেবেন, ধীরে ধীরে ভুল চিন্তাগুলো নির্মূল করে নির্ভুল চিন্তাগুলো ছড়াবেন, জাহেলী পদ্ধতি বর্জন করে ধীরে ধীরে তাদেরকে উন্নত পর্যায়ের আইন মেনে চলা শেখাবেন এবং শিশুদেরকে যেভাবে শিক্ষা দিয়ে ও পরিচর্যা করে গড়ে তোলা হয় তাদেরকেও ঠিক তেমনিভাবে গড়ে তুলবেন। আল্লাহ জানেন, এভাবে জাতিদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে কত হাজার বছর শেষ হয়ে গেছে। যা হোক উন্নতি লাভ করতে করতে একদিন সে সময়টি এসে গেল যখন মানবজাতি শৈশবাবস্থার সীমা পেরিয়ে সাবালকত্বের বয়সে পৌঁছে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরির উন্নতির সাথে সাথে জাতিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। চীন-জাপান থেকে নিয়ে ইউরোপ-আফ্রিকার দূরবর্তী দেশগুলো পর্যন্ত নৌ-চলাচল ও স্থলপথে সফর শুরু হয়ে গেল। অধিকাংশ জাতির মধ্যে বর্ণমালার প্রচলন হল। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারলাভ করল এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার আদান-প্রদান শুরু হল। বড় বড় দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার জন্ম হল। তারা বিরাট-বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে

---

* যারা খতমে নবুয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মানবিক জ্ঞানের জন্যে এর প্রয়োজন নেই বলে দাবী করে, তারা আসলে নবুয়াতের ধারাবাহিকতার অবমাননা ও তার ওপর আক্রমণ চালায়। এ ব্যাখার অর্থ দাঁড়ায় ঃ জ্ঞানের একটি বিশেষ অবস্থা পর্যন্তই নবীর এ হেদায়াতের প্রয়োজন হয়, এরপর মানুষ নবীর নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থাকে না।—লেখক

কয়েকটি দেশ ও জাতিকে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন করল। এভাবে মানবজাতির পূর্বের বংশধরদের মধ্যে যে ব্যবধান, দূরুত্ব ও বিচ্ছেদ ছিল তা ধীরে ধীরে কম হতে থাকল। এখন সমগ্র বিশ্বের জন্যে ইসলামের একক শিক্ষা ও একক শরীয়াত পাঠানোর মতো পরিবেশ সৃষ্টি হল। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মানুষের অবস্থার এতটা উন্নতি সাধিত হয়েছিল যে, তারা নিজেরাই একটি সবার উপযোগী একক ধর্ম প্রত্যাশা করছিল। বৌদ্ধধর্ম যদিও কোনো পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ছিল না এবং সেখানে মাত্র কয়েকটি নৈতিক বিধানেরই অস্তিত্ব ছিল, তবুও তা ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে একদিকে চীন-মঙ্গোলিয়া ও জাপান পর্যন্ত এবং অন্যদিকে আফগানিস্তান ও বুখারা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারকরা এ ধর্ম প্রচার করতে করতে বহু দূরদেশে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এর কয়েকশ' বছর পর ঈসায়ী ধর্মের আবির্ভাব হল। হযরত ঈসা (আ) ইসলামের শিক্ষা নিয়ে এলেও তাঁর তিরোধানের পর ঈসায়ী ধর্ম নামে একটি পঙ্গু ও বিকৃত ধর্ম তৈরী করে নেয়া হল। ঈসায়ীরা এ ধর্মটি ছড়িয়ে দিল ইরান থেকে নিয়ে ইউরোপের অতি দূরদেশ পর্যন্ত। এসব ঘটনা সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ করছে যে, তদানিন্তন বিশ্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি বিশ্বধর্মের প্রত্যাশা করছিল। এ জন্যে সে নিজেকে এতটা প্রস্তুত করে নিয়েছিল যে, তখনও পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল ধর্ম না পাওয়া গেলেও সে অপরিপক্ক ও অসম্পূর্ণ ধর্মগুলোকেই মানব জাতির মধ্যে ছড়ানো শুরু করে দিল।

দ্বীনের পূর্ণতা ও খতমে নবুয়াত

এ সময় সারা দুনিয়ায় ও সারা দুনিয়ার মানব জাতির জন্যে একজন নবী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আরব দেশে পাঠানো হল ; তাঁকে ইসলামের পরিপূর্ণ শিক্ষা ও পূর্ণাঙ্গ আইন দান করে সারা দুনিয়ায় তা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

তাই নিসন্দেহে বর্তমান যুগে মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষা ও কুরআন মজীদ ছাড়া ইসলামের সত্য-সরল পথ জানার দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। মুহাম্মদ (সা) সমগ্র মানবজাতির জন্যে আল্লাহর নবী। নবীর সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা তাঁর ওপর খতম করে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষের জন্যে যে পরিমাণ নির্দেশ ও বিধান দান করতে চাচ্ছিলেন তা সব তাঁর এ শেষ নবীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহর এ শেষ নবীর ওপর ঈমান আনা সত্যসন্ধানী ও আল্লাহর অনুগত বান্দা হতে ইচ্ছুক প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য। তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা মেনে চলা এবং যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তা অনুসরণ করা তাদের অপরিহার্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।[৮২]

খতমে নবুয়াতের প্রমাণ

নবুয়াতের তাৎপর্য অনুধাবনকারী ব্যক্তির জন্যে এ কথা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয় যে, নবীর জন্ম প্রতিদিন হয় না এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে সবসময় একজন নবী থাকা অপরিহার্য নয়। নবীর শিক্ষা ও হেদায়াতের জীবনই হচ্ছে নবীর জীবন। যতদিন তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত বেঁচে থাকে ততদিন যেন তিনি নিজেই বেঁচে থাকেন। আগের নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। কারণ তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছিলেন লোকেরা তা বিকৃত করে ফেলেছে। যেসব গ্রন্থ তাঁরা এনেছিলেন সেগুলোর একটিও আজ তাদের আসল অবস্থায় নেই। তাঁদের অনুসারীরাও আজ এ দাবী করতে পারবে না যে, তাদের নবী যে গ্রন্থ এনেছিলেন তা

আসল ও অবিকৃত অবস্থায় তাদের নিকট আছে। তারা নিজেদের নবীদের জীবন চরিতও বিস্মৃত হয়েছে। আগের নবীদের কোনো একজনেরও জীবনের নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ঘটনাবলী আজ কোথাও পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁরা কোন্ যুগে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কি কাজ করেছিলেন তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাঁরা কোথায় জীবনযাপন করেছিলেন, কি শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কোন্ সব কথা ও কাজ থেকে মানুষকে বিরত রেখেছিলেন এ কথাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতের যুগ এখনও চলছে। কারণ তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত জীবিত রয়েছে। তিনি যে কুরআন দিয়েছিলেন তা তার আসল শব্দাবলীসহ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে কোথাও একটি হরফের হেরফের হয়নি। একটি নোকতা বা জের-জবরের ওলট-পালট হয়নি। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর কথা ও কর্ম সবকিছু যথাযথভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইতিহাসে আজো এসবের চেহারা এতই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল যেন আমরা স্বচক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দেখছি। দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তির জীবন রসূল করীম (সা)-এর ন্যায় এতবেশী সংরক্ষিত নয়। আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে সবসময় রসূলে করীম (সা)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারি। রসূলে করীম (সা)-এর পর অন্য কোনো নবীর প্রয়োজন না থাকার এটিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

একজন নবীর পর আর একজন নবী আসার কেবল তিনটি মাত্র কারণ হতে পারে।

এক. প্রথম নবীর শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং তাকে পুনর্বার পেশ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

দুই. প্রথম নবীর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয় এবং তার মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

তিন. প্রথম নবীর শিক্ষা একটি বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অন্য জাতিদের জন্যে আর একজন পৃথক নবীর প্রয়োজন।*

এক ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষা ও হেদায়াত জীবিত আছে। তাঁর দ্বীন কি ছিল, তিনি কি হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন, কোন্ ধরনের জীবন পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন এবং কোন্ পদ্ধতিগুলো তিনি খতম করার ও বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, যে কোনো সময় তা জানা যেতে পারে। এ বিষয়গুলো জানার উপায় পুরোপুরি সংরক্ষিত রয়েছে। কাজেই তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াতগুলো যখন খতম হয়ে যায়নি তখন সেগুলোকে নতুন করে উপস্থাপিত করার জন্যে কোনো নবী আসার প্রয়োজন নেই।

দুই ঃ রসূলে করীম (সা)-এর মাধ্যমে দুনিয়াকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের শিক্ষা দান করা হয়েছে। এখন আর তার মধ্যে কিছু কমানো বাড়ানোর প্রয়োজন নেই এবং তার মধ্যে এমন কোনো অভাব বা কমতিও নেই, যা পূরণ করার জন্যে কোনো নবী আসার প্রয়োজন হয়। কাজেই দ্বিতীয় কারণটিও দূর হয়ে গেল।

* চতুর্থ কারণ হিসেবে আর একটি কারণও দেখানো যেতে পারে। সেটি হচ্ছে, এক নবীর উপস্থিতিতে তাঁর সাহায্যের জন্যে আর একজন নবীও পাঠানো যায়। কিন্তু আমি এ কারণটির উল্লেখ করিনি। কারণ কুরআন মজীদে এর মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। ঐ দু'টি ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত থেকে সাহায্যকারী নবী পাঠাবার কোনো সাধারণ নিয়ম আল্লাহর নিকটে আছে বলে সিদ্ধান্ত করা যায় না।—গ্রন্থকার

তিন ঃ রসূলে করীম (সা)-কে কোনো বিশেষ জাতির জন্যে নয় বরং সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্যে তাঁর শিক্ষা যথেষ্ট। ফলে তৃতীয় কারণটিও দূর হয়ে গেল।

এ জন্যেই রসূলে করীম (সা)-কে খাতামুন নাবীয়ীন বা শেষ নবী বলা হয়েছে। অর্থাৎ নবুয়াতের ধারাবাহিকতা তিনি পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। এখন দুনিয়ার জন্যে আর কোনো নবীর প্রযোজন নেই বরং এর পরিবর্তে এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা রসূলে করীম (সা)-এর পথে নিজেরা চলবেন ও অন্যদেরকেরও চালাবেন, তাঁর শিক্ষা অনুধাবন করবেন, তার ওপর আমল করবেন এবং যে আইন নিয়ে তিনি দুনিয়ায় এসেছিলেন সারা দুনিয়ায় তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত করবেন।৮৩

সমগ্র মানবজাতির জন্যে হেদায়াতের উপায়

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ○

"হে নবী, আমি সমগ্র মানব জাতির জন্যে তোমাকে সুসংবাদকারী ও ভীতি-প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।"

–(সূরা আস সাবা ঃ ২৮)

এর অর্থ হলো, তুমি কেবল এ শহর, এ দেশ বা এ যুগের লোকদের জন্যে নও, বরং কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষ ও জাতির জন্যে প্রেরিত হয়েছ কিন্তু তোমার সমকালীন দেশবাসীরা তোমার মর্যাদা ও কদর বুঝে না। তাদের কাছে যে কত বড় মহান মহিমান্বিত ব্যক্তিকে পাঠান হয়েছে এ অনুভূতি তাদের নেই। নবী করীম (সা)-কে কেবল নিজের দেশ ও নিজের যুগের জন্যে পাঠান হয়নি বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্যে তাঁকে পাঠান হয়েছে এ কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ ط (الانعام : ١٩)

"আর আমার প্রতি এ কুরআন অহী হিসেবে পাঠান হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।"

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ(الاعراف : ١٥٨)

"হে নবী! বলে দাও ঃ হে লোকেরা, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রসূল।"

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ○(الانبياء : ١٠٧)

"আর আমি তোমাকে কেবলমাত্র সমগ্র বিশ্বের রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।"

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا○ (الفرقان : ١)

"তিনি মহান বরকতপূর্ণ যিনি নিজের বান্দার ওপর কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে তিনি হতে পারেন সমগ্র বিশ্বের জন্যে সতর্ককারী।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ১)।

রসূলে করীম (সা) নিজেও এ একই বক্তব্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ

بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ -(مسند احمد)

"আমাকে সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলের জন্যে পাঠানো হয়েছে।"

اَمَّا اَنَا فَاُرْسِلْتُ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّةً وَّكَانَ مَنْ قَبْلِىْ اِنَّمَا يُرْسَلُ اِلَى قَوْمِهٖ -

"আমাকে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির জন্যে পাঠান হয়েছে। অথচ আমার আগে প্রত্যেক নবীকে কেবল তাঁর নিজের জাতির জন্যেই পাঠান হয়েছিল।"–(আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত, মুসনাদে আহমদ থেকে)।

وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَّبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً -

"প্রথমে প্রত্যেক নবীকে বিশেষ জাতির কাছে পাঠানো হত আর আমাকে পাঠান হয়েছে সমগ্র মানব জাতির কাছে।"–(বুখারী ও মুসলিম থেকে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত)।

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَعْنِى اَصْبَعَيْنَ -

"আমাকে নবী করে পাঠানোর সাথে কিয়ামতের সম্পর্ক ঠিক এমনি—একথা বলে রসূলুল্লাহ (সা) নিজের হাতের দু'টো আঙ্গুল উঠালেন।"–(বুখারী ও মুসলিম)।

এ কথার অর্থ হচ্ছে, যেমন এ দু'টো আঙ্গুলের মধ্যে তৃতীয় কোনো আঙ্গুলের অন্তরাল নেই, তেমনি আমার ও কিয়ামতের মধ্যে নবুয়াতের কোনো অন্তরাল নেই। আমার পরেই কিয়ামত আসছে। কিয়ামত পর্যন্ত আমিই নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকব।৮৪

সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ط وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○(فاطر : ٢٤)

"তোমাকে তো আমি হকের সাথে পাঠিয়েছি সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। আর এমন কোনো জাতি নেই যার মধ্যে কোনো সতর্ককারী পাঠান হয়নি।"–(সূরা ফাতের ঃ ২৪)।

প্রথম আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, হে নবী! মানুষকে সতর্ক করে দেয়া ছাড়া তোমার আর কোনো কাজ নেই। এরপরও যদি কারও টনক না নড়ে এবং সে গোমরাহীর অতলে ডুবতে থাকে তাহলে তোমার ওপর তার কোনো দায়িত্ব নেই। অন্ধদেরকে দেখাবার এবং বধিরদেরকে শোনাবার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে, দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে এমন কোনো জাতির অভ্যুদয় হয়নি যার হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা কোনো নবী পাঠাননি। সূরা আর রা'আদের ৭ম আয়াতে বলা হয়েছে وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ সূরা আল হিজরের ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ। সূরা আন নাহলের ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا। সূরা আশ শূ'আরার ২০৮ আয়াতে বলা হয়েছে وَمَا اَهْلَكْنَا

مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَـهَا مُنْذِرُوْنَ কিন্তু এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্যে দু'টি কথা অবশ্যি বুঝে নিতে হবে। এক, একজন নবীর দাওয়াত যে এলাকা পর্যন্ত পৌছুতে পারে সে এলাকার লোকদের জন্যে তিনিই যথেষ্ট। কাজেই প্রত্যেক জনবসতি ও প্রত্যেক গোত্রের জন্যে যে পৃথক পৃথক নবী পাঠাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দুই, একজন নবীর দাওয়াত ও হেদায়াতের নিদর্শন এবং তাঁর নেতৃত্বের পদাংক যতদিন দুনিয়ায় সংরক্ষিত থাকবে ততদিন কোনো নতুন নবীর প্রয়োজন হয় না। জাতির প্রত্যেক পুরুষের জন্যে পৃথক করে নবী পাঠাবারও প্রয়োজন নেই।৮৫

সমগ্র মানবজাতির জন্যে আল্লাহর রহমত

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ○(الانبياء : ١٠٧)

"হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি এটা আসলে পৃথিবীবাসীদের জন্যে আমার রহমত।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৭)

এ আয়াতটির আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "আমি তোমাকে পৃথিবীবাসীদের জন্যে রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি। উভয় অবস্থায়ই এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, রসূলে করীম (সা)-এর আগমন প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির জন্যে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। কারণ তিনি এসে সুপ্ত দুনিয়াকে জাগ্রত করেন। তাকে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জ্ঞানদান করেন। সর্বোপরি তাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন, কোন্‌টি ধ্বংসের পথ এবং কোন্‌টি শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। মক্কার কাফেররা রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়াতকে নিজেদের জন্যে বিপদ ও কষ্টের কারণ মনে করত। তারা বলত, এ ব্যক্তি আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, নখ থেকে গোশত ছাড়িয়ে আলাদা করে দিয়েছে। এর জবাবে বলা হয় ঃ হে নির্বোধের দল, তোমরা যাকে বিপদ মনে করছ সে আসলে তোমাদের জন্যে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ।৮৬

সমগ্র মানবজাতির জন্যে রসূল

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج

(الاعراف : ١٥٨) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ-(يونس : ٤٧)

"হে মুহাম্মদ বলে দাও ! হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সবার জন্যে সেই আল্লাহর রসূল হিসেবে এসেছি যিনি পৃথিবী ও আকাশের শাসন কর্তৃত্বের মালিক।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৮)। "প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একজন রসূল আছেন।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৪৭)।

'উম্মত' শব্দটি এখানে শুধুমাত্র জাতির প্রতিশব্দ হিসেবে আনা হয়নি বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত যতগুলো লোকের কাছে পৌছে যায় তারা সবাই তাঁর উম্মত, এ অর্থে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এ জন্যে রসূলের জীবিত থাকা এবং তাদের মধ্যে সশরীরে অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই বরং রসূলের তিরোধানের পরেও যতদিন তাঁর শিক্ষা জীবিত থাকে এবং যতদিন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে —তিনি আসলে কোন্ বিষয়ের শিক্ষা দেন তা জানার পথ খোলা থাকে, ততদিন দুনিয়ার

সমস্ত অধিবাসী তাঁর উম্মত গণ্য হবে। সামনের আলোচনায় যে বিধানের কথা বলা হয়েছে তা তাদের ওপর কার্যকর হবে। এ প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁর উম্মত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাঁর উম্মত থাকবে যতক্ষণ কুরআন নির্ভুল ও অবিকৃত অবস্থায় বিরাজ করবে। তাই আয়াতে বলা হয়নি "প্রত্যেক জাতির জন্যে একজন রসূল আছেন" বরং বলা হয়েছে "প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একজন রসূল আছেন।"৮৭

আল্লাহ প্রত্যেক জনবসতিতে একজন নবী পাঠাবার পরিবর্তে সারা দুনিয়ার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ○ (الفرقان : ٥١)

"আমি চাইলে প্রত্যেক জনবসতিতে এক একজন ভীতি-প্রদর্শনকারী পাঠিয়ে দিতাম।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৫১)

অর্থাৎ এ কাজটা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল না। আমি চাইলে সব জায়গায় নবীর আবির্ভাব ঘটাতে পারতাম। কিন্তু তা না করে আমি সারা দুনিয়ার জন্যে একজন নবী পাঠিয়েছি। একটি সূর্য যেমন সারা দুনিয়ার জন্যে যথেষ্ট তেমনি এই একটি মাত্র হেদায়াতের সূর্য সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে যথেষ্ট।৮৮

কুরআন মজীদে রসূলে করীম (সা)-কে 'সতর্ককারী', 'জ্ঞাতকারী' এবং 'গাফলতি' ও গোমরাহীর অনিষ্ঠকর পরিণতির ভীতিপ্রদর্শনকারী' উপাধি দেয়া হয়েছে। এই সঙ্গে তাঁকে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাত কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে নয় বরং সারা দুনিয়ার জন্যে। কেবলমাত্র নিজের যুগের জন্যে নয় বরং আগত সমস্ত যুগের জন্যে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ(الاعراف : ١٥٨)

"হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রসূল হয়ে এসেছি।"

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ط (لانعام : ١٩)

"আমার নিকট এ কুরআন পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং আর যাদের কাছে এটি পৌঁছেছে তাদেরকে।"

–(সূরা আল আন'আম ঃ ১৯)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ(سبا : ٢٨)

"আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি।"–(সূরা আস সাবা ঃ ২৮)

হাদীসে এ বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বারবার বলেছেন ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ "আমাকে সাদা-কালো নির্বিশেষে সবার কাছে পাঠান হয়েছে।" তিনি আরো বলেছেন ঃ كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً "ইতিপূর্বে একজন নবীকে বিশেষ করে তাঁর জাতির জন্যে পাঠান হত আর আমাকে পাঠান হয়েছে সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্যে।"-(বুখারী ও মুসলিম)।

আরও বলেছেন ঃ وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَّخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ "সমগ্র সৃষ্টির জন্যে আমাকে পাঠান হয়েছে আর আমার আগমনের সাথে সাথে নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে।"৮৯

আল্লাহর শেষ নবী

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ○(لانبياء : ١)

"মানুষের হিসেবের সময় সন্নিকটবর্তী অথচ তারা মুখ ফিরিয়ে গাফলতির মধ্যে রয়েছে।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১)

এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত নিকটবর্তী। অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার প্রভু ও প্রতিপালকের কাছে হাজির হয়ে নিজের যাবতীয় কাজের হিসেব পেশ করবে সে দিনটি দূরে নয়। মানবজাতি যে তার ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াত লাভ তারই একটি আলামত। এখন তারা নিজেদের সূচনাপর্বের তুলনায় সমাপ্তি পর্বের অধিক নিকটবর্তী। সূচনাকাল ও মধ্যমকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন সমাপ্তিকাল শুরু হয়েছে। এ কথাটিই রসূলে করীম (সা) একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজের দু'টি আঙ্গুল উঠিয়ে বলেন ঃ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ "আমাকে এমন অবস্থায় পাঠানো হয়েছে যে আমার হাতের এ আঙ্গুল দু'টো পাশাপাশি যে অবস্থায় আছে আমি ও কিয়ামত ঠিক সে অবস্থায় আছি।" অর্থাৎ আমার পর এখন শুধু কিয়ামতের অপেক্ষা। এর মাঝখানে আর কোনো নবী নেই। সৎপথ লাভ করতে চাইলে আমার দাওয়াতের মাধ্যমেই সৎপথ লাভ কর এরপর সৎপথ দেখাবার জন্যে আর কোনো পথপ্রদর্শক ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসবে না।৯০

খতমে নবুয়াত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ط قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ط قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط (ال عمارن : ٨١)

"স্মরণ কর, আল্লাহ যখন পয়গাম্বরদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন ঃ আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত দান করেছি। কাল যদি অন্য কোনো রসূল তোমাদের নিকট পূর্ব থেকে রক্ষিত ঐ শিক্ষার সত্যতা ঘোষণা করে তোমাদের কাছে আসে, তাহলে তার ওপর তোমাদের ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে। এ কথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি এর অঙ্গীকার কর এবং এ

ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে অঙ্গীকারের গুরুদায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত আছ ? তারা জবাবে বলল ঃ হ্যাঁ, আমরা আঙ্গীকার করছি।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮১)

এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক পয়গাম্বরকে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয়। আর পয়গাম্বরকে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয় তার দাযিত্ব অনিবার্যভাবে তাঁর অনুসারীদের ওপরও বর্তায়। তাদেরকে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয় তা হচ্ছে ঃ তোমাদেরকে যে দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী পাঠান হয় তখন তার সাথে তোমাদের সহযোগিতা করতে হবে। তার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে পারবে না। নিজেদেরকে দ্বীনের ইজারাদার মনে করতে পারবে না। সত্যের বিরোধিতা করতে পারবে না। বরং যেখানে যে ব্যক্তিকে আমার পক্ষ থেকে সত্যের পতাকা উত্তোলন করার জন্যে পাঠান হবে তাঁর পতাকাতলে তোমাদেরকে সমবেত হতে হবে।

এখানে অবশ্যি এতটুকু কথা বুঝে নিতে হবে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে প্রত্যেক নবীকে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয়। এ জন্যেই প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর খবর দেন এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়ে যান। কিন্তু কুরআন-হাদীসের কোথাও এমন কোনো ইশারাও পাওয়া যায় না যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে এ ধরনের কোনো অঙ্গীকার নেয়া হয় অথবা তিনি উম্মতকে তাঁর পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর খবর দিয়ে তাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।*৯১

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأۡتِيَنَّكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ

فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ○(الاعراف : ٢٥)

"হে বনী আদম! মনে রেখ, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে এমন কোন রসূল আসে যে তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনায়, তাহলে যে ব্যক্তি নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের সংশোধন করে নেবে তার জন্যে কোনো প্রকার আশংকা ও মর্মবেদনার কোনো প্রশ্নই থাকবে না।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩৫)

কুরআন মজীদের যেখানেই আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাত থেকে নির্বাসিত করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সেখানেই একথা বলা হয়েছে (এ জন্যে দেখুন সূরা আল বাকারাহ ঃ ৩৮-৩৯ আয়াত, সূরা আত ত্বহা ঃ ১২৩-১২৪ আয়াত)। কাজেই এখানেও এ কথাটিকে ঐ একই প্রসঙ্গ সম্পর্কিত মনে করা হবে। অর্থাৎ মানব জীবনের সূচনালগ্নেই এ কথাটি তাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল।৯২

* নবুয়াতের ব্যাপারটি বড়ই নাজুক, এ কথা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। নবীকে মানা ও না মানার ওপর মানুষের ঈমান ও কুফরী এবং নাজাত অথবা ধ্বংস নির্ভর করে। কিন্তু কুরআন মজীদে রসূলে করীম (সা)-এর পরে অন্য কোনো নবীর আসার খবর দেয়া তো দূরে থাক বরং রসূলে করীম (সা)-কে শেষ নবী বলা হয়েছে। আর রসূলুল্লাহ (সা) নিজের উম্মতকে ডেকে তাদেরকে পরবর্তীকালে আগমনকারী কোনো নবীর ওপর ঈমান আনার নির্দেশ দেবার পরিবর্তে অসংখ্য হাদীসে এ কথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর পরে কোনো নবী আসবেন না এবং নবুয়াতের ধারাবাহিকতা তাঁর থেকে শেষ হয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দ্বীন ও ঈমানের সাথে কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোনো শত্রুতা ছিল ? রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে কোনো নবী আসবেন অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূল উভয়ই এমন কথা বলেছেন যার ফলে আমরা তাকে না মেনে কুফরী করছি এবং আখেরাতের আযাবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি ? এমনটি কি কোনোক্রমে সম্ভব ?–(গ্রন্থকার)

খতমে নবুয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি আয়াতের যুক্তি

(١) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَّإِبْرٰهِيمَ وَمُوسٰى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا (لاحزاب : ٧)

"আর (হে নবী!) মনে রেখ সেই অঙ্গীকারের কথা যা আমি সকল পয়গাম্বরের কাছ থেকেই নিয়েছি, তোমার কাছ থেকেও নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ামের পুত্র ঈসার কাছ থেকে সবার কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছি।"−(সূরা আহযাব ঃ ৭)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবী (সা)-কে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সকল নবীর ন্যায় আপনার কাছ থেকেও আল্লাহ একটি পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছেন। আপনার কঠোরভাবে এ অঙ্গীকার পালন করা উচিত। এ অঙ্গীকার বলতে কোন্ অঙ্গীকারটি বুঝাচ্ছে ? আগে থেকে যে প্রসঙ্গের আলোচনা চলছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট জানা যায় যে, এটা এমন একটা অঙ্গীকার যার আওতায় নবী নিজে আল্লাহর প্রত্যেকটি হুকুমের অনুগত হবেন এবং অন্যদেরকেও এর অনুগত করবেন। আল্লাহর কথাগুলো হুবহু লোকদের কাছে পৌছাবেন এবং কার্যত সেগুলো প্রবর্তিত করার চেষ্টার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি করবেন না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। যেমন ঃ

(٢) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيْسٰى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ(الشورى : ١٣)

"আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেই দ্বীনটি যার হেদায়াত তিনি করেছিলেন নূহকে এবং যা নাযিল করা হয়েছিল (হে মুহাম্মদ) তোমার ওপর আর যার হেদায়াত করা হয়েছিল ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই তাকীদ সহকারে যে, তোমরা দ্বীন কায়েমকর এবং তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কর না।"−(সূরা আশ শূরা ঃ ১৩)

(٣) وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ز

"আর (হে মুসলমানরা)! স্মরণ কর আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে যা তিনি তোমাদের ওপর তাঁর কিতাব নাযিল করা হয়েছিল এই মর্মে যে, তোমরা এর শিক্ষা বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।"−(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৭)

(٤) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللّٰهَ قف ـ(البقرة : ٨٣)

"আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবে না।"
−(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩)

(٥) أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ .... خُذُوْا مَا أٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○(الاعراف : ١٦٩ـ١٧١)

"তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার নেয়া হয়নি ? তোমাদের ওপর আমি যা নাযিল করেছি তা শক্ত করে ধর আর তার মধ্যে যে হেদায়াত আছে তা স্মরণ কর। আশা করা যায় তোমরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে বাঁচতে পারবে।"

−(সূরা আল আরাফ ঃ ১৬৯-১৭১)

(٦) وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز (المائدة : ٧)

"আর হে মুসলমানরা, স্মরণ কর আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে যা তিনি তোমাদের ওপর করেছেন আর সেই অঙ্গীকারকে (স্মরণ কর) যা তিনি তোমাদের থেকে নিয়েছেন যখন তোমরা বলেছিলে ঃ আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি।"−(সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৭)

বিশেষ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা এ অঙ্গীকারটি যে কারণে স্মরণ করাচ্ছেন তা হচ্ছে এই যে, নবী (সা) শত্রুদের নিন্দার ভয়ে মুখে ডাকা (রক্তের নয়) সম্পর্কের ব্যাপারে জাহেলী যুগের প্রচলিত রীতি ভাঙ্গতে ইতস্তত করছিলেন। ব্যাপারটি হচ্ছে, একটি মেয়ের সাথে বিয়ে সংক্রান্ত। তাই তিনি বারবার লজ্জা পাচ্ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, আমি যতই সদিচ্ছা সহকারে নিছক সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে এ কাজটি করি না কেন শত্রুরা বলতেই থাকবে, আসলে নিজের ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করার জন্যেই এ কাজ করা হয়েছে এবং এ ব্যক্তি শুধুমাত্র জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে সংস্কারকের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলছেন ঃ তুমি আমার নিয়োগকৃত পয়গাম্বর। অন্য সব পয়গাম্বরদের ন্যায় তোমার সাথেও আমার পাকাপোক্ত অঙ্গীকার রয়েছে যে, আমি যে নির্দেশ দেব তা তুমি নিজে পালন করবে এবং অন্যদেরকেও তা পালন করার নির্দেশ দেবে। কাজেই তুমি কারোর নিন্দা-অপবাদের পরোয়া করো না। কাউকে লজ্জা কর না। কারও ভয় কর না। তোমাকে দিয়ে আমি যে কাজ করাতে চাই নির্দ্বিধায় তা কর।

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের উম্মতদের থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল এ অঙ্গীকার থেকে একটি দল সেই অর্থ নিয়েছে। তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তারা পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর ওপর ঈমান আনবেন এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা করবেন। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ঐ দলটির দাবী হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পরও নবুয়াতের দরজা খোলা আছে এবং নবী করীম (সা)-এর নিকট থেকেও এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, তাঁর পর যে নবী আসবে তাঁর উম্মত তাঁর ওপর ঈমান আনবে কিন্তু আয়াতের পূর্বপর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীনভাবে এ ব্যাখ্যাটির ভ্রান্তি ঘোষণা করছে। যে কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি উক্ত হয়েছে তাতে এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, রসূলে করীম (সা)-এর পরেও নবী আসবেন এবং তাঁর উম্মতকে সেইসব নবীর ওপর ঈমান আনতে হবে। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতটি এখানে একেবারেই বেখাপ্পা ও সম্পর্কহীন হয়ে পড়বে। তাছাড়া আয়াতের শব্দগুলোর এমন কোনো সুস্পষ্ট অর্থ হয় না যা থেকে এখানে কোন্ ধরনের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে তা বুঝা যেতে পারে। কাজেই এখানে কোন্ ধরনের অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে তা জানার জন্যে আমাদের কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে যেখানে নবীদের কাছ থেকে গৃহীত অঙ্গীকারের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি সমগ্র কুরআন মজীদে একটি মাত্র অঙ্গীকারের উল্লেখ থাকত

এবং তা হত পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের সম্পর্কে, তাহলে এখানেও অঙ্গীকার প্রসঙ্গে ঐ অঙ্গীকারের কথাই বলা হয়েছে এ কথা সঙ্গতভাবেই চিন্তা করা যেত। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে কুরআন অধ্যয়নকারী ব্যক্তিমাত্রই জানে, এ গ্রন্থে নবীগণ ও তাঁদের উম্মতদের কাছ থেকে গৃহীত বহু অঙ্গীকারের উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই ঐসব বিভিন্ন অঙ্গীকারের মধ্য থেকে এখানে সেই অঙ্গীকারটির অর্থগ্রহণ করা সঙ্গত হবে পূর্বাপর আলোচনার সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে। যে অঙ্গীকারের আলোচনার কোন সুযোগই এখানেই নেই, এখানে সেটির অর্থ গ্রহণ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হবে না। এ ধরনের ভুল অর্থ গ্রহণ করার ফলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনো কোনো লোক কুরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করার পরিবর্তে কুরআনকেই হেদায়াত দান করার প্রচেষ্টা চালায়।৯৩

(৭) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۝ (يونس : ١٧)

"অতপর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে—যে একটি মিথ্যা কথা তৈরী করে তাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে অথবা আল্লাহর যথার্থ আয়াতগুলোকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। অবশ্যি অপরাধীরা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারে না।"
–(সূরা ইউনুস ঃ ১৭)

কোনো কোনো নির্বোধ লোক 'সাফল্য'কে দীর্ঘায়ু, পার্থিব সমৃদ্ধি বা পার্থিব উন্নতি অর্থে গ্রহণ করেছেন। এভাবে তারা এ আয়াতটি থেকে এ অর্থ গ্রহণ করতে চান যে, যে ব্যক্তি নবুয়াতের দাবী করার পর জীবিত থাকেন অথবা দুনিয়ায় খুব উন্নতি করেন অথবা তাঁর দাওয়াত বিস্তার লাভ করে, তাঁকে সত্য নবী হিসেবে মেনে নেয়া উচিত। কারণ তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। যদি তিনি সত্য নবী না হতেন তাহলে মিথ্যা নবুয়াতের দাবী করার সাথে সাথেই তাকে হত্যা করা হত অথবা অনাহারে তাকে মেরে ফেলা হত এবং তার দাওয়াত দুনিয়ায় ছড়াতে পারত না, কিন্তু কুরআন থেকে এ ধরনের অজ্ঞজনোচিত যুক্তি-প্রমাণ একমাত্র সেই ব্যক্তিই উপস্থাপন করতে পারে, যে কুরআনের পারিভাষিক শব্দ 'ফালাহ'-এর অর্থ জানে না অথবা কুরআনে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী আল্লাহ্ অপরাধীদের জন্যে যে অবকাশ দান—বিধি নির্ধারণ করেছেন সে সম্পর্কে অবহিত নয় এ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা বোঝে না।

প্রথম কথা হচ্ছে, অপরাধী সাফল্য লাভ করতে পারে না। এ কথাটি আয়াতটির আলোচনা প্রসঙ্গে এমন অর্থে বলাই হয়নি যার ফলে এটি কারও নবুয়াতের দাবী যাচাই করার মানদণ্ডে পরিণত হয় এবং সাধারণ লোকেরা নিজেরাই নবুয়াতের দাবীদারদেরকে সেই মানদণ্ডে যাচাই করার পর যাকে সাফল্য লাভকারী হিসেবে পেত তার দাবী মেনে নেয়ার এবং যাকে অকৃতকার্য দেখত তার দাবী অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিত। বরং এ কথা এখানে যে অর্থে বলা হয়েছে তা হচ্ছে, "আমি নিশ্চিতভাবে জানি অপরাধীরা সাফল্য লাভ করতে পারে না। তাই মিথ্যা নবুয়াতের দাবী করে আমি নিজেই এ অপরাধ করতে পারি না বরং তোমাদের ব্যাপারে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তোমরা সত্য নবীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার অপরাধ করছ, তাই তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে না।"

ফালাহ বা সাফল্য শব্দটি কুরআনের পার্থিব সাফল্যের সীমিত অর্থেও ব্যবহৃত হয়নি। বরং এর অর্থ হচ্ছে এমন একটি নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য যার ফলশ্রুতিতে কোনো প্রকার ক্ষতির নামগন্ধও নেই। পার্থিব জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তার মধ্যে সাফল্যের কোনো দিক না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। কোনো একজন সুস্পষ্ট গোমরাহীর আহ্বানকারী দুনিয়ায় আরামের জীবনযাপন করতে পারে, পার্থিব সমৃদ্ধি ও উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করতে পারে, তার গোমরাহীর দাওয়াত বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে এবং চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করতে পারে কিন্তু কুরআনের পরিভাষায় যাকে সাফল্য বলা হয়েছে এটা সে সাফল্য নয় বরং এটা সুস্পষ্ট ক্ষতি ও ব্যর্থতা। আবার এমনও হতে পারে, একজন সত্যের আহ্বায়ক দুনিয়ায় কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন, বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্টের চাপে তিনি নিপিষ্ট হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে পারেন অথবা যালেমদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে শিগ্রই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারেন। তাঁর দলে একজন লোকও যোগদান না করতে পারে কিন্তু কুরআনের ভাষায় এটা ক্ষতি ও ব্যর্থতা নয় বরং এটিই যথার্থ সাফল্য।

এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা অপরাধীদের পাকড়াও করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন না বরং তাদেরকে সংশোধিত হবার জন্যে যথেষ্ট সময়-সুযোগ দেন। আর এই সময়-সুযোগকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে যদি তারা আরও বেশী বিগড়ে গিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে অবকাশ (মুহলত) দেয়া হয় এবং অনেক সময় তাদের ওপর অনুগ্রহ ধারা বর্ষণ করা হয়। এর ফলে তারা নিজেদের অন্তর্দেশে লুকানো সমস্ত দুষ্কৃতিকে পুরোপুরি প্রকাশ করে দেয় এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এমন শাস্তির অধিকারী হয় যা অসৎ গুণাবলী সমন্বিত হবার কারণে যথার্থই তাদের প্রাপ্য। কাজেই কোনো মিথ্যা দাবীদারের রশি লম্বা হয়ে গেলে এবং তার ওপর পার্থিব 'সাফল্যের' অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হতে থাকেল তার এ অবস্থাকে তার হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার প্রমাণ মনে করা একটি মরাত্মক ভুল হিসেবে চিহ্নিত হবে। আল্লাহর অবকাশ বা ঢিল দেয়া ও সুযোগ-সুবিধা দানের আইন সমস্ত অপরাধীদের ন্যায় মিথ্যা নবুয়াতের দাবীদারদের জন্যেও সমানভাবে কার্যকর। শেষোক্তদেরকে ঐ আইনের আওতা বহির্ভূত মনে করার পক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। আবার শয়তানকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ যে সুযোগ দিয়েছেন সেখানে কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, তুমি যত রকমের প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করবে সব চলতে দেয়া হবে কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তুমি কোনো মিথ্যা ও ভণ্ড নবী দাঁড় করালে সে প্রতারণাটি কোনোক্রমেই কার্যকর হতে দেয়া হবে না।

আমার এ কথার জবাবে সম্ভবত কোনো ব্যক্তি সূরা আল হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে পারে। যেখানে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ○ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ○

অর্থাৎ 'যদি মুহাম্মদ আমার নামে কোনো মনগড়া কথা বলে থাকে তাহলে আমি তার হাত ধরে ফেলতাম এবং তার হৃদয়তন্ত্রী কেটে দিতাম'। কিন্তু এ আয়াতগুলোতে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে যথার্থ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন তিনি যদি মিথ্যে কথা বানিয়ে আল্লাহর অহী হিসেবে পেশ করেন তাহলে তিনি

সাথে সাথেই পাকড়াও হবেন। এ বক্তব্য থেকে যে নবুয়াতের দাবীদার পাকড়াও হচ্ছে না সে নিশ্চয়ই সত্য এ যুক্তি পেশ করা একটি নীতিগত বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর সুযোগদান ও ঢিল দেয়ার বিধানের মধ্যে যে ব্যতিক্রম এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে তা একমাত্র সাচ্চা নবীর জন্যে। এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা নবুয়াতের দাবী করে সেও এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা সবাই জানে যে, সরকারী কর্মচারীদের জন্যে যে আইন প্রণীত হয় তা কেবল তাদের ওপরই প্রযোজ্য হয় যারা সত্যিকার সরকারী কর্মচারী। জাল সরকারী কর্মচারীদের ওপর সে আইন প্রযোজ্য হয় না বরং ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী সাধারণ বদমাশ ও অপরাধীদের সাথে যে ব্যবহার করা হয় তাদের সাথেও একই ব্যবহার করা হবে। তাছাড়া সূরা আল হাক্কার এ আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তাও লোকদেরকে নবী যাচাই করার মানদণ্ড জানাবার জন্যে বলা হয়নি। অর্থাৎ গায়েবের পর্দা ভেদ করে যদি কোনো হাত বের হয়ে আসে এবং অকস্মাৎ তার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন করে তাহলে মনে করতে হবে সে মিথ্যা ও ভণ্ড, অন্যথায় তাকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। নবীর চরিত্র, কার্যাবলী এবং তিনি যা কিছু পেশ করেছেন তার মাধ্যমে তাঁকে যাচাই করে তিনি সত্য না ভণ্ড নবী তা নির্ধারণ করা যদি সম্ভব না হত তাহলে হয়ত এ ধরনের অযৌক্তিক মানদণ্ড মেনে নেবার প্রয়োজন হত।[৭৪]

শেষ নবীর পর নবুয়াতের দাবী

প্রশ্ন ঃ তরজমানুল কুরআন (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) এর ২৩৬ পৃষ্ঠায় আপনি লিখিছেন, "আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কখনও মিথ্যাকে সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা দান করেন না। আমি সবসময় এ নীতি অনুসরণ করে এসেছি ...... যাদেরকে আমি সত্যতা ও বিশ্বস্ততা থেকে বেপরোয়া এবং আল্লাহর ভীতিশূন্য পাই তাদের কথার কখনও জবাব দেই না .... আল্লাহ তাদের থেকে বদলা নিতে পারেন ...... এবং দুনিয়াতেই ইনশাআল্লাহ তাদের হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে।"

আমি নিবেদন করছি, আমি আহমদী জামায়াতের বইপত্র পড়েছি এবং তাদের কাজের সাথেও জড়িত থেকেছি। সেই প্রসঙ্গে আমি নিম্নলিখিত প্রশ্ন ক'টি রাখছি।

এক ঃ এটা কেবল আপনারই অভিজ্ঞতা নয় বরং কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে ভালবাসেন না।" আর "মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" আবার এমন ধরনের মিথ্যাবাদীদের ওপর যে, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ .... الْأَقَاوِيلِ। তাদের শাস্তি হচ্ছে তাৎক্ষণিক পাকাড়ও এবং জান্নামে নিক্ষেপ (لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ -(الحاقة : ٨٦) এ অবস্থায় যদি মীর্জা গোলাম আহাম্মদ মিথ্যুক হয়ে থাকেন তাহলে কি কারণে (ক) এখনও আল্লাহ তায়াল তাকে পাকড়াও করেননি (খ) দলের সদস্যদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং মীর্জা সাহেবের মিশনের মুসলমানদের কাছে যা গোমরাহ বলে পরিচিত—শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে কেন আবার বর্তমানে এ দলটির শিকড় দেশের বাইরেও মজবুত হয়ে গেছে। (গ) মীর্জা সাহেব যে বাণী এনেছিলেন তারপর আজ ষাট বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে আমরা আর কতদিন আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষা করব বর্তমানে তারা উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে চলছে। (ঘ) যেসব

দল ও ব্যক্তি এ দলটির বিরোধিতা করছে তারা কেন তাদের বিরোধিতা পরিহার করছে না এবং বিষয়টি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছে না ?

দুই ঃ তরজুমানুল কুরআনের ২৪২ পৃষ্ঠায় আপনার দলের একজন জার্মান সমর্থক বার্লিনে আহমদী জামায়াতের সাথে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। যদি আপনিও তাদের ইসলাম প্রচারের কাজকে সঠিক মনে করে থাকেন তাহলে পাকিস্তানে তাদের সাথে সহযোগিতা করছেন না কেন ?

উত্তর ঃ আপনি একজন নবুয়াতের দাবীদারের ব্যাপারটিকে এত হালকাভাবে দেখছেন! এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি মোটেই উপযোগী নয়। আমি যা কিছু লিখেছিলাম তা ছিল একটি সুস্পষ্ট মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কিত। কতিপয় স্বার্থবাদী লোক আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। এ কথাকে আপনি প্রযোজ্য করছেন এমন একজন লোকের ব্যাপারে যিনি আসলে নবুয়াতের দাবী করেছেন। আপনার জানা উচিত একজন নবুয়াতের দাবীদারের ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থার যে কোনোটি অবশিই সত্য। যদি তার দাবী সত্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে যে মানে না সে কাফের। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে যে মানে সে কাফের। এতবড় একটা নাজুক ব্যাপারের সিদ্ধান্ত কি আপনি কেবল এতটুকু কথার ওপর করতে চান যে, আল্লাহ তায়ালা এখনও তাকে পাকড়াও করেননি, তার দলের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে আর 'আমরা আর কতদিন আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষা করব ?' এর অর্থ কি তাহলে এটাই ধরে নিতে হবে যে, যে কোনো ব্যক্তি নবুয়াতের দাবী করার পর তার দল যদি উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং আপনার প্রস্তাবিত প্রতীক্ষার মেয়াদের মধ্যে আল্লাহ তাকে পাকড়াও না করেন তাহলে কেবল ততটুকু কথাই তাকে নবী হিসেবে মেনে নেবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবে আপনার মতে নবুয়াত যাচাই করার মানদণ্ড কি এটাই وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ থেকে আপনি যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা আসলে মূলগতভাবে ভুল। এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মদ (সা) যিনি আসলে আল্লাহর নবী, যদি আল্লাহর অহী ছাড়া কোনো কথা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে আল্লাহর নামে পেশ করতে থাকেন তাহলে তাঁর শ্বাসনালী কেটে দেয়া হবে। এ থেকে যে ব্যক্তি আসলে নবী নয় এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নবী বলে পেশ করছে তার শ্বাসনালীও কেটে দেয়া হবে এ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়। এ ছাড়াও এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে নবুয়াতের দাবীদারের শ্বাসনালী কেটে দেয়া হবে না সে সত্য নবী আর যার শ্বাসনালী কেটে দেয়া হবে সে ভণ্ড নবী—এ কথাকে মিথ্যা ও সত্য নবী বেছে নেয়ার মানদণ্ড হিসেবে পেশ করেননি। কুরআনের আয়াতের এভাবে টেনে-হিঁচড়ে বিকৃত অর্থ করার পদ্ধতি নিশ্চয় আপনার নিজস্ব কায়দা নয়, বরং মীর্জা সাহেবের দলের কাছ থেকেই এটা আপনি রপ্ত করেছেন। এ দলটির দিলে যে আল্লাহর ভয় নেই এ থেকেই তা প্রমাণ হয়।

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর যে ব্যক্তি নবুয়াতের দাবী করবে তার কথাকে আপনার পেশকৃত মানদণ্ডে যাচাই করা হবে না। বরং তার কথাকে পরম নিশ্চিন্তে প্রত্যাখ্যান করা হবে। কারণ কুরআন ও হাদীস এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য রেখেছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসূলে করীম (সা)-এর পর আর কোনো নবী আসবেন না। মীর্জা সাহেব ও তার অনুসারীরা নবুয়াতের দরজা উন্মুক্ত থাকার স্বপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করে থাকেন সেগুলো

সম্পর্কেও আমি অবহিত কিন্তু আপনাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই ঐ যুক্তিগুলো কেবলমাত্র একজন অজ্ঞ ও স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন লোককেই প্রভাবিত করতে পারে। একজন তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি তাদের যুক্তিগুলো দেখার পর কেবলমাত্র তাদের মূর্খতা সম্পর্কেই নিসন্দেহ হতে পারে।

তরজুমানুল কুরআনে জার্মানীর যে চিঠি ছাপা হয়েছে—অর্থ এ নয় যে, ঐ চিঠির সব কথাকে আমরা হুবহু সত্য বলে মনে করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ চিঠির মাধ্যমে আমাদের দেশের মুসলমানদের সামনে জার্মানীর নও-মুসলিম ভাইদের অবস্থা তুলে ধরা এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে মুসলমানদের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা। তারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলামী দুনিয়ায় কত রকমের ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তা তারা কেমন করে জানবে। তারা তো এখন ইসলামের নামে যেখান থেকে যা কিছু পাবে তা থেকে নিজেদের তৃষ্ণা মিটাবার চেষ্টা করবে। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যজ্ঞান সমৃদ্ধ বইপত্র তাদের হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্ব তো এখন আমাদের। অন্যথায় অজ্ঞতার কারেণ তারা যে কোনো ফিতনার শিকার হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনার জবাব পেয়েছি। দুঃখের বিষয়, তা আমার সংশয় নিরসন করতে পারেনি। আমি তো আপনারই কথা "আল্লাহ নিজেই মিথ্যাবাদীকে শাস্তি দেবেন" তুলে ধরে এর আলোকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যাকে সব মুসলমানই মিথ্যাবাদী মনে করে তার ওপর আল্লাহর শাস্তি আসছে না কেন এবং আল্লাহ কিভাবে এতদিন ধরে নিজের বান্দাদের গোমরাহ হওয়া প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছেন ?

আমি মীর্জা সাহেবের লেখা প্রায় ২৫ খানা বই অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছি। এরপর এর বিরুদ্ধে লেখা মুসলিম আলেমগণের কয়েকখানা বইও পড়েছি, অবশ্য আমি স্বীকার করছি এ প্রসঙ্গে আপনার কোনো বই আমি পড়তে পারিনি। তবে আলেমগণের বইগুলো সম্পর্কে আমার সামগ্রকি প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ

তারা মীর্জা সাহেবের লেখা বিকৃত করে তার ভুল অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং তা মীর্জা সাহেবের ওপর আরোপ করেছেন।

যে বিষয়ে তারা লেখনী চালিয়েছেন সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান তারা রাখেন না। পরে আমি তাদের সাথে পত্র যোগাযোগ করি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই নীরবতা অবলম্বন করেন। মীর্জা সাহেবের বইপত্র থেকে আমি সাধারণত যা কিছু বুঝেছি তা হচ্ছে ঃ মীর্জা সাহেব 'নিজে এবং তার বাণীসমূহ নবী করীম (সা)-এর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এরই ভিত্তিতেই আমি মীর্জা সাহেবের দাবীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আর এখন আমার কাছে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে ঃ

এক ঃ মীর্জা সাহেবের দাবীসমূহ কুরআন ও হাদীসের বিরোধী নয়।

দুই ঃ মীর্জা সাহেবের নবুয়াত রসূলে করীম (সা)-এর মর্যাদা লাঘব করছে না বরং যদি মূসা (আ)-এর বদৌলতে নগরে নগরে নবী হতে পারে তাহলে মুহাম্মদ (সা)-এর মর্যাদার বদৌলতে গ্রামে গ্রামে এমন লোক হতে হবে যারা বলবে, "আমরা শরীয়াতে মুহাম্মদীর ওপর আমল করে আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেছি"। মীর্জা সাহেব নিজেই বলেছেন ঃ

"আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি উৎসারিত এ ঝর্ণাধারাটি
মুহাম্মদী কামালিয়াতের সমুদ্রের একটি বারিকণা মাত্র।"

এখন আপনি আবার আমাকে মীর্জা সাহেবের দাবী যাচাই করার অনমুতি দিয়েছেন। মেহেরবানী করে আপনি কি মীর্জা সাহেবের কোনো একটি দাবীকে কুরআন করীমের আলোকে মিথ্যা প্রমাণ করে আমাকে সঠিক পথ গ্রহণে সাহায্য করবেন ?

উত্তর ঃ আগের চিঠিটাই আপনার সংশয় নিরসন করতে পারত যদি আপনি যথার্থই সংশয় নিরসন করতে চাইতেন। আমি তরজুমানুল কুরআনে যা কিছু লিখেছিলম তা ছিল সেইসব লোকদের সম্পর্কে যারা আমার ওপর মিথ্যা দোষারোপ করছে। আর এ ব্যাপারে আল্লাহর ওপর আস্থা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদেরকে শাস্তি দেবেন কিন্তু আপনি একে একজন নবুয়াতের দাবীদারের দাবী যাচাই করার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করছেন। আবার মানদণ্ডও এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যে, যদি দেখা যায় নবুয়াতের দাবীদার শাস্তি পাচ্ছে না তাহলে তাকে অবশ্যই সত্য নবী বলতে হবে। দুনিয়ায় যে শাস্তি পেয়ে যাবে সে মিথ্যাবাদী ও গোমরাহ আর যে শাস্তি পাবে না সে সত্যবাদী ও সৎপথপ্রাপ্ত —সত্যিই কি লোকদের সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী এবং সৎপথপ্রাপ্ত বা গোমরাহ হবার জন্যে এটা কোনো সঠিক মানদণ্ড ?

আপনি অদ্ভূত কথা বলেছেন যে, মীর্জা সাহেবের নবুয়াতের দাবী করার পর ৬০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে আর কতদিন অপেক্ষা করা যায়। নবুয়াতের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্যে আপনি একটি অদ্ভূত মানদণ্ড পেশ করেছেন। আপনার মতে, একজন মিথ্যা দাবীদারের কোন্ ধরনের শাস্তি পাওয়া উচিত—কথাটা একটু বিস্তারিতভাবে বলুন। যদি আপনি মনে করে থাকেন, গায়েব থেকে একটি হাত এসে তার কণ্ঠনালী কেটে দিয়ে যাবে তাহলে আমি বলব, এ শাস্তি তো রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় মিথ্যা নবুয়াতের দাবীদার মুসাইলামা কাযযাবকেও দেয়া হয়নি। যদি আপনি মনে করে থাকেন, যে নবুয়াতের দাবীদার মানুষের হাতে নিহত হবে সে মিথ্যাবাদী তাহলে সেসব নবীদের সম্পর্কে আপনি কি বলেন যাদের নবুয়াতের সত্যতা আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা করেছেন এবং এই সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের নিজেদের জাতিরাই তাদেরকে হত্যা করেছে ? কুরআনে নিশ্চয়ই আপনি নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি পড়েছেন ঃ

قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○(ال عمران : ١٨٣) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ-(النساء : ١٥٥)

এ আয়াতগুলোর আলোকে আপনার নিজের চিন্তাধারার নতুন করে পর্যালোচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি। নবীর দাবীকে এ ধরনের মানদণ্ডে যাচাই করা যায় না। নবীর ব্যাপারে যে বিষয়টির পর্যালোচনা করতে হবে তা হচ্ছে এই যে, তাঁর পূর্বেকার আল্লাহর বাণীর আলোকে তাঁর স্থান কোথায় ? তিনি কি এনেছেন ? তাঁর জীবনধারা কেমন ? এ মানদণ্ডে যে ব্যক্তি পুরোপুরি উতরোবে না তাকে কেবলমাত্র আপনি চর্মচক্ষে

এ দুনিয়ায় শাস্তি পেতে দেখছেন না বলেই সত্য নবী বলে মেনে নেবেন, এটা একটা মারাত্মক ভুল।

ওপরে আমি যে তিনটি মানদণ্ডের কথা বলেছি তার মধ্য থেকে প্রথমটির কষ্ঠিপাথরে নবুয়াতের দাবীদারের দাবী যাচাই হয়ে পুরোপুরি নির্ভেজাল প্রমাণিত হয়ে না এলে শেষোক্ত মানদণ্ড দু'টোতে যাচাই হবার প্রশ্নই ওঠে না। কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকেই যখন এ কথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর আর কোনো নতুন নবী আসতে পারবেন না তখন রসূলে করীম (সা)-এর পর আগমনকারী নবী কি এনেছেন এবং তিনি কেমন লোক তা দেখার কোনো প্রয়োজনই থাকে না। যদিও আমার দৃষ্টিতে মীর্জা সাহেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে ও নবুয়াতের মর্যাদা থেকে এত দূর অবস্থান করছেন যে, নবুয়াতের দরজা যদি খোলা থাকত তাহলেও অন্ততঃপক্ষে কোনো সুবিবেচক ব্যক্তি তাঁকে নবী বলে ধারণা করতে পারত না কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্তের পর এ আলোচনাকে আমি অপ্রয়োজনীয় বরং আল্লাহ ও রসূলের (সা) মোকাবিলায় চরম দৃষ্টতা মনে করি।

যদি জিজ্ঞেস করেন, নবুয়াতের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে কুরআন ও হাদীসে এর স্বপক্ষে কি যুক্তি আছে, তাহলে একটি পত্রে এর জবাব দেয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে সময় সুযোগ দেন তাহলে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়বস্তুর ওপর আমি একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখব। অন্যথায় সূরা আহযাবের তাফসীরে তো এ প্রসঙ্গ আসবেই তখন আলোচনা করা যাবে।*৯৫

খতমে নবুয়াতের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের আর একটি যুক্তি

প্রশ্ন ঃ তাফহীমুল কুরআনে সূরা আলে ইমরানের .... وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় ৬৯ নম্বর টীকায় আপনি লিখেছেন ঃ "এখানে এতটুকু কথা আরও বুঝে নিতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকেই এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে আর এরই ভিত্তিতে প্রত্যেক নবীই তাঁর পরবর্তী নবী সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন এবং তাঁকে সমর্থন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সা)-এর কাছ থেকেও এ ধরনের কোনো অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল অথবা তিনি নিজের উম্মতকে পরবর্তীকালে আগমনকারী কোনো নবীর খবর দিয়ে তার ওপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন কুরআন ও হাদীসের কোথাও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।"

এ বাক্যগুলো পড়ার পর মনের মধ্যে এ কথার উদয় হলো যে, নবী মুহাম্মদ (সা) এ কথা বলেননি ঠিক কিন্তু কুরআন মজীদের সূরা আহযাবে একটি অঙ্গীকারের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ .....

এখানে 'মিনকা' (তোমার নিকট থেকে) শব্দটির মাধ্যমে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এখানে যে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে তা সূরা আলে

* কয়েক পৃষ্ঠা পরেই 'খতমে নুবয়াতের আকীদা সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা' শীর্ষক নিবন্ধে এ আলোচনা আসছে।-(সংকলক)

ইমরানে উল্লেখিত হয়েছে। সূরা আলে ইমরান ও সূরা আহযাব এ উভয় সূরায় উল্লিখিত আয়াতগুলোর অঙ্গীকারের উল্লেখ থেকে বুঝা যায়, অন্য নবীদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল নবী মুহাম্মদ (সা)-এর থেকেও সেই একই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে।

আসলে আহমদীয়াদের একটি বই পড়ার পর আমার মনে এ প্রশ্ন জেগেছে। সেখানে ঐ সূরা দু'টোর উল্লিখিত আয়াতগুলোকে একটির সাহায্যে অপরটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ সঙ্গে 'মিনকা' শব্দটির ওপর বিরাট আলোচনা করা হয়েছে।

উত্তর ঃ ...... وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ সূরা আহযাবের এ আয়াতটি থেকে কাদিয়ানী সাহেবান যে যুক্তি পেশ করেন তা যদি তারা আন্তরিকতার সাথে পেশ করে থাকেন তাহলে তা তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। আর যদি ইচ্ছা করে লোকদেরকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে করে থাকেন তাহলে তাদের গোমরাহী সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তারা সূরা আলে ইমরানের وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ আয়াতটি থেকে একটি বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। তাতে নবীগণ ও তাদের উম্মতদের কাছ থেকে আগামীতে আগমনকারী কোনো নবীর আনুগত্য করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। আবার দ্বিতীয় একটি বক্তব্য নিয়েছেন সূরা আহযাবের উপরোল্লিখিত আয়াতটি থেকে। এখানে অন্যান্য নবীগণের সাথে সাথে রসূলে করীম (সা)-এর থেকেও অঙ্গীকার নেয়ার কথাও বলা হয়েছে। অতপর দু'টোকে জুড়ে তারা নিজেরাই এ তৃতীয় বক্তব্যটি বানিয়ে ফেলেছেন যে, নবী করীম (সা) থেকেও আগামীতে আগমনকারী কোনো নবীর ওপর ঈমান আনার ও তাকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল অথচ যে আয়াতে আগামীতে আগমনকারী নবীর থেকে অঙ্গীকার নেয়ার কথা বলা হয়েছে সে আয়াতের কোথাও আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলেননি যে, এ অঙ্গীকারটি হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকেও নেয়া হয়েছে। আর যে আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে একটি অঙ্গীকার নেয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, এ অঙ্গীকারটি ছিল আগামীতে আগমনকারী কোনো নবীর আনুগত্যের সাথে জড়িত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দু'টো পৃথক বক্তব্যকে জুড়ে তৃতীয় একটি বক্তব্য যা কুরআনের কোথাও ছিল না তৈরী করার যৌক্তিকতা কোথায়? এর তিনটি যুক্তি বা ভিত্তি হতে পারত। এক ঃ যদি এ আয়াতটি নাযিল হবার পর নবী করীম (সা) সাহাবীদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা করতেন ঃ "হে লোকেরা! আল্লাহ আমার কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমার পর যে নবী আসবেন আমি তার ওপর ঈমান আনব এবং তাকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করব। কাজেই আমার অনুগত হওয়ার কারণে তোমরাও এ অঙ্গীকার কর।"—কিন্তু সমগ্র হাদীস গ্রন্থগুলোর কোথাও আমরা এ বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদীসও দেখি না। বরং বিপরীত পক্ষে এমন অসংখ্য হাদীস দেখি যেখান থেকে নবী করীম (সা)-এর ওপর নবুয়াতের সিলসিলা খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এ কথা কি কোনো দিন কল্পনাও করা যেতে পারে যে, নবী করীম (সা)-এর থেকে এমন ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে আর তিনি তাকে এভাবে অবহেলা করে গেছেন, বরং উল্টো এমন সব কথা বলেছেন যার ভিত্তিতে তাঁর উম্মতের বিরাট অংশ আল্লাহ প্রেরিত কোনো নবীর ওপর ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে?

কুরআনে যদি সকল নবী ও তাঁদের উম্মতদের থেকে একটিমাত্র অঙ্গীকার নেয়ার উল্লেখ থাকত তাহলে সেটি এ বক্তব্য গ্রহণের দ্বিতীয় যুক্তি বা ভিত্তি হতে পারত। আর সে অঙ্গীকারটি হচ্ছে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর ওপর ঈমান আনা। সমগ্র কুরআনে এটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অঙ্গীকারের উল্লেখ থাকত না। এ অবস্থায় এ যুক্তি পেশ করা যেতে পারত যে, সূরা আহযাবের উল্লিখিত আয়াতেও এ একই অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি পেশ করারও কোনো অবকাশ এখানে নেই। কুরআনে একটি নয় বহু অঙ্গীকারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ১০ রুকূ'তে বনী ইসরাঈল থেকে আল্লাহর বন্দেগী, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক রক্তপাত থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৯ রুকূ'তে সমস্ত আহলে কিতাবদের থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে ঃ আল্লাহর যে কিতাব তোমাদের হাতে দেয়া হয়েছে তোমরা তার শিক্ষাবলি গোপন করবে না বরং তাকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেবে। সূরা আরাফের ২১ রুকূ'তে বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে ঃ আল্লাহর নাম হক ছাড়া কোনো কথা বলবে না আর আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার শিক্ষাগুলো মনে রাখবে। সূরা মায়েদার প্রথম রুকূ'তে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীদেরকে একটি অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যা তারা আল্লাহর সাথে করেছিল তা হচ্ছে, "তোমরা আল্লাহর সাথে শ্রবণ ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করছ।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সূরা আহযাবের সংশ্লিষ্ট আয়াতে যে অঙ্গীকারের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে অঙ্গীকারটি কি ছিল তা যখন বলা হয়নি তখন এ অঙ্গীকারটি চিহ্নিত করার জন্যে উল্লিখিত বহু অঙ্গীকারের মধ্য থেকে কোনো একটি গ্রহণ না করে বিশেষ করে সূরা আলে ইমরানের ৯ রুকূ'তে উল্লিখিত অঙ্গীকারটি গ্রহণ করা হবে কেন ? এ জন্যে অবশ্যই একটি ভিত্তির প্রয়োজন। আর এ ভিত্তি কোথাও নেই। এর জবাবে যদি কেউ বলে যে, উভয় ক্ষেত্রে যেহেতু নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের কথা রয়েছে তাই একটি আয়াতের সাহায্যে অন্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাহলে আমি বলব নবীদের উম্মতদের থেকে অন্য যতগুলো অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে কোনোটাই সরাসরি নেয়া হয়নি বরং নবীদের মাধ্যমেই নেয়া হয়েছে। এছাড়াও গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়নকারী ব্যক্তিমাত্রই জানেন, প্রত্যেক নবীর থেকে আল্লাহর কিতাব মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার ও তার বিধানসমূহের আনুগত্য করার অঙ্গীকার নেয়া হয়।

তৃতীয় যুক্তি বা ভিত্তি হতে পারতো সূরা আহযাবের পূর্বাপর আলোচনা প্রসঙ্গ। সেখানে যদি এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকত যে, এখানে অঙ্গীকার বলতে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের ওপর ঈমান আনার অঙ্গীকার বুঝান হয়েছে, তাহলে এ বক্তব্য গ্রহণ করা সঙ্গত হত। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণ উল্টো। পূর্বাপর আলোচনা প্রসঙ্গ বরং এ অর্থ গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে। সূরা আহযাব শুরু করা হয়েছে এ বাক্যটির মাধ্যমে ঃ

"হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য কর না আর তোমার রব যে অহী পাঠান সেই অনুযায়ী কাজ কর এবং আল্লাহর ওপর আস্থা স্থাপন কর।" এরপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে পালকপুত্র নেয়ার যে পদ্ধতি চলে আসছে তা এবং তার সাথে সম্পর্কিত সব রকমের কুসংস্কার ও রীতি-রসম নির্মূল

করে দাও। তারপর বলা হচ্ছে, রক্তহীন সম্পর্কের মধ্যে কেবলমাত্র একটি সম্পর্কই এমন আছে যা রক্ত সম্পর্কের চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন। সেটি হচ্ছে, নবী ও মু'মিনদের মধ্যকার সম্পর্ক। এ সম্পর্কের কারণে নবীর স্ত্রীগণ মু'মিনদের নিকট তাদের মায়েদের ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন এবং মায়েদের ন্যায় তাদের ওপর হারাম। এছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে একমাত্র রক্ত সম্পর্কই আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিবাহ হারাম হওয়া ও মীরাস লাভের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃত। এ বিধান নির্দেশ করার পর আল্লাহ তায়ালা হামেশা সমস্ত নবীদের থেকে এবং সেই অনুযায়ী নবী করীম (সা) থেকেও যে অঙ্গীকারটি নিয়েছেন সে কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখন একজন সাধারণ বিবেকমান ব্যক্তিমাত্রেই দেখতে পারেন যে, এ আলোচনা প্রসঙ্গে কোথায় পরবর্তীকালে আগমনকারী একজন নবীর ওপর ঈমান আনার অংঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অবকাশ ছিল ? এখানে বড়জোর সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অবকাশ ছিল যাতে আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার, তার বিধানসমূহ মনে রাখার, সেগুলো কার্যকর করার এবং জনসমক্ষে তা প্রকাশ করার জন্যে সকল নবীকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এরপর আর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা দেখছি আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সা)-কে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, আপনি নিজে আপনার পালকপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে জাহেলিয়াতের সেই ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল করে দিন যার ভিত্তিতে লোকেরা পালক পুত্রকে নিজেদের ওরসজাত পুত্রের ন্যায় মনে করত। কাফের ও মুনাফিকরা এর বিরুদ্ধে একের পর এক আপত্তি উত্থাপন করে অপপ্রচারে লিপ্ত হলে আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর জবাব দেন।

এক. প্রথমত মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষের পিতা নন, যার ফলে তার (সেই পুরুষের) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তাঁর ওপর হারাম হতে পারে।

দুই. আর যদি তোমরা এ কথা বল যে, সে তার জন্যে হালাল হয়ে থাকলেও তাকে বিয়ে করার এমন কী প্রয়োজন ছিল ? তাহলে এর জবাবে বলতে হয় যে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল। আল্লাহ যে কাজটি খতম করতে চান নিজে অগ্রসর হয়ে সেটি খতম করে দেয়াই হচ্ছে তাঁর দায়িত্ব।

তিন. এ ছাড়াও এটি করা তাঁর জন্যে আরও বেশী প্রয়োজন ছিল এ জন্যে যে, তিনি নিছক রসূল নন বরং তিনি শেষ রসূল। জাহেলিয়াতের এ রীতি-রসমগুলোর যদি তিনি বিলোপ সাধন না করে যান তাহলে তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না যিনি এগুলোর বিলোপ সাধন করবেন।

এই শেষের বক্তব্যটিকে আগের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে পড়লে যে কেউ নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলবে যে, এই পূর্বাপর বক্তব্যের মধ্যে নবী করীম (সা)-কে যে অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে তা নিসন্দেহে পরবর্তীকালে আগমনকারী কোনো নবীর ওপর ঈমান আনার অঙ্গীকার নয়।

এবার বিবেচনা করুন, আলোচ্য আয়াতটি থেকে কাদিয়ানীদের বিবৃত অর্থ গ্রহণ করার জন্যে এ তিনটি ভিত্তিই হতে পারত। এ তিনটি ভিত্তির প্রত্যেকটিই তাদের বক্তব্যের সাথে সম্পর্কহীন বরং তার বিপরীত। এছাড়া তাদের কাছে যদি চতুর্থ কোনো যুক্তি ও ভিত্তি

থাকে তাহলে তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আর এ তিনটি যুক্তির জবাবও তাদের কাছ থেকে নিন। অন্যথায় ন্যায়সঙ্গতভাবে এ কথা মনে করা হবে যে, তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে অন্যথায় আল্লাহর ভয়কে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করে সরল-প্রাণ জনসাধারণকে গোমরাহ করার জন্যে আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করেছে। যা হোক, আমি এটা বুঝতে পারছি না যে, মীর্জা সাহেব যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে এখনও তার 'সাহাবী'দের যুগ শেষ হয়নি অথচ তার সমগ্র উম্মত বর্তমানে 'তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপরও তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা প্রকাশ্যে আল্লাহর কিতাব থেকে এ ধরনের ভুল ও মিথ্যা যুক্তি পেশ করে যাচ্ছে অথচ এ মূর্খতার বিরুদ্ধে সমগ্র উম্মতের মধ্যে একটি আওয়াজও বুলন্দ হচ্ছে না।[৯৬]

খতমে নবুয়াতের আয়াতের তিনটি যুক্তি

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ○ (الاحزاب : ٤٠)

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারও পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। আর আল্লাহ সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।"–(সূরা আহবাব ঃ ৪০)

সূরা আহযাবে যে পটভূমিকায় খতমে নবুয়াতের আলোচনা এসেছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ। আরবে পালকপুত্রকে সম্পূর্ণরূপে নিজের ঔরসজাত পুত্রের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। সে ঔরসজাত পুত্রের মতো মীরাস পেত। মা-ছেলে ও ভাই-বোন যেভাবে এক সংসারে অবস্থান করত পালকপুত্র তেমনি পালক পিতার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে মিশেমিশে থাকত। পালকপুত্র হয়ে যাবার পর রক্ত সম্পর্কের কারণে আত্মীয়দের মধ্যে যে সম্পর্ক কায়েম হত পালকপুত্র ও পালক পিতার মধ্যে সে ধরনের সব সম্পর্ক কায়েম হয়ে যেত। আল্লাহ এ রসমটি বিলুপ্ত করতে চাচ্ছিলেন। তাই প্রথমে বলে দিলেন, মুখে কাউকে ছেলে বলে দিলেই সে তার প্রকৃত ছেলে হয়ে যায় না। (৪নং আয়াত) কিন্তু শত শত বছরের রেওয়াজ ও প্রচলনের কারণে মনের মধ্যে যে মর্যাদাবোধ ও হারাম হওয়ার ধারণা শিকড় গেড়ে বসেছিল তাকে সহজে মূলোৎপাটিত করা সম্ভবপর ছিল না। তাই কার্যতঃ এ প্রথাটি ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। ঘটনাক্রমে এ সময় ঘটে গেল হযরত যায়েদ (রা) ও হযরত যয়নব (রা)-এর ব্যাপারটি। রসূলে করীম (সা)-এর পালকপুত্র হযরত যায়েদ তার স্ত্রী হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে দিলেন। রসূলে করীম (সা) অনুভব করলেন, এ মারাত্মক জাহেলী প্রথাটি ভাঙ্গার এটাই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। যতক্ষণ না তিনি নিজে নিজের পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেন ততক্ষণ পালকপুত্রকে প্রকৃত ও ঔরসজাত পুত্রের মতো মনে করার জাহেলী ধারণার অবসান হবে না। কিন্তু তিনি এ কথাও জানতেন যে, মদীনার মুনাফিকগোষ্ঠী এবং মদীনার আশপাশের ইহুদী সম্প্রদায় ও মক্কার কাফের সমাজ তাঁর এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মহা হুলস্থুল বাধাবে। তারা এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাবার ও ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করবে না। তাই তিনি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করা সত্ত্বেও ইতস্তত করছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তিনি হযরত যয়নব (রা)-কে বিয়ে করে নিলেন। ফলে পূর্ব অনুমিত আশংকা অনুযায়ী আপত্তির ঝড় উঠল। নিন্দা ও অপবাদের বন্যা বইতে লাগল।

এমনকি অনেক মুসলমানের মনেও নানা ধরনের সংশয় ও সন্দেহ জেগে উঠল। এসব আপত্তি, নিন্দাবাদ, অপবাদ ও সংশয়ের জবাবে সূরা আহযাবের পঞ্চম রুকূ'র ৩৭ থেকে ৪০ নম্বর পর্যন্ত এ আয়াতগুলো নাযিল হয়।

এ আয়াতগুলোর শুরুতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ বিয়ে আমার নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মু'মিনদের জন্যে তাদের পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা মোটেই দূষণীয় নয়। তারপর বলেন, আল্লাহর হুকুম কার্যকর করার ব্যাপারে কারও ভয়ে ইতস্তত করা কোনো নবীর কাজ নয়। অতপর নিম্নোক্ত কথাগুলো পেশ করে এ আলোচনার সমাপ্তি টানেন ঃ

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারও পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।" এখানে এ বাক্যটি থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা আপত্তিকারীদের জবাবে তিনটি যুক্তি পেশ করতে চান। বিরুদ্ধ পক্ষ রসূলে করীম (সা)-এর বিয়ের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি ও অপপ্রচার চালাচ্ছিল এ একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে সেসবের শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল, তাঁর নিজের শরীয়াতেই ছেলের স্ত্রী বাপের জন্যে হারাম এতদসত্ত্বেও তিনি কেমন করে নিজের ছেলের স্ত্রীকে বিয়ে করলেন ? এর জবাবে বলা হয়েছে, এ বিয়ে আপত্তিকর নয়। কারণ যে ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা হয়েছে তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর আসল ছেলে ছিলেন না এবং মুহাম্মদ (সা)-ও তার আসল বাপ ছিলেন না। তাই বলা হয়েছে, "মুহাম্মদ (সা) তোমাদের পুরুষদের কারও পিতা নন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা হয়েছে সে তো মুহাম্মদ (সা)-এর ছেলেই ছিল না। কাজেই তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হবে কেন ? তোমরা সবাই জানো মুহাম্মদ (সা)-এর কোন ছেলে নেই।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল, পালকপুত্র যদি প্রকৃত পুত্র না হয়ে থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা বড়জোর বৈধ হতে পারে কিন্তু তাঁকে বিয়ে করতেই হবে এমন কি অপরিহার্যতা ছিল ? এর জবাবে বলা হয়েছে, "কিন্তু তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল।" অর্থাৎ রসূল হবার কারণে এ কাজটি তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে যে, তোমাদের প্রচলিত প্রথা যে হালাল বস্তুটি অনর্থক হারাম করে রেখেছে তার ব্যাপারে যাবতীয় রক্ত সম্পর্কের ধারণার অবসান ঘটিয়ে তিনি তাকে হালাল করে দেবেন এবং এ ব্যাপারে সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় নিরসন করবেন।

তৃতীয়তঃ এর অপরিহার্যতার আরও একটি কারণ ছিল এই যে, মুহাম্মদ (সা) নিছক নবী নন বরং তিনি সর্বশেষ নবী। তাই অতিরিক্ত জোর দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে, "আর তিনি হচ্ছেন সব নবীদের শেষ নবী।" অর্থাৎ তাঁর পর আর কোনো রসূল তো দূরের কথা কোনো নবীই আসবেন না। আইন বা সামাজিক প্রথার কোনো একটির সংস্কার যদি তাঁর জামানায় সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পরে আগমনকারী নবী তাঁর এ আরব্ধ কাজটি সম্পন্ন করে দেবেন—এর কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাজেই জাহেলিয়াতের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রথাটি তিনি নির্মূল করে যাবেন এটা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।[৯৭] কারণ এখন তাঁর হাতে জাহেলিয়াতের এ প্রথাটির মৃত্যু না ঘটলে কিয়ামত পর্যন্ত এর মৃত্যুর কোনো

সম্ভাবনা নেই। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তিনি যে কাজটুকু রেখে যাবেন সেটুকু সম্পন্ন করার আর কেউ থাকবে না।

এর ওপর আরও অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলা হলো, "আল্লাহ সব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।" অর্থাৎ আল্লাহ জানেন এ সময় জাহেলিয়াতের এ প্রথাটিকে মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে নির্মূল করার কেন প্রয়োজন ছিল, অন্যথায় কি ক্ষতি হত আল্লাহ জানেন, এখন তাঁর পক্ষ থেকে আর কোনো নবী আসবেন না। কাজেই তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে তিনি যদি এখনই এ প্রথাটিকে নির্মূল করে না দেন তাহলে ভবিষ্যতে এমন আর কোনো ব্যক্তিত্ব থাকবে না যিনি এ প্রথাটির বিরুদ্ধাচরণ করলে সারা দুনিয়ার মুসলিম সমাজে এটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরবর্তীকালের সংস্কারকগণ এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তাঁদের কারও কর্মকাণ্ডও এমন চিরন্তন ও বিশ্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবে না যার ফলে প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক যুগের লোকেরা তা নির্দ্বিধায় মেনে নেবে এবং তার অনুসারী হবে। তাছাড়া তাঁদের কোনো একজনও এমন ধরনের কোনো পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন না যার ফলে তিনি যে এ কাজটি করেছেন অর্থাৎ এটি যে তাঁর সুন্নাত—এ ধরনের কোনো চিন্তাই লোকদের মন থেকে এর বিরুদ্ধে উদ্ভূত যাবতীয় ঘৃণা ও অস্বস্তিকর মনোভাব খতম করে দিতে সক্ষম হবে না।

দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগে একটি দল এ আয়াতটির ভুল অর্থ করে একটি বিরাট ফিতনার দরজা খুলে দিয়েছে। তাই খতমে নবুয়াত প্রসঙ্গটির ওপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে এই দলটি যেসব বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে সেগুলো দূর করার জন্যে আমি পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিতভাবে খতমে নবুয়াতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।[৯৮]

খতমে নবুয়াতের আকীদা সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা

বর্তমান যুগে একটি দল নতুন নবুয়াতের বিরাট ফিতনা সৃষ্টি করেছে। তারা وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ط আয়াতটিতে উল্লেখিত 'খাতামান নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ করে নবীদের মোহর। এরা বুঝাতে চায়, রসূলুল্লাহ (সা)-এর পর তাঁর মোহরাঙ্কিত হয়ে আরও অনেক নবী দুনিয়ায় আসবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, রসূলুল্লাহ (সা)-এর মোহরাঙ্কিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ নবী হবেন না।

কিন্তু যে বর্ণনা পরম্পরায় এ আয়াতটি বিবৃত হয়েছে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে একে বিচার করলে সংশ্লিষ্ট শব্দের এ অর্থ গ্রহণের কোন অবকাশই দেখা যায় না। বরং এ অর্থ গ্রহণ করলে এ পরিবেশে শব্দটির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। যয়নব (রা)-এর বিয়ের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিবাদ ও তা থেকে সৃষ্ট নানা প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দিতে দিতে হঠাৎ মাঝখানে বলে দেয়া ঃ 'মুহাম্মদ নবীদের মোহর', অর্থাৎ যত নবী আসবেন তারা সবাই মুহাম্মদ (সা) -এর মোহরাঙ্কিত হয়ে আসবেন; এটা কি নিছক অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় ? আগে-পিছের এ বর্ণনার মাঝখানে এ কথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এর মাধ্যমে প্রতিবাদকারীদের জবাবে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিল তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় প্রতিবাদকারীদের হাতে একটা চমৎকার সুযোগ এসে গিয়েছিল। তারা সহজেই বলতে পারত, আপনার জীবনকালে এ কাজটা সম্পন্ন না করলে ভালই করতেন, কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকত না। এ বদ রসমটা বিলুপ্ত করার এতই যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে আপনার পরে আপনার মোহরাঙ্কিত হয়ে যেসব নবী আসবেন তাদের যে কেউ এটা বিলুপ্ত করতে পারবেন।

উল্লিখিত দলটি শব্দটির আরেকটি বিকৃত অর্থ নিয়েছে। অর্থাৎ 'খাতামান নাবীয়্যীন' অর্থ 'আফযালুন নাবীয়্যীন'। এর অর্থ হলো, নবুয়াতের দরজা খোলাই রয়েছে, তবে নবুয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখত বিভ্রান্তির পুনরাবির্ভাবের হাত থেকে নিস্তার নেই। পূর্বাপর আলোচনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটি পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবহ। কাফের ও মুনাফিকরা বলতে পারত ঃ জনাব, আপনার চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন হলেও আপনার পরে আরও নবী তো আসতে থাকবেন, কাজেই এ কাজটা তাদের ওপর না হয় ছেড়ে দিতেন। এ বদ রসমটা নির্মূল করার দায়িত্ব যে আপনাকেই পালন করতে হবে— এরই বা কি এমন অপরিহার্যতা আছে ?

খাতামান নাবীয়্যীন শব্দের আভিধানিক অর্থ

পূর্বাপর আলোচনার সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে চূড়ান্তভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এখানে খাতামান নাবীয়্যীন শব্দের অর্থ নবুয়াতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু শুধু পূর্বাপর সম্বন্ধের দিক

দিয়েই নয়, আভিধানিক দিক দিয়েও এটিই এর একমাত্র যথার্থ অর্থ। আরবী অভিধান ও প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতাম' শব্দের অর্থ হলো ঃ মোহর লাগান, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া এবং কোনো কাজ শেষ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা।

খাতামাল আমাল (خَتَمَ الْعمل) অর্থ হল ঃ ফারাগা মিনাল আমাল (فَرغ مِن الْعَمَل) অর্থাৎ কাজ শেষ করে ফেলেছে।

খাতামাল ইনাআ (خَتَمَ الْاِنَاءَ) অর্থ হল ঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে না আসতে পারে এবং বাইরে থেকে কিছু ভেতরে যেতে না পারে।

খাতামাল কিতাব (خَتَمَ الْكِتَابَ) অর্থ হল ঃ পত্র বন্ধ করে তার মুখে মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, ফলে পত্রটি সংরক্ষিত হবে।

খাতামা আলাল কালব (خَتَمَ عَلَى الْقَلْبِ) অর্থ হল ঃ দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর বাইরের কোন কথা আর সে বুঝতে পারবে না এবং ভেতরের স্থিতিশীল কোনো কথা বাইরে বেরুতে পারবে না।

খিতামু কুল্লি মাশরুব (خِتَام كُلِّ مَشْرُوبٍ) অর্থ হল ঃ কোন পানীয় পান করার পর সব শেষে যে স্বাদ অনুভূত হয়।

খাতিমাতু কুল্লি শাইয়িন আকিবাতুহু ওয়া আখিরাতুহু (خَاتِمَةُ كُلِّ شَيْئٍ عَاقِبَتُه وَاٰخِرَتُه) অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের খাতিমা অর্থ হল তার পরিণাম ও শেষ।

খাতামাশ শাইয়ে বালাগা আ-খেরাহ (خَتَمَ الشَّيْئَ بَلَغَ اٰخِرَه) অর্থাৎ কোনো জিনিসকে খতম করার অর্থ হল তার শেষ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া। খতমে কুরআন বলতে এ অর্থই গ্রহণ করা হয় এবং এ অর্থের ভিত্তিতেই প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় 'খাওয়াতিম'।

খাতামুল কওমে আখেরুহুম (خَاتَمُ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ) অর্থাৎ জাতির শেষ ব্যক্তিই হচ্ছে খাতামুল কওম। (দৃষ্টব্য ঃ লিসানুল আরব, কামুস ও আকরাবুল মাওয়ারিদ)।*

---

* এখানে আমি মাত্র তিনটি অভিধানের উল্লেখ করলাম। কিন্তু শুধু এ তিনটি অভিধানই কেন, আরবী ভাষার যে কোনো নির্ভরযোগ্য অভিধান খুলে দেখলে সেখানে 'খাতাম' শব্দের উপরোল্লিখিত অর্থ ও ব্যাখ্যাই পাওয়া যাবে কিন্তু খতমে নবুয়াত অস্বীকারকারীরা আল্লাহর দ্বীনের সুরক্ষিত দূর্গে সিদকাটার জন্যে এর আভিধানিক অর্থকে পুরোপুরি এড়িয়ে গেছেন। তারা বলতে চান, কোনো ব্যক্তিকে 'খাতামুশ শোয়ারা', 'খাতামুল ফোকাহা' অথবা 'খাতামুল মুফাস্সিরীন' বললে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় না যে, যাকে ঐ পদবী দেয়া হয় তারপর আর কোনো শায়ের, ফকীহ বা মুফাস্সির পয়দা হয়নি। বরং এর অর্থ হয়, ঐ ব্যক্তির ওপর উল্লিখিত বিদ্যা বা শিল্পের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথচ কোনো বস্তুকে অত্যধিক ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ ধরনের পদবী ব্যবহারের ফলে কখনও খাতাম-এর আভিধানিক অর্থ 'পূর্ণ' অথবা 'শ্রেষ্ঠ' হয় না এবং শেষ অর্থে এর ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ গণ্য হয় না।

একমাত্র ব্যাকরণ রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ ধরনের কথা বলতে পারেন। কোনো ভাষারই নিয়ম এ নয় যে, কোনো একটি শব্দ তার আসল অর্থের পরিবর্তে কখনও কখনও পরোক্ষভাবে অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হলে সেটাই তার আসল অর্থে পরিণত হবে এবং আসল আভিধানিক অর্থে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। কোনো আরবের সামনে যখন বলা হবে, 'জাআ খাতামুল কওম' (جاء خاتم القوم) তখন কখনও সে মনে করবে না যে, গোত্রের শ্রেষ্ঠ অথবা কামেল ব্যক্তিটি এসে গেছে বরং সে মনে করবে গোত্রের সবাই এসে গেছে, এমনকি শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও।

এ জন্যেই সমস্ত অভিধান 'বিশারদ ও তাফসীরকারগণ একযোগে খাতামুন নাবীয়্যীন শব্দের অর্থ করেছেন 'আখেরুন নাবীয়্যীন'—অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান ও প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতাম'-এর অর্থ ডাকঘরের মোহর নয়, চিঠির ওপর যার ছাপ লাগিয়ে চিঠি পোস্ট করা হয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে সেই মোহর যা খামের মুখে এ উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে আসতে পারবে না এবং বাইরের কোনো জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী

কুরআনের পূর্বাপর আলোচনা ও আভিধানিক দিক দিয়ে শব্দটির যে অর্থ হয় রসূলুল্লাহ (সা)-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যাও তা সমর্থন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করছি ঃ

(١) قال النبى صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى ، وانه لانبى بعدى وسيكون خلفاء. (بخارى، كتاب المناقب، باب ما ذكر عن بنى اسرائيل)

"রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলীদের নেতৃত্ব করতেন আল্লাহর রসূলগণ। যখন কোনো নবী ইন্তেকাল করতেন তখন অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন কিন্তু আমার পরে কোনো নবী হবে না, হবে শুধু খলীফা।"–(বুখারী, মানাকিব অধ্যায়)

(٢) قال النبى صلى الله عليه وسلم ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبيين -(بخارى، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين)

"রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হল এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরী করল এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, এ স্থানে একটা ইট রাখা

এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, মানুষের পক্ষ থেকেই কিছু লোককে খাতামুশ শোয়ারা, খাতামুল ফোকাহা, খাতামুল মুহাদ্দিসীন ইত্যাদি উপাধি দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তিকে সে খাতামুশ শোয়ারা বা খাতামুল ফোকাহা উপাধি দিচ্ছে তারপর এ গুণের অধিকারী আর কোনো ব্যক্তির জন্ম হবে কিনা এ কথা জানার কোনো ক্ষমতাই মানুষের নেই। তাই তার গুণটিকে অত্যধিক বড় করে দেখবার এবং তার কামালিয়াতের স্বীকৃতি দেয়ার জন্যেই মানুষের ভাষায় এ ধরনের উপাধি বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো একটি বিশেষ গুণ তার ওপর খতম হয়ে গেছে বলে চিহ্নিত করে দেন, তখন তাকেও মানুষের প্রয়োগকৃত শব্দের ন্যায় পরোক্ষ অর্থে ব্যবহার করার কোনো কারণ দেখি না। আল্লাহ যদি কাউকে খাতামুশ শোয়ারা বলতেন, তাহলে নিসন্দেহে তার অর্থ হতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পর আর কোনো শায়ের বা কবির জন্ম হবে না। কাজেই তিনি যাকে খাতামুন নাবীয়্যীন বলে দিয়েছেন তাঁর পরে আর কোনো নবীর জন্ম হওয়া অসম্ভব। কারণ আল্লাহ গায়েব এবং ভবিষ্যতের কথা জানেন কিন্তু মানুষ গায়েব এবং ভবিষ্যতের কথা জানে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে খাতামুন নাবীয়্যীন বলে দেয়া আর মানুষের পক্ষ থেকে কাউকে খাতামুশ শোয়ারা উপাধি কেমন করে এক পর্যায়ে হতে পারে ? –(গ্রন্থকার)

হয়নি কেন ? কাজেই আমিই সেই ইট এবং আমিই সেই নবী। (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুয়াতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন কোনো শূন্য স্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্যে আবার কোনো নবীর প্রয়োজন হবে।"–(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু খাতামুন নাবীয়্যীন)।

এই একই বিষয়বস্তু সম্বলিত চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাযায়েলের 'বাবু খাতামুন নাবীয়্যীন'-এ উল্লেখিত হয়েছে। শেষ হাদীসটিতে নিম্নোক্ত অংশটুকু বর্ধিত হয়েছে فجئت فختمت الانبياء অর্থাৎ 'তারপর আমি এসে নবীদের সিলসিলা খতম করে দিলাম'।

এই হাদীসটি তিরমিযী শরীফে একই শব্দ সম্বলিত হয়ে কিতাবুল মানাকিবের 'বাবু ফাযলিন নবী' এবং কিতাবুল আদাবের 'বাবুল আমসালে' বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সিলসিলায় উল্লেখিত হয়েছে। এর শেষ অংশটুকু হল ختم بى الانبياء অর্থাৎ আমার মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা খতম করা হল।

মুসনাদে আহমদ সামান্য শাব্দিক হেরফেরের সাথে এ ধরনের হাদীস হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

(٣) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم ، وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا، وارسلت الى الخلق كافة ، وختم بى النبيون -(مسلم، ترمذى، ابن ماجه)

"রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ছ'টা ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। (ক) আমাকে পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (খ) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। (গ) গণীমতের অর্থ-সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (ঘ) পৃথিবীর যমীনকে আমার জন্যে মসজিদে (অর্থাৎ আমার শরীয়াতে নামায কেবল বিশেষ ইবাদতগাহে নয়, দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানে পড়া যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (অর্থাৎ শুধু পানিই নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অযু ও গোসলের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে। (ঙ) আমাকে সারা দুনিয়ার জন্য রসূল বানানো হয়েছে এবং (চ) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে।"–(মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

(٤) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول ولا نبى -(ترمذى كتاب الرؤيا، باب ذهاب النبوة، مسند احمد، مرويات انس بن مالك)

"রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ রিসালাত ও নবুয়াতের সিলসলা খতম করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আমার পর আর কোনো রসূল ও নবী আসবে না।"–(তিরমিযী, কিতাবুর রুইয়া, বাবু যিহাবিন নবুওয়াহ, মুসনাদে আহমদ, আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণিত)।

(৫) قال النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحی بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی ـ(بخاری و مسلم، کتاب الفضائل، باب اسماء النبی، ترمذی کتاب الاداب، باب اسماء النبی، مؤطا کتاب اسماء النبی، المستدرک حاکم کتاب التاریخ ـ باب اسماء النبی)

"নবী (সা) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ এবং আমি আহমদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষ আগমনকারী হচ্ছে সেই) যার পরে আর নবী আসবে না।"–(বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাবু আসমাইন নবী; তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, বাবু আসমাইন নবী ; মুয়াত্তা, কিতাবু আসমাইন নবী; মুসতাদরাক হাকেম, কিতাবুত তারিখ, বাবু আসমাইন নবী)।

(৬) قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان اللّٰہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال وانا اخر الانبیاء وانتم اخر الامم وھو خارج فیکم لامحالۃ ـ(ابن ماجۃ کتاب الفتن باب الدجال)

"রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি তার উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয়নি) এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মত। দাজ্জাল নিসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে।"–(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতানা, বাবুদ দাজ্জাল)।

(৭) عن عبد الرحمن بن جبیر قال سمعت عبد اللّٰہ بن عمرو بن العاص یقول خرج علینا رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یوما کالمودع فقال انا محمد النبی الامی ثلاثا ولا نبی بعدی ـ(مسند احمد، مرویات عبد اللّٰہ بن عمروا بن العاص)

"আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসকে বলতে শুনেছি, একদিন রসূলুল্লাহ (সা) নিজের ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনলেন। তিনি এভাবে আসলেন যেন আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মুহাম্মদ। তারপর বললেন, আমার পর আর কোনো নবী নেই।"–(মুসনাদে আহমদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা)-এর বর্ণনা)।

(৮) قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم لانبوۃ بعدی الا المبشرات قیل وما المبشرات یارسول اللّٰہ ؟ قال الرؤیا الحسنۃ ـ او قال الرؤیا الصالحۃ ـ(مسند احمد مرویات ابو الطفیل، نسائ، ابو داؤد)

"রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার পরে আর কোনো নবুয়াত নেই। আছে কেবল সুসংবাদদানকারী কথার সমষ্টি। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ রসূল! সুসংবাদদানকারী

কথাগুলো কি ? জবাবে তিনি বললেন, ভাল স্বপ্ন। অথবা বললেন, কল্যাণময় স্বপ্ন। অর্থাৎ আল্লাহর অহী নাযিল হবার এখন আর কোনো সম্ভাবনা নেই। বড়জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যদি কাউকে কোনো ইঙ্গিত দেয়া হয় তাহলে শুধু ভাল স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হবে।"-(মুসনাদে আহমদ, আবুত তোফায়েল বর্ণিত, নাসাঈ, আবু দাউদ)।

(৯) قال النبی صلی اللّه علیه وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب -(ترمذی کتاب المناقب)

"নবী (সা) বলেন ঃ আমার পর যদি কোনো নবী হত তাহলে উমর ইবনে খাত্তাব সে সৌভাগ্য লাভ করত।"-(তিরমিয়ী, কিতাবুল মানাকিব)।

(১০) قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم لعلی انت منی بمنزلة هرون من موسی الا انه لانبی بعدی -(بخاری و مسلم، کتاب فضائل الصحابة)

"রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলেন ঃ আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসা (আ)-এর সাথে হারুন (আ)-এর সম্পকের্র মত। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই।"-(বুখারী ও মুসলিম, কিতাবু ফাযায়েলিস সাহাবা)।

বুখারী ও মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত দু'টি হাদীস হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হাদীসের শেষাংশ হল الا انه لانبوة بعدی 'মনে রেখো আমার পর আর কোনো নবুয়াত নেই।" আবু দাউদ তিয়ালিসী, ইমাম আহমদ এবং মুহাম্মদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে মদীনা তাইয়েবার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রেখে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে থাকে। তিনি গিয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে শিশু ও মেয়েদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন ? তখন রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ 'আমার সাথে তোমার সম্পর্ক তো মূসা (আ)-এর সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো।" অর্থাৎ তুর পাহাড়ে যাবার সময় হযরত মূসা (আ) যেমন বনী ইসরাঈলদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে হযরত হারুন (আ)-কে পেছনে রেখে গিয়েছিলেন তেমনি মদীনার হেফাজতের জন্যে আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে সন্দেহও জাগে যে, হযরত হারুন (আ)-এর সঙ্গে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়ত পরে এ থেকে কোন ফিতনার সৃষ্টি হতে পারে। তাই পরমুহূর্তেই তিনি কথাটা স্পষ্ট করে বলে দেন ঃ 'তবে মনে রেখ, আমার পরে কোনো ব্যক্তি নবী হবে না।'

(১১) عن ثوبان قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم .... وانه سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبین لانبی بعدی -(ابو داود کتاب الفتن)

"হযরত সাওবান বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ----- আর কথা হচ্ছে এই যে, আমার উম্মতের মধ্যে তিরিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই

নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোনো নবী নেই।"–(আবু দাউদ, কিতাবুল ফিতান)।

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত আর একটি হাদীস আবু দাউদ 'কিতাবুল মালাহিম'-এ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও হযরত সাওবান এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীস দু'টি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় হাদীসটির শব্দ হল ঃ

حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله۔

"অর্থাৎ এমনকি তিরিশ জনের মত প্রতারক আসবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করবে।"

(১২) قال النبى صلى الله عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن من امتى احد فعمر-(بخارى كتاب المناقب)

"নবী (সা) বলেন ঃ তোমাদের পূর্বে যেসব বনী ইসরাঈল অতীত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক লোক এমন ছিলেন যাদের সঙ্গে কালাম করা হয়েছে (আল্লাহ কথা বলেছেন), তাঁরা নবী ছিলেন না। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ হয় তবে সে হবে উমর।"–(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)।

মুসলিমে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত যে হাদীস উল্লেখিত হয়েছে তাতে يكلمون এর পরিবর্তে محدثون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মুকাল্লাম ও মুহাদ্দাস শব্দ দু'টি সমার্থক। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কালাম করেছেন অথবা যার সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা হয়। এ থেকে জানা যায়, নবুয়াত ছাড়াও যদি এ উম্মতের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাথে কালাম করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতেন তবে তিনি হতেন একমাত্র হযরত উমর (রা)।

(১৩) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبى بعدى ولا امة بعد امتى -(بيهقى كتاب الرؤيا طبرانى)

"রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার পর আর কোনো নবী নেই আর আমার উম্মতের পর আর কোনো উম্মত নেই।"–(বায়হাকী, কিতাবুর রুইয়া ; তাবারানী)।

(১৪) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى اخر الانبياء وان مسجدى اخر المساجد -(مسلم، كتاب الحج، باب فضل الصلوة بمسجد مكة والمدينة)

"রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ (অর্থাৎ মদীনার মসজিদে নববী) শেষ মসজিদ।"* (মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযিলত সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ)।

* খতমে নবুয়াত অস্বীকারকারীরা এ হাদীস থেকে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যেমন তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ বলেছেন, অথচ এটি শেষ মসজিদ নয়; এর পর দুনিয়ায় বেশুমার মসজিদ নির্মিত হয়েছে—অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, তিনি শেষ নবী। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরেও নবী আসবে। অবশ্যি শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হচ্ছেন শেষ নবী এবং তাঁর মসজিদ শেষ মসজিদ। কিন্তু আসলে এ ধরনের বিকৃত অর্থই এ কথা প্রমাণ করে

(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে বহুসংখ্যক সাহাবী হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সনদসহ এগুলো উদ্ধৃত করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না। নবুয়াতের সিলসিলা তাঁর ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পরে যে ব্যক্তি রসূল বা নবী হবার দাবী করবে সে হবে দাজ্জাল ও কাজ্জাব।* কুরআনের 'খাতামুন নাবীয়্যীন' শব্দ এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে। রসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণীই এখানে সনদ ও চূড়ান্ত প্রমাণ। তদুপরি যখন তা কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন তা আরও অধিক শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর চেয়ে বেশী কে কুরআনকে বুঝেছে এবং এর তাফসীর করার অধিকারী তিনি ব্যতীত আর কে হতে পারে? এমন কে আছে যে খতমে নবুয়াতের অন্য কোনো অর্থ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে চিন্তা করতেও আমরা প্রস্তুত হব?

সাহাবীদের ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা মতৈক্য হচ্ছে তৃতীয় গুরুত্বের অধিকারী। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণ হয় যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

যে, এ লোকগুলো আল্লাহ ও রসূল (সা)-এর কালামের অর্থ অনুধাবন করা যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মুসলিম শরীফের যে স্থানে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এ বিষয়ের সমস্ত হাদীস সামনে রাখলেই এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ কোন্ অর্থে বলেছেন। এখানে হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং উম্মুল মুমেনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মাত্র তিনটি মসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সেখানে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় হাজার গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। এ জন্যে একমাত্র এ তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্যে সফর করা জায়েয। এ তিনটি ছাড়া দুনিয়ায় আর যত মসজিদ আছে সেগুলোর সব ক'টিকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটিতে নামায পড়ার জন্যে সেদিকে সফর করা জায়েয নয়। এ বিশেষ তিনটি মসজিদের মধ্যে 'মসজিদুল হারাম' হচ্ছে প্রথম মসজিদ। হযরত ইবরাহিম (আ) এটি বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো ম'সজিদে আকসা'। হযরত সুলায়মান (আ) এটি নির্মাণ করেছিলেন। আর তৃতীয়টি হচ্ছে মদীনার 'মসজিদে নববী'। এটি নির্মাণ করেন রসূলুল্লাহ (সা)। রসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্যের অর্থ হলো, এখন যেহেতু আমার পর আর কোনো নবী আসবে না, সেহেতু আমার মসজিদের পর দুনিয়ায় আর চতুর্থ এমন কোনো মসজিদ নির্মিত হবে না, যেখানে নামায পড়ার সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশী হবে এবং সেখানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সেদিকে সফর করা জায়েয হবে।-(গ্রন্থকার)

* খতমে নবুয়াত অস্বীকারকারীরা নবী করীম (সা)-এর এ সমস্ত হাদীসের মোকাবিলায় হযরত আয়েশা বলে কথিত নিম্নোক্ত বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়। এতে বলা হয়েছেঃ قولوا انه خاتم الانبياء ولا تقولوا لانبى بعده অর্থাৎ "বলো, নিশ্চই তিনি খাতামুন নাবীয়্যীন, তবে এ কথা বলো না যে, তাঁর পর আর নবী নেই।" কিন্তু প্রথমতঃ নবী করীম (সা)-এ সুস্পষ্ট আদেশের মোকাবিলায় হযরত আয়েশা (রা)-এর কোনো কথা পেশ করা চরম ধৃষ্টতা ও বেআদবী ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু হযরত আয়েশা (রা)-এর বলে কথিত উপরোক্ত উদ্ধৃতি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীসের কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা)-এর উপরোক্ত উক্তির উল্লেখ নেই। কোনো বিখ্যাত হাদীস লিপিবদ্ধকারী হাদীসটি তাঁর গ্রন্থে লিপিব্ধ করেননি। উপরোক্ত উক্তিটি 'দুররে মনসুর' নামক তাফসীর গ্রন্থ এবং 'তাকমিলায়ে মাজমাউল বাহার' নামক হাদীস অভিধান থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কিন্তু এর সনদের কোনো উল্লেখ নেই।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর অসংখ্য সুস্পষ্ট হাদীস, যেগুলোকে শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় মুহাদ্দিসগণ নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো অস্বীকার করার জন্যে একজন মহিলা সাহাবীর বলে কথিত দুর্বলতম উক্তি পেশ করা চরম ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুয়াতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুয়াত স্বীকার করে নেয় তাদের সবার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ করেন।

এ প্রসঙ্গে মুসাইলামা কাজ্জাবের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াত অস্বীকার করেনি বরং তার দাবী ছিল, তাকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াতের অংশীদার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের পূর্বে সে তাঁর কাছে যে চিঠি লিখেছিল তাতে বলা হয়েছিল ঃ

من مسيلمة رسول اللّه الى محمد رسول اللّه سلام عليك فانى اشركت فى الامر معك -(طبرى، جلد٢، صفحه ٣٩٩، طبع مصر)

অর্থাৎ "আল্লাহর রসূল মুসাইলামার তরফ হতে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের নিকট। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুয়াতের কাজে শরীক করা হয়েছে।"-(তাবারী, ২য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, মিসরে মুদ্রিত)। এছাড়াও ঐতিহাসিক তাবারী আরও বর্ণনা করেছেন যে, মুসাইলামার লোকেরা যে আযান দিত তাতে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' বাক্যটিও বলা হত।

এভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় রিসালাতে মুহাম্মদীকে স্বীকার করে নেয়ার পরও তাঁকে কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত গণ্য করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে এ কথাও প্রমাণিত যে, বনু হুনায়ফা সরল অন্তঃকরণে (in good faith) তাঁর ওপর ঈমান এনেছিল। অবশ্যি তারা এ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সা) নিজেই তাকে তাঁর নবুয়াতের কাজে শরীক করেছেন। এ ছাড়াও আর একটা কথা হল এই যে, এমন এক ব্যক্তি তাদের সামনে কুরআনের আয়াতকে মুসাইলামার ওপর অবতীর্ণ আয়াত হিসেবে পেশ করেছিল যে, মদীনা তাইয়েবা থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে গিয়েছিল। (ইবনে কাসীর লিখিত আল বেদয়া ওয়ান নেহায়া, ৫ম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)। এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করেননি। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এরপর মুরতাদ হওয়ার কারণে নয়, বরং বিদ্রোহের অপরাধে সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, এ কথা বলার সুযোগ নেই। বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি কখনও যুদ্ধ করতে হয় তাহলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম বানান যাবে না। মুসলমানই বা কেন জিম্মীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, গ্রেফতার হওয়ার পর তাদেরকেও গোলাম বানান যাবে না। কিন্তু মুসাইলামা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা) ঘোষণা করেন ঃ তাদের মেয়েদের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে গোলাম বানান হবে। গ্রেফতার করার পর দেখা গেলো সত্যিই তাদেরকে গোলাম বানানো হয়েছে। হযরত আলী (রা) তাদের মধ্য থেকেই এক যুদ্ধবন্দিনীর মালিক হন। এ যুদ্ধবন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া* হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি।-(আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১৬-৩২৫ পৃঃ)।

* হানাফীয়া অর্থ হানাফীয়া গোত্রের মেয়ে।

এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তা বিদ্রোহজনিত অপরাধ ছিল না বরং সে অপরাধ ছিল এই যে, এক ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর পর নবুয়াতের দাবী করে এবং লোকেরা তাঁর নবুয়াতের ওপর ঈমান আনে। রসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের পরপরই এ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা) আর সাহাবীদের সমগ্র দলটি একযোগে তাঁর সহায়তা করেন। সাহাবীদের ইজমার এর চেয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে!

আলেম সমাজের ইজমা

শরীয়াতে সাহাবীদের ইজমার পর চতুর্থ পর্যায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হচ্ছে সাহাবীদের পরবর্তীকালের আলেম সমাজের ইজমা। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় হিজরী প্রথম শতক থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকার আলেম সমাজ হামেশাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে ঃ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কোনো ব্যক্তি নবী হতে পারে না এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুয়াতের দাবী করবে বা যে ব্যক্তি এ মিথ্যা দাবী মেনে নেবে, সে কাফের। মিল্লাতে ইসলামীয়ার মধ্যে তার স্থান নেই।

এ ব্যাপারে কতিপয় প্রমাণ উপস্থাপন করছি ঃ

এক ঃ ইমাম আবু হানিফার (৮০-১৫০ হিঃ) যুগে এক ব্যক্তি নবুয়াতের দাবী করে।

সে বলে ঃ আমাকে সুযোগ দাও, আমি আমার নবুয়াতের সাংকেতিক চিহ্ন পেশ করব। এ কথা শুনে ইমাম সাহেব বলেন ঃ যে ব্যক্তি এর কাছ থেকে কোনো সাংকেতিক চিহ্ন তলব করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, لانبى بعدى "আমার পর আর কোনো নবী নেই।" (মানাকিব ইমাম আযম আবু হানিফা, ইবনে আহমদ মক্কী লিখিত, ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃঃ, হায়দ্রাবাদে প্রকাশিত ১৩২১ হিঃ)।

দুই ঃ আল্লামা ইবনে জারীর তারাবী (২২৪-৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত কুরআনের তাফসীরে وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ الذى ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لاحد بعده الى قيام الساعة অর্থাৎ "যিনি নবুয়াতকে খতম করে দিয়েছেন এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। কাজেই কিয়ামত পর্যন্ত এর দরজা আর কারো জন্যে খুলবে না।"-(তাফসীরে ইবনে জারীর, ২২ খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা)।

তিন ঃ ইমাম তাহাবী (২৩৯-৩২১ হিঃ) তাঁর 'আকীদায়ে সালফীয়া' গ্রন্থে পূর্ববর্তী নেতৃস্থানীয় আলেমগণ বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে নবুয়াত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত আকীদা লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ "আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাঁর বাছাই করা নবী ও প্রিয় রসূল। আর তিনি হচ্ছেন শেষ নবী. মুত্তাকীদের ইমাম, রসূলদের নেতা ও রব্বুল আলামীনের বন্ধু। তাঁর পরে নবুয়াতের প্রত্যেকটি দাবী গোমরাহী ও স্বার্থপূজার নামান্তর।"-(শারহুত তাহাবীয়া ফিল আকীদাতিস সালফিয়া, দারুল মা'আরিফ, মিসর, পৃষ্ঠা ১৫, ৮৭, ৯৬, ৯৭, ১০০ ও ১০২)।

চার ঃ আল্লামা ইবনে হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) লিখেছেন ঃ "নিসন্দেহে রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে অহীর সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি হচ্ছে এই যে, অহী আসে একমাত্র নবীর কাছে এবং মহান আল্লাহ বলেছেন, মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয় কিন্তু সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।"–(আল মুহাল্লা, ১ম খণ্ড, ২৬ পৃঃ)।

পাঁচ ঃ ইমাম গাজ্জালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) বলেন ঃ *

لو فتح هذا الباب (اى باب انكار كون الاجماع حجة) انجر الى امور شنيعة وهو ان قائلا لو قال يجوز ان يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيبعد التوقف فى تكفيره، ومستبعد استحالة ذالك عند البحث تستمد من الاجماع لا محالة، فان العقل لايحيله وما نقل فيه من قوله لانبى بعدى، ومن قوله تعالى خاتم النبيين، فلا يعجز هذا القائل عن تاويله، فيقول خاتم النبيين اراد به اولوا العزم من الرسل، فان قالوا النبيين عام، فلا يبعد تخصيص العام، وقوله لانبى بعدى لم يرد به الرسول وفرق بين النبى والرسول والنبى اعلى مرتبة من الرسول الى غير ذالك من انواع الهذايان، فهذا وامثاله لايمكن ان ندعى استحالته من حيث مجرد اللفظ، فانا فى تاويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات ابعد من هذه، ولم يكن ذالك مبطلا للنصوص، ولكن الرد على هذا القائل ان الامة فهمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبى بعده ابدا وعدم رسول الله ابدا وانه ليس فيه تاويل ولا تخصيص فمنكر هذا لايكون الا منكر الاجماع ـ(اقتصاد فى الاعتقاد، المطبعة الادبيه مصر، ص ١١٤)

অর্থাৎ "যদি এ দরজা (ইজমাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করার দরজা) খুলে দেয়া হয়, তাহলে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি বলে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পরে অন্য কোন নবীর আগমন সম্ভব, তাহলে তাকে কাফের আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করাকে জায়েয প্রমাণ করতে হলে নিসন্দেহে ইজমার আশ্রয় নিতে হবে। কারণ বুদ্ধি তার নাজায়েয হবার সিদ্ধান্ত দেয় না। আর কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে বলা যায়, এ আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ঃ 'আমার পরে আর নবী নেই' এবং 'শেষ নবী' এ বাক্য দু'টির মনগড়া অর্থ করা মোটেই কঠিন হবে না। সে বলতে পারে 'শেষ নবী' অর্থ শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরদের আগমনের সমাপ্তি। আর যদি বলা হয় 'নাবীয়্যীন' শব্দ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এ সাধারণকে বিশ্লেষণ করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। আমার পরে আর নবী নেই—এ বাক্যটি সম্পর্কে সে বলতে পারে, 'এ কথা তো বলা হয়নি যে আমার পরে আর রসূল নেই।' রসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নবীর মর্যাদা রসূলের চেয়ে বেশী। মোটকথা, এ ধরনের বহু আজেবাজে কথা বলা যেতে পারে। আর নিছক শাব্দিক

* ইমাম গাজ্জালীর বক্তব্য তাঁর আসল ভাষায় এখানে হুবহু উদ্ধৃত করলাম। এর কারণ হচ্ছে খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীরা অত্যন্ত জোরেশোরে এ বরাতটির নির্ভুলতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে।–(গ্রন্থকার)

বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মনগড়া অর্থ করার পথ বন্ধ করা সম্ভবও নয়। বরং উপমার বহিরঙ্গের (মনগড়া) অর্থ করার ব্যাপারে এর চেয়েও দূরবর্তী অর্থের সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে বলে আমরা মনে করি। আর এ ধরনের অর্থ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, তারা কুরআন ও হাদীস অস্বীকার করছে। কিন্তু এদের বক্তব্যের প্রতিবাদে আমরা বলবো, সমগ্র মুসলিম উম্মত সর্বসম্মিলিতভাবে এ শব্দ (অর্থাৎ আমার পরে আর নবী নেই) ও নবী করীম (সা)-এর অবস্থা থেকে এ কথাই বুঝেছে যে, নবী করীম (সা)-এর বক্তব্যের অর্থ ছিল ঃ তাঁর পরে না আর কোনো নবী আসবে, না রসূল। তাছাড়া সমগ্র মুসলিম উম্মত একযোগে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, এ ব্যাপারে কোনো প্রকার তা'বীল, মনগড়া বা দূরবর্তী অর্থ গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। কাজেই এহেন ব্যক্তিকে ইজমা অস্বীকারকারী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।" –(আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, আল মাতবা'আতুল আবদীয়া, মিসর, ১১৪ পৃষ্ঠা)।

ছয় ঃ মুহীউস সুন্নাহ বাগাবী (মৃত্যু ঃ ৫১০ হিঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ মা'আলিমুত তানযীল-এ লিখেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবুয়াতের সিলসিলা খতম করেছেন। কাজেই তিনি সর্বশেষ নবী .... ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ তায়ালা (এ আয়াতে) ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ (সা)-এর পর আর কোনো নবী হবে না। –(৩য় খণ্ড, ১৫৮ পৃঃ)।

সাত ঃ আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হিঃ) তাফসীরে কাশশাফে লিখেছেন যদি তোমরা বল, রসূলুল্লাহ (সা) শেষ নবী কেমন করে হলেন, যেখানে হযরত ঈসা (আ) শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন, তাহলে আমি বলব, রসূলুল্লাহ (সা)-এর শেষ নবী হওয়ার অর্থ হল, তাঁর পরে আর কাউকে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হবে না। হযরত ঈসা (আ)-কে রসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বে নবী বানান হয়েছে। পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-এর শরীয়াতের অনুসারী হবেন এবং তাঁর কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।"–(২য় খণ্ড, ২১৫ পৃঃ)।

আট ঃ কাজী ইয়ায (মৃত্যু ঃ ৫৪৪ হিঃ) লিখেছেন, যে ব্যক্তি নিজে নবুয়াতের দাবী করে অথবা নিজের প্রচেষ্টায় নবুয়াত অর্জন করা এবং অন্তত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নবীর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভব মনে করে (যেমন কোনো কোনো দার্শনিক ও বিকৃতমনা সুফী মনে করেন), এভাবে যে ব্যক্তি নবুয়াতের দাবী করে না অথচ তার ওপর অহী নাযিল হবার দাবী করে—এ ধরনের সমস্ত লোক কাফের এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। কেননা তিনি খবর দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবে না। আবার তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে খবর দিয়েছেন যে, তিনি নবুয়াতের পরিসমাপ্তি টেনেছেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্যে তাঁকে পাঠান হয়েছে। সমগ্র মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণীয় এবং এর দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ করার সুযোগই এখানে নেই। কাজেই উল্লিখিত দলগুলোর কাফের হওয়া সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও ইজমার দৃষ্টিতে কোনো সন্দেহ নেই।–(শিফা, ২য় খণ্ড, ২৭০-২৭১ পৃঃ)।

নয় ঃ আল্লামা শাহারিস্তানী (মৃত্যু ঃ ৫৪৮ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত আলমিলাল ওয়ান নিহাল গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আর এভাবে যে ব্যক্তি বলে .... মুহাম্মদ (সা)-এর পর কোনো নবী আসবে [হযরত ঈসা (আ) ছাড়া], তার কাফের হবার ব্যাপারে দু'জন লোকের মধ্যেও কোনো মতবিরোধ নেই।-(৩য় খণ্ড, ২৪৯ পৃঃ)।

দশ ঃ ইমাম রাযী (৫৪৩-৬০৬ হিঃ) তাঁর তাফসীরে কবীর গ্রন্থে 'খাতামান নাবীয়্যীন' আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ বর্ণনা প্রসঙ্গে 'খাতামান নাবীয়্যীন' শব্দ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যে নবীর পরে অন্য কোনো নবী আসবেন তিনি যদি উপদেশ ও নির্দেশাবলীর ব্যাপারে কিছু অপূর্ণ রেখে যান তাহলে তাঁর পরে আগমনকারী নবী তা পূর্ণ করতে পারবেন কিন্তু যাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না তিনি নিজের উম্মতের ওপর খুব বেশী স্নেহশীল হন এবং তাদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দান করেন। কারণ তাঁর দৃষ্টান্ত এমন একজন পিতার ন্যায় যিনি জানেন তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রের আর কোনো অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক থাকবে না।-(৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৮১ পৃঃ)।

এগার ঃ আল্লামা বায়যাবী (মৃঃ ৬৮৫ হিঃ) তাঁর তাফসীরে 'আনওয়ারুত তানযীল' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ অর্থাৎ তিনিই শেষ নবী। তিনি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। অথবা তাঁর কারণেই নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগান হয়েছে। আর তাঁর পরে হযরত ঈসা (আ)-এর নাযিল হওয়ার কারণে খতমে নবুয়াতের ওপর কোনো দোষ আসছে না। কারণ তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-এর দ্বীনের অনুসারী হয়ে নাযিল হবেন।
-(৪র্থ খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ)।

বার ঃ আল্লামা হাফেজ উদ্দীন নাসাফী (মৃঃ ৮১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মাদারেকুত তানযীল গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আর রসূলুল্লাহ (সা) হচ্ছেন খাতামুন নাবীয়্যীন। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো ব্যক্তিকে নবী করা হবে না। হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, তাঁকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। পরে যখন তিনি নাযিল হবেন তখন তিনি হবেন রসূলুল্লাহ (সা)-এর শরীয়াতের অনুসারী। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মত।-(৪৭১ পৃঃ)।

তের ঃ আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী (মৃত্যু ঃ ৭২৫ হিঃ) তাঁর তাফসীরে খাযেন গ্রন্থে লিখেছেন ঃ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ অর্থাৎ আল্লাহ রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর নবুয়াত খতম করে দিয়েছেন। কাজেই তাঁর পরে আর কোনো নবুয়াত নেই এবং তাঁর পরে তাঁর নবুয়াতের কোনো অংশীদারও নেই وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ এ কথা জানেন যে, তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই।-(৪৭১-৪৭২ পৃষ্ঠা)।

চৌদ্দ ঃ আল্লামা ইবনে কাসীর (মৃঃ ৭৪ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে লিখেছেন অতপর আলোচ্য আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর আর কোনো নবী নেই। আর যখন তাঁর পরে কোনো নবী নেই তখন রসূলের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা রিসালাত একটা বিশেষ পদমর্যাদা এবং নবুয়াতের পদমর্যাদা সাধারণধর্মী প্রত্যেক রসূল নবী হন কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল হন না। রসূলুল্লাহ (সা)-এর পর যে ব্যক্তি এ পদমর্যাদার দাবী করবে সে হবে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল, গোমরাহ এবং অন্যকে গোমরাহকারী। সে যতই প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ও জাদুর

তেলেসমতী দেখিয়ে মানুষের চোখে ধূম্রজাল সৃষ্টি করুক না কেন তার দাবী মানা যেতে পারে না। ... কিয়ামত পর্যন্ত এ পদমর্যাদার দাবীদার প্রত্যেকটি ব্যক্তির অবস্থা একই ধরনের হবে।–(৩য় খণ্ড, ৪৯৩-৪৯৪ পৃঃ)।

পনের ঃ আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) তাঁর তাফসীরে জালালায়েন গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ......وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ জানেন যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর পর আর কোনো নবী নেই এবং হযরত ঈসা (আ) নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা)-এর শরীয়াত অনুযায়ী আমল করবেন।"–(৭৬৮ পৃঃ)।

ষোল ঃ আল্লামা ইবনে নুজাইম (মৃঃ ৯৭০ হিঃ) উসূলে ফিকাহর মশহুর কিতাব আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের-এর 'কিতাবুস সিয়ারের বাবুর রিদ্দা'য় লিখেছেন ঃ যদি কেউ নবী মুহাম্মদ (সা)-কে শেষ নবী মনে না করে, তাহলে সে মুসলমান নয়। কেননা এ কথাগুলো জানা ও এগুলোকে স্বীকার করে নেয়া দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত।–(১৭৯ পৃষ্ঠা)।

সতের ঃ মোল্লা আলী কারী (মৃঃ ১০১৬ হিঃ) 'শারহে ফিকহে আকবর' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আমাদের রসূলের পর অন্য কোনো ব্যক্তির নবুয়াতের দাবী করা সর্বসম্মতভাবে কুফরী।–(২০২ পৃষ্ঠা)।

আঠার ঃ শায়খ ইসমাঈল হাক্কী (মৃত্যু ১১৩৭ হিঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ান গ্রন্থে উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ আসেম* 'খাতাম' শব্দটির 'তা' এর ওপর জবর লাগিয়ে পড়েছেন। এর অর্থ হয় খতম করার যন্ত্র, যার সাহায্যে মোহর লাগান হয়।

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) সকল নবীর শেষে এসেছেন এবং তাঁর সাহায্যে নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফারসীতে একে বলা হবে 'মোহরে পয়গম্বঁরা'। অর্থাৎ তাঁর সাহায্যে নবুয়াতের দরজা মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং পয়গম্বরদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ক্বারীগণ 'তা' এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন 'খাতিমুন নাবীয়্যীন'। এর অর্থ হয়, তিনি ছিলেন মোহরকারী। অন্য কথায় বলা যায়, পয়গম্বরদের ওপর মোহরকারী। এভাবে এ শব্দটিও 'খাতাম'-এর সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। ..... তাহলে রসূলুল্লাহ (সা)-এর পর তাঁর উম্মতের আলেম সমাজ এখন উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন একমাত্র তাঁর প্রতিনিধিত্ব। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথেই নবুয়াতের উত্তরাধিকারেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর পরে হযরত ঈসা (আ)-এর নাযিল হওয়ার ব্যাপারটি তাঁর নবুয়াতকে ত্রুটিযুক্ত করবে না। কেননা খাতিমুন নাবীয়্যীনের অর্থ হচ্ছে এই যে, তাঁর পরে আর কাউকে নবী বানান হবে না এবং হযরত ঈসা (আ)-কে তাঁর পূর্বে নবী বানান হয়েছে। কাজেই তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসারীদের মধ্যে শামিল হবেন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন এবং তাঁরই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তখন হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর অহী নাযিল হবে না এবং তিনি কোনো নতুন আহকাম জারি করবেন না। বরং তিনি হবেন রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিনিধি। ..... আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের নবীর

* তাজবীদ শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম।–(অনুবাদক)

পরে কোনো নবী নেই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। আর রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ لَا نَبِىَّ بَعْدِى "আমার পরে আর কোনো নবী নেই।" কাজেই বর্তমানে যে ব্যক্তি বলবে, মুহাম্মদ (সা)-এর পরে নবী আছে, তাকে কাফের বলা হবে। কারণ সে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণাকে অস্বীকার করেছে। অনুরূপভাবে তাকেও কাফের বলা হবে, যে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। কারণ সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের পর হক বাতিল থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর পর নবুয়াতের দাবী করবে তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে।-(২২ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)।

উনিশ ঃ ফতওয়া-ই-আলমগীরী ঃ হিন্দুস্তানের বাদশাহ আলমগীরের নির্দেশে বারশ' হিজরীতে উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেমগণ সম্মিলিতভাবে এ কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেন। এতে বলা হয়েছে ঃ যদি কেউ মনে করে মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী নয়, তাহলে সে মুসলিম নয়। আর যদি সে নিজেকে আল্লাহর রসূল বা পয়গম্বর বলে দাবী করে তাহলে তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হবে।-(২য় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)।

বিশ ঃ আল্লামা শওকানী (মৃত্যু ১২৫৫ হিজরী) তাঁর তাফসীর ফাতহুল কাদীরে লিখেছেন ঃ সমগ্র মুসলিম সমাজ 'তা' এর নীচে যের লাগিয়ে 'খাতিম' শব্দটি পড়েছেন। একমাত্র আসেম যবর লাগিয়ে পড়েছেন। প্রথমটার অর্থ হল, রসূলুল্লাহ (সা) সমস্ত নবীদের ধারাবাহিকতা খতম করেছেন অর্থাৎ তিনি সবার শেষে এসেছেন। আর দ্বিতীয়টার অর্থ হল, তিনি সমস্ত পয়গম্বরদের জন্যে মোহরের ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁর সাহায্যে নবীদের সিলসিলা মোহর এঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে তাদের দলটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে।-(৪র্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা)।

একুশ ঃ আল্লামা আলুসী (মৃত্যু ১২৮০ হিজরী) তাফসীরে 'রুহুল মা'আনী'তে লিখেছেন ঃ নবী শব্দটি রসূলের চেয়ে বেশী সাধারণ অর্থব্যঞ্জক। কাজেই রসূলের খাতামুন নাবীয়্যীন হবার অর্থ হল এই যে, তিনি খাতামুল মুরসালীনও। তিনি শেষ নবী এবং শেষ রসূল এ কথার অর্থ হলো, এ দুনিয়ায় তাঁর নবুয়াতের গুণে গুণান্বিত হওয়ার পরেই মানুষ ও জ্বিনের মধ্য থেকে এ গুণটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।-(২২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)। রসূলুল্লাহ (সা)-এর পর যে ব্যক্তি নবুয়াতের অহী লাভ করার দাবী করবে তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ নেই।-(২২ খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)। রসূলুল্লাহ (সা) শেষ নবী—এ কথাটি কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে। রসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত এটিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখা করেছে এবং সমগ্র মুসলিম সমাজ এর ওপর আমল করেছে। কাজেই যে ব্যক্তি এর রিরোধী কোন দাবী করবেন, তাকে কাফের গণ্য করা হবে।-(২২ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

হিন্দুস্তান থেকে মরক্কো ও আন্দালুসিয়া এবং তুরস্ক থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ, মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা এবং মতামত আমি এখানে উল্লেখ করলাম। তাঁদের নামের সাথে সাথে তাঁদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখও উল্লেখ করেছি। এ থেকে প্রথম দৃষ্টিতেই যে কোনো ব্যক্তি আন্দাজ করতে পারবেন যে, হিজরীর প্রথম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এর মধ্যে

শামিল আছেন। হিজরী চতুর্দশ শতকের আলেম সমাজের মতামতও আমি এখানে উল্লেখ করতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছা করেই তাদের মতামতের উদ্ধৃতি দেইনি। কারণ তাদের মতামত ও ব্যাখ্যার জবাবে কেউ হয়তো এ কথা বলতে পারেন যে, তাঁরা এ যুগের নবুয়াতের দাবীদারের প্রতি জিদের বশবর্তী হয়ে খতমে নবুয়াতের এ অর্থ বিবৃত করেছেন। তাই আমি পূর্ববর্তী যুগের আলেম সমাজের মতামতের উদ্ধৃতি দিয়েছি। বলা বাহুল্য আজকের যুগের কারও সাথে তাদের কোনো বিরোধের প্রশ্নই উঠে না। এসব মতামত থেকে এ কথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিজরীর প্রথম শতক থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহান একযোগে খাতামুন নাবীয়্যীন শব্দের অর্থ নিয়েছে শেষ নবী। প্রত্যেক যুগের মুসলমানরা এ একই আকীদা পোষণ করেছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর পর নবুয়াতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারেও কোনোকালে কোনো মতবিরোধ হয়নি যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পরে যে ব্যক্তিই রসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে আর যে ব্যক্তি তার দাবী মেনে নেবে তারা কাফের হয়ে যাবে।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন যে, খাতামান নাবীয়্যীন শব্দের যে অর্থ আরবী অভিধান থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, রসূলুল্লাহ (সা)-এর যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম যে ব্যাখ্যায় মতৈক্য প্রকাশ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম সমাজ দ্ব্যর্থহীনভাবে যা স্বীকার করে আসছেন, তার বিপক্ষে দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ অর্থাৎ কোনো নতুন দাবীদারের জন্যে নবুয়াতের দরজা উন্মুক্ত করার অবকাশ ও সুযোগ থাকে কি ? আর সেই সব লোককেও বা কেমন করে মুসলমান বলে স্বীকার করে নেয়া যায় যারা নবুয়াতের দরজা উন্মুক্ত করার নিছক ধারণাই পোষণ করেনি বরং ঐ দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি নবুয়াতের দালানে প্রবেশ করেছে এবং তারা তাঁর নবুয়াতের ওপর ঈমানও এনেছে ?

এ প্রসঙ্গে আরো তিনটি কথা বিবেচনা করতে হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

প্রথম কথা হল, নবুয়াতের ব্যাপারটি বড়ই নাজুক। কুরআনের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি ইসলামের মৌলিক আকীদার অন্তর্ভুক্ত। এটি স্বীকার করার ও না করার ওপর মানুষের ঈমান ও কুফরী নির্ভর করে। যদি কোনো ব্যক্তি নবী হয়ে থাকেন এবং লোকেরা তাকে না মানে তাহলে তারা কাফের হয়ে যায়। আবার কোনো ব্যক্তি নবী না হওয়া সত্ত্বেও যদি লোকেরা তাকে নবী বলে মেনে নেয় তাহলে তারাও কাফের হয়ে যায়। এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিকট থেকে কোনো প্রকার অসতর্কতার চিন্তাই করা যায় না। যদি নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর আর কোনো নবী আসার না থাকত তাহলে আল্লাহ নিজেই কুরআনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করতেন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে প্রকাশ্য-ভাবে তা ঘোষণা করতেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)ও কখনও এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যেতেন না যতক্ষণ না তিনি সমগ্র উম্মতকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত করতেন যে তাঁর পরে আরও নবী আসবেন এবং তাদেরকে আমাদের মেনে নিতে হবে। আমাদের দ্বীন ও ঈমানের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা)-এর কি দুশমনি ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর পর নবুয়াতের দরজা তো উন্মুক্ত থাকবে এবং এ দরজা দিয়ে কোনো নবী প্রবেশ করবেন।

যার ওপর ঈমান না আনলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না—অথচ আমাদেরকে এ সম্পর্কে শুধু বেখবরই রাখা হয়নি বরং বিপরীত পক্ষে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল একযোগে এমন সব কথা বলেছেন, যার ফলে তেরশ' বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত এ কথাই মনে করত এবং আজও মনে করে যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর আর কোনো নবী আসবেন না ?

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম নবুয়াতের দরজা উন্মুক্ত আছে এবং কোনো নবী এসেও গেছেন। এ অবস্থায় আমরা নির্দ্বিধায় তাকে অস্বীকার করে বসব। ভয় থাকতে পারে একমাত্র আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের। কিন্তু কিয়ামতের দিন তিনি আমাদের কাছে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে আমরা সোজাসুজি উল্লিখিত রেকর্ডগুলো তাঁর আদালতে পেশ করব। এ থেকে প্রমাণ হয়ে যাবে (মা'আযাল্লাহ) আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতই আমাদেরকে এ কুফরীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি, এসব রেকর্ড দেখার পর কোনো নতুন নবীর ওপর ঈমান না আনার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু যদি সত্যিই নবুয়াতের দরজা বন্ধ হয়েই থাকে এবং আর কোনো নবী আসার সম্ভাবনা না থাকে আর এ সত্ত্বেও এক ব্যক্তি কোনো নবুয়াতের দাবীদারের ওপর ঈমান আনে, তাহলে এ অবস্থায় তার চিন্তা করা উচিত, এ কুফরীর অপরাধ থেকে বাঁচার জন্যে সে আল্লাহর আদালতে এমনকি রেকর্ড পেশ করতে পারে, যার ফলে সে মুক্তি লাভের আশা করতে পারে। আদালতে হাযির হবার পূর্বে তার নিজের জবাবদিহির জন্যে সংগৃহীত দলিল-প্রমাণগুলো এখানেই বিশ্লেষণ করে নেয়া উচিত। আর আমরা যেসব দলিল-প্রমাণ পেশ করেছি সেগুলার সাথে তার নিজের দলিল-প্রমাণগুলো পর্যালোচনা করে তার বিচার করা উচিত যে, যে সাফাইয়ের ওপর নির্ভর করে সে এ কাজ করছে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এর ওপর নির্ভর করে কুফরীর শাস্তি ভোগ করার বিপদ টেনে নিতে পারে ?

এখন নতুন নবীর প্রয়োজনটা কি ?

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হচ্ছে এই যে, ইবাদাত ও নেক কাজে তরক্কী করে কোনো ব্যক্তি নিজের মধ্যে নবুয়াতের গুণ পয়দা করতে পারে না। নবুয়াত এমন কোনো পুরস্কার নয় যা কোনো বিরাট খেদমতের বিনিময়ে মানুষকে দান করা হয়। বরং এ একটি মর্যাদা যা বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে দান করে থাকেন। এ প্রয়োজনের সময় যখন আসে তখন আল্লাহ এক ব্যক্তিকে এ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যখন প্রয়োজন হয় না বা থাকে না, তখন অযথা আল্লাহ একের পর এক নবী পাঠাতে থাকেন না।

কোন্ পরিস্থিতিতে নবী পাঠাবার প্রয়োজন দেখা দেয়—কুরআন মজীদ থেকে এ তথ্য জানার চেষ্টা করলে জানতে পারা যায় যে, শুধুমাত্র চার ধরনের পরিস্থিতিতে নবী প্রেরিত হয়েছেন ঃ

এক ঃ কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে নবী পাঠাবার প্রয়োজন দেখা দেয় এ জন্যে যে, তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোনো নবী আসেননি এবং অন্য কোনো জাতির মধ্যে পাঠান নবীর পয়গামও তাদের নিকট পৌঁছেনি।

দুই ঃ নবী পাঠাবার প্রয়োজন এ জন্যে দেখা দেয় যে, পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা মানুষ ভুলে গেছে অথবা তা বিকৃত করেছে এবং সে নবীর দেখান পথ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

তিন ঃ পূর্ববর্তী নবীর মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং দ্বীনের পূর্ণতার জন্যে অতিরিক্ত নবী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

চার ঃ কোনো নবীর সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে আর একজন নবীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বলা বাহুল্য রসূলুল্লাহ (সা)-এর পর উপরোল্লিখিত কারণগুলোর কোনো একটিও বর্তমান নেই।

কুরআন নিজেই বলছে, রসূলুল্লাহ (সা)-কে সারা দুনিয়ার জন্যে হেদায়াতকারী হিসেবে পাঠান হয়েছে। দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ কথা বলে যে, তাঁর নবুয়াত প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র দুনিয়ায় এমন অবস্থা বিরাজ করছে যার ফলে তাঁর দাওয়াত দুনিয়ার সব জাতির মধ্যে পৌছতে পারে। এরপরও প্রত্যেক জাতির মধ্যে আলাদা আলাদা পয়গম্বর পাঠাবার কোনো প্রয়োজন থাকে না।

কুরআন এ কথাও বলে এবং এ সঙ্গে হাদীস ও সীরাতের যাবতীয় বর্ণনাও এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা পরোপুরি নির্ভুল ও নির্ভেজালরূপে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোনো প্রকার বিকৃতি বা রদবদল হয়নি। তিনি যে কুরআন এনেছিলেন আজ পর্যন্ত তার মধ্যে একটি শব্দও কমবেশী হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারবে না। নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যাম তিনি যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাও আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি। কাজেই দ্বিতীয় প্রয়োজনটাও খতম হয়ে গেছে।

আবার কুরআন মজীদ রসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে পূর্ণতা দান করার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে। কাজেই দ্বীনের পূর্ণতার জন্যেও এখন আর কোনো নবীর প্রয়োজন নেই।

এখন বাকি থাকে চতুর্থ প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, এ জন্যে যদি কোনো নবীর প্রয়োজন হত তাহলে রসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে তাঁর সঙ্গেই তাঁকে পাঠান হত। কিন্তু সবাই জানে, এমন কোনো নবী রসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে পাঠান হয়নি। কাজেই এ কারণটাও বাতিল হয়ে গেছে।

এখন আমরা জানতে চাই, রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে আর একজন নতুন নবী আসার পঞ্চম কারণটা কি ? যদি কেউ বলে, সমগ্র উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, কাজেই তাদের সংস্কারের জন্যে আর একজন নতুন নবীর প্রয়োজন, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করব ঃ নিছক সংস্কারের উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো নবী এসেছেন কি, যে আজ শুধু এ কাজের জন্যে একজন নবী আসবেন ? নবী পাঠাবার কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁর ওপর অহী নাযিল করা হয়। আর অহীর প্রয়োজন পড়ে কোনো নতুন পয়গাম দেবার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে। আল্লাহর কুরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহীর সমস্ত সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গেছে, তখন সংস্কারের জন্যে একমাত্র সংস্কারকের প্রয়োজনই, বাকি রয়ে গেছে—নবীর প্রয়োজন নয়।

নতুন নবুয়াত বর্তমান উম্মতের জন্যে রহমতের বার্তাবহ নয়

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে, কোনো জাতির মধ্যে নবী আসার সাথে সাথেই তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফরীর প্রশ্ন উঠবে। যারা ঐ নবীকে স্বীকার করে নেবে তারা এক উম্মতভুক্ত হবে। আর যারা তাকে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যি আর একটি পৃথক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ দুই উম্মতের মতবিরোধ কোনো আংশিক বা খুঁটিনাটি মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না। বরং তা একজন নবীর ওপর ঈমান আনার পর্যায়ে এমন একটি মৌলিক মতবিরোধ নেমে আসবে, যার ফলে তাদের একটি দল যতদিন না নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ত্যাগ করবে ততদিন পর্যন্ত অন্য দলের সাথে কখনও একত্র হতে পারবে না। এ ছাড়াও কার্যতঃ তাদের উভয়ের জন্যে হেদায়াত ও আইনের উৎস হবে বিভিন্ন। কারণ একটি দল তাদের নিজেদের নবীর অহী ও সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয় দলটি এ দু'টিকে তাদের আইনের উৎস হিসেবে মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকার করবে। কাজেই তাদের উভয়ের একত্রে একটি সমাজ সৃষ্টি কখনও সম্ভব হবে না।

এ উজ্জ্বল সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোনো ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, 'খতমে নবুয়াত' মুসলিম মিল্লাতের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার একটি বিরাট রহমতস্বরূপ। এরই বদৌলতে সমগ্র মুসলিম মিল্লাত একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে শামিল হতে পেরেছে। এ জিনিসটা মুসলমানদেরকে এমন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছে যা তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ বপন করতে পারতো। কাজেই যে ব্যক্তি নবী মুহাম্মদ (সা)-কে হেদায়াত দানকারী ও নেতা বলে স্বীকার করে এবং তাঁর শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো হেদায়াতের উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায় না সে এ ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং যে কোনো সময় এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। নবুয়াতের দরজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম মিল্লাত কখনও এ ঐক্যের সন্ধান পেতো না। কারণ প্রত্যেক নবীর আগমনের পর এ ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।

মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও এ কথাই সমর্থন করে যে, একটি বিশ্বজনীন ও পরিপূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করে তাকে সকল প্রকার বিকৃতি ও রদবদল থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে সম্মিলিতভাবে এ শেষ নবীর অনুগমন করে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান চিরকালের জন্যে একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে এবং বিনা প্রয়োজনে নতুন নতুন নবীর আগমনে উম্মতের মধ্যে বারবার বিভেদ সৃষ্টি হতে পারবে না। নবী 'যিল্লী' হোক অথবা 'বুরুযী'*, 'উম্মতওয়ালা' অথবা শরীয়াতওয়ালা ও কিতাবওয়ালা যে কোনো অবস্থায়ই যিনি নবী হবেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হবেন তার আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে এই যে, তাঁকে যারা মেনে নেবে, তারা হবে একটি উম্মত আর যারা মানবে না তারা কাফের বলে গণ্য হবে। যখন নবী পাঠাবার সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন—শুধুমাত্র তখনই—এ বিভেদ অবশ্যম্ভাবী হয় কিন্তু যখন তার আগমনের কোনো প্রয়োজন থাকে না তখন আল্লাহর হিকমত এবং তাঁর রহমতের নিকট কোনো ক্রমেই আশা করা যায় না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে অযথা ঈমান ও কুফরীর সংঘর্ষে লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি উম্মতভুক্ত হবার সুযোগ দেবেন না। কাজেই কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়, মানুষের বিবেক বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে এবং আর দাবী হচ্ছে এই যে, বর্তমান যুগে নবুয়াতের দরজা বন্ধ থাকা উচিত।

* পূর্ববর্তী নবীর অনুবর্তি নবীকে 'যিল্লী' নবী এবং পূর্ববর্তী নবীর অনুবর্তি নয় এমন নবীকে 'বুরুযী' নবী বলা হয়।

হাদীসের আলোকে 'প্রতিশ্রুত মসীহ'-এর তাৎপর্য

নতুন নবুয়াতের দিকে আহ্বানকারীরা সাধারণত অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বলেন যে, হাদীসে 'প্রতিশ্রুত মসীহের' আগমনের কথা আছে এবং 'মসীহ' নবী ছিলেন। কাজেই তাঁর আগমনের ফলে খতমে নবুয়াত কোনো দিক দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে না। বরং খতমে নবুয়াতও সত্য এবং প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আগমনও সত্য।

এ প্রসঙ্গে তাঁরা আরও বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) 'প্রতিশ্রুত মসীহ' নন। তাঁর তো মৃত্যু হয়েছে। হাদীসে যার আগমনের খবর দেয়া হয়েছে তিনি হলেন 'মাসীলে মসীহ'—অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর অনুরূপ একজন মসীহ। আর তিনি 'অমুক' ব্যক্তি যিনি সম্প্রতি আগমন করেছে। তাঁকে মেনে নেয়া খতমে নবুয়াত বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়।

এ প্রতারণার পর্দা ভেদ করার জন্যে আমরা এখানে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো থেকে এ ব্যাপারে উল্লিখিত প্রামাণ্য হাদীসসমূহ সূত্রসহ নকল করছি। এ হাদীসগুলো প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারবেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) কি বলেছিলেন আর আজ তাঁকে কিভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে।*

হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কিত হাদীস

(١) عن ابى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليت ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها - (بخارى كتاب احاديث الانبياء باب نزول عيسى ابن مريم، باب بيان نزول عيسى، ترمذ ابواب الفتن باب فى نزول عيسىٰ مسند احمد مرويات ابوهريرة رضـ)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম ন্যায় বিচারক শাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন। অতপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর ধ্বংস করবেন** এবং যুদ্ধ খতম করে দেবেন (বর্ণনান্তরে যুদ্ধের পরিবর্তে 'জিযিয়া' শব্দটি

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুরআনের সাথে প্রতিশ্রুত মসীহ'র আসা না আসার ব্যাপারটির কোনো সম্পর্ক নেই। হাদীসের ওপরই এর যাবতীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কাজেই যদি কোনো মসীহকে আসতে হয়, তাহলে সেই মসীহেরই আসার কথা যার উল্লেখ নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়। আর মসীহ সংক্রান্ত হাদীসগুলো না মানলে মসীহের আসার প্রশ্নই দেখা দেয় না। এ আকিদার ভিত্তি তো থাকবে হাদীসের ওপর কিন্তু যেসব নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য মসহিহের আসার খবর দেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অযথা নানান ত্রুটি দেখানো হবে নিছক ভাঁড়ামি।-(গ্রন্থকার)।

** ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা ও শূকর ধ্বংস করার অর্থ হচ্ছে, একটি স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে খৃষ্ট ধর্মের বিলুপ্ত হয়ে যাবে। খৃষ্ট ধর্মের সমগ্র কাঠামোটা এ আকিদার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্রকে [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে] ক্রুশে বিদ্ধ করে অভিশপ্ত মৃত্যুদান করেছেন এবং এতেই সমস্ত মানুষের গোনাহের কাফফারা হয়ে গেছে। অন্যান্য নবীদের উম্মতের সঙ্গে খৃষ্টানদের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এরা কেবল আকিদাটুকু গ্রহণ করে খোদার সমগ্র শরীয়াত নাকচ করে দিয়েছে। এমনকি শূকরকেও এরা হালাল করে নিয়েছে—যা সকল নবীর শরীয়াতে

উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ জিযিয়া খতম করে দেবেন)।* তখন ধনের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না এবং (অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছবে যে, মানুষ আল্লাহর জন্যে) একটি সিজদা করে নেয়াটাকেই দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করবে।

অন্য এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

(٢) لاتقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم -

অর্থাৎ "হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।" .... এরপর যা কিছু বলা হয়েছে তা উপরোল্লিখিত হাদীসের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।-(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, বাবু কাসরিস সালীব; ইবনে মাজা কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতি দাজ্জাল)।

(٣) عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم ؟ (بخارى كتاب احاديث الانبياء باب نزول عيسى، مسلم بيان نزول عيسى، مسند احمد مرويات ابى هريرة رضـ)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন ইবনে মরিয়াম এবং সে সময়ে তোমাদের ইমাম নিযুক্ত হবেন তোমাদের মধ্য থেকেই ?"**

(٤) عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلوة ويعطى المال حتى لايقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها او يعتمر او يجمعهما (مسند احمد بسلسلئه مرويات ابى هريرة، مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع فى الحج والقران)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ঈসা ইবনে মরিয়াম অবতীর্ণ হবেন। তিনি শূকর ধ্বংস করবেন ক্রুশ নিশ্চহ্ন করবেন। তাঁর জন্য একাধিক নামায এক ওয়াক্তে পড়া হবে। তিনি এত ধন বিতরণ করবেন যে অবশেষে তার গ্রহীতা পাওয়া যাবে না। তিনি খেরাজ মওকুফ করে দেবেন। রাওহা*** নামক স্থানে অবস্থান করে তিনি সেখান থেকে হজ্জ অথবা উমরাহ করবেন অথবা দু'টোই করবেন।"**** [রসূলুল্লাহ (সা) এর মধ্যে কোন্‌টা বলেছিলেন সে সম্পর্কে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়ে গেছে]।

হারাম ছিল। কাজেই হযরত ঈসা (আ) নিজে এসে যখন বলবেন, আমি আল্লাহর পুত্র নই, আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়নি এবং আমি কারও গোনাহর কাফফারা হইনি,তখন খৃষ্ট ধর্ম-বিশ্বাসের বুনিয়াদই সমূলে উৎপাটিত হবে। অনুরূপভাবে যখন তিনি বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্যে আমি শূকর হালাল করিনি এবং তাদেরকে শরীয়াতের বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন খৃষ্ট ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নির্মূল হয়ে যাবে।

* অন্য কথায় বলা যায়, তখন ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ একমাত্র দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না এবং কারও থেকে জিযিয়াও আদায় করা হবে না।-(গ্রন্থকার)।

** অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) নামাযে ইমামতি করবেন না। মুসলমানদের পূর্ব নিযুক্ত ইমামের পেছনেই নামায পড়বেন।-(গ্রন্থকার)।

** * রাওহা মদীনা থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি স্থানের নাম।

**** উল্লেখ্য, বর্তমানে যুগে যাকে 'মাসীলে মসীহ' বা মসীহের সদৃশ গণ্য করা হয়েছে তিনি জীবনে কোনো দিন হজ্জ ও উমরাহ করেননি।*-(গ্রন্থকার)।

(٥) عن ابى هريرة (بعد ذكر خروج الدجال) فبينماهم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسى ابن مريم فامهم فاذا راه عدو الله يذوب كما يذوب الملح فى الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه فى حربته -(مشكوت كتاب الفتن باب الملاحم بحوالئه مسلم)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, [দাজ্জালের আবির্ভাব বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ] ইত্যবসরে মুসলমানরা তার সাথে লড়াইয়ের প্রস্তুতি করতে থাকবে, কাতারবন্দি হতে থাকবে এবং নামাযের জন্যে 'ইকামত' শেষ হবে। এমন সময় ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) অবতীর্ণ হবেন এবং নামাযে মুসলমানদের ইমামতি করবেন। আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল তাঁকে দেখা মাত্রই এখনভাবে গলিত হতে থাকবে যেমনভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা (আ) তাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন তাহলেও সে গলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে হযরত ঈসা (আ)-এর হাতে কতল করাবেন। তিনি দাজ্জালের রক্তে রঞ্জিত নিজের বর্শা-ফলক মুসলমানদের দেখাবেন।"

(٦) عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس بينى وبينه نبى (يعنى عيسى) وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض بين ممصرتين كان رأسه يقطروان لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث فى الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون (ابو داؤد كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، مسند احمد مرويات ابو هريرة)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার ও তাঁর [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর] মাঝখানে আর কোনো নবী নেই এবং তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে দেখা মাত্রই তোমরা চিনে নিয়ো। তিনি হবেন মাঝারি ধরনের লম্বা। গায়ের বর্ণ লাল-সাদায় মেশানো। পরণে দু'টো হলুদ রঙের কাপড়। তাঁর মাথার চুল এমন হবে যেন মনে হবে এই বুঝি তা থেকে পানি টপকে পড়ছে। অথচ তা মোটেই সিক্ত হবে না। তিনি ইসলামের জন্যে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবেন। শূকর ধ্বংস করবেন। জিযিয়া কর রহিত করবেন। তাঁর জামানায় আল্লাহ ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার আর সমস্ত মিল্লাত খতম করে দেবেন। তিনি (মসীহ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং দুনিয়ায় চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতপর তিনি ইন্তেকাল করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামায পড়বে।"

(٧) عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول اميرهم تعال فصل فيقول لاان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة (مسلم بيان نزول عيسى ابن مريم، مسند احمد بسلسه مرويات جابر ابن عبد الله)

"হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, -------- অতপর ঈসা ইবনে মরিয়াম অবতীর্ণ হবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন আসুন আপনি নামায পড়ান। কিন্তু তিনি বলবেন, না তোমরা নিজেরাই একে অপরের আমীর।* আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতকে যে ইজ্জত দান করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ কথা বলবেন।"

(৮) عن جَابر بن عَبد اللّه (فى قصة ابن صياد) فقال عمر بن الخطاب ائذن لى فاقتله يارسول اللّه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان يكن هو فلست صاحبه انما صاحبه عيسى ابن مريم عليه الصلوة والسلام، وان لايكن فليس لك ان تقتل رجلا من اهل العهد ـ(مشكوة كتاب الفتن باب قصة ابن صياد بحوله شرح السنه بغوى)

"হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) (ইবনে সাইয়াদ প্রসঙ্গে) বর্ণনা করেছেন, অতপর উমর ইবনে খাত্তাব আরজ করলেন, হে রসূলুল্লাহ, অনুমতি দিন, আমি তাকে কতল করি। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি এ সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর হত্যাকারী নও বরং ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) একে হত্যা করবেন। আর যদি এ সেই ব্যক্তি না হয়ে থাকে, তাহলে জিম্মীদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার তোমাদের কোনো অধিকার নেই।"

(৯) عن جابر بن عبد اللّه (فى قصة الدجال) فاذهم بعيسى ابن مريم عليه السلام فتقام الصلوة له تقدم ياروح اللّه فيقول ليتقدم امامكم فليصل بكم فاذا صلى صلوة الصبح خرجوا اليه قال فحين يرى الكذاب بيماث كما ينماث الملح فى الماء فيهشى اليه فيقتله حتى ان الشجر والحجر ينادى ياروح اللّه هذا اليهودى، فلا يترك ممن كان يتبعه احدا الا قتله ـ(مسند احمد بسلسلئه روايات جابر بن عبد اللّه)

"হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, দাজ্জাল প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সেই ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। লোকেরা নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁকে বলা হবে, হে রুহুল্লাহ, অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বলবেন, না তোমাদের ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া উচিত। তিনিই নামায পড়াবেন। অতপর ফজরের নামাযের পর মুসলমানরা দাজ্জালের মোকাবেলায় বের হবে। তিনি রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন সেই কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) হযরত ঈসা (আ)-কে দেখবে, তখন গলে যেতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। অতপর তিনি দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তখন অবস্থা এমন হবে যে, গাছপালা এবং প্রস্তরখণ্ড চিৎকার করে বলবে, হে রুহুল্লাহ ! ইহুদীটা এই আমার পিছনে লুকিয়ে আছে। দাজ্জালের অনুগামীদের মধ্যে এমন কেউ জীবিত থাকবে না যাকে হযরত ঈসা (আ) কতল করবেন না।"

* অর্থাৎ তোমাদের আমীর তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত।

(١٠) عن النواس بن سمعان (في قصة الدجال) فبينما هو كذالك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فيزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طأطأ راسه قطرو اذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الامات ونفسه ينتهي الى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ـ(مسلم ذكر الدجل، ابوداؤد كتاب الملاحم باب خروج الدجال، ترمذى ابواب الفتن باب في فتنة الدجال، ابن ماجه كتاب الفتن باب فتنة الدجال)

"হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন কেলাবী (রা) দাজ্জাল প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি উদ্বৃত্ত করে বলেন, দাজ্জালের এসব কর্মকাণ্ড চলাকালে আল্লাহ মসীহ্ ইবনে মরিয়াম (আ)-কে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে সাদা মিনারের সন্নিকটে দু'টো হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে দু'জন ফেরেশতার কাঁদে হাত রেখে নামবেন। তিনি মাথা নীচু করলে পানি টপকাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার মাথা উঁচু করলে মনে হবে যেন বিন্দু বিন্দু পানি মোতির মতো চমকাচ্ছে। তাঁর নিঃশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে এবং এর গতি হবে তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত—সে আর জীবিত থাকবে না। অতপর ইবনে মরিয়াম দাজ্জালের পেছনে ধাওয়া করবেন এবং লুদের* দ্বারপ্রান্তে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করবেন।"

(١١) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في امتي فيمكث اربعين (لاادرى اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما) فيبعث الله عيسى ابن مريم كانه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ـ(مسلم ذكر الدجال)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দাজ্জাল আমার উম্মতের মধ্যে বের হবে এবং চল্লিশ (আমি জানি না চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর)** পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতপর ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ)-কে পাঠাবেন। তাঁর চেহারা উরওয়া ইবনে মাসউদের (জনৈক সাহাবীর মতো) তিনি দাজ্জালের পেছনে ধাওয়া করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন অবস্থায় থাকবে যে, দু'জন লোকের মধ্যেও শত্রুতা থাকবে না।"

(١٢) عن حذيفة بن اسيد الغفارى قال اطلع النبى صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ماتذكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها

---

* এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লূদ (Lydda) ফিলিস্তিনের অন্তর্গত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী তেলআবীব থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ইহুদীরা এখানে একটি বিরাট বিমান বন্দর নির্মাণ করেছে।—(গ্রন্থকার)

** এটি সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর কথা।

عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وياجوج وماجوج وثلثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذالك نار تخرة من اليمن تطرد الناس الى محشرهم (مسلم كتاب الفتن واشراط الساعة، ابو داؤد كتاب الملاحم باب امارات الساعة)

"হযরত হুযায়ফা ইবনে আসীদ আল গিফারী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মজলিসে তাশরীফ আনলেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় লিপ্ত ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আলোচনা করছ ? লোকেরা বললো, আমরা কিয়ামতের বিষয় আলোচনা করছি। তিনি বললেন, যতক্ষণ না দশটি নিশানী প্রকাশ হবে ততদিন তা কিছুতেই সংঘটিত হবে না। অতপর তিনি দশটি নিশানী বললেন, যথা—ধূঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাদুল আর্‌দ, পশ্চিম দিক থেকে সুর্যোদয়, ঈসা ইবনে মরিয়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ ও মাজুজ, তিনটি প্রকাণ্ড জমি ধ্বস (Land slide)—পূর্বে, পশ্চিমে এবং আরব উপদ্বীপে। অবশেষে একটি প্রকাণ্ড অগ্নি ইয়মেন থেকে উঠবে এবং মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানের দিকে।"

(١٣) عن ثوبان مولى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم عن النبى صلى اللّٰه عليه وسلم عصابتان من امتى احرزهما اللّٰه تعالى من النار ـ عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام ـ(نسائى، كتاب الجهاد، مسند احمد بسلسله رويات ثوبان)

"রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুক্ত করা গোলাম সাওবান থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার উম্মতের দু'টো সেনাদলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাদের একটি হলো, যারা হিন্দুস্তানের ওপর হামলা করবে। আর দ্বিতীয়টি, যারা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ)-এর সাথে অবস্থান করবে।"

(١٤) عن مجمع بن جارية قال سمعت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد ـ(مسند احمد، ترمذى، ابواب الفتن)

"মুজাম্মে ইবনে জারিয়া আনসারী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ইবনে মরিয়াম দাজ্জালকে লুদের দ্বারপ্রান্তে কতল করবেন।"

(١٥) عن ابى امامة الباهلى (فى حديث طويل فى ذكر الدجال) فبينما امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذا نزل عليهم عيسى بن مريم فرجع ذالك الامام ينكص يمشى قهقرى ليتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح وورائه الدجال ومعه سبعون الف يهودى كلهم ذوسيف محلى وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح فى الماء وينطلق هربا ويقول عيسى ان لى فيك ضربة لن تسبقنى بها فيدركه عند باب اللد الشرقى فيهزم اللّٰه

اليهود .... وتملاء الارض من المسلم كما يملاء الاناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا اللّه تعالى -(ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال)

"আবু উমামা বাহেলী (এক দীর্ঘ হাদীসে দাজ্জাল প্রসেঙ্গ) বর্ণনা করেছেন, ফজরের নামায পড়ার জন্যে মুসলমানদের ইমাম যখন অগ্রবর্তী হবেন, ঠিক সেই সময় ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) তাদের ওপর অবতীর্ণ হবেন। ইমাম পেছনে সরে আসবেন ঈসা (আ)-কে অগ্রবর্তী করার জন্যে। কিন্তু ঈসা (আ) তাঁর কাঁদে হাত রেখে বলবেন, না তুমিই নামায পড়াও, কেননা এরা তোমার জন্যেই দাঁড়িয়েছে। কাজেই তিনিই (ইমাম) নামায পড়াবেন। সালাম ফেরার পর ঈসা (আ) বলবেন, দরজা খোল। তখন দরজা খোলা হবে। বাইরে দাজ্জাল সত্তর হাজার সশস্ত্র ইহুদী সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করবে। তার দৃষ্টি হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর পড়া মাত্র সে এমনভাবে গলে যেতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। সে পলায়ন করবে। ঈসা (আ) বলবেন, আমার কাছে তোমার জন্যে এমন এক আঘাত আছে যার হাত থেকে তোমার কোনো ক্রমেই নিষ্কৃতি নেই। অতপর তিনি তাকে লুদের পূর্ব দ্বার দেশে গিয়ে গ্রেফতার করবেন এবং আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদেরকে পরাজয় দান করবেন .... এবং জমিন মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে ভরপুর হবে যেমন পাত্র পানিতে ভরে যায়। সবাই কালেমায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করা হবে না।"

(١٦) عن عثمان بن ابى العاص قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول .... وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند صلوة الفجر فيقول له اميرهم ياروح اللّه تقدم، صل فيقول هذه الامة بعضهم امراء على بعض فيتقدم اميرهم فيصلى، فاذا قضى صلواته اخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فاذا يراه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين شندوبته فيقتله وينهزم اصحابه ليس يومئذ شئ يوارى منهم احدا حتى ان الشجر ليقول يامؤمن هذا كافر -(مسند احمد، طبرانى، حاكم)

"উসমান ইবনে আবিল আস বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ .... এবং ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) ফযরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বললেন, হে রুহুল্লাহ ! আপনি নামায পড়ান। তিনি জবাব দেবেন ঃ এই উম্মতের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের আমীর। তখন মুসলমানদের আমীর অগ্রবর্তী হয়ে নামায পড়াবেন। অতপর নামায শেষ করে। ঈসা (আ) নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। তিনি নিজের অস্ত্র দিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তার দলবল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। কিন্তু কোথাও তারা আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না। এমনকি গাছও ডেকে বলবে ঃ হে মুমিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে। প্রস্তরখণ্ডও ডেকে বলবে, হে মুমিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে।"

(١٧) عن سمرة بن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم (فى حديث طويل) فيصبح فيهم عيسى ابن مريم فيهزمه الله وجنوده حتى ان اجذم الحائط واصل الشجر لينادى يامؤمن هذاكافر يستتربى فتعال اقتله (مسند احمد، حاكم)

"সামুরা ইবনে জুনদুব (এক দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতপর সকাল বেলা ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) মুসলমানদের মধ্যে আসবেন এবং আল্লাহ তায়ালা দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনীকে পরাজয় দান করবেন। এমনকি প্রাচীর ও গাছের কাণ্ডও ডাক দিয়ে বলবে, হে মুমিন, এই যে কাফের এখানে আমার পেছনে লুকিয়ে আছে, এসো একে হত্যা করো।"

(١٨) عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى ياتى امر الله تبارك وتعالى وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام -(مسند احمد)

"ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে হামেশা একটি দল হকের ওপর কায়েম থাকবে এবং তারা বিরোধী দলের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তার করবে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা এসে যাবে এবং মরিয়াম পুত্র ঈসা (আ) অবতীর্ণ হবেন।"–(মুসনাদে আহমদ)।

(١٩) عن عائشة (فى قصة الدجال) فينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى عليه السلام فى الارض اربعين سنة اماما عادلا وحكما مقسطا -(مسند احمد)

"হযরত আয়েশা (রা) দাজ্জাল প্রসঙ্গে বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর ঈসা (আ) অবতীর্ণ হবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন। অতপর ঈসা (আ) চল্লিশ বছর ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও শাসক হিসাবে দুনিয়ায় অবস্থান করবেন।"

(٢٠) عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فى قصة الدجال) فينزل عيسى عليه السلام فيقتله الله تعالى عند عقبة افيق -(مسند احمد)

"রসূলুল্লাহ (সা)-এর আজাদকৃত গোলাম সুফায়না দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর ঈসা (আ) অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহ তায়ালা 'আফিক'* নামক সীমান্ত ঘাটির নিকটে তাকে (দাজ্জালকে) মেরে ফেলবেন।"

(٢١) عن حذيفة (فى ذكر الدجال) فلما قاموا يصلون نزل عيسى ابن مريم امامهم فصلى بهم فلما انصرف قال هكذا فرجوا بينى وبين عدو الله ..... ويسلط الله عليهم المسلمين فيقتلونهم حتى ان الشجر والحجر لينادى ياعبد الله ياعبد

* আফিককে বর্তমানে 'ফীক' বলা হয়। সিরিয়া ও ইসরাঈল সীমান্ত বর্তমান সিরিয়া রাষ্ট্রের সর্বশেষ শহর আফিক। তার সামনে পশ্চিমের দিকে কয়েক মাইল দূরে তাবারিয়া নামে একটি হ্রদ আছে। এটাই হলো জর্দান নদীর উৎপত্তিস্থল। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যভাগে নিম্নভূমিতে একটি রাস্তা রয়েছে। এ রাস্তাটা প্রায় দেড় হাজার ফুট গভীরে নেমে গিয়ে সেই স্থানে পৌঁছায় যেখান থেকে জর্দান নদী তাবারিয়ার মধ্য দিয়ে বের হচ্ছে। এ পথকেই বলা হয় আকাবায়ে আফীক (আফীকের নিম্ন পার্বত্য পথ)।–গ্রন্থকার।

الرحمن يا مسلم هذا اليهودى فاقتلهم فيفنيهم الله تعالى ويظهر المسلمون فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير ويضعون الجزية -(مستدرك حاكم)

"হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর যখন মুসলমানরা নামাযের জন্যে তৈরী হবে এমন সময় তাঁদের চোখের সামনে ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) অবতীর্ণ হবেন। তিনি মুসলমানদেরকে নামায পড়াবেন। অতপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের বলবেন, আমার ও আল্লাহর এ দুশমনের মাঝখান থেকে সরে যাও .... এবং আল্লাহ্ তায়ালা দাজ্জালের দলবলের ওপর মুসলমানদেরকে প্রতিপত্তি দান করবেন। মুসলমানরা তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করতে থাকবে। অবশেষে গাছ এবং পাথরখণ্ডও ডেকে বলবে ঃ হে আল্লাহর বান্দাহ্, হে রহমানের বান্দাহ্, হে মসলমান দেখো, এখানে একজন ইহুদী, একে হত্যা করো। এভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং মুসলমান বিজয় লাভ করবে। তারা ক্রুশ নিপাত করবে, শূকর ধ্বংস করবে এবং জিযিয়া মওকুফ করে দেবে।"

(মুসলিমে এ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে এবং হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ৪৫০ পৃষ্ঠায় একে সহীহ্ গণ্য করেছেন)।

এ একুশটি হাদীস চৌদ্দজন সাহাবী মারফত নির্ভুল সনদসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও এ ব্যাপারে আরও অসংখ্য হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হবে ভেবে আমরা সেগুলো এখানে উদ্ধৃত করিনি। বর্ণনা এবং সনদের দিক দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোই শুধু এখানে উদ্ধৃত করেছি।

এ হাদীসগুলো থেকে কি প্রমাণিত হয়?

যে কোনো ব্যক্তি এ হাদীসগুলো পড়ে নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এখানে কোনো প্রতিশ্রুত মসীহ 'মাসীলে মসীহ' বা 'বুরুজে মসীহ'র কোনো উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি বর্তমানকালে পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কোনো ব্যক্তির এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) যে মসীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই মসীহ। আজ থেকে দু' হাজার বছর আগে পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়াম (আ)-এর গর্ভে যে ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছিল এ হাদীসগুলোর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য থেকে তারই অবতরণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ইন্তিকাল করেছেন, না জীবিত অবস্থায় কোথাও রয়েছেন—এ আলোচনা সম্পূর্ণ অবান্তর। তর্কের খাতিরে যদি এ কথা মেনে নেয়া যায় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তাহলেও বলা যায়, আল্লাহ তাঁকে জীবত করার ক্ষমতা রাখেন।* তাছাড়া আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে তাঁর এ বিশাল সৃষ্টি জগতের কোনো এক স্থানে হাজার হাজার বছর জীবিত অবস্থায় রাখার পর নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো সময় তাঁকে এ দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারেন। আল্লাহর অসীম

* যারা আল্লাহর এই পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা অস্বীকার করেন তাদের সূরা বাকারার ২৫৯ নম্বর আয়াতটির অর্থ অনুধাবন করা উচিত। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ তিনি তাঁর এক বান্দাকে ১০০ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখার পর আবার তাকে জীবিত করেন।-(গ্রন্থকার)

ক্ষমতার প্রেক্ষিতে এ কথা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে, তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী ব্যক্তিকে উল্লিখিত ঈসা ইবনে মরিয়াম বলে স্বীকার করতেই হবে। তবে যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে সে আদতে কোনো আগমনকারীর অস্তিত্বই স্বীকার করতে পারে না। কারণ আগমনকারীর আগমন সম্পর্কে যে বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে হাদীস ছাড়া আর কোথাও তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপারটি শুধু এখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আগমনকারীর আগমন সম্পর্কিত ধারণা বিশ্বাস গ্রহণ করা হচ্ছে হাদীস থেকে কিন্তু সেই হাদীসগুলোই আবার যখন সুস্পষ্ট করে এ বক্তব্য তুলে ধরছে যে, উক্ত আগমনকারী কোনো 'মাসীলে মসীহ' (মসীহসদৃশ ব্যক্তি) নন বরং তিনি হবেন স্বয়ং ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) তখন তা অস্বীকার করা হচ্ছে।

এ হাদীসগুলো থেকে দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) দ্বিতীয়বার নবী হিসেবে অবতরণ করবেন না। তাঁর ওপর ওহী নাযিল হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি কোনো নতুন বাণী বা বিধান আনবেন না। শরীয়াতে মুহাম্মদীর মধ্যেও তিনি কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি করবেন না। দ্বীন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্যেও তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হবে না। তিনি এসে লোকদেরকে নিজের ওপর ঈমান আনার আহ্বান জানাবেন না এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে তাদেরকে নিয়ে একটি পৃথক উম্মতও গড়ে তুলবেন না।* তাঁকে কেবলমাত্র একটি পৃথক

---

* মুসলিম আলেম সমাজ বিষয়টিকে অন্তত্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লামা তাফতাজানী (৭২২-৭৯২ হিঃ) তার শারহে আকায়েদে নাসাফি গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

ثبت انه اخر الانبياء ...... فان قيل قدروى فى الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده قلنا نعم لكنه يتابع محمد عليه السلام لان شريعته قد نسخت فلا يكون اليه وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام ـ(طبع مصر ص ـ ١٣٥)

"এটা প্রমাণিত সত্য যে, মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী। ..... যদি বলা হয়, তাঁর পর হাদীসে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের কথা বলা হয়েছে, তাহলে আমরা বলবো, হ্যাঁ হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের যে কথা বলা হয়েছে তা সত্য। তবে তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হবেন। কারণ তাঁর শরীয়াত বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই তাঁর ওপর ওহী নাযিল হবে না এবং তিনি নতুন বিধানও নির্ধারণ করবেন না বরং তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন।"

আর এ কথাই আল্লামা আলুসী তাফসীরে রুহুল মা'য়ানীতে বলেছেন ঃ

ثم انه عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال لكنه لايتعبد بها لنسخها فى حقه وحق غيره وتكليفه باحكام هذه الشريعة اصلا وفرعا فلا يكون اليه عليه السلام وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته بين امته ـ(جلد ٢٢ ص ٣٢)

"অতপর হযরত ঈসা (আ) যখন অবতরণ করবেন তখন তিনি স্বীয় সাবেক নবুয়াতী পদেই অধিষ্ঠিত থাকবেন ও পূর্বপদ (নবুয়াত) থেকে অপসারিত হবেন না। কিন্তু স্বীয় সাবেক শরীয়াতের অনুসারী হবেন না। কেননা তা তাঁর জন্যে এবং অন্যান্য সকল লোকদের বেলায় বাতিল করা হয়েছে। এখন থেকে তিনি মূলনীতি ও খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারে এ শরীয়াতেরই (শরীয়াতে মুহাম্মদীর) অনুসারী হবেন। সুতরাং এখন তার কাছে যেমন কোনো ওহী আসবে না, তেমনি কোনো বিধান দেয়ারও কোনো অধিকার তাঁর থাকবে না। বরং তিনিই এ উম্মতের মধ্যে রসূল (সা)-এর প্রতিনিধি (নায়েব) এবং তার মিল্লাতে মুহাম্মদীর শাসকদের একজন শাসকরূপেই কাজ করবেন। (২২শ' খণ্ড, ৩২ পৃঃ) ইমাম রাযী (রা) এ কথাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে নিম্নোক্ত ভাষায় বলেছেন ঃ

দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হবে। অর্থাৎ তিনি দাজ্জালের ফিত্নাকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্যে তিনি এমনভাবে অবতরণ করবেন যার ফলে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশই থাকবে না। যেসব মুসলমানদের মধ্যে তিনি অবতরণ করবেন তারা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যে ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা অনুযায়ী তিনি যথাসময়ে অবতরণ করেছেন। তিনি এসে মুসলনানদের দলে শামিল হয়ে যাবেন। মুসলমানদের তদানীন্তন ইমামের পেছনে তিনি নামায পড়বেন।* সেকালে মুসলমানদের যিনি নেতৃত্ব দেবেন তাকেই অগ্রবর্তী করবেন, যাতে কেউ এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করতে না পারে যে, তিনি নিজের পূর্ববর্তী পয়গাম্বরী পদমর্যাদা সহকারে পুনর্বার পয়গাম্বরীর দায়িত্ব পালন করার জন্যে ফিরে এসেছেন। নিসন্দেহে বলা যেতে পারে, কোনো দলে আল্লাহর নবীর উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি ইমাম বা নেতা হতে পারেন না। কাজেই নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কথাই ঘোষণা করবে যে, তিনি নবী হিসেবে আগমন করেননি। এ জন্যে তাঁর আগমনে নবুয়াতের দুয়ার উন্মুক্ত হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

নিসন্দেহে তাঁর আগমন একজন ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনের সাথে তুলনীয়। এ অবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এসে বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে কোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। একজন সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তিও সহজেই একথা বুঝতে পারেন যে, একজন রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে অন্য একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনেই আইন ভেঙে যায় না। তবে দু'টি অবস্থায় অবশ্যি আইন ভেঙে যায়। এক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এসে যদি আবার নতুন করে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন। দুই, কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের কাজটাও অস্বীকার করে বসে। কারণ এটা হবে তার রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে যেসব কাজ হয়েছিল সেগুলোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। এ দু'টি অবস্থার কোনো একটি না হলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনই আইনগত অবস্থার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে পারে না। হযরত ঈসা (আ)-এর দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তার নিছক আগমনেই খতমে নবুয়াতের দুয়ার ভেঙে পড়বে না। তবে তিনি এসে যদি পুনর্বার নবীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন অথবা কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রাক্তন নবুয়াতের মর্যাদাও অস্বীকার করে বসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নবুয়াত বিধি ভেঙে পড়বে। হাদীসের বর্ণনা এ দু'টো পথই পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। হাদীসে

انتهاء الانبياء الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعند مبعثه انتهت تلك المدة فلا يبعد ان يصير (اى عيسى ابن مريم) بعد نزوله تبعا لمحمد -(تفسير كبير، ٣ ص ٣٤٣)

"মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের পর নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের পর তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারী হবেন, এ কথা মোটেই অযৌক্তিক নয়।"

* যদিও হাদীসে (৫ ও ২১ নম্বর) বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ) অবতরণ করার পর প্রথম নামাযটি নিজে পড়াবেন কিন্তু অধিকাংশ, বিশেষ করে শক্তিশালী কতিপয় হাদীস (৩, ৭, ৯, ১৫ ও ১৬ নম্বর) থেকে জানা যায় যে, তিনি নামাযের ইমামতি করতে অস্বীকার করবেন এবং মুসলমানদের তৎকালীন ইমাম ও নেতাকে অগ্রবর্তী করবেন। মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ সর্বসম্মতভাবে এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

একদিকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর আর কোন নবী নেই এবং অন্যদিকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ঈসা (আ) পুনর্বার অবতরণ করবেন। এ থেকে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে, তার এ দ্বিতীয় আগমন নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে হবে না।

অনুরূপভাবে তাঁর আগমনে মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে কুফরী ও ঈমানের প্রশ্ন দেখা দেবে না। আজও কোনো ব্যক্তি তাঁর পূর্বের নবুয়াতের ওপর ঈমান না আনলে কাফের হয়ে যাবে। নবী মুহাম্মদ (সা) নিজেও তাঁর ঐ নবুয়াতের ওপর ঈমান রাখতেন। নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সমগ্র উম্মতও শুরু থেকেই তাঁর ওপর ঈমান রাখে। হযরত ঈসা (আ)-এর পুনর্বার আগমনের সময়ও এ একই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। মুসলমানরা কোনো নবুয়াতের প্রতি ঈমান আনবেন না। বরং আজকের ন্যায় সেদিনও তারা ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ)-এর পূর্বের নবুয়াতের ওপর ঈমান রাখবে। এ অবস্থাটি বর্তমানে যেমন খতমে নবুয়াত বিরোধী নয় তেমনি সেদিনও বিরোধী হবে না।

সর্বশেষ যে কথাটি এ হাদীসগুলো এবং অন্যান্য বহুবিধ হাদীস থেকে জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা (আ)-কে যে দাজ্জালের বিশ্বব্যাপী ফিত্না নির্মূল করার জন্যে পাঠানো হবে সে হবে ইহুদী বংশোদ্ভূত। সে নিজেকে 'মসীহ'রূপে পেশ করবে। ইহুদীদের ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয় চিন্তা-বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর পর যখন বনী ইসরাঈলরা সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক পতনের শিকার হলো অতপর তাদের এ পতন দীর্ঘায়িত হতে থাকলো এমনকি অবশেষে ব্যাবিলন ও আসিরিয়া অধিপতিরা তাদেরকে পরাধীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো এবং তাদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত করে দিলো, তখন বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদেরকে সুসংবাদ দিতে থাকলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মসীহ এসে তাদেরকে এ চরম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবেন। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা একজন মসীহর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। তিনি হবেন বাদশাহ। তিনি যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন। বনী ইসরাঈলদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে এনে ফিলিস্তিনে একত্রিত করবেন এবং তাদের শক্তিশালী রাষ্ট্র কায়েম করবেন। কিন্তু তাদের এসব আশা-আকাঙ্খাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে 'মসীহ' হয়ে আসবেন এবং কোনো সেনাবাহিনী ছাড়াই আসবেন তখন ইহুদীরা তাঁকে 'মসীহ' বলে মেনে নিতে অস্বীকার করবে। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হবে। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদী দুনিয়া সেই প্রতিশ্রুত মসীহর (Promissed Messiah) প্রতীক্ষায় দিন গুণছে, যার আগমনের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সেই বাঞ্ছিত যুগের সুখ-স্বপ্ন ও কল্প কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তালমুদ ও রিব্বীউনদের সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এর যে নকশা তৈরি করা হয়েছে তার কল্পিত স্বাদ আহরণ করে শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি জীবন ধারণ করছে। তারা বুকভরা আশা নিয়ে বসে আছে যে, এই প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন একজন শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীলনদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা—যে এলাকাকে ইহুদীরা নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এলাকা মনে করে—আবার ইহুদীদের দখলে আনবেন এবং সারা দুনিয়া থেকে ইহুদীদেরকে এনে একত্র করবেন।

বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রসূলুল্লাহ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মহানবী (সা)-এর কথামত ইহুদীদের প্রতিশ্রুত মসীহর ভূমিকা পালনকারী প্রধানতম দাজ্জালের আগমনের জন্যে মঞ্চ সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তর এলাকা থেকে মুসলমানদেরকে বেদখল করা

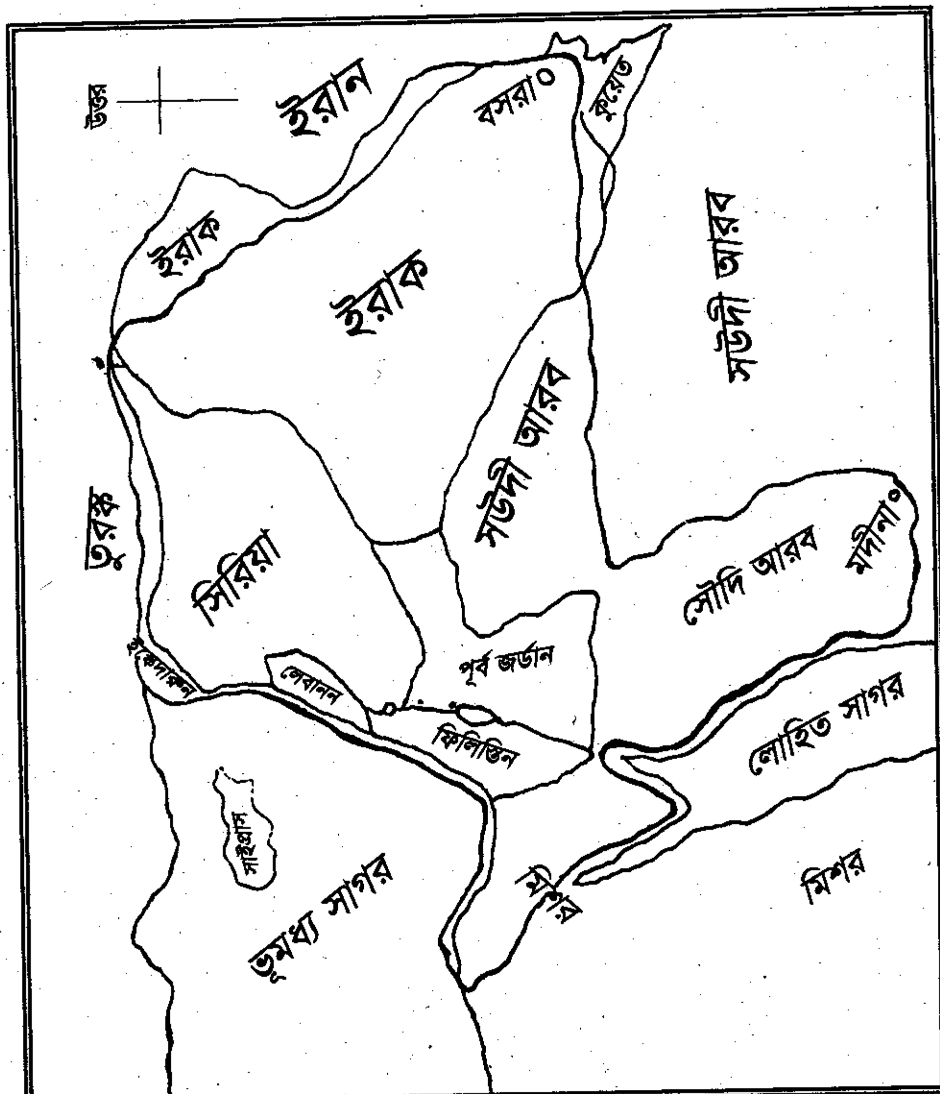

ইসরাঈল নেতৃবর্গ যেই ইহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে

হয়েছে। সেখানে ইসরাঈল নামে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা দলে দলে এসে সেখানে বাসস্থান গড়ে তুলছে। আমেরিকা বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে একটি বিরাট সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছে। ইহুদী পুঁজিপতিদের সহায়তায় ইহুদী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিদগণ তাকে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চারপাশের মুসলিম দেশগুলোর জন্যে তাদের এ শক্তি এক মহাবিপদে পরিণত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ তাদের এই উত্তরাধিকার সূত্রে "প্রাপ্ত দেশ" দখল করার আকাঙ্খাটি মোটেই লুকিয়ে রাখেনি। দীর্ঘকাল থেকে আগামীর ইহুদী রাষ্ট্রের যে নীলনকশা তারা পেশ করে আসছে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় তার একটি প্রতিকৃতি দেয়া হলো। এ নকশায় দেখা

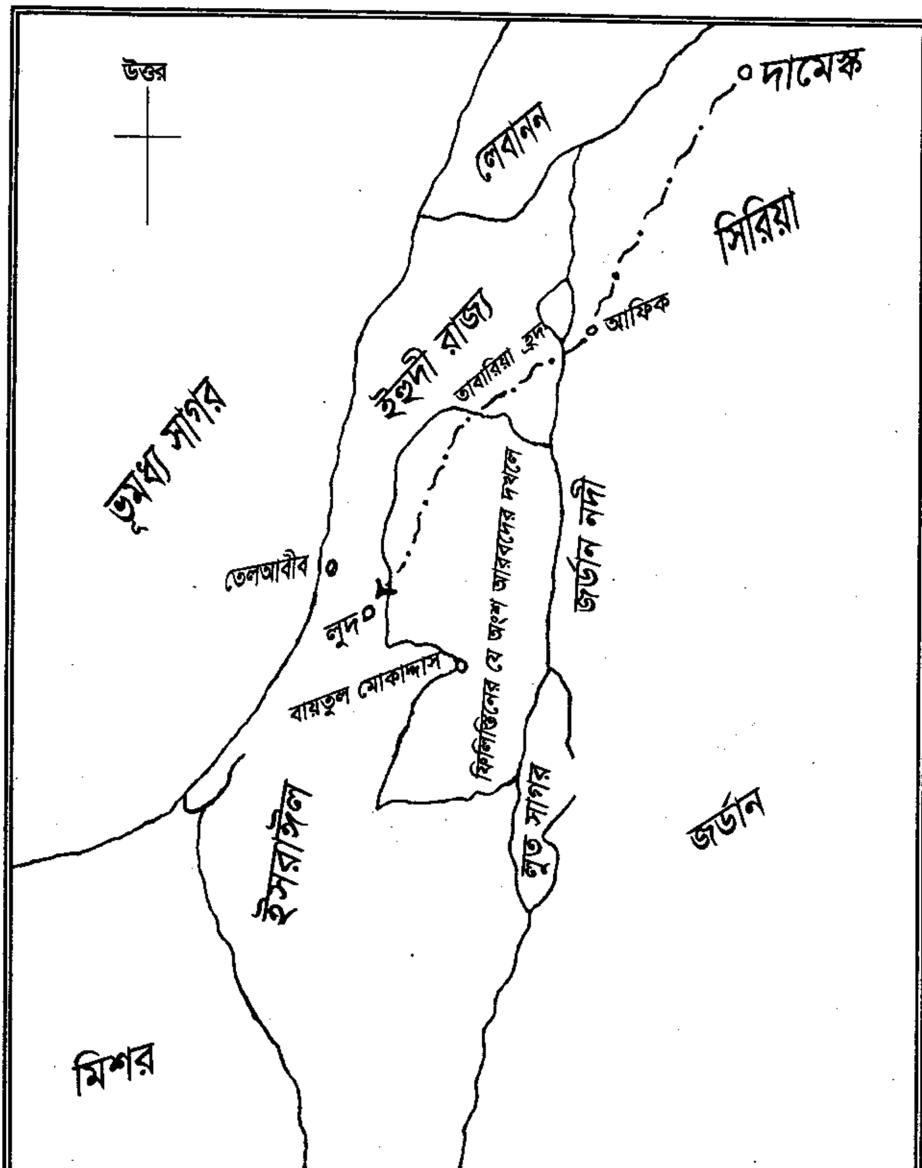

আসল মসীহ হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের স্থান

যাবে, সিরিয়া, লেবানন ও জর্দানের সমগ্র এলাকা এবং প্রায় সমগ্র ইরাক ছাড়াও তুরস্কের ইস্কান্দারোন, মিসরের সিনাই ও ব-দ্বীপ এলাকা এবং মদীনা-মুনাওয়ারাসহ আরবের অন্তর্গত

হিজায ও নজদের উচ্চভূমি পর্যন্ত তারা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আগামীতে কোনো একটি বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তারা ঐসব এলাকা দখল করার চেষ্টা করবে এবং ঐ সময়ই কথিত প্রধানতম দাজ্জাল তাদের প্রতিশ্রুত মসীহরূপে আগমন করবে। রসূলুল্লাহ (সা) কেবল তার আগমন সংবাদ দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি বরং এই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, সে সময় মুসলানদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়বে এবং এক একটি দিন তাদের কাছে এক একটি বছর মনে হবে। এ জন্যে তিনি নিজে মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও আশ্রয় চাইতে বলেছেন।

এই মসীহ দাজ্জালের মোকাবেলা করার জন্যে আল্লাহ কোনো 'মাসীলে মসীহ'কে পাঠাবেন না বরং আসল মসীহকে পাঠাবেন। দু' হাজার বছর আগে ইহুদীরা এই আসল মসীহকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জানা মতে তারা তাঁকে শূলিবিদ্ধ করে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই আসল মসীহ ভারত, আফ্রিকা বা আমেরিকায় অবতরণ করবেন না বরং তিনি অবতরণ করবেন দামেস্কে। কারণ তখন সেখানেই যুদ্ধ চলতে থাকবে। মেহেরবাণী করে পূর্বের পাতার নকশাটিও দেখুন। এতে দেখা যাচ্ছে ইসরাঈলের সীমান্ত থেকে দামেস্ক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে। ইতিপূর্বে আমি যে হাদীস উল্লেখ করে এসেছি তার বিষয়বস্তু মনে থাকলে সহজেই এ কথা বোধগম্য হবে যে, মসীহ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইহুদী সেনাদল নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে এবং দামেস্কের সামনে উপস্থিত হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে দামেস্কের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের নিকট সুবহে সাদেকের পর হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করবেন এবং ফজর নামায শেষে মুসলমানদেরকে নিয়ে দাজ্জালের মোকাবিলায় বের হবেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে দাজ্জাল পশ্চাদপসারণ করে আফিকের পার্বত্য পথ দিয়ে (২১নং হাদীসে দেখনু) ইসরাঈলের দিকে ফিরে যাবে। কিন্তু তিনি তার পশ্চাদ্ধাবন করবেন। অবশেষে লিডডা বিমান বন্দরে সে তার হাতে মারা পড়বে (১০, ১৪ ও ১৫নং হাদীস)। এরপর ইহুদীদেরকে সব জায়গা থেকে ধরে হত্যা করা হবে এবং ইহুদী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৯, ১৫ ও ২১নং হাদীস) হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের পর ঈসায়ী ধর্মও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। (১, ২, ৪, ও ৬নং হাদীস) এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সমস্ত মিল্লাত একীভূত হয়ে যাবে (৬ ও ১৫নং হাদীস)।

কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও জড়তা ছাড়াই এ দ্ব্যর্থহীন সত্যটি হাদীস থেকে ফুটে উঠেছে। এ সুদীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না 'প্রতিশ্রুত মসীহ'র নামে আমাদের দেশে যে কারবার চালানো হচ্ছে তা একটি প্রকাণ্ড জালিয়াতি ছাড়া আর কিছু নয়।

এই জালিয়াতির সবচেয়ে হাস্যকর দিকটি এবার আমি উপস্থাপিত করব। যে ব্যক্তি নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মসীহর সাথে অভিন্ন বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি নিজে ঈসা ইবনে মরিয়াম হবার জন্যে নিম্নোক্ত রসালো বক্তব্যটি পেশ করেছেন ঃ

"তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় অংশে আমার নাম রেখেছেন মরিয়াম। অতপর যেমন বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, দু' বছর পর্যন্ত আমি মরিয়ামের গুণাবলী সহকারে লালিত হই। .... অতপর মরিয়ামের ন্যায় ঈসার রূহ

আমার মধ্যে ফুঁৎকারে প্রবেশ করানো হয় এবং রূপকার্থে আমাকে গর্ভবতী করা হয়। অবশেষে কয়েক মাস পরে যা দশ মাসের চাইতে বেশি হবে না, সেই এলহামের মাধ্যমে, যা বারাহীনে আহমদীয়ার চতুর্থ অংশে উল্লিখিত হয়েছে, আমাকে মরিয়াম থেকে ঈসায় পরিণত করা হয়। কাজেই এভাবে আমি হয়েছি ঈসা ইবনে মরিয়াম।"

–(কিশতীয়ে নূহ ৮৭, ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ প্রথমে তিনি মরিয়াম হন। অতপর নিজে নিজেই গর্ববর্তী হন। তার পর নিজের পেট থেকে নিজেই ঈসা ইবনে মরিয়াম রূপে জন্ম নেন। এরপরও সমস্যা দেখা দিলো। কারণ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা ইবনে মরিয়াম দামেস্কে অবতরণ করবেন। দামেস্ক কয়েক হাজার বছর থেকে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত শহর। পৃথিবীর মানচিত্রে আজো এই শহরটি এ নামেই চিহ্নিত। কাজেই অন্য একটি রসাত্মক বক্তব্যের মাধ্যমে এ সমস্যাটির সমাধান দেয়া হয়েছে ঃ

'উল্লেখ্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে দামেস্ক শব্দটির অর্থ আমার কাছে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ স্থানে এমন একটি শহরের নাম দামেস্ক রাখা হয়েছে যেখানে এজিদের স্বভাব সম্পন্ন ও অপবিত্র এজিদের অভ্যাস ও চিন্তার অনুসারী লোকদের বাস। .... এই কাদীয়ান শহরটি এখানকার অধিকাংশ এজিদী স্বভাব সম্পন্ন লোকের অধিবাসের কারণে দামেস্কের সাথে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক রাখে।–(এযালায়ে আওহাম, টীকা ৬৩ থেকে ৭৩ পর্যন্ত)

আর একটি জটিলতা এখনও রয়ে গেছে। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ইবনে মরিয়াম একটি সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। এ সমস্যার সমাধান করে ফেলা হয়েছে অতি সহজে। অর্থাৎ মসীহ সাহেব নিজেই এসে নিজের মিনারটি তৈরি করে নিয়েছেন। এখন বলুন, কে তাঁকে বুঝতে যাবে যে, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, ইবনে মরিয়ামের অবতরণের পূর্বে মিনারটি সেখানে মওজুদ থাকবে। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ সাহেবের আগমনের পর মিনারটি তৈরি হচ্ছে।

সর্বশেষ ও সবচেয়ে জটিল সমস্যাটি এখনো রয়ে গেছে। অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা মতে ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) লিড্ডার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রথমে আবোলতাবোল অনেক কথাই বলা হয়েছে। কখনো বায়তুল মাকদেসের একটি গ্রামকে লিড্ডা বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। (এযালায়ে আওহাম, আমানে আহমদীয়া লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার ২২০ পৃষ্ঠা)। আবার কখনো বলা হয়েছে, লিড্ডা এমন সব লোককে বলা হয় যারা অনর্থক ঝগড়া করে। .... যখন দাজ্জালের অনর্থক ঝগড়া চরমে পৌঁছে যাবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব হবে এবং তার সমস্ত ঝগড়া শেষ করে দেবে।' (এযালায়ে আওহাম ৭৩০ পৃষ্ঠা) কিন্তু এত করেও যখন সমস্যার সমাধান হলো না, তখন পরিষ্কার বলে দেয়া হলো যে, লিড্ডা (আরবীতে লুদ) অর্থ হচ্ছে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহর। লুধিয়ানার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে, দুষ্টদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মীর্জা সাহেবের হাতে এখানেই সর্বপ্রথম বাইআত অনুষ্ঠিত হয়।–(আল হুদা, ৯৯ পৃষ্ঠা)

যে কোনো সুস্থ্য বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এসব বক্তব্য বর্ণনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হবেন যে, এখানে প্রকাশ্য দিবালোকে মিথ্যাবাদী বহুরূপীর (False Impersonation) অভিনয় করা হয়েছে।

কাদিয়ানদের আরও কিছু বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা

কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ

আল্লাহ ও তাঁর রসূল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিধানের মাধ্যমে যখন কোনো বিষয়ের মীমাংসা করে দেন তখন সেই সুস্পষ্ট বিধানকে দূরে সরিয়ে রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে অসম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস থেকে নিজের প্রয়োজন মতো অর্থ বের করা এবং কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত আকীদা পোষণ করা আর সেই অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া চরম গোমরাহী বরং আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তার বিধানের পরিপন্থী কোন পথ অবলম্বন করে, সে অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের বিদ্রোহ করে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁদেরই ঘোষণা ও বিধান বিকৃত করে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা কোনো ছোটখাটো বিদ্রোহ নয়। এ কাজ যারা করে তাদের সম্পর্কে আমরা কোনোক্রমেই এ কথা ভাবতে পারি না যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মনে চলে। সায়্যেদিনা মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী কি না এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন কি না—এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে আমরা (النساء : ٦٩)-وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ এবং يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ প্রভৃতি আয়াতের দিকে মনসংযোগ করতে পারতাম যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল বিশেষ করে ঐ প্রশ্নের জবাব কুরআন ও হাদীসের কোথাও না দিয়ে দিতেন। কিন্তু যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে 'খাতামান নাবীয়্যীন' আয়াতে এবং রসূলের পক্ষ থেকে অসংখ্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে আমরা বিশেষ করে এ প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন জবাব পেয়ে গেছি তখন وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ এবং يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ প্রভৃতি আয়াতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং সেগুলো থেকে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী অথবা গ্রহণ করা একমাত্র সেই ব্যক্তিরই কাজ হতে পারে, যার দিলে বিন্দুমাত্রও আল্লাহর ভয় নেই এবং যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাসই করে না যে, মরার পরে একদিন তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন দেশের দণ্ডবিধি আইনের একটি ধারায় একটি কাজকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এক ব্যক্তি এ অপরাধটিকে বৈধ কর্ম প্রমাণ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। এ উদ্দেশ্যে সে ঐ বিশেষ ধারাটিকে বাদ দিয়ে আইনের অমান্য অসম্পর্কিত ধারার মধ্যে সামান্যতম কোনো ইঙ্গিত বা ছোটখাট কোনো অস্পষ্ট বক্তব্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। তারপর এগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে আইনের সুস্পষ্ট ধারা যে কাজটিকে অপরাধ গণ্য করেছে তাকে একটি বৈধ কর্ম প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছে। এ ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ যদি দুনিয়ার পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও আদালত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে আল্লাহর আদালতে তা কেমন করে গৃহীত হবার আশা করা যেতে পারে?

গায়ের জোরে প্রমাণ করা

তারপর যে আয়াতগুলো থেকে কাদিয়ানীরা তাদের বক্তব্য প্রমাণ করতে চায় সেগুলো পড়ার পর অবাক হতে হয় তাদের প্রমাণ কৌশল দেখে। দেখা যায় ঐ আয়াতগুলোর ঐ অর্থই নয়, যা তারা গায়ের জোরে টেনে-হিঁচড়ে করতে চায়। যেসব আয়াতের ওপর তারা

কসরত চালিয়েছে সেগুলোর আসল অর্থ কি দেখা যাক ঃ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ সূরা নিসার ৬৯ নম্বর আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কেবল এতটুকু যে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যকারীরা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের (সৎ ব্যক্তিবর্গের) সহযোগী হবে। এ থেকে যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে তারা হয় নবী হয়ে যাবে, নয়তো সিদ্দীক অথবা শহীদ বা সালেহীন হবে—এ কথা কেমন করে বের হলো ? তারপর সূরা হাদীদের ১৯ নম্বর আয়াতটি একবার অনুধাবন করুন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ق وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

অর্থাৎ "আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের ওপর, তারাই হচ্ছে তাদের রবের কাছে সিদ্দীক ও শহীদ।" এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান লাভ করার ফলে এক ব্যক্তি কেবলমাত্র সিদ্দীক ও শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর নবীদের ব্যাপারে বলা যায়, নবীদের সহযোগী হওয়াই ঈমানদারদের জন্যে যথেষ্ট। কোনো কাজের পুরস্কারস্বরূপ কোনো ব্যক্তির নবী হয়ে যাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাই সূরা নিসার আয়াতে বলা হয়েছে. আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যকারীরা নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে অবস্থান করবে। আর সূরা হাদীদের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ ও রসূলের ওপর যারা ঈমান আনবে তারা নিজেরাই সিদ্দীক ও শহীদে পরিণত হবে।

আর সূরা আরাফের ৩৫ নম্বর আয়াতে يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ সম্পর্কে বলা যায়, এটি একটি বর্ণনাধারার সাথে সম্পর্কিত। সূরা আরাফের ১১ থেকে ৩৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ বর্ণনা চলেছে। এ বর্ণনার পূর্বাপর বিষয়বস্তুর মধ্যে রেখে একে বিচার করলে পরিষ্কার জানা যায়, মানব জাতির সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে বনী আদমকে এ সম্বোধন করা হয়েছিল। এ আয়াতগুলো পড়ে কেমন করে এ ধারণা লাভ করা যেতে পারে যে, এগুলোর মধ্যে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর নবীদের আগমনের কথা বলা হয়েছে ? এখানে তো হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে যখন বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কার করে দুনিয়ায় আনা হয় সে সময়কার কথা বলা হয়েছে।[৯৯]

সূরা আরাফের আয়াতের সঠিক অর্থ

কাদিয়ানী সাহেবান সূরা আরাফের ৩৫ নম্বর আয়াতকে তার পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে অর্থ বের করে থাকেন তা তাকে যথাস্থানে রেখে বিচার করলে যে অর্থ বের হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে যে বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে তা সূরা আরাফের দ্বিতীয় রুকূ' থেকে চতুর্থ রুকূ'র মাঝামাঝি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে দ্বিতীয় রুকূ'তে আদম ও হাওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ রুকূ'তে এ কাহিনীর ফলাফলের ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। এ পূর্বাপর আলোচনা সামনে রেখে ৩৫ নম্বর আয়াতটি পড়লে পরিষ্কার জানা যায় যে, يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ এর মাধ্যমে সম্বোধন করে যে কথা বলা হয়েছে তা সৃষ্টির সূচনা পর্বের সাথে সম্পর্কিত, কুরআন অবতরণকালের সাথে সম্পর্কিত নয়। অন্য কথায় বলা যায়, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনা পর্বেই আদম সন্তানদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে যে হেদায়াত পাঠানো হবে তার আনুগত্যের ওপর তোমাদের নাজাত নির্ভর করবে।

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত কুরআনের তিনটি স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি স্থানে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে এর অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতটি এসেছে সূরা বাকারায় (৩৮ নম্বর আয়াত) দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আ'রাফে (৩৫ নম্বর আয়াত) এবং তৃতীয় আয়াতটি সূরা ত্বহায় (১২৩ নম্বর আয়াত)। এ তিনটি আয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর সাদৃশ্যের সাথে সাথে তাদের পরিবেশ পরিস্থিতির সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

কুরআনের মুফাস্‌সিরগণ অন্যান্য আয়াতের ন্যায় সূরা আ'রাফের এ আয়াতটিকেও হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত গণ্য করেন। আল্লামা ইবনে জারীর (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবু সাইয়্যার আস্‌ সুলামীর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা এখানে হযরত আদম (আ) ও তাঁর পরিজনদেরকে একই সঙ্গে ও একই সময়ে সম্বোধন করেছেন।" ইমাম রাযী (রা) তাঁর তাফসীরে কবীর গ্রন্থে এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "যদি নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, অথচ তিনি শেষ নবী, তাহলে এর অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালা এখানে উম্মতদের ব্যাপারে নিজের নীতি বর্ণনা করছেন।" আল্লামা আলুসী তাঁর তাফসীরে রুহুল মা'আনী গ্রন্থে বলেছেন ঃ "প্রত্যেক জাতির সাথে যে ব্যাপারটি ঘটে গেছে সেটাই এখানে কাহিনী আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতকে বনী আদম অর্থে গ্রহণ করলে মারাত্মক ভুল ও সুস্পষ্ট অর্থের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। কারণ রসূল শব্দটি একবচনে না বলে বহুবচনে 'রসূল' (رسل) বলা হয়েছে।" আল্লামা আলুসীর বক্তব্যের শেষাংশের অর্থ হচ্ছে, যদি এখানে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সম্বোধন করা হতো, তাহলে তাদেরকে কখনো এ কথা বলা যেতো না যে, "তোমাদের মধ্যে কখনো রসূলগণ আসবেন।" কারণ এ উম্মতের মধ্যে একজন রসূল [মুহাম্মদ (সা)] ছাড়া অন্য কোনো রসূল আসার প্রশ্নই ওঠে না।

সূরা মুমিনূনের আয়াতের অর্থ

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ط اِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ - *

এ আয়াতটিকে এর পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন না করলে, কাদিয়ানীরা এর যে অর্থ করেছে তা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যে বক্তব্য প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে তা দ্বিতীয় রুকূ' থেকে শুরু হয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। এসব আয়াতে হযরত নূহ (আ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সমস্ত নবী ও তাঁদের জাতির কথা আলোচনা করে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক যুগে নবীগণ মানুষদেরকে একটি শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন, তাদের পদ্ধতিও ছিল এক ও অভিন্ন এবং তাঁদের ওপর আল্লাহ তায়ালা একই ধরনের অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। বিপরীতপক্ষে পথভ্রষ্ট জাতিরা হামেশা আল্লাহর পথ ত্যাগ করে দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছে।" এ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি কোনোক্রমেই নিম্নোক্ত অর্থে নাযিল হয়নি ঃ "হে রসূলগণ ! যারা মুহাম্মদ (সা)-এর পরে আসবে, তোমরা পাক-পবিত্র খাদ্য খাও এবং ভালো কাজ কর।" বরং এ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে নূহ (আ) থেকে

* অর্থাৎ "হে রসূলগণ ! পাক-পবিত্র খাদ্য খাও এবং ভালো কাজ করো, অবশ্যি তোমরা যা কিছু করো আমি তা সব জানি।"-(সূরা আল মুমেনুন ঃ ৫১)

শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত যত নবী এসেছিলেন তাঁদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালা এই একই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা পাক-পবিত্র খাদ্য খাও ও ভালো কাজ কর।

এ আয়াতটি থেকেও, মুফাস্সিরগণ কখনো নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর নবুয়াতের দরজা খুলে যাওয়ার অর্থ নেয়নি। আরো বেশি অনুসন্ধান ও মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে চাইলে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এ স্থানটির আলোচনা পাঠ করতে পারেন।১০০

হাদীস থেকে কাদিয়ানীদের ভুল প্রমাণ উপস্থাপন

لَوْعَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ نَبِيًّا -

অর্থাৎ ইবরাহীম [রসূলে করীম (সা)-এর পুত্র] বেঁচে থাকলে অবশ্যি নবী হত-এ হাদীসটি থেকেও কাদিয়ানীগণ যে প্রমাণ উপস্থাপন করে তা চারটি কারণে ভুল।

এক ঃ যে রেওয়ায়াতে এটিকে নবী করীম (সা)-এর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তার সনদ দুর্বল এবং কোনো মুহাদ্দিসও এই সনদকে শক্তিশালী বলেননি।

দুই ঃ নববী ও ইবনে আবদুল বারের ন্যায় শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের বিষয়বস্তুকে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। ইমাম নববী তাঁর 'তাহযীবুল আস্‌মা ওয়াল্ লুগাত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

اما ما روى عن بعض المتقدمين لوعاش ابراهيم لكان نبيا فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم -

অর্থাৎ "আর কোনো কোনো পূর্ববর্তী আলেম যে কথা লিখে গেছেন যে, যদি ইবরাহীম [মুহাম্মদ (সা)-এর পুত্র] জীবিত থাকতো, তাহলে সে নবী হতো—এ কথাটি সত্য নয়। কারণ এটি গায়েব সম্পর্কে কথা বলার দুঃসাহস এবং মুখ থেকে না ভেবে-চিন্তে একটি কথা বলে ফেলার মতো।"

আল্লামা ইবনে আবদুল বার 'তামহীদ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

*لا ادرى ما هذا فقد ولد نوح عليه السلام غير نبى ولو لم يلد النبى الانبياء لكان كل احد نبيا لانهم من نوح عليه السلام -

অর্থাৎ "আমি জানি না, এটি কেমন বিষয়বস্তু। নূহ (আ)-এর পরিবারে এমন সন্তান জন্ম নিয়েছে যে নবী ছিল না। অথচ যদি নবীর পুত্রের জন্যে নবী হওয়া অপরিহার্য হত, তাহলে আজ দুনিয়াতে সবাই নবী হত। কারণ সবাই নূহ (আ)-এর আওলাদ।"

তিন ঃ অধিকাংশ রেওয়ায়াতে এ হাদীসকে নবী (সা)-এর উক্তির পরিবর্তে সাহাবীগণের উক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার তাঁরা এই সঙ্গে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যেহেতু নবী (সা)-এর পর আর কোনো নবী নেই তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর পুত্রকে উঠিয়ে নিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বুখারীর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ

عن اسماعيل بن ابن خالد قال قلت لعبد اللّه بن ابى اوفى ارأيت ابراهيم ابن النبى صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال مات صغيرا ولو قضى ان يكون بعد محمد

صلى الله عليه وسلم نبى عاش ابنه ولكن لانبى بعده -(بخارى كتاب الادب باب من سمى باسماء الانبياء)

"ইসমাঈল ইবনে আবী খালেদ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফাকে (সাহাবা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমকে দেখেছিলেন? তিনি বলেন, সে শৈশবেই মারা যায়। যদি আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর কোনো নবী পাঠাবার ফায়সালা করতেন তাহলে তাঁর পুত্রকে জীবিত রাখতেন। কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর পর আর কোনো নবী নেই।'

হযরত আনাস (রা) প্রায় এরই সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ولو بقى لكانٌ نبيا لكن لم يبق لان نبيكم اخر الانبياء-

"যদি সে জীবিত থাকতো তাহলে নবী হত। কিন্তু সে জীবিত থাকেনি। কারণ তোমাদের নবী হচ্ছেন শেষ নবী।"-(তাফসীরে রুহুল মা'আনী ঃ ২২ খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

চার, যে রেওয়ায়াতে এ উক্তিটিকে নবী করীম (সা)-এর উক্তি বলা হয়েছে এবং যাকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয়েছে যদি তাতে সাহাবায়ে কেরামের এ ব্যাখ্যা না থাকতো এবং মুহাদ্দিসগণের এ উক্তিগুলো সেখানে সংযুক্ত নাও হতো তবুও তা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতো না। কারণ হাদীসশাস্ত্রের সর্বসম্মত নীতি হচ্ছে, কোনো একটি রেওয়ায়াতের বিষয়বস্তু যদি বহু সংখ্যক নির্ভুল হাদীসের সাথে সংঘর্ষশীল হয় তাহলে তাকে কোনোক্রমেই গ্রহণ করা যেতে পারে না। তাহলে এখন দেখা যাক, একদিকে অসংখ্য নির্ভুল ও শক্তিশালী সনদ সম্বলিত হাদীস, যাতে পরিষ্কারভাবে এ কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর নবুয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আর অন্যদিকে এ একটিমাত্র রেওয়ায়াত, যা নবুয়াতের দরজা খোলা থাকার সম্ভাবনা প্রকাশ করে—এ দু'টি অবস্থা পর্যালোচনা করলে এ একটিমাত্র রেওয়ায়াতের মোকাবিলায় অসংখ্যা রেওয়ায়াতকে কেমন করে প্রত্যাখ্যান করা যায়?[১০১]

শেষ কথা

কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ উভয়ের দৃষ্টিতে নবুয়াত দ্বীনের একটি মৌলিক বিষয়। অর্থাৎ মানুষের ঈমান ও কুফরীর ভিত্তি এরই ওপর স্থাপিত এবং এরই ভিত্তিতে তার আখেরাতে সাফল্য ও ব্যর্থতার ফায়সালা হবে। কোনো সাচ্চা নবীকে না মানলে মানুষ কাফের হয়ে যাবে। আবার মিথ্যা নবীকে মেনে নিলেও কাফের হয়ে যাবে। এ ধরনের মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী কোনো বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) কখনো অস্পষ্ট, জটিল ও সন্দেহযুক্ত করে রাখেননি। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূল (সা) সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে পথ দেখিয়েছেন। মানুষের দ্বীন ও ঈমান যাতে বিপদগ্রস্ত না হয় এবং তার গোমরাহীর জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) দায়ী না হন এর ব্যবস্থা তাঁরা আগেই করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগে কখনো কোনো নবীর যুগে এ কথা বলা হয়নি যে, নবুয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আর কোনো নবী আসবেন না। এর অর্থ হচ্ছে, নবীদের আসার দরজা তখন খোলা ছিল এবং এখন আর কোনো নবী আসবেন না এ কথা বলে কোনো ব্যক্তি কোনো

নবুয়াতের দাবীদারের দাবী অস্বীকার করার অধিকার রাখতো না। আবার সে যুগে নবীগণ তাঁদের পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকতেন। তাঁরা নিজেদের অনুসারীদের নিকট থেকে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের আনুগত্য করার শপথ নিতেন। এসব কার্যক্রম এ কথাটিকে আরো শক্তিশালী করতো যে, কোনো ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করলে কোনো প্রকার ভাবনা-চিন্তা না করে এক কথায় তাকে নাকচ করা চলতো না। বরং তার দাওয়াত, ব্যক্তিত্ব, কার্যাবলী ও অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি যথার্থ আল্লাহর নবী না মিথ্যা নবুয়াতের দাবীদার তা জানার চেষ্টা করা হত। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। এখন ব্যাপারটি শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর পরে আর কোনো নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেননি এবং উম্মতের নিকট থেকে তার প্রতি আনুগত্যের শপথও নেননি বরং বিপরীত পক্ষে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী এবং তিনি একটা দু'টা নয়, অসংখ্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর পরে নবুয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর কোনো নবী আসবেন না। এখন যে নবুয়াতের দাবী নিয়ে দাঁড়াবে সে হবে দাজ্জাল। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর নবীর দৃষ্টিতে কি বর্তমানে মানুষের ইসলাম ও কুফরীর ব্যাপারটি নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ নয়? রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরবর্তী মুমিনগণই কি শুধুমাত্র কুফরীর ফিতনা থেকে বাঁচার অধিকারী ছিল? এ জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণ কি শুধু তাদেরকেই নবুয়াতের দরজা খোলা থাকার এবং নবীদের আগমনের সিলসিলা জারি থাকার কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাবার ব্যবস্থা করেছিলেন? কিন্তু এখন তারা জেনে-বুঝেই কি আমাদেরকে এ বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন? অর্থাৎ একদিকে থাকছে নবী আসার সম্ভাবনা, যাকে মানা না মানার কারণে আমরা ঈমানদার বা কাফের হয়ে যেতে পারি। আবার অন্যদিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণ কেবল নবীর আগমনের খবর থেকে আমাদেরকে অনবহিত রেখেই ক্ষান্ত হননি বরং এর থেকেও এগিয়ে এসে তাঁরা অনবরত এমন সব কথা বলে যাচ্ছেন যার ফলে আমরা মনে করছি নবুয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং এ জন্যে নবুয়াতের দাবীদারকে মেনে নিতে পারছি না। আপনাদের বিবেক-বুদ্ধি সত্যিই কি এ কথা বলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা) আমাদের সাথে এ ধরনের প্রতারণা করতে পারেন?

কাদিয়ানীরা 'খাতামান নাবীয়্যীন' শব্দের ব্যাখ্যা যা খুশী করতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে এতটুকু কথা তো তারা অস্বীকার করতে পারবে না যে, নবুয়াতের সিলসিলা খতম করাও এর অর্থ হতে পারে এবং উম্মতের ওলামা ও জনগণের কোটির মধ্যে নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শ' নিরানব্বই জন এ শব্দের এই অর্থই করে। প্রশ্ন হচ্ছে, নবুয়াতের মতো এমন একটি নাজুক বিষয়—যার ওপর মুসলমানদের ঈমান ও কুফরী নির্ভর করে, আল্লাহর কি এমন একটি ভাষা ব্যবহার করা উচিত ছিল, যা থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কাদিয়ানী ছাড়া সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদী এই মনে করেছে যে, এখন আর কোনো নবী আসবেন না? আর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উক্তিগুলো তো এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ভিন্নতর ব্যাখ্যার অবকাশই রাখে না। এ উক্তিগুলোতে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর নবীর কি

আমাদের সাথে এমন কোনো শত্রুতা ছিল যার জন্যে তাঁর পরে নবী আসবেন অথচ তিনি উল্টো আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে গেলেন যাতে করে আমরা তাকে না মানি এবং কাফের হয়ে জাহান্নামে চলে যাই ?

এ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যতই আকর্ষণীয় চেহারা-সুরাতের অধিকারী হোক না কেন, তার ভবিষ্যদ্বাণী শতকরা একশ' ভাগ সত্য প্রমাণিত হলেও এবং তার হাজারো কৃতিত্ব সত্ত্বেও আমরা তার নবুয়াতের দাবীকে বিবেচনাযোগ্যই মনে করি না। কারণ নবী আসার সম্ভাবনা থাকলে তবেই তো এটা বিবেচনাযোগ্য হত। আমরা তো প্রত্যেক নবুয়াতের দাবীদারের কথা শুনামাত্রই পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে তাকে মিথ্যুক অভিহিত করবো এবং নবুয়াতের স্বপক্ষে আসা তার যুক্তি প্রমাণের ওপর কোনোই গুরুত্বারোপ করবো না। এটা যদি কুফরী হয়ে থাকে তাহলে এর কোনো দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তাবে না। কারণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সাফাই পেশ করার জন্যে আমাদের কাছে কুরআন ও রসূলের হাদীস রয়ে গেছে।[১০২]

অধ্যায় ঃ ৬

মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যক্তিগত জীবন ও নবী-জীবন

মহানবীর অনুসরণ ও আনুগত্য

যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন ও মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান তাঁদের জন্যে রসূল তখন আর কেবল বার্তাবাহক থাকেন না বরং রসূল তখন তাঁদের জন্যে একাধারে শিক্ষক প্রশিক্ষণ-গুরু এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতির বাস্তব নমুনারূপে পরিগণিত হন। সর্বোপরি তিনি তাদের জন্যে তখন এক মহান নেতার মর্যাদা লাভ করেন যাঁর নিরঙ্কুশ আনুগত্য সকল যুগেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষক, প্রশিক্ষণদাতা ও আদর্শ মানুষ

শিক্ষক হিসেবে মহানবী (সা)-এর দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ যা কিছু শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছেন এবং যেসব আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ নাযিল করেছেন সে সবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ভালো করে সবাইকে বুঝিয়ে দেবেন। কুরআনের এই বাক্যটিতে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ "তাদেরকে তিনি কিতাব ও (কিতাবের শিক্ষা বাস্তবায়ন করার) তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেবেন।" প্রশিক্ষক বা ট্রেনিংদাতা হিসেবে তাঁর কাজ হলো এই যে, কুরআনের শিক্ষা ও আইন-কানুন অনুযায়ী মুসলমানদেরকে তৈরী করে সেই ছাঁচে তাদের জীবন গড়ে তুলবেন وَيُزَكِّيهِمْ। আর আদর্শ মানুষ হিসেবে রসূল (সা)-এর ভূমিকা হলো এই যে, তিনি নিজেকে কুরআনের শিক্ষার মূর্তপ্রতীক হিসেবে পেশ করবেন —আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী একজন মুসলমানের জীবন যে ধরনের হওয়া উচিত তাঁর জীবন হবে হুবহু সেই জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁর প্রত্যেকটি কথা ও কাজ দেখে জানা যাবে যে, কথা এভাবে বলতে হবে, আপন শক্তির সদ্ব্যবহার এভাবে করতে হবে এবং পার্থিব জীবনে এ ধরনের আচার-আচরণই আল্লাহর কিতাবের অভিপ্রেত। তার বিপরীত যতকিছু তা সবই উক্ত কিতাবের ইচ্ছার পরিপন্থী। কুরআনের এ আয়াত দু'টির বক্তব্যও ঠিক তাই ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "তোমাদের জন্যে রসূলুল্লাহর জীবনে উত্তম নমুনা বা আদর্শ রয়েছে।" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ "তিনি কোনো মনগড়া কথা বলেন না। যা কিছু বলেন তা তাঁর কাছে অহীর মাধ্যমেই আসে।" সাথে সাথে রসূল মুসলমানদের আমীর বা নেতাও। কিন্তু তিনি এমন নেতা নন যাঁর কথা ও কাজে কোনোরূপ মতানৈক্য ও বিতর্ক করা যেতে পারে। বরং তিনি এমন নেতা যে, কুরআনের নির্দেশ মেনে চলার মতোই বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা ফরজ। কুরআনের ভাষায় فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ "তোমরা কোনো ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলে তা আল্লাহ ও রসূলের কাছে পেশ করো।" وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করে।" তিনি এমন নেতা নন যে, শুধু জীবদ্দশায় নেতা, বরং তিনি কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাতির নেতা। তাঁর নির্দেশাবলী মুসলমানদের জন্যে সকল যুগে ও সকল অবস্থায় অবশ্য পালনীয়।

কেবলমাত্র প্রচারক ও বার্তাবাহক নন

কুরআনের বাক্য إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ "আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দেয়াই আপনার কাজ।" এবং অনুরূপ আরো কিছু আয়াত থেকে কেউ কেউ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, রসূলের কাজ শুধুমাত্র প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এসব লোক এ কথাটা ভুলে যান যে, রসূল কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত প্রচারক মাত্র, যতক্ষণ লোকেরা ইসলাম গ্রহণ না করে এবং তা কেবল তাদের জন্যেই যারা এখনও রসূলের শিক্ষাকে মেনে নেয়নি। কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের জন্যে রসূল শুধু প্রচারক নন বরং রসূল তাদের একাধারে নেতা, শাসক, আইনদাতা, বিচারক, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ গুরু এবং সর্বোপরি এমন এক আদর্শ মানব যাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করতেই হবে।

আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ এবং ইসলাম প্রচারক আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে এভাবে যে পার্থক্য কেউ কেউ করতে চেয়েছেন, পবিত্র কুরআন থেকে তা মোটেই প্রমাণিত হয় না। কুরআনে মহানবীর মাত্র একটা পরিচয়ই দেয়া হয়েছে এবং তাহলো এই যে, তিনি নবী ও রসূল। তিনি প্রত্যেকটি কথা আল্লাহর রসূল হিসেবেই বলতেন এবং প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর রসূল হিসেবেই করতেন। এভাবে রসূলের পদমর্যাদায় আসীন হওয়া থেকেই তিনি একাধারে প্রচারক ও শিক্ষাগুরুও ছিলেন, প্রশিক্ষণদাতা ও চরিত্র শোধনকারীও ছিলেন, বিচারক ও শাসক, নেতা এবং পরিচালকও ছিলেন। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের সকল কাজকর্মও রসূল হিসেবেই পরিচালিত ও সম্পাদিত হতো। জীবনের এ সমস্ত বিভাগেই তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ মানব, একজন অনুগত মুসলিম এবং একজন সত্যনিষ্ঠ মুমিনের ন্যায় নিখুঁত, নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবনধারার অধিকারী। তাঁর সেই নিষ্কলুষ পবিত্র ও জীবনধারার অনুসরণ ও অনুকরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সাফল্য অর্জনের জন্যে অপরিহার্য। এ কথা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ২১ আয়াতে ঘোষণা করেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

নবী হিসেবে, মানুষ হিসেবে এবং শাসক হিসেবে হযরত (সা)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়েছে এমন ধারণা কুরআনের কোনো বাক্য থেকে সামান্য ইশারা-ইঙ্গিতেও পাওয়া যায় না। এমন পার্থক্য কি করেই বা সম্ভব হতে পারে? তিনি যখন আল্লাহর রসূল তখন তাঁর পুরো জীবনটাই যে আল্লাহর শরীয়াতের অধীন ও অনুসারী হবে এবং ইসলামী বিধানের প্রতিনিধিত্ব করবে সেটা তো অপরিহার্য। আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কাজ বা আচরণ তাঁর দ্বারা হতেই পারে না।

তিনি প্রবৃত্তি ও মনের খেয়ালখুশী দ্বারা চালিত হতেন না

হযরত রসূলুল্লাহ (সা) যে কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত ছিলেন এবং নিজের খেয়ালখুশী দ্বারা চালিত হতেন না, সে কথা পবিত্র কুরআনের সূরা নাজমের প্রথম কয়টি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى "তোমাদের সাথী [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা)] খারাপ পথেও চালিত হননি পথভ্রষ্টও হননি।" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى "তিনি কোনো কথাই নিজের খেয়ালখুশী মতো বলেন না।" إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ

يُوحَى "তাঁর প্রতিটি উক্তি তাঁর ওপর অবতীর্ণ অহী ছাড়া আর কিছু নয়।" عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى। "তাঁকে শিখিয়েছেন একজন জবরদস্ত ক্ষমতাশালী উস্তাদ।" কতক লোকের ধারণা, এ আয়াতগুলোতে কেবল কুরআনের অহী হওয়ার দাবী করা হয়েছে। কোনো কাফেররা সেটাই অস্বীকার করত। কিন্তু আমি এ আয়াতগুলোতে কোথাও কুরআনের দিকে সামান্য ইঙ্গিতও দেখতে পাই না। إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى এ আয়াতটিতে هُوَ (তা) সর্বনামটি রসূলের (সা) কথার দিকেই নির্দেশ করছে। অর্থাৎ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى "নিজের খেয়ালখুশীতে তিনি কোনো কথাই বলেন না।" এ বাক্যের মধ্যে যে 'কথা' শব্দটি আছে তার দিকেই ইঙ্গিত করছে। রসূলের (সা) কথা দ্বারা যে এখানে কেবল কুরআনকেই নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়েছে তা বলার মতো কোনো ভিত্তি এ আয়াতগুলোতে নেই। রসূলের (সা) মুখ থেকে যে কথাই বের হোক না কেন তা যে অহীই হবে এবং প্রবৃত্তির তাড়না ও মনের খেয়ালখুশী থেকে মুক্ত হবে, এ আয়াতগুলোতে সে কথাই বলা হয়েছে। কুরআন যে এই সার্টিফিকেট দিচ্ছে তার উদ্দেশ্য হলো রসূলকে (সা) যাদের কাছে পাঠান হয়েছে তারা যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে ও নিসন্দেহে জেনে নিতে পারে যে, রসূল (সা) বিন্দুমাত্রও ভুল পথে চালিত হননি এবং তিনি নিজের খেয়ালখুশীতে কোনো কথাই বলতেন না বরং তার প্রত্যেক কথাই স্বয়ং আল্লাহর কথা। নচেৎ তাঁর কোনো একটা কথা সম্পর্কেও যদি সন্দেহ জাগত যে, এ কথাটা তিনি নিজের খেয়ালখুশী অনুযায়ী বলেছেন—আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেননি, তাহলে রসূল হিসেবে তাঁর ওপর কারও আস্থা থাকত না। কাফেরাও তো এ কথাই অর্থাৎ তাঁর রসূল হওয়ার কথাই অস্বীকার করত। তারা ভাবত যে, (নাউজুবিল্লাহ) নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মাথা খারাপ হয়েছে, কিংবা কোনো মানুষ তাকে গোপনে শিখিয়ে দিয়ে যায়, কিংবা তিনি নিজে মনগড়া কথা বলেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা নাজমের এ আয়াতগুলো নাযিল করে এ ভুল ধারণার অপনোদন করেছেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের সঙ্গী কুপথগামীও নয়, পথভ্রষ্টও নয়। সে মনগড়া কথাও বলে না। তার মুখ দিয়ে যে কথাই বেরোয়, সত্য বেরোয় এবং আমার তরফ থেকেই তা নাযিল হয়। কোনো মানুষ, জ্বিন বা শয়তান তাকে পড়িয়ে দেয় না বা শিখিয়ে দেয় না তাকে শিখায় এক মহা শক্তিশালী শিক্ষক। স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (সা) নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করে এ কথাই বলেছিলেন, فو الذى نفسى بيده ما يخرج منه الاَّ حَقًّا "আমার জীবন-মৃত্যু যাঁর হাতে সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ জিহ্বা দিয়ে সত্য কথা ছাড়া কিছুই বেরোয় না।"

সকল অবস্থায় তাঁর অনুসরণ বাধ্যতামূলক

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কিছু লোক এ কথা মানতে চান না যে, সকল অবস্থাতেই রসূল (সা)-এর আনুগত্য করা জরুরী। তাঁরা বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সা) নিজ গৃহে আপন স্ত্রীদের সাথে কিংবা ঘরের বাইরে অন্যান্য লোকের সাথে যেসব কথাবার্তা বলতেন, সেগুলো সম্পর্কে দাবী করা হতো না যে, তাও অহী আর কাফেররাও তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। আমি বলতে চাই, হযরত রসূলুল্লাহ (সা) যখন যে অবস্থায় যা কিছু করতেন তা রসূল হিসেবেই করতেন। তাঁর সবকিছুই গোমরাহী ও প্রবৃত্তির লালসা থেকে মুক্ত ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে নিখুঁত, নির্ভুল ও সত্যাশ্রয়ী বিবেক ও স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে

সৃষ্টি করেছিলেন এবং খোদাভীতি ও পবিত্রতার যে সীমারেখা তাঁর জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, তাঁর সকল কথা ও কাজ সেই স্বভাব প্রকৃতি থেকেই উৎসারিত হতো এবং সেই সীমারেখার মধ্যেই সীমিত থাকত। সমগ্র মানব জাতির অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য একটা উৎকৃষ্ট নমুনা ও আদর্শ ছিল তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বে। বস্তুত ইসলামে কি বৈধ, কি অবৈধ, কি হালাল ও কি হারাম ; কোন্ কোন্ জিনিস আল্লাহর পছন্দনীয় এবং কোন্টা অপছন্দনীয়, কোন্ কোন্ ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার ও চিন্তা-গবেষণার স্বাধীনতা আছে আর কোন্ কোন্ ব্যাপারে তা নেই সেসব আমরা ঐ আদর্শের নিরীখেই জানতে পারি। সেই আদর্শই আমাদের বলে দেয়—কিভাবে নেতা ও শাসকের আনুগত্য করতে হবে, কিভাবে পরামর্শের ভিত্তিতে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে, আর আমাদের দ্বীন ইসলামে গণতন্ত্রের অর্থই বা কি।

নবী মুহাম্মদ (সা) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার নিযুক্ত আমীর

হযরত রসূলুল্লাহ (সা) মানুষের নির্বাচিত বা মনোনীত আমীর ছিলেন না, নিজে নিজেও তা হননি। তিনি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত আমীর ও নেতা। নেতা হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা ছিল, তা রসূল হিসেবে তাঁর ভূমিকা থেকে ভিন্নতর ছিল না বরং আসলে তিনি আল্লাহর রসূল হিসেবেই মানুষের নেতা ছিলেন। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে তিনি নেতা বা আমীর ছিলেন না বরং আল্লাহর আজ্ঞাবহ ছিলেন। নিজের অনুসারীদের সাথে পরামর্শ করার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল, সে কথা ঠিক। এ জন্যে যে, তিনি নিজেকে তাঁর উম্মতের কাছে পরামর্শের প্রতীক হিসেবে পেশ করবেন। স্বয়ং আপন কাজকর্মের দ্বারা তিনি গণতন্ত্রের (Democracy) সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিতেন। এর থেকে এ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না যে, তাঁর মর্যাদা ছিল অন্যান্য নেতাদের মতোই। অন্যান্য নেতাদের জন্যে তো আইন করে দেয়া হয়েছে যে, তারা অবশ্যি পরামর্শ করে কাজ করবে। وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ "তাদের যাবতীয় কাজ পারস্পরিক পরামর্শক্রমেই চালাতে হবে।" আর পরামর্শ করতে গিয়ে মতানৈক্য ঘটলে সরাসরি আল্লাহ ও রসূল (সা) তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নির্দেশ নিতে হবে ঃ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -(النساء : ٥٩) (কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে, সে বিষয়টির ফায়সালা আল্লাহ ও রসূলের নিকট থেকে গ্রহণ কর)। অথচ রসূলুল্লাহ (সা)-কে পরামর্শ করার হুকুম দিয়ে সাথে সাথেই এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে ঃ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ "অতপর যখন কোনো বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো।" এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি পরামর্শের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তবুও তাঁকে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে শুধু এ জন্যে যে, রসূলের (সা) পবিত্র হাত দিয়ে একটা সত্যিকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিপত্তন হোক।

নেতা বা আমীর হিসেবে রসূলের আনুগত্য

এ ব্যাপারেও কেউ কেউ ভুল ধারণায় লিপ্ত আছেন। তারা বলেন, নেতা হিসেবে হযরত (সা)-এর আনুগত্য তাঁর জীবদ্দশাতেই সীমাবদ্ধ। অথচ এ কথা ঠিক নয়। তারা প্রমাণ দর্শান সূরা আনফালের ২০ নম্বর আয়াতের وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ শব্দগুলো থেকে এবং তারা এরূপ অর্থ গ্রহণ করেন যে, রসূল (সা)-এর কথা মেনে চলার হুকুম কেবল তাদেরকে

দেয়া হয়েছে যারা তখন তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। অথচ এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ তা নয়। সূরা আনফালেরই প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহ ও রসূলের কথা মতো চল।" শুধু তাই নয় বরং যারা রসূল (সা)-এর জিহাদের ডাকে সাড়া দিতে মনে মনে ইতস্তত বোধ করতো ৫নং আয়াতে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। তারপর ১৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বাদানুবাদ করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"

এসব কথা বলার পরই ২০নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ -

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর হুকুম মান এবং রসূলের হুকুম মান। হুকুম অমান্য কর না—যখন তা শুনতে পাচ্ছ।" এ আয়াতে ও আগের আয়াতগুলোতে রসূলের সাথে সাথে আল্লাহর হুকুম মানার কথা বারবার বলা হয়েছে। রসূলের হুকুম মানা যে স্বয়ং আল্লাহর হুকুম মানারই শামিল তা বুঝানই এর উদ্দেশ্য। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। সব জায়গাতেই 'রসূল' শব্দ বলা হয়েছে, 'আমীর' শব্দ কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। এমনকি এমন কোনো প্রচ্ছন্নতম ইঙ্গিতও এতে নেই যাতে বুঝা যায় যে, রসূল অর্থ নেতা বা আমীর জাতীয় এমন কোন পদমর্যাদা—যা রসূল (সা)-এর পদমর্যাদা থেকে আলাদা। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, রসূলের (সা) হুকুম উপেক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা করলে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ "তোমরা যখন তা শুনতে পাচ্ছ" এ কথার সুস্পষ্ট মর্ম এই দাঁড়ায় যে, তোমরা আমার এত বারবার উচ্চারিত হুকুমগুলো শুনেও আমার রসূলের (সা) আনুগত্য করতে অস্বীকার কর না। এখানে 'তোমরা' শব্দটির অর্থ রসূলের (সা) জীবদ্দশায় জীবিত মুসলমানই শুধু নয় বরং কেয়ামত পর্যন্ত যত মুমিন কুরআনের বাণী শুনবে তাদের সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সকলের জন্যেই রসূলের (সা) প্রতিটি আদেশ মানা ও কার্যকর করা ফরজ, তা যেভাবেই তাদের কাছে পৌঁছুক না কেন।

একটা অদ্ভুত যুক্তি

কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, নবী করীম (সা)-এর নেতৃত্বের দায়িত্ব ঠিক তেমনি সাময়িক যেমন অন্যান্য নেতাদের বেলায় হয়ে থাকে। কেননা আজকের এ যুগে বদর ও ওহোদ যুদ্ধের মতো সড়কী-বল্লম ও তরবারী দিয়ে লড়াই করা অসম্ভব। এ একটা অদ্ভুত যুক্তি বটে! রসূলুল্লাহ (সা) সে যুগে যেসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন সেগুলোর ব্যবহার সে যুগের বিশেষ পরিবেশে সীমাবদ্ধ হতে পারে। তাই বলে তিনি যুদ্ধে যেসব নৈতিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতেন এবং অন্যকেও মেনে চলতে বলে গেছেন সেটা কোনো বিশেষ যুগের ব্যাপার নয়। বরং ওগুলো দিয়ে তিনি মুসলমানদের জন্যে একটা স্থায়ী সমরবিধি তৈরী করে দিয়ে গেছেন।

আসলে শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত (সা) যুদ্ধে কি কি অস্ত্র ব্যবহার করতেন —তরবারী, বন্দুক, না কামান ; সেটা কোনো গুরুতর ব্যাপার নয়। বরং তিনি ঐসব অস্ত্র

কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন এবং তা দিয়ে কি রকম রক্তপাত ঘটাতেন সেটিই আসল বিবেচ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে তিনি যে আদর্শ বিভিন্ন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন তা ইসলামী জিহাদের জন্যে এক চিরন্তন ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তাই আদর্শগতভাবে ও নীতিগত-ভাবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কেয়ামত পর্যন্ত সর্বযুগের সকল মুসলিম সেনাদলের সর্বাধিনায়ক।

নবীর নেতৃত্বের বিশিষ্ট মর্যাদা

জনৈক ভদ্রলোক এমারত ও রিসালাতের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে বলেন যে, মুসলমানরা তাদের নেতার সাথে বিতর্ক ও দ্বিমত করার অধিকার রাখে—অথচ রসূলের (সা) সাথে দ্বিমত পোষণ করা যায় না। আমি সে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি, রসূলের (সা) নেতৃত্ব আর অন্যান্য নেতার নেতৃত্ব কি করে সমান হতে পারে ? হযরত (সা)-এর সাথে বাদানুবাদ করার অধিকার কি কোনো মুসলমানের ছিল ? যে নেতার সামনে উচ্চৈস্বরে কথা পর্যন্ত বলা যেত না, শুধু উচ্চৈস্বরে কথা বললেই সারা জীবনের সমস্ত নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে বলে সূরা হুজুরাতে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার সাথে বাদানুবাদ করলে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে বলে সূরা নিসায় সতর্ক করা হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করার কোনো অধিকার কি মুসলমানের থাকতে পারে ? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে সেই নেতার নেতৃত্ব ও অন্যান্য নেতার নেতৃত্ব কি করে সমান হতে পারে ? অন্যান্য নেতার সাথে দ্বিমত পোষণের অধিকার তো মুসলমানদেরকে দেয়াই হয়েছে।

আনুগত্যের তিনটি পর্যায়

রসূল (সা)-এর আনুগত্য করার যেসব নির্দেশ কুরআনে এসেছে তাকে আমীর বা নেতার আনুগত্যের সমার্থক বলে কেউ কেউ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন। এ ধরনের একটি অভিমতের উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হল ঃ

“আল্লাহ ও রসূলের (সা) আনুগত্যের হুকুম কুরআনের যেখানে যেখানে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার অর্থ হলো সাধারণভাবে মুসলমানদের সেই নেতৃত্বের আনুগত্য যা কুরআনকে আইন ও শাসনতন্ত্রের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে এবং তা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) অথবা তাঁর খলিফা কর্তৃক পরিচালিত হয়। যেমন কুরআনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ “জনগণ তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রসূলের।” এটা জানা কথাই যে, গনিমতের মাল সংক্রান্ত এ নির্দেশ হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পরবর্তীকালের জন্যেও তা সমভাবে পালনীয়। সে হুকুম পরবর্তীকালে কার্যকর করা খেলাফতের দায়িত্ব। ...... চূড়ান্ত এখতিয়ার আল্লাহ ও রসূলের (সা) অর্থাৎ সমসাময়িক মুসলিম নেতৃত্বের হাতে নিবদ্ধ। কাজেই নেতা হিসেবে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিজের যে মর্যাদা তাঁর খলীফাদেরও অবিকল তা-ই।

এ অভিমত স্পষ্টতই সত্যের অপলাপ মাত্র। পবিত্র কুরআনে নেতৃত্বের তিনটি স্তর সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ আল্লাহর আনুগত্য, রসূলের (সা) আনুগত্য এবং ‘উলুল আমরের আনুগত্য’। আল্লাহর আনুগত্য বলতে কুরআনের হুকুমসমূহের আনুগত্য বুঝায়। রসূলের (সা) আনুগত্য বলতে হযরতের কথা ও কাজের অনুসরণ ও অনুকরণ বুঝায়। আর

'উলুল আমর'-এর আনুগত্যের অর্থ হলো, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য ও ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের পরিচালনাকারী এবং নীতি-নির্দেশক নেতৃত্বের আনুগত্য। প্রথম দু'টো পর্যায় সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। কুরআন বারংবার ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ ও রসূলের (সা) নির্দেশের ওপর বিন্দুমাত্র বিতর্কের অবকাশ নেই। মুসলমানদের কাজ হলো শুধু তা শোনা ও সে অনুসারে কাজ করা। আল্লাহ ও রসূল যে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন সে ব্যাপারে অতপর অন্য কোনো মুসলমানের নতুন করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আদৌ কোনো এখতিয়ার নেই। অন্য কথায় বলা যায়, এ দু'টো পর্যায়ে কোনো আপত্তি বা বিরোধিতা বা বিতর্ক তোলার চেষ্টা করলেই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যেতে হয়। আর তৃতীয়টি সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য হলো, আমীর বা নেতার আনুগত্য আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের অধীন। বিতর্ক, বিরোধ বা মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ ও রসূলের (সা) বিধান অনুসারে তার ফায়সালা করতে হবে। এমন পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকতে আল্লাহ ও রসূলের (সা) অর্থ মুসলমানদের নেতৃত্ব—এ কথা বলার অবকাশই নেই। হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্ব আর সাধারণ মুসলিম নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বকে এক পর্যায়ে ফেলা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ "আয়াত থেকে যে যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে তা ঠিক নয়। গনিমতের সম্পদ আল্লাহ ও রসূলের হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ ও রসূল (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রের কল্যাণে তা ব্যয় করতে হবে। এ আয়াত থেকে কি করে বুঝা গেল যে, আল্লাহ ও রসূল মানেই মুসলিম নেতৃত্ব?

ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টির ভ্রান্ত প্রচেষ্টা

কুরআনে এমন কোনো প্রচ্ছন্নতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না যাতে করে রসূলুল্লাহ (সা)-এর শুধুমাত্র ধর্মীয় কার্যকলাপকেই শাশ্বত ও কালজয়ী আদর্শ বলে মনে করা যায় এবং তাঁর সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিষয় সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশ ও সিদ্ধান্তসমূহকে কেবল বিশেষ যুগের জন্যে প্রযোজ্য মনে করা যায়। এমন কোনো আয়াত যদি কুরআনে থেকে থাকে—যার আলোকে এ দু' ধরনের কার্যলাপের মধ্যে পার্থক্য করা চলে তাহলে তা কেউ দেখিয়ে দিলে ভাল হয়। আমার জানা মতে, কুরআনের এটাই সুস্পষ্ট বিধান যে ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○ (الاحزاب : ٣٦)

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর কোনো মু'মিন নারী-পুরুষের নিজেদের ব্যাপারে নতুন করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আর থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানি করবে সে প্রকাশ্য গোমরাহিতে লিপ্ত হয়ে যাবে।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬)

এ আয়াতে যুগ বা সময়ের গণ্ডী চিহ্নিত করে দেয়া হয়নি। এখানে যে মু'মিন নারী ও পুরুষের কথা রয়েছে তার মানে রসূলুল্লাহর জীবদ্দশার মু'মিন নারী-পুরুষ—এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের বিষয়ও কেবল ধর্মীয় বলে

নির্দিষ্ট করা হয়নি বরং তার মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক—সব ধরনের বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ও রসূল অর্থ আল্লাহ ও রসূলই 'এমারত' বা নেতৃত্ব কখনই নয়। কোনো আমীর অথবা 'উলুল আমর' তো মু'মিনই হবেন। আর এখানে আল্লাহ ও রসূল কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত করে দেয়ার পর কোনো মু'মিন নারী-পুরুষের আর কোনো অধিকারই থাকছে না যে, তারা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারে। এ সিদ্ধান্ত কেউ একা করুক অথবা সকলে মিলে করুক। তারপর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধাচরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এর মানে হচ্ছে এই যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল তাঁদের নির্দেশ ও বিধানের ভিত্তিতে ইসলামী জামায়াত বা সমাজের যে বিধান কায়েম করেছেন তা ঐ আইন ও বিধানকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ছাড়া টিকিয়ে রাখাই সম্ভব নয়।

আল্লাহ যা বলেছেন এবং তাঁর রসূল যা করেছেন তা উপেক্ষা করে যদি মানুষ আপন ইচ্ছা ও এখতিয়ারের কোনো পন্থা অবলম্বন করে তাহলে সে বিধান টিকে থাকবে না।[১০৩]

নবীর আনুগত্য এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামী ধারণা

এক ভদ্রলোক লিখেছেন ঃ

"সূরা আহযাবে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা) এবং হযরত যয়নব (রা)-এর যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাতে একটা প্রশ্ন জাগে। হযরত রসূলুল্লাহ (সা) যায়েদকে বললেন, أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ (তোমার স্ত্রীকে নিজের দাম্পত্য বন্ধনে বহাল রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর) কিন্তু হযরত যায়েদ মহানবীর এ নির্দেশের বিপরীত কাজ করলেন এবং হযরত যয়নবকে তালাক দিলেন। এ কাজটা যে রসূলুল্লাহ (সা)-এর হুকুমের খেলাফ হলো তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ কুরআনের বর্ণনাভঙ্গিতে স্পষ্টাক্ষরে বা ইঙ্গিতে এমন কোনো কথা পাওয়া যায় না যাতে হযরত যায়েদের এ বিরুদ্ধাচরণকে আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অপছন্দ করেছেন বলে বুঝা যায়। বরঞ্চ ঘটনার শুরুতে হযরত যায়েদকে আল্লাহর অনুগৃহীত বান্দাহরূপে অভিহিত করা হয়েছে, الَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ (যার ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন) এ থেকে ধারণা জন্মে যে, তাহলে বোধ হয় নবীর হুকুমের খেলাফ কাজ করাতে দোষ নেই এবং নবীর কথা যদি প্রমাণিতও হয় তথাপি তা মেনে চলা আল্লাহর হুকুমের মতো অপরিহার্য নয়।"

প্রশ্নের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই এবং অল্প কথায় প্রশ্নকারীর সন্দেহ দূর করা যেত। কিন্তু আসলে যেখান থেকে সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে সেখান থেকে বিভিন্ন ভুল ধারণাও উৎসারিত হচ্ছে। আর সে ভুল ধারণাগুলোর শিকড় অনেক গভীরে সঞ্চারিত। তাই এ সন্দেহ নিরসনের সাথে সাথে তার মূল ও শাখা-প্রশাখাগুলোর ওপরও কিছু আলোকপাত করা যাক।

নির্দেশ দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহর

অন্যান্য আসমানী কিতাবের চেয়ে কুরআন অধিকতর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম আইনদাতা, হুকুমদাতা ও শাসক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ اللّٰهِ (আল্লাহ ছাড়া আর কারও অধিকার নেই আইন জারি করার ও শাসন করার) আল্লাহ তায়ালাই যেমন খুশী নির্দেশ দিতে পারেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ (নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তাই হুকুম করেন) একমাত্র তিনিই এমন শাসক যাঁর নির্দেশাবলীর মধ্যে কোনোরূপ প্রশ্নের অবকাশ নেই ঃ لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ (তাঁর কোনো কাজে প্রশ্ন তোলা যায় না)। কেবল আল্লাহরই আনুগত্য করা ফরজ এবং তা এ জন্যেই ফরজ যে, সৃষ্টিগতভাবে সে তারই বান্দা বা গোলাম। তাকে সৃষ্টি করাই হয়েছে আল্লাহর দাসত্বের জন্যে। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ (আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার গোলামী বা দাসত্ব করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি)। মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারও সৃষ্টিও নয়, দাসও নয়, পোষ্যও নয়। তাই কোনো মানুষের জন্যে অন্য মানুষের আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ (তারা

জিজ্ঞেস করে, শাসন কর্তৃত্বে আমাদের কোনো অংশ আছে কি ? তুমি জানিয়ে দাও, শাসন-কর্তৃত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহর)। সুতরাং কোনো মানুষের যেমন অন্য মানুষের ওপর সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব (Absolute Authority) নেই, তেমনি কোনো মানুষের ওপর এ বাধ্যবাধকতাও নেই যে, খোদা ছাড়া সে অন্য কারও আদেশ মেনে চলবে, শুধু এ কারণে যে, আদেশটি ঐ বিশেষ ব্যক্তির।

মানুষের ওপর মানুষের শাসন কর্তৃত্ব

কুরআন মানুষের কাঁধের ওপর থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোনো সত্তার আনুগত্যের জোয়াল নামিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক। তাকে প্রকৃত সার্বভৌম মনিব ও শাসক আল্লাহর অনুগত দাসে পরিণত করতে চায়। অতপর তাকে দিতে চায় চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। বস্তুত এটাই ছিল কুরআন নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য। এ জন্যেই আমরা দেখতে পাই, মানুষের গোলামী ও দাসত্বের বিরুদ্ধে কুরআনই করেছে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম। একজন মানুষ নিজের ইচ্ছা মতো কোনো জিনিসকে হারাম বা হালাল বলে ঘোষণা করবে, আর তার আদেশ ও নিষেধকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের মতো শিরোধার্য করে নিতে হবে এমন অধিকার তার দৃষ্টিতে কোনো মানুষেরই নেই। কুরআন কোনো মানুষেরই এমন নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। বরং এ ধরনের আদেশ-নিষেধ মেনে চলাকে সে শিরক বলে ঘোষণা করেছে। যারা আলেম, পীর-মুর্শেদ, পাদ্রী-পুরোহিত এবং শাসকদেরকে أَرْبَابٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ বা আল্লাহর বিকল্প দেবতা ও খোদার আসনে সবায়, তাদের কথাকে অম্লান বদনে মেনে নেয়, কুরআন তাদেরকে মুশরিক বলে ঘোষণা করেছে। কোনো কোনো মানুষ যখন অন্য মানুষের প্রতি এমন নির্ভেজাল আনুগত্য পোষণ করে তখন সে অনিবার্যভাবেই তাকে নিজের মনিব এবং নিজেকে তার গোলাম বলে ভাবতে থাকে। একজন মানুষ অপর একজন মানুষের সামনে নিজের বিবেক-মন ও দেহের স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় পুরোপুরিভাবে বিসর্জন দিতে রাজি হতে পারে কেবল তখনই যখন সে তাকে সকল ভুল-ত্রুটির উর্ধে এবং সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও নিষ্কলংক মনে করে অথবা যখন মনে করে যে, সে নিজস্ব অধিকারের বলে যে কোনো ধরনের আদেশ-নিষেধ করার ক্ষমতা রাখে এবং শাসন ও কর্তৃত্ব চালানোর সহজাত অধিকার তার রয়েছে। আথবা এরূপ মনে করে যে ক্ষতি বা উপকার করার যাবতীয় ক্ষমতা কেবল তারই আছে, জীবিকা দেয়া বা বন্ধ করার ক্ষমতাও কেবল তারই রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রাণী বা পদার্থের এ ধরনের গুণাবলী থাকার কথা বিশ্বাস করাই শিরক ও দাসত্বের মূল উৎস। পক্ষান্তরে তাওহিদী আদর্শের মূল কথাই হলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রাণী বা বস্তুই এসব গুণের অধিকারী নয় বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং সকলেরই কর্তৃত্ব বা শাসনাধিকার প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সৃষ্টির গোলামী থেকে মানুষের পরিপূর্ণ মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভই এ আদর্শের অনিবার্য ফলশ্রুতি।

নবীর আনুগত্য কি হিসেবে করতে হবে

ওপরের আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করার পর ভেবে দেখতে হবে যে নবী (সা)-এর যে আনুগত্য ইসলামে অপরিহার্য করা হয়েছে এবং যার ওপর 'দ্বীন' নির্ভরশীল তা কি হিসেবে করতে হবে। এ আনুগত্য কিছুতেই এ জন্যে নয় যে, নবী এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, যেমন ইমরান পুত্র অথবা মরিয়াম পুত্র অথবা আবদুল্লাহর পুত্র এবং এ বিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়ার কারণে

আদেশ ও নিষেধ করার এবং হালাল ও হারাম নির্ধারণ করার অধিকার তাঁর আছে। এমন হলে তো মায়াযাল্লাহ, নবী স্বয়ং আরবাবুম্মিন দুনিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বিকল্প বহু আল্লাহর মধ্যে তিনি একজন হয়ে পড়বেন। আর এভাবে স্বয়ং তাঁর হাতেই সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে—যার জন্যে তাঁকে নবী করে পাঠান হয়েছে। কুরআন এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে। সে বলে, ব্যক্তি হিসেবে নবী অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ। قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً "হে নবী! তুমি বল ঃ আমার প্রভু সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধে। বস্তুত আমি একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নই—যাকে রসূলের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।" وَقَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ "তাদেরকে তাদের নবীরা বললেন যে, আমরা তো তোমাদের মতই মানুষ।" অবশ্য নবী হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। তাঁকে যখন নবুয়াত দান করা হয় তখন সেই সাথে তাঁকে অর্পণ করা হয় শাসন ক্ষমতাও। আল্লাহ বলেন ঃ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ـ "নবীরা হলেন তাঁরাই যাঁদেরকে আমি কিতাব, শাসন ক্ষমতা ও নবুয়াত দান করেছি।" এখানে 'হুকুম' বা শাসন ক্ষমতা বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব উভয়ই বুঝায়। অতএব স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, নবীর হাতে যে ক্ষমতা ও এখতিয়ার তা তাঁর ব্যক্তিগত নয়—বরং আল্লাহর অর্পিত ক্ষমতা ও এখতিয়ার। এ জন্যে তাঁর আনুগত্য স্বয়ং আল্লারই আনুগত্য। আল্লাহ বলেন ঃ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" নবীকে পাঠানোর উদ্দেশ্যই এই যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে আল্লাহর নির্দেশসমূহ জারি করবেন এবং মুসলমানরা তা মেনে চলবে। আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ "আমি যে নবীই পাঠাই তা এ জন্যেই পাঠাই যে, আল্লাহর নির্দেশেই তাঁর আনুগত্য করতে হবে।" এ হিসেবে রসূলের (সা) হুকুম স্বয়ং আল্লাহরই হুকুম। এ সম্পর্কে কারও কোনো প্রশ্ন তোলার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا ـ

"হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি নবীর সাথে কোন্দল-কলহ করে এবং এমন পথ অবলম্বন করে—যা ঈমানদারদের পথ থেকে পৃথক হয়, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে মুখ ফিরায়। তারপর তাকে আমি জাহান্নামে ঠেলে ফেলে দেই। আর জাহান্নাম অতীব নিকৃষ্ট স্থান।"

নিরংকুশ আনুগত্য

রসূল (সা)-এর কার্যত নাফরমানী করা তো দূরের কথা, মনে মনেও যদি নাফরমানির ইচ্ছা পোষণ করা হয় তাহলেও নিশ্চিতভাবে ঈমান চলে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

"আল্লাহর শপথ, তারা কখনও মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাকে নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে মীমাংসাকারীরূপে মেনে নেবে এবং তুমি যে ফায়সালা করবে তা মেনে নিতে মনে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করবে না। বরং তার সামনে পুরোপুরিভাবে মাথানত করে দেবে।"

রসূলের অবাধ্যতা মানুষকে এনে দেয় চিরন্তনের জন্যে ক্ষতি ও ব্যর্থতা। আল্লাহ তায়লা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَرْضُ۔

"যারা কুফরী ও রসূলের নাফরমানী করেছে, কেয়ামতের দিন তাদের ওপর এমন আপদ আসবে যে তারা কামনা করবে তাদের ওপর গোটা পৃথিবীটা চাপিয়ে দেয়া হোক।"

নবী মানুষকে তাঁর গোলামে পরিণত করেন না

নবীর আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের ওপর 'দ্বীন' ও ঈমান নির্ভরশীল। এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, হেদায়াত নির্ভর করে নবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আনুগত্যের ওপর। (وَاِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوْا) মানুষ অথবা ব্যক্তি হিসেবে এ আনুগত্য যে নবীর প্রাপ্য নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। মানুষকে নিজের দাস ও গোলাম বানাবার জন্যে নবীরা প্রেরিত হন না বরং মানুষকে আল্লাহর অনুগত করে দেয়ার জন্যেই তারা প্রেরিত হন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ۔

"কোনো মানুষের পক্ষে এটা সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, শাসনক্ষমতা ও নবুয়াত দান করবেন আর সে পরক্ষণেই মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহর বান্দা না হয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও। না, বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও।"

নবী এ জন্যে আগমন করেননি যে, তিনি মানুষকে তাঁর ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার আনুগত্য করতে বাধ্য করবেন, নিজের মহত্ব ও বুজুর্গির প্রভাব তাদের ওপর বিস্তার করবেন এবং তাঁর ব্যক্তি ক্ষমতার যাঁতাকলে তাদেরকে পিষ্ট করে এমন অসহায় করে ফেলবেন যে, তারা তাঁর মতামতের মোকাবিলায় নিজেদের মতামত পোষণ করার অধিকার থেকেই বঞ্চিত হবে এবং নিজেদের মন-মস্তিষ্ক তাঁর কাছে নিষ্ক্রীয় করে রেখে দেবে। এ তো সেই গায়রুল্লাহর বন্দেগীই হলো যার মূলোৎপাটনের জন্যেই নবীর আগমন।

মানুষের কাঁধে মানুষের দাসত্বের যত রকম শৃঙ্খল চাপানো হয়েছে তা সব ছিন্ন করার জন্যেই তো নবীর আগমন। আল্লাহ বলেন ঃ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ "আর তিনি (নবী) তাদের ওপর চাপানো যাবতীয় বোঝা নামিয়ে দেন এবং যেসব বন্ধনে তারা আবদ্ধ থাকে তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করেন।" মানুষ মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং বৈধ ও অবৈধের মনগড়া সীমারেখা নির্ধারণ করার যে ক্ষমতা ও এখতিয়ার করায়ত্ত্ব করে রেখেছিল, তা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যেই নবী এসে থাকেন। আল্লাহ

বলেন ঃ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ "নিজের মুখ দিয়ে যাকে ইচ্ছা হারাম বা হালাল বলে ঘোষণা করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই।" মানুষের হুকুম ও সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নেয়ার মত যে হীনতা মানুষকে পেয়ে বসেছিল তা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যেই নবুয়াতের আবির্ভাব ঘটেছিল। কুরআন এ কথাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঃ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ "আমাদের মধ্য হতে কোনো মানুষ যেন অন্য মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজের রব বানিয়ে না নেয়।" সুতরাং একজন নবী মানুষের কাঁধের ওপর থেকে অপরের গোলামীর শিকল ছিন্ন করে তাদেরকে নিজের গোলামীর শিকল দিয়ে নতুন করে বাঁধবেন এটা কি করে বৈধ হতে পারে ? তিনি হালাল হারাম নির্ধারণের অধিকার অন্য সবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন এবং পরক্ষণে নিজেই তা দখল করে বসবেন এবং ক্ষমতা ও আধিপত্যের আসন থেকে অন্য সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই গিয়ে তার ওপর সমাসীন হবেন, এটা কেমন করে সমীচীন হতে পারে ? যে নবী ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে এই বলে তিরস্কার করেন যে, তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও পীর-পুরোহিতদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে, (اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) তিনি কি করে বলবেন যে, এখন তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে রব বা খোদা বলে স্বীকার কর এবং আমার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব কর?

নবী হিসেবে নবীর আনুগত্য

বস্তুত এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে দিয়ে বারংবার এ সত্যটি প্রকাশ করেছেন যে, মু'মিনকে যে আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে আনুগত্যের ওপর ঈমান থাকা না থাকা নির্ভরশীল এবং যে আনুগত্য বর্জন তো দূরের কথা, চুল পরিমাণ তা থেকে দূরে সরারও অধিকার মু'মিনের নেই, সেটা আসলে মানুষ হিসেবে নবীর আনুগত্য নয় বরং —নবী হিসেবেই তাঁর আনুগত্য। অর্থাৎ যে হুকুম, যে জ্ঞান, যে পথনির্দেশ ও যে আইন ও বিধান নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, তারই আনুগত্য করতে হবে। এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, ইসলাম মানুষকে যে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে সেটা আসলে মানুষের আনুগত্য নয় বরং আল্লাহরই আনুগত্য। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ ـ(النساء : ١٠٥

"(হে নবী!) আমি তোমার কাছে এই সত্য গ্রন্থ এ জন্যেই নাযিল করেছি যে, আল্লাহ তোমাকে যে ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়েছেন সেই অনুসারে যেন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পার।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১০৫)।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○(المائدة : ٤٥)

"আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুসারে বিচার-ফায়সালা করে না তারাই প্রকৃতপক্ষে যালিম।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ৪৫)।

আল্লাহর এই আইন মেনে চলতে যেমন অন্য সব মানুষ বাধ্য তেমনি একজন মানুষ হিসেবে স্বয়ং নবীও তা মেনে চলতে বাধ্য। اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَىَّ "অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয় কেবলমাত্র তা-ই আমি মেনে চলি।"–(সূরা আনয়াম ঃ ৫০)

নবীর আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশের অধীন

উপরোক্ত আয়াতগুলো ছাড়াও আরও বহু আয়াত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, আনুগত্য কেবল আল্লাহরই, আর কারও নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর দাসত্ব এবং মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব ও আধিপত্যের উচ্ছেদ সাধনের জন্যেই ইসলাম এসেছে। ইসলামে কোনো মানুষের আনুগত্যের যদি অবকাশ থেকে থাকে তবে তা মানুষ হিসেবে নয়। নবীর আনুগত্য করতে হবে সত্য কিন্তু সেটা এ জন্যে যে, আল্লাহর তরফ থেকে তাকে নির্দেশ জারী করার অধিকার দেয়া হয়েছে। শাসক-প্রশাসকদের আনুগত্য করতে হবে এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের (সা) হুকুম প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। আলেমদের আনুগত্য এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের (সা) আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর নির্দেশিত বৈধ-অবৈধের সীমারেখা জানিয়ে দেন। এঁদের মধ্যে কেউ যদি আল্লাহর হুকুম পেশ করেন তবে তার সামনে মাথানত করে দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। এর যৌক্তিকতা বা বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার কোনো অধিকার তার নেই। আল্লাহর সামনে কোনো মু'মিনের চিন্তার স্বাধীনতা ও মতামতের স্বাধীনতা নেই। কিন্তু যদি কোনো মানুষ আল্লাহর হুকুম নয়—বরং নিজের কোনো মত বা ধারণা পেশ করে তবে তা মেনে নেয়া মুসলমানের ওপর ফরয নয়। সে ক্ষেত্রে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও নিজস্ব মত পোষণের অধিকারী। স্বেচ্ছায় মতকে গ্রহণ বা স্বেচ্ছায় তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার তার রয়েছে। এরূপ শুধু আলেম ও শাসক কেন স্বয়ং নবীর ব্যক্তিগত মতের সাথে দ্বিমত পোষণেও কোনো বাধা নেই।

মহানবীর (সা) জীবনের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি

মহানবী (সা)-এর জীবনের একটি উদ্দেশ্য হলো মানুষের গলায় আল্লাহর গোলামী ও আনুগত্যের শিকল পরিয়ে দেয়া। অন্যটি হলো মানুষের আনুগত্য ও গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত ও স্বাধীন করা। এ দু'টো কাজই নবী হিসেবে তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দু'টোর গুরুত্বই ছিল সমান। প্রথম কাজটি সম্পন্ন করার জন্যে নবী হিসেবে তাঁর আনুগত্য করতে সকল মুসলমানকে বাধ্য করা ছিল অপরিহার্য। কেননা তাঁর আনুগত্যের ওপরই আল্লাহর আনুগত্য নির্ভরশীল ছিল। অপরদিকে দ্বিতীয় কাজটি সম্পন্ন করার জন্যেও ঠিক ততখানিই জরুরী ছিল যে, সর্বপ্রথম তিনি তাঁর কার্যকলাপ ও আচার-ব্যবহার দ্বারা মুসলমানদের মনে এ সত্যটি বদ্ধমূল করে দেবেন যে, কোনো মানুষেরই এমনকি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদেরও মানুষ হিসেবে আনুগত্য করাও তাদের জন্যে ফরজ নয় এবং তাদের মন মানুষের দাসত্ব করা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। এটা ছিল একটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। একই ব্যক্তির মধ্যে নবুয়াত ও মনুষত্ব—এ উভয় গুণের সমাবেশ ছিল। কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত না। কিন্তু আল্লাহর রসূল (সা) আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা দিয়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে এ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। একদিকে নবী হিসেবে তিনি এমন আনুগত্য লাভ করলেন যা বিশ্ব ইতিহাসের কোনো নায়ক কোনো কালেই লাভ করেনি। অপরদিকে মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর নিবেদিত প্রাণ অনুসারীদেরকে এমন ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, দুনিয়ার অতি বড় গণতন্ত্রমনা নেতাও কোনো দিন তাঁর অনুসারীদেরকে এমন স্বাধীনতা দিতে পারেনি।

নবী হিসেবে তাঁর অনুসারীদের ওপর তাঁর কতখানি প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং মুসলমানদের কাছে তিনি কতখানি শ্রদ্ধাভাজন ও জনপ্রিয় ছিলেন তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী হয়েও তিনি দৈনন্দিন আচার-আচরণে নিজের মানবিক মর্যাদা ও নবীসুলভ মর্যাদাকে এমন নিখুঁতভাবে আলাদা করে রাখতেন যে, তার নযির খুঁজে পাওয়া যায় না। নবী হিসেবে শর্তহীন ও দ্বিধাহীন আনুগত্য লাভের পাশাপাশি মানুষ হিসেবে তিনি মানুষকে মতামতের অবাধ স্বাধীনতা দান করতেন, এমনকি নিজের ব্যক্তিগত মতের সাথে দ্বিমত পোষণেও তিনি সকলকে উৎসাহিত করতেন। এ বিষয়টি নিয়ে কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে অবশ্যই উপলব্ধি করবে যে, এমন পরিপূর্ণ আত্মসংযম, এমন বিস্ময়কর বাছবিছার ক্ষমতা এবং এহেন উচ্চস্তরের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন একজন নবীর পক্ষেই সম্ভব। এ ক্ষেত্রে একদিকে যেমন অনুভূত হয় যে, নবীর ব্যক্তিগত পদমর্যাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও নবুয়াতের পদমর্যাদার মধ্যে তা হারিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে এটাও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে, ব্যক্তিগত আচার-আচরণের মধ্য দিয়েও তিনি নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যখন বিভিন্ন কাজ করেন তখন তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে চিন্তার স্বাধীনতার সবক দেন। তাঁদেরকে শিখান, মানুষের সাথে আচরণে নিজের চিন্তার স্বাধীনতাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে। তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, মানুষ তার মত ও চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রত্যেক মানুষের মোকাবিলায় প্রয়োগ করতে পারে। এমনকি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে যাঁকে সে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি বলে মানতে বাধ্য, সেই শ্রেষ্ঠতম মানুষটির মোকাবিলায়ও সে এ স্বাধীনতার মালিক এবং তা প্রয়োগ করতে পারে। একজন নবী ছাড়া আর কেউ যদি মানুষের ওপর এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হতো তাহলে সে নির্ঘাত তাদেরকে নিজের গোলামে পরিণত করত এবং তাদের ওপর নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করত, যেমনটি করেছে যুগে যুগে দেশে দেশে পাদ্রী, পুরোহিত, পীর ও রাজারা। হযরত রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشئ من رائى فانما انا بشر-

"আমিও একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদেরকে তোমাদের ধর্মীয় বিষয়ে কোনো হুকুম দেব তখন তা মেনে নিও। আর যখন নিজের মতানুসারে কিছু বলব তখন জানবে, আমি একজন মানুষ মাত্র।"

মতামতের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করার কয়েকটি দৃষ্টান্ত

একবার হুযুর (সা) মদীনার ফলের বাগানের মালিকদেরকে খেজুর চাষ সম্পর্কে কয়েকটি পরামর্শ দেন। বাগানের মালিকরা সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে কিন্তু তাতে তেমন উপকার হলো না। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন বলা হলো, তখন তিনি বললেন ঃ

انى انما ظننت ظنا ولا تؤاخذونى بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فانى لم اكذب على الله-

"আমি কেবল অনুমান করে একটা কথা বলেছিলাম। নিছক আন্দাজ-অনুমান ও নিজস্ব মতের ভিত্তিতে আমি যা বলি তা মেন না। হ্যাঁ যখন আল্লাহর তরফ থেকে কিছু বলি তখন তা মেনে নিও। কেননা আমি আল্লাহর ওপর কখনও মিথ্যা আরোপ করিনি।"

বদরের যুদ্ধে নবী (সা) যেখানে প্রথম তাঁবু ফেলেছিলেন সে জায়গাটা তেমন ভাল ছিল না। সাহাবী হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ জায়গাটা কি অহীর নির্দেশে নির্বাচন করা হয়েছে, না কেবল সামরিক কৌশল হিসেবে ? হযরত (সা) বললেন, অহীর নির্দেশে নয়। তখন হুবাব বললেন, তাহলে আমার মতে আরও সামনে গিয়ে অমুক জায়গায় তাঁবু ফেলা উচিত। হযরত (সা) তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং সেই অনুসারে কাজ করলেন।

বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে হযরত (সা) সাহাবীবৃন্দের সাথে পরামর্শ করেন এবং নিজেও দলের একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে নিজের মত ব্যক্ত করেন। এ ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা) রসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। এটা ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। সেই বৈঠকেই হযরত (সা) নিজের জামাতা আবুল আ'স সম্পর্কেও কথা তোলেন এবং সাহাবীগণকে বলেন, তোমরা যদি অনুমতি দাও তাহলে আবুল আ'সের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে যে হারখানা পাওয়া গেছে তা তাকে ফেরত দেয়া যেতে পারে। সকল সাহাবী খুশী মনে অনুমোদন করলেই তিনি সেই হার তাকে ফেরত দেন।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত বনী গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধি করতে চাইলেন। আনসারদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বললেন, 'এটা যদি অহীর নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে কোনো কথা নেই। আর যদি হযরতের (সা) নিজস্ব মত হয়ে থাকে তবে এতে আমাদের দ্বিমত আছে।' হযরত (সা) তাঁদের মত মেনে নিলেন এবং নিজ হাতে সন্ধির খসড়াটি ছিঁড়ে ফেললেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধিটি আপাতঃ দৃষ্টিতে নতি স্বীকারমূলক সন্ধি মনে হওয়ায় সাহাবীদের মনঃপুত হয়নি। হযরত ওমর (রা) প্রকাশ্যে ভিন্নমত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু যখন হযরত (সা) বলেন, এটা আমি নবী হিসেবে করছি, তখন ইসলামী সম্ভ্রমবোধের দরুন সবাই একটু মনঃক্ষুণ্ন থাকলেও কেউ টু-শব্দটিও করার সাহাস দেখালেন না। হযরত ওমর (রা) মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নানা উপায়ে এ ভুলের জন্যে অনুতাপ করতে থাকেন যে, তিনি হযরতের সাথে এমন একটা বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বসেছিলেন যা তিনি রসূল হিসেবে করতে যাচ্ছিলেন।

হোনাইনের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাবসম্পন্ন অমুসলিমদের প্রতি যে সৌজন্য প্রদর্শন করেন তাতে আনসাররা মনঃক্ষুণ্ন হন। হযরত তাঁদেরকে ডেকে আনালেন। তিনি নিজের কাজের সমর্থনে এ কথা বললেন না যে, আমি নবী—যা খুশী তাই করব বরং একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান যেমন বিরোধী দলের লোকদের সামনে যুক্তিতর্ক দিয়ে বক্তৃতা করে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেন তেমনি করলেন। রসূলের (সা) ওপর ঈমান থাকে তো এটা মেনে নাও—এ ধরনের আবেদন তিনি করলেন না, বরং তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগের কাছে আবেদন জানালেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করে তবে বিদায় করলেন।

এ তো গেল সমাজের উচ্চমর্যাদাশীল লোকদের সাথে আচরণের কথা। মহানবী (সা) দাস-দাসীদের মধ্যে পর্যন্ত স্বাধীন মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন। বারীরা নাম্নী এক দাসী তার স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তার সঙ্গ ত্যাগ করে। কিন্তু তার স্বামী তার প্রতি ছিল পরম অনুরক্ত। তার স্বামীর কান্নাকাটা দেখে বারীরাকে হযরত (সা) বললেন, "তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে গেলে মন্দ হতো না।" সে বললো, "হে আল্লাহর রসূল (সা) ! আপনি কি হুকুম দিচ্ছেন ?' হযরত (সা) বললেন, "হুকুম নয়, তবে সুপারিশ করছি।" সে বললো, "এটা যদি সুপারিশ হয় তাহলে আমি তাব কাছে ফিরে যেতে চাইনে।"

এ ধরনের আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। এসব থেকে বুঝা যায় যে, হাবভাব দ্বারা কিংবা হযরতের সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা যখন বুঝা যেত যে হযরত (সা) নিজস্ব মতানুসারে কথা বলছেন, তখন লোকেরা স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করত আর তিনিও তাদেরকে স্বাধীন মতামত প্রকাশে উৎসাহ দিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করা শুধু বৈধই ছিল না বরং তাঁর কাছে পছন্দনীয়ও ছিল এবং তিনি অনেক সময় নিজের মত প্রত্যাহার করে নিতেন।

হযরত যায়েদের ঘটনার তৎপর্য

এবার আসুন হযরত যায়েদের ঘটনা পর্যালোচনা করি। নবী পাক (সা)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল কয়েক রকমের। একটা সম্পর্ক ছিল এই যে, হুযুর (সা) তাঁর নেতা ছিলেন এবং যায়েদ ছিলেন হুযুর (সা)-এর অনুসারী। অন্য একটি সম্পর্ক ছিল এই যে, হযরত ছিলেন শ্যালক আর যায়েদ ভগ্নিপতি।* তৃতীয় সম্পর্ক হলো, হযরত (সা) ছিলেন তাঁর পালক পিতা (মুরুব্বী) এবং যায়েদ তাঁর পালিত পুত্র। যায়েদের সাথে তাঁর স্ত্রীর বনিবনাও হলো না। তাই তিনি তাঁকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এমতাবস্থায় একজন শ্যালকের তাঁর ভগ্নিপতিকে এবং পালকের তার পালিত পুত্রকে যে ধরনের পরামর্শ দেয়া স্বাভাবিক, হযরত সেই ধরনের উপদেশই দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন, আল্লাহকে ভয় কর, স্ত্রীকে তালাক দিও না। কিন্তু উভয়ের মেজাজ প্রকৃতির পার্থক্যের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল তা হযরত যায়েদ স্বয়ং অনুভব করতেন অনেক বেশী। এটা তাঁর দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপার ছিল না, বরং ছিল মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির। সে জন্যে তিনি হযরতের দেয়া পরামর্শ গ্রহণ না করে তালাক দিয়ে দিলেন। এখানে তিনি যে বিরুদ্ধাচরণ করলেন সেটা একজন রসূলের বিরুদ্ধাচরণ ছিল না। আর হযরত যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাও তিনি আল্লাহর রসূল হিসেবে দেননি। তাই তিনিও নারাজ হননি, আল্লাহ তায়ালাও নারাজ হননি। কিন্তু হুযুর (সা)-এর স্থলে যদি এমন কেউ হতো যে কাউকে শৈশবে প্রতিপালন করেছে তার ওপরে অনুগ্রহ-অনুকম্পা দেখিয়ে এসেছে। দাসত্বের কলঙ্ক থাকা সত্ত্বেও তার সাথে আপন ভগ্নির বিয়ে দিয়েছে এবং তারপর নিষেধ করা সত্ত্বেও সে ভগ্নিকে তালাক দিয়েছে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হতো। কিন্তু হযরত (সা) শুধু মুরুব্বী এবং শ্যালকই ছিলেন না বরং আল্লাহর রসূলও ছিলেন। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করা এবং মানুষের হারানো মানবিক অধিকার তাকে ফিরিয়ে দেয়া রসূল হিসেবে তাঁর কর্তব্য ছিল। সে জন্যেই তিনি হুকুম দেননি, দিয়েছেন পরামর্শ। আর সেই

* হযরত যয়নব ছিলেন নবী পাক (সা)-এর ফুফাতো বোন এবং হযরত যায়েদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

পরামর্শ অমান্য করায় তিনি বিন্দুমাত্রও অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। এ থেকেই বুঝা যায় যে, তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে নবীসুলভ পদমর্যাদা ও মানবসুলভ পদমর্যাদা পৃথক পৃথকও ছিল আবার ওতপ্রোতভাবে জড়িতও ছিল। এ উভয়ের প্রয়োগ ক্ষেত্রে তিনি এমন বিস্ময়কর ভারসাম্য রক্ষা করেছেন যে, একজন নবীই এমন ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম। মানুষ হিসেবেও তিনি এমনভাবে কাজ করতেন যে, নবুয়াতের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও সেই সাথে আপনা-আপনিই সম্পন্ন হয়ে যেত।

চিন্তার স্বাধীনতা সম্পর্কে নবীর শিক্ষা

চিন্তার স্বাধীনতার যে বীজ নবী করীম (সা) বপন করেছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশাবলী মেনে চলার সাথে সাথে মানুষের সামনে স্বাধীন মতামত প্রকাশে যে শিক্ষা তিনি তাঁর কাজ ও আচরণের মাধ্যমে দিয়েছিলেন তার প্রভাবেই সাহাবায়ে কেরাম (রা) অন্য সকল মানুষের চেয়ে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অধিকতর আনুগত্যশীল এবং সকলের চেয়ে অধিকতর স্বাধীনচেতা ও গণতন্ত্রমনা ছিলেন। বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনেও তাঁরা আপন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেন না। কোনো অভিমত নিছক কোনো মহান ব্যক্তির হওয়ার কারণে সমালোচনার ঊর্ধে হতে হবে—এমন চিন্তা তাঁদের মন-মস্তিষ্কে স্থান পেত না। তাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং যাদের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরা নিজেরাও স্বীকার করতেন এবং আজকের দুনিয়াও স্বীকার করে, তাঁদের মতকেও তাঁরা কখনও কেবল তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ করেননি, বরং স্বাধীনভাবে কখনও গ্রহণ করেছেন, কখনও প্রত্যাখ্যান করেছেন। রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরেই সবচেয়ে বেশী মতামতের স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন। তাঁরা তাদের মহান নেতার দেখাদেখি মানুষের স্বাধীনতাকে শুধু সহ্য করেছেন তা নয়, বরং তাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁরা কখনও একজন অতি নগণ্য মানুষকেও বলেননি যে, আমরা শ্রেষ্ঠ মানব। কাজেই আমাদের কথা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নাও।

খেলাফতে রাশেদার পর চিন্তার স্বাধীনতা

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকরা চিন্তা ও মতামতের স্বাধীনতা কখনও ভয় দেখিয়ে, কখনও কঠোর যুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে, আবার কখনও লোভ দেখিয়ে নানাভাবে হরণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহাবীদের উত্তরসূরী তাবেঈন এবং তাঁদের উত্তরসূরী তাবে-তাবেঈদের মধ্যে এমনকি তাঁদের পরবর্তী মুসলমানদের মধ্যেও দীর্ঘদিন যাবত স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা অক্ষুণ্ন ছিল। প্রথম দুই-তিন শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে এর অত্যন্ত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য শাসক ও আমীর-ওমরাহদের সামনে স্বাধীনতাবোধ অপেক্ষাকৃত নগণ্য ব্যাপার। আত্মা ও বিবেকের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন এই যে, মানুষ যে ব্যক্তিত্বকে পরম শ্রদ্ধেয় ও পবিত্র মনে করে তার মনের মণিকোঠায় যার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদা বিরাজমান তারও অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত থাকবে, তার মোকাবিলায়ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে ও স্বাধীন মতামত স্থির করবে। এরূপ স্বাধীনতাবোধ আমরা সে যুগের বিদ্বান ও পণ্ডিতদের মধ্যে দেখতে পাই।

ফকীহ ও ইমামদের চিন্তার স্বাধীনতা

সাহাবীদের চেয়ে পবিত্র ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আর কেইবা হতে পারে ? আর তাঁদের প্রতি তাবেঈদের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধাশীল বা কে ? তথাপি তাঁরা সাহাবীদের মতামতের অবাধে সমালোচনা করতেন, সাহাবীদের পারস্পরিক মতবিরোধের বিচার-বিবেচনা করতেন এবং একজনের মতামত অগ্রাহ্য করে অন্যজনের মতামত গ্রহণ করতেন। সাহাবীদের পারস্পরিক মতবিরোধের ব্যাপারে ইমাম মালেক (র) দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন, خطاء وصواب فانظر فى ذالك "সাহাবীদের মতামতের মধ্যে ভুল ও নির্ভুল উভয়ই আছে। তোমরা স্বয়ং চিন্তা-ভাবনা করে মতামত স্থির কর।" অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, احد القولين خطاء والمائم فيه موضوع "দু'টো ভিন্ন ধরনের মতের একটিকে অবশ্যই ভুল মনে করতে হবে।"

স্বয়ং এই ইমামদেরও কেউ কখনও বলেননি যে, আমাদের কোনো ভুল নেই। তোমরা নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা বন্ধ রেখে শুধু আমাদের অনুকরণ করে চল। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা) যখনই কোনো বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতেন সাথে সাথে বলতেন ঃ

هذا رائى فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطاء فمنى واستغفر الله -

"এ হলো আমার মত। এটা ঠিক হলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আর ভুল হলে আমার পক্ষ থেকে এবং আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।"

হযরত ওমর (রা) বলতেন, لاتجعلوا خطاء الراى سنة مالامة "ভ্রান্ত মতকে বিশ্ব মুসলিমের আদর্শে পরিণত হতে দিও না।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ

الا لايقلدن احدكم دينه رجلا، ان امن امن وان كفر كفر فانه لاسوة فى الشر

"সাবধান! তোমাদের কেউ যেন ইসলামের ব্যাপারে কারও অন্ধ অনুকরণ না করে এবং এমন না হয় যে, অনুসৃত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয় তবে সেও মু'মিন হলো আর অনুসৃত ব্যক্তি কাফের হলে সেও কাফের হলো। বস্তুত খারাপ ও ভুল কাজে কারও অনুকরণ করা চলে না।"

ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ

انما انا بشر اخطى واصيب فانظروا فى رائى فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه -

"আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার মত ভুলও হতে পারে, ঠিকও হতে পারে। তোমরা আমার মত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর। যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পাও তা মেনে নাও, আর যা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী পাও তা বর্জন কর।"

ইমাম মালেকের এ ঘটনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে, আব্বাসীয় খলিফা মনসুর তাঁর কিতাব মুয়াত্তাকে সারা মুসলিম বিশ্বের কার্যকর সংবিধানরূপে চালু করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ফেকাহর প্রচলিত সকল মাযহাব বাতিল করে দিয়ে তিনি কেবল মালেকী

মাযহাব চালু করে দেবেন। কিন্তু ইমাম মালেক নিজেই তাঁকে সেটা করতে দেননি। কেননা তিনি অন্যদের চিন্তা, গবেষণা, মতামত ও ইজতিহাদের স্বাধীনতাকে হরণ করতে চাননি।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ لايحل لاحد ان يقول مقالتنا حتى يعلم من اين قلنا "আমরা যে মত প্রকাশ করেছি তার উৎস না জেনে অন্যদের তা মেনে নেয়া বৈধ নয়।"

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ

مثل الذى يطلب العلم بلاحجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه افعى تلدغه وهو لايدرى-

> "যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতিরেকে জ্ঞান অর্জন করে সে রাতের অন্ধকারে কাষ্ঠ আহরণকারীর ন্যায়। সে কাষ্টের বোঝা মাথায় তুলবে। অথচ সে জানে না যে বোঝার মধ্যে সাপ লুকিয়ে আছে যা তাকে দংশন করবে।"

চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতার পতন যুগ

হযরত রসূলে করীম (সা) স্বীয় অনুসারীদের মধ্যে চিন্তা-গবেষণার মতামত ও সত্যানুসন্ধানের অবাধ স্বাধীনতার যে প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করে গিয়েছিলেন, মুসলমানদের মধ্যে তা প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর আমীর-ওমরাহ, শাসক, আলেম ও পীরদের স্বৈরাচার ঐ প্রাণশক্তি নস্যাৎ করে দিতে আরম্ভ করে। চিন্তাশীল লোকদের স্বাধীন চিন্তার অধিকার এবং দেখার ও কথা বলার অধিকারও ছিনিয়ে নেয়া হয়। দরবার থেকে শুরু করে মাদ্রাসা ও খানকা পর্যন্ত মুসলমানদেরকে গোলামীর শিক্ষা দেয়া হতে থাকে। মন-মগজ, আত্মা ও দেহের সর্বাত্মক গোলামীতে তাদেরকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলা হয়। শাসকরা তাদের উদ্দেশ্যে রুকূ'-সিজদা করিয়ে সৃষ্টি করেন গোলামীর মানসিকতা। মাদ্রাসার পরিচালকগণ খোদাপুরস্তি শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে মুরব্বী পূজার বিষপাষ্পও মাথায় ঢুকয়ে দেন। আর 'বায়য়াত' এর যে পদ্ধতি হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ থেকে চলে আসছে, পীর-মুর্শেদগণ তা বিকৃত করে এক ধরনের 'পবিত্র গোলামী'র শৃঙ্খলে মুসলমানদেরকে আবদ্ধ করেন। সে শৃঙ্খল এমনই ভয়াবহ যে মানুষ মানুষের জন্যে—তার চেয়ে কঠিন ও ভারী শৃঙ্খল বোধ হয় আর কখনও উদ্ভাবন করতে পারেনি।

ফলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সামনে মাথা নত হতে লাগল, তার সামনে নামাযের মত হাত বাঁধা শুরু হলো, মানুষের দিকে চোখ তুলে দেখা বেয়াদবীর শামিল হলো, মানুষের হাত-পা চুম্বন করা শুরু হলো, মানুষ মানুষের খোদা ও রেজেকদাতা হয়ে গেল, মানুষ আপনা-আপনিই আদেশ-নিষেধ করার এখতিয়ার লাভ করল এবং কুরআন ও সুন্নাহর দলিল-প্রমাণ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেল, মানুষকে দোষ-ক্রটির উর্ধে মনে করা হতে লাগল, মানুষের হুকুম ও মতামতকে আকীদাহ বিশ্বাসের দিক দিয়ে না হলেও কার্যত খোদার হুকুমের ন্যায় অবশ্য পালনীয় মনে করা হলো। এমন অবস্থা যখন হলো তখন মনে করতে হবে যে, তখন সেই শাশ্বত দাওয়াত থেকে মুখ ফেরান হলো যা আল্লাহর নবী দিয়েছেন। তাহলো ঃ

اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"(আসুন) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাসত্ব আনুগত্য করব না এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করব না। আর আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে খোদা বানিয়ে না নেয়।" তারপর আর কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। পতনই হবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।১০৪

রিসালাত ও তদসংক্রান্ত ইসলামী বিধান

রসূলের আনুগত্য সম্পর্কে এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, কোনো রসূল ব্যক্তি হিসেবে আনুগত্যের অধিকারী নন। মূসা (আ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্যে নয় যে, তিনি মূসা বিন ইমরান, ঈসা (আ)ও এ জন্যে আনুগত্য পেতে পারেন না যে, তিনি ঈসা ইবনে মরিয়াম। অনুরূপভাবে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য এ জন্যে অনিবার্য নয় যে, তিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ। আনুগত্য ও অনুসরণ যা কিছু করতে হয় তা শুধু এ জন্যে যে, এ মহান ব্যক্তিগণ আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তাঁদেরকে যে সত্য জ্ঞান ও হেদায়াত দান করেছেন তা সাধারণ মানুষকে করেননি। তিনি তাঁদেরকে দুনিয়ায় জীবনযাপন করার জন্যেই তাঁরই মর্জি মতো ঐসব সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যা সাধারণ মানুষ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী অথবা নবীগণ ব্যতীত অন্য লোকের সাহায্যে লাভ করতে পারে না। এখন যে সম্পর্কে মতভেদ তা হচ্ছে এই যে, রসূলের (সা) আনুগত্য ও অনুসরণ কোন্ কোন্ বিষয়ে এবং তার সীমারেখা কি।

একটি দলের দৃষ্টিকোণ

একটি দল বলে যে, রসূল (সা) যে কিতাব আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন আনুগত্য ও অনুসরণ শুধু সে কিতাবের করতে হবে। এ কিতাব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার পর রসূলের (সা) রিসালাতের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ। অন্যান্য মানুষ যদি আমীর এবং জাতীয় নেতা হয় তাহলে নিছক আইন-শৃঙ্খলার (Discipline) প্রয়োজনে তার আনুগত্য করতে হয় কিন্তু সেটা কোনো ধর্মীয় দায়িত্ব নয়। অন্যান্য মানুষ যদি জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও আইন রচয়িতা হয় তবে তার গুণাবলীর (Merits) জন্যে [illegible]সরণ করা হবে। তবে সেটা হবে সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার, অপরিহার্য কর্তব্য নয়[illegible]সূলের (সা) ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করতে হবে। কিতাব পৌঁছে দেয়া ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে তাঁর মর্যাদা নিছক ব্যক্তিগত। ব্যক্তি হিসেবে তিনি আমীর বা নেতা হলে তাঁর আনুগত্য ঐ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকাকাল পর্যন্ত—স্থায়ীভাবে নয়। তিনি যদি বিচারক হয়ে থাকেন তবে তার বিচার-ফায়সালা তার নির্দিষ্ট গণ্ডির (Jurisdiction) ভেতরেই কার্যকর হবে। সেই গণ্ডীর বাইরে একজন বিজ্ঞ বিচারক হিসেবে তাঁর বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত বড়জোর একটি নযীর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু আইন রচয়িতা ও বিধানদাতা হিসেবে তাঁর মর্যাদা স্বীকৃত হবে না। তিনি যদি একজন প্রাজ্ঞ মনীষী হন তাহলে তিনি যেসব জ্ঞান ও নৈতিকতার কথা বলবেন তার গুণগত মানের দিক দিয়ে তা গ্রহণ করা যেতে পারে যেমন অন্যান্য জ্ঞানী-গুণী ও পাণ্ডিতদের এ জাতীয় কথা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র একজন রসূলের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরিয়েছে বলেই তাঁকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে না। অনুরূপভাবে তিনি যদি একজন চরিত্রবান মানুষ হয়ে থাকেন এবং চালচলন, আচার-ব্যবহার ও লেনদেনে তাঁর জীবন যদি একটি অতি উত্তম ধরনের জীবন বলে বিবেচিত হয় তবে আমরা সেচ্ছায় তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করব, যেমন একজন সাধারণ মানুষের নিষ্কলুষ জীবনকেও আদর্শ হিসেবে মেনে নেয়ার ব্যাপারে আমরা স্বাধীন। তবে তার কোনো কাজ বা কথা

আমাদের জন্যে নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় আইনের মর্যাদাসম্পন্ন হবে না।

দ্বিতীয় একটি দলের দৃষ্টিভঙ্গী

অপর একটি দল ওপরের অভিমতে সামান্য রদবদল করেছে। তাদের বক্তব্য হলো, রসূলের (সা) কাজ শুধু কিতাব পৌঁছে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং কিতাবে সন্নিবেশিত নির্দেশসমূহ বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেয়াও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাতে মুসলিম জাতি তা হুবহু অনুসরণ করতে পারে। ইবাদাত ইত্যাদি সম্পর্কে কিতাবের বিধিসমূহের যে বিস্তারিত বাস্তব কার্যপদ্ধতি রসূল (সা) শিক্ষা দিয়েছেন তাও মেনে চলা ধর্মীয় দায়িত্ব এবং তা কিতাবেরই অনুসরণ বলে গণ্য হবে। কিন্তু কিতাবে সন্নিবেশিত বিধিসমূহ ছাড়া রসূল ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যথা বিচারপতি, সমাজ সংস্কারক, মনীষী, নাগরিক ও দলের সদস্য হিসেবে যেসব কাজ সমাধা করেছেন তার কোনোটাই এমন কোনো শাশ্বত ও বিশ্বজনীন আইনের উপকরণ হতে পারে না, যার অনুসরণ ও আনুগত্য করা একটা ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

তৃতীয় দলের অভিমত

তৃতীয় দলের মতে, রসূল (সা)-এর রিসালাতের দায়িত্ব ও মর্যাদা তাঁর জীবনের একটি বিরাট অংশে পরিব্যাপ্ত। নৈতিকতা, সামাজিক আচার-আচরণ, অর্থনৈতিক লেনদেন, প্রশাসনিক ও আইনগত বিচার-ফায়সালা এবং অনুরূপ আরও বহু বিষয়ে রসূলের কথা ও কাজ স্বয়ং আল্লাহর বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে, এসব বিষয়ে রসূলের কথা ও কাজ সমগ্র উম্মতের জন্যে উত্তম ও অবশ্য পালনীয় আদর্শ। তবে তারা তাঁর ব্যক্তি জীবন ও নবী জীবনের মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষপাতি। তাঁরা মনে করেন যে, রসূলের (সা) জীবনের কিছু কিছু ব্যাপার এমন রয়েছে যা তাঁর নবী জীবনের বহির্ভূত এবং অনুকরণযোগ্য আদর্শ নয়। অবশ্য এ দলটি কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা এঁকে দিয়ে রসূলের নবী-জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনকে আলাদা করে দেখাতে পারেননি এবং কোন্ সীমার ওপরে গিয়ে রসূল (সা) নিছক একজন মানুষের মর্যাদা লাভ করেন তা বলতে পারেননি।

চতুর্থ দলের অভিমত

চতুর্থ দলের অভিমত এই যে, রসূল (সা)-এর ব্যক্তিগত জীবন ও নবী জীবন যদিও মর্যাদার দিক দিয়ে দু'রকমের বলেই বিবেচিত কিন্তু বাস্তবে তা একই এবং তাদের মধ্যে কার্যকরভাবে কোনো পার্থক্য করা সম্ভব নয়। রিসালাতের পদমর্যাদা দুনিয়ার অন্যান্য পদ-মর্যাদার মত নয় যে, দায়িত্বশীল যতক্ষণ তাঁর আসনে বসে আছেন ততক্ষণই দায়িত্বশীল, আর যখনই আসন থেকে নামলেন অমনি সাধারণ মানুষের দলভুক্ত হয়ে গেলেন। রসূল যে মুহূর্তে রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করেন তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ দায়িত্বে বহাল থাকেন। এ সমগ্র সময়টায় তিনি যে রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হয়েছেন, সে রাজ্যের নীতি-বিরোধী কোনো কাজে এক মুহূর্তের জন্যেও লিপ্ত হতে পারেন না। তিনি নেতা বা রাষ্ট্রনায়ক হোন, কিংবা সমাজের একজন সাধারণ সদস্য হোন ; স্বামী, পিতা, ভাই কিংবা আত্মীয় ও বন্ধু হোন, তাঁর জীবনের সকল কার্যকলাপের ওপর রিসালাতের দায়িত্ব সর্বতোভাবে কর্তৃত্বশীল। রিসালাতের দায়িত্ব ও মর্যাদা এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর

সত্তা থেকে আলাদা হয় না। এমনকি তিনি নামাযের ইমামতী করার সময় যেমন আল্লাহর রসূল (সা) আপন স্ত্রীর নির্জন সান্নিধ্যে অবস্থান করার সময়েও তেমনি আল্লাহর রসূল (সা)। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যা-ই করেন আল্লাহর নির্দেশেই করেন। তিনি সবসময় আল্লাহর কঠোর তদারকীর অধীনে থাকেন। তাই প্রতিটি কাজ তিনি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে করতে বাধ্য থাকেন। এভাবে নিজের কথা, কাজ ও যাবতীয় আচার-আচরণের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের গোটা ব্যবস্থা এসব মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং এ চৌহদ্দির মধ্যে মানুষের কাজকর্মের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এ মহান দায়িত্ব তিনি সরকারী পর্যায়ে যেমন সুষ্ঠুভাবে পালন করেন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও তেমনি। কোনো ব্যাপারে যদি তাঁর সামান্য একটু পদস্খলন হয় তাহলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়। কোনো তাঁর ভুল গোটা মুসলিম উম্মতের ভুলের কারণ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। তাঁকে রসূল হিসেবে পাঠানোর উদ্দেশ্যই এই যে, তিনি সমাজের মধ্যে জীবন যাপন করার ভেতর দিয়ে জনগণের সামনে একজন সত্যিকার মুসলমানের জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরবেন। শুধু যে ব্যক্তিগত কার্যকলাপে তাদের পথ প্রদর্শন করে তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে উৎকৃষ্ট মুসলমানে পরিণত করবেন তা নয়—বরং সেই সাথে ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিধান বাস্তবায়িত করে একটি যথার্থ ইসলামী সমাজ গড়ে তুলবেন। এ জন্যেই তাঁর ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। যাতে করে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তাঁর অনুকরণ করা যায় এবং তাঁর কথা ও কাজকে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের প্রকৃত মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য নবীর কথা ও কাজের অনুকরণ ও অনুসরণে বাধ্যবাধকতার স্তরভেদ যে রয়েছে তা অনস্বীকার্য। কোনোটা অত্যাবশ্যক তথা ফরজ বা ওয়াজেব পর্যায়ের, কোনোটা অপেক্ষাকৃত উত্তম বা মুস্তাহাব পর্যায়ের, আবার কোনোটা শুধুমাত্র পূর্ণতা অর্জন পর্যায়ের কিন্তু মোটের ওপর নবীর সমগ্র জীবনই আদর্শ। মানব সন্তান তাঁর অনুসরণ করে নিজেকে তাঁর মতো করে গড়ে তুলবে—এ উদ্দেশ্যেই তাঁকে পাঠান হয়েছে। এ আদর্শের অনুকরণে যে ব্যক্তি যতবেশী অগ্রগামী হবে সে ততই পূর্ণ মানুষ ও পূর্ণ মুসলমান হতে পারবে কিন্তু যে ব্যক্তি এর অনুকরণে ন্যূনতম অত্যাবশ্যক পর্যায়েরও নীচে থাকবে সে তার পশ্চাদপদতার অনুপাতেই গুনাহগার, নাফরমান, পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হবে।

আমার মতে; এ শেষোক্ত দলই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমি পবিত্র কুরআন ও যুক্তির আলোকে যতবেশী চিন্তা-গবেষণা করি, এ শেষোক্ত মতের সত্যতা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস ততই মজবুত হয়।

শৈশবকাল থেকেই নবীদের তরবিয়তের বিশেষ ব্যবস্থা

পবিত্র কুরআনে নবীদের সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা পড়লে নবুয়াতের তাৎপর্য বুঝা যায়। সে বিবরণের প্রেক্ষিতে আমার মনে হয় না যে আল্লাহ তায়ালা হঠাৎ করে একজন পথচারীকে ধরে এনে তাঁর কিতাব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন অথবা কিছু সময়ের জন্যে কর্মচারী হিসেবে কাউকে নবুয়াতের জন্যে নিয়োগ করেন যিনি নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট কাজ করে দিয়েই অব্যাহতি পান এবং তারপরে যা খুশী তাই করতে পারেন। পক্ষান্তরে আমি দেখি যে, আল্লাহ যখনই কোনো জাতির কাছে

নবী পাঠাতে চেয়েছেন তখন নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করতে পারে এমন একজন লোককে বিশেষভাবেই সৃষ্টি করে থাকেন। যে সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী ও যে শ্রেষ্ঠতম মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও যোগ্যতা এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন, তা তাঁর মধ্যে আগে থেকেই তিনি দিয়ে রাখেন। জন্মলগ্ন থেকেই তাঁকে নিজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে লালন পালন করেন।

নবুয়াত দানের পূর্বে তাঁকে সব রকমের চারিত্রিক ক্রুটি-বিচ্যুতি, গোমরাহি ও অসৎ কাজকর্ম থেকে দূরে রেখেছেন এবং সব রকমের বিপদ ও ধ্বংসকারিতা থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন। তাঁকে এমন পরিবেশে লালন করেছেন যে, নবুয়াতের যোগ্যতা শক্তির সীমারেখা থেকে অগ্রসর হয়ে উত্তরোত্তর কার্যকারিতার রূপ ধারণ করতে থাকে। অতপর যখন তিনি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেন তখন তাঁকে নিজের কাছ থেকে জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও নির্ভুল পথের সন্ধান প্রদান করেন। এভাবেই তাঁকে নবুয়াতের সুমহান মসনদে সমাসীন করেন এবং এ কাজ তাঁকে দিয়ে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করান। এই মসনদে আরোহণ করার পর থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর জীবন এই গুরু দায়িত্ব পালনেই ছিল উৎসর্গীকৃত। আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হওয়া আয়াতগুলোকে হুবহু আপন জাতির সামনে উপস্থাপিত করা, অতপর আল্লাহর কিতাবের বিস্তারিত জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়া, আর মানুষের আত্মার সার্বিক পরিশুদ্ধিকরণ—এই হল তাঁদের কাজ। এ ছাড়া তাঁদের আর কোনো কাজ ছিল না। রাত দিন, চলাফেরা ও উঠাবসায় প্রতিটি মুহূর্তে এটাই ছিল তাঁদের একমাত্র চিন্তা-ভাবনা যে কিভাবে পথভ্রষ্ট লোকদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন আর যারা সঠিক পথে এসেছে কিভাবে তাদের উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণের যোগ্য করে তুলবেন। তারা হলেন এক একজন সার্বক্ষণিক কর্মচারী। কখনও তাঁর বিরতি বা ছুটি ছিল না। তাঁদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমাও ছিল না। তারা যাতে কোনো গুনাহর কাজ না করতে পারেন সে জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কড়া প্রহরা নিয়োজিত থাকত। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে তাদেরকে কঠোর ভাবে রক্ষা করা হতো। দৈনন্দিন কার্যকলাপ কিভাবে করবেন তা পুরোপুরি তাদের মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার-বিচেনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং যেখানেই নিজের খেয়াল-খুশী বা নিজস্ব বিচার-বিবেচনা মতো চলতে গিয়ে সঠিক পথ থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হয়েছেন সেখানেই ভুল ধরিয়ে দিয়ে সোজা পথে তাদেরকে চালিত করা হয়েছে কেননা তাদের জন্ম ও নবীর পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যই ছিল এই যে, তারা যেন আল্লাহর বান্দাদেরকে সঠিক পথে চালিত করেন। তারা যদি এই পথ থেকে এক চুল পরিমাণও সরে যান তবে সাধারণ মানুষ শত শত মাইল দূরে সরে যাবে।

আমার এ বক্তব্যের প্রতিটি অক্ষরের সাক্ষ্যদান করে কুরআন। নবীরা যে জন্মের আগে থেকেই নবুয়াতের জন্যে নির্বাচিত হতেন এবং তাঁদেরকে বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হতো সে কথা বেশ কয়েকজন নবীর অবস্থা থেকে জানা যায়। যেমন হযরত ইসহাকের জন্মের আগেই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর জন্ম ও নবুয়াত লাভের সুংসবাদ দেয়া হয়েছিল।

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ط

"আমি ইবরাহীমকে একজন পুণ্যবান নবী হিসেবে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম এবং তাঁর ও ইসহাকের ওপর বরকত দান করেছিলাম।"

–(সূরা আস সফফাত ঃ ১১২-১১৩)

হযরত ইউসুফ সম্পর্কে তাঁর শৈশবকালেই পিতা হযরত ইয়াকুব জানতে পারেন যে, আল্লাহ তাঁকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন এবং ইবরাহীম (আ) ও ইসহাক (আ)-এর ন্যায় তাঁকেও নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ আকারে দান করবেন। হযরত যাকারিয়া (আ) পুত্রের জন্যে দোয়া করলে আল্লাহ তাঁকে এভাবে সুসংবাদ দান করেন ঃ

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○(ال عمران : ٣٩)

"আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়া নামক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের সত্যায়নকারী হিসেবে আগমন করবেন। তিনি নেতৃত্ব ও মহত্বের অধিকারী হবেন। তিনি নবী ও পুণ্যবানদের মধ্যে গণ্য হবেন।"

হযরত মরিয়ামের নিকট বিশেষভাবে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে হযরত ঈসা সম্পর্কে এই বলে সুসংবাদ দেয়া হয় যে, তাঁকে একটি পুত-পবিত্র পুত্রসন্তান দান করা হবে। যখন তাঁর সন্তান প্রসবের সময় হলো তখন বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রসবকালীন ব্যবস্থাপনা করা হলো।–(সূরা মরিয়াম ঃ ২ রুকূ, দ্রঃ)। তারপর সেই ইসরাঈলী মেষচালকের ব্যাপারটাও লক্ষণীয়। আল্লাহ তাঁকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় ডেকে নিয়ে কথাবার্তা বলেন। অন্যান্য মেষচালকের মতো ছিলেন না তিনি। মিসরে তাঁকে বিশেষভাবে ফেরাউনের কুশাসন ধ্বংস ও বনী ইসরাঈলকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়। হত্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁকে একটা বাক্সতে রেখে নদীতে ফেলে দেয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। যে ফেরাউন তাঁর হাতেই পর্যদস্তু ও ধ্বংস হবে, তার বাড়ীতেই গিয়ে পৌঁছে তাঁর ভাসমান বাক্স। তাঁকে আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করা হয় যাতে ফেরাউনের পরিবার-পরিজনের হৃদয়ে তিনি স্থান করে দিতে পারেন। وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ তাঁর মুখে যাতে কোনো নারীর দুধ প্রবেশ না করে এবং তার লালন-পালন আল্লাহর বিশেষ তদারকীতে সুসম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ এ দৃষ্টান্তগুলো থেকে জানা যায় নবীগণকে বিশেভাবে নবুয়াতের জন্যেই পয়দা করা হতো।

অসাধারণ যোগ্যতা ও বিশেষ কর্মক্ষমতা

উল্লেখ্য যে, এভাবে যাঁদের জন্ম, তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো নন। তাঁরা অসাধারণ যোগ্যতা নিয়ে আবির্ভূত হন। তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র ও সৎ স্বভাবের মানুষ। তাঁদের মন-মস্তিষ্কের প্রকৃতি ও কাঠামো এমন যে, তাঁরা যে কথাই বলেন অত্যন্ত সোজা ও সরলভাবেই বলেন। ভ্রান্ত পদক্ষেপ এবং বক্র দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের এমন কোনো প্রবণতাই তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতিতে নেই। জন্মগতভাবে তাঁদেরকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, তাঁরা বিনা ইচ্ছা ও শুধু তীব্র অনুভূতি ও দিব্যজ্ঞানের (Intvition) দ্বারা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারেন, যা অন্যান্য মানুষ দীর্ঘ চিন্তা গবেষণার পরও পারে না। জ্ঞান তাঁদের অর্জন করতে হয় না। তাদের জ্ঞান সহজাত ও খোদাপ্রদত্ত। কোন্‌টা হক, কোন্‌টা বাতিল

এবং কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা সঠিক—সে জ্ঞান তাঁদের মজ্জাগত। স্বভাবতই তাঁরা সঠিক চিন্তা করেন, সঠিক কথা বলেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত ইয়াকুব (আ)-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত ইউসুফের স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনা মাত্রই তাঁর মনে খটকা জন্মে। ছেলেটির ভাইয়েরা তাকে বেঁচে থাকতে দেবে না। ভাইয়েরা ইউসুফকে খেলার জন্যে সাথে করে নিয়ে যেতে চায়। হযরত ইয়াকুব শুধু যে তাদের অসদুদ্দেশ্যই ধরে ফেলেন তাই নয়, বরং পরবর্তী সময়ে তারা যে মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করাতে চেয়েছিল তাও নির্ভুলভাবে বুঝতে পারেন। তিনি বলেন, وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ (আমার আশংকা হয় যে তোমরা ওর দিকে লক্ষ্য রাখবে না, এমন এক মুহূর্তে ওকে বাঘে খেয়ে ফেলবে।) এরপর যখন ইউসুফের ভাইয়েরা রক্তমাখা জামা এনে দেখাল তখন হযরত ইয়াকুব তা দেখেই বললেন, بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا "তোমাদের প্রবৃত্তি একটা কঠিন কাজ তোমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছে।" আবার ইউসুফের ভাইয়েরা যখন মিসর থেকে ফিরে এসে বলল, আপনার ছেলে চুরি করেছে এবং তাঁর যাতে বিশ্বাস হয় সে জন্যে বলল, সেই গ্রামের লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন যেখান থেকে আমরা এলাম ; তখন আবার তিনি সেই একই জবাব দেন যে, তোমাদের প্রবৃত্তি একটা কঠিন কাজ তোমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছে। অতপর তিনি ছেলেদের আবার এই বলে মিসর পাঠান اِذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ (যাও ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর)। ব্যাপারটা এমন যেন দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইউসুফ বেঁচে আছেন এবং মিসরেই আছেন। এরপর হযরত ইয়াকুবের ছেলেরা হযরত ইউসুফের জামা নিয়ে যখন মিসর থেকে রওনা দিল তখন হযরত ইয়াকুব দূর থেকেই হযরত ইউসুফের ঘ্রাণ পেতে থাকেন। এসব ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে, নবীদের মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক শক্তি-সামর্থ কত প্রবল ও অসাধারণ। এটা শুধু হযরত ইয়াকুবেরই বৈশিষ্ট্য নয়—সকল নবীরই একই অবস্থা। হযরত ইয়াহিয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّاۙ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ط (مريم : ١٢-١٣)

"আমি শৈশবকালেই তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা দান করেছিলাম।"–(মরিয়ম ঃ ১২-১৩)।

হযরত ঈসা (আ) যখন মায়ের কোলে তখন তাঁকে দিয়ে ঘোষণা করান হয় ঃ

وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَاكُنْتُ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّاۙ وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِىْ

وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّاۙ (مريم : ٣١-٣٢)

"তিনি আমাকে বরকতের অধিকার করে সৃষ্টি করেছেন—যেখানেই আমি থাকি না কেন—আর আজীবন নামায ও যাকাত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাকে তিনি আমার মায়ের হক আদায়কারী করে পয়দা করেছেন। আমাকে বলপ্রয়োগকারী ও অসৎ বানাননি।"

মহানবী (সা) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "নিশ্চয়ই তুমি নৈতিক চরিত্রের উচ্চ শিখরে।"–(সূরা কলম ঃ ৪)

এগুলো হলো নবীদের জন্মগত ও স্বভাবগত গুণ-বৈশিষ্ট্য যা নিয়ে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। অতপর আল্লাহ তাঁদের এসব সহজাত গুণ-বৈশিষ্ট্যকে আরও উৎকর্ষ প্রদান করে সক্রিয় ভূমিকার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। অবশেষে তাঁদেরকে সেই মহান বস্তু দান করেন যাকে কুরআনের ভাষায় এলম ও হুকুম (জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা) এবং হেদায়াত (পথনির্দেশ) ও বাইয়েনা (সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী) প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতিকে বলেন ঃ

وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○ (اعراف : ٦٢)

"আমি আল্লাহর কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করেছি যা তোমরা লাভ করনি।"

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর ওপর আল্লাহর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করান হয় (সূরা আনআম)। সে পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি যখন নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে ফিরলেন তখন আপন পিতাকে বললেন ঃ

يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ○

"হে আমার পিতা! আমি এমন এক জ্ঞান লাভ করেছি যা আপনি লাভ করেননি। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সোজা পথ দেখাব।"
–(সূরা মরিয়াম ঃ ৪৩)

হযরত ইয়াকুব সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○ (يوسف : ٦٨)

"নিশ্চিতভাবেই তিনি আমার দেয়া জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তবে অধিকাংশ লোক সে রহস্য জানে না।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ৬৮)

হযরত ইউসুফ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط (يوسف : ٢٢)

"তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন আমি তাকে জ্ঞান ও বিচার-ফায়সালার ক্ষমতা প্রদান করি।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ২২)।

সূরা কাসাসের ১৪ আয়াতে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কেও এ কথা বলা হয়েছে। হযরত লূতকেও একই জ্ঞান ও বিচার-ফায়সালার ক্ষমতা দেয়া হয়।–(সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৪)

স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেও এই অসাধারণ জ্ঞান দান করা হয় ঃ

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط (النساء : ١١٣)

"আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান এবং তোমাকে সেই জ্ঞান দান করেছেন যা আগে তুমি জানতে না।"–(সূরা নিসা ঃ ১১৩)

قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ -(انعام : ٥٧)

"তুমি বলে দাও যে, আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল পথে আছি।"-(সূরা আনআম ঃ ৫৭)

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط (يوسف : ١٠٨)

"বল এই হলো আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। আমি নিজে এবং আমার অনুসারীরা দিব্যজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।"-(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮)

এই জ্ঞান ও বিচার-ফায়সালার ক্ষমতার দরুন নবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এতখানি পার্থক্য সৃষ্টি হয় যতখানি পার্থক্য থাকে একজন চক্ষুষ্মান ও অন্ধের মধ্যে।

اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ط (انعام : ٥٠)

"আমি কেবল আমার কাছে যে অহী আসে তার অনুসরণ করি। (হে মুহাম্মদ!) বলুন, অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ কি সমান হতে পারে?"-(সূরা আনআম ঃ ৫০)

এ আয়াতগুলোতে যে জিনিসটির কথা বলা হয়েছে সেটি শুধু কিতাব নয়—বরং তা হচ্ছে নবীদের অন্তরে সদাপ্রোজ্জ্বল এক জ্যোতি। এ জন্যে কিতাব থেকে আলাদাভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ জিনিসটিকে নবীদের গুণ-বৈশিষ্ট্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা ঐ আলোকরশ্মির সাহায্যে তথ্যানুসন্ধান করেন এবং তাঁদের সামনে যেসব সমস্যা প্রতিনিয়ত হাজির করা হয় তারও সমাধান খোঁজেন। বিজ্ঞ মনীষীগণ একে 'গোপন অহী' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এটা একটা অন্তর্নিহিত পথনির্দেশিকা ও আত্মস্থ উপলব্ধি—যা প্রতিমুহূর্তে তাঁদের কাছে বর্তমান থাকে এবং যে কোনো ব্যাপারে তাঁরা তাঁর সাহায্য নিয়ে থাকে। অন্যান্য লোক দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পরও যেসব বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং ভুল ও নির্ভুল নির্ণয় করতে পারে না, সেসব বিষয়ে নবীর দৃষ্টি আল্লাহ প্রদত্ত জ্যোতি ও দিব্যজ্ঞানের বলে মুহূর্তের মধ্যেই নিগূঢ়তম রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়।

নবীদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থা

কুরআন থেকে আমরা এ কথাও জানতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে শুধু যে তত্ত্বজ্ঞান, বিচার-ফায়সালার ক্ষমতা এবং অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি তাঁদের ওপর বিশেষ দৃষ্টিও রাখেন, ভুল-ভ্রান্তি থেকে তাঁদেরকে রক্ষা করেন এবং পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করেন তা মানুষের প্রভাবেই হোক কিংবা শয়তানের প্ররোচনায় অথবা নিজ প্রভৃত্তির কুমন্ত্রণায় হোক। এমনকি নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েও তাঁরা যদি ভুল করেন তাহলে আল্লাহ তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে শুধরে দেন। হযরত ইউসুফের ঘটনাই ধরুন। মিসরের তৎকালীন জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার স্ত্রী যখন ইউসুফকে তাঁর ফাঁদে প্রায় ফেলেছিল, তখন আল্লাহ তাঁর সুস্পষ্ট 'প্রমাণ' দেখিয়ে তাঁকে দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করেন।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ج وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ط كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ ط

وَالْفَحْشَآءَ ط اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○ (يوسف : ٢٤)

“সে (মহিলাটি) ইউসুফের প্রতি অসৎ অভিপ্রায় পোষণ করলো। ইউসুফও তার প্রতি করতো যদি না সে আপন প্রতিপালকের প্রমাণ দেখতে না পেতো। এমনটি হলো এ জন্যে যাতে করে আমি তাকে খারাপ ও বেহায়াপনার কাজ থেকে ফিরিয়ে দিতে পারি। কেননা সে ছিল এমন বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে আমি আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছি।”–(সূরা ইউসুফ ঃ ২৪)।

হযরত মূসা ও হারুনকে যখন ফেরাউনের কাছে যেতে বলা হল তখন ফেরাউন তাদের ওপর অত্যাচার করতে পারে ভেবে তাঁরা ভীত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ বলেন, ভয় কর না। আমি তোমাদের সাথে আছি এবং সবকিছু দেখছি ও শুনছি (সূরা তাহা ঃ ৪৫-৪৬) মানবিক দুর্বলতা হেতু তারা ভীত হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা অহী দ্বারা এ মারাত্মক দুর্বলতা দূর করে দেন।

হযরত নূহ ছেলেকে ডুবে মরতে দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন! رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ “হে খোদা! এ আমার ছেলে।” এ ছিল মানবীয় দুর্বলতা। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে এ অর্থ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলেন—যে সে তার ঔরসজাত সন্তান হলে হতে পারে কিন্তু সে তার ‘পরিজনভুক্ত’ নয়। কেননা সে দুষ্কৃতকারী। পিতৃস্নেহের আবেগে মানবসুলভ দুর্বলতা কিছুক্ষণের জন্যে এ সত্যকে নবীর অন্তর্দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন রাখে যে সত্যের বেলায় পিতা, পুত্র, ভাই-বোন কিছু নয়। অহীর মাধ্যমে চোখের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে দিলেন। হযরত নূহ আশ্বস্তবোধ করলেন।

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বেলায়ও বেশ কয়েকবার এ রকম ঘটনা ঘটেছে। কখনও স্বভাবসুলভ দয়া ও করুণা বশে, কখনও কাফেরদের ইসলামে দীক্ষিত করার অদম্য উৎসাহে কখনও কাফেরদের মন জয় করার অভিলাষে, কখনও লোকদের ছোটখাট উপকারের প্রতিদান দেয়ার চেষ্টায়, কখনও মুনাফেকদের মনে ঈমানের প্রেরণা উজ্জীবিত করার বাসনায় এবং কখনও মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাঁর পক্ষ থেকে ইজতেহাদী ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে কিন্তু যখনই এ রকম হয়েছে তখনই আল্লাহ প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট অহী দ্বারা তাঁকে সংশোধন করে দিয়েছেন। যেমন ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى -(عبس : ١)

“তিনি বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরালেন। কেননা তার কাছে অন্ধ লোকটি এসেছিল।”

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى (الانفال : ٦٧)

“কোনো নবীর কাছে যুদ্ধবন্দী থাকবে এটা কোনো নবীর জন্যে শোভনীয় নয়।”

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ -(التوبة : ٤٣)

“(হে নবী) আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি কেন তাদেরকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্যে অনুমতি দিলে।”–(সূরা আত তওবা ঃ ৪৩)।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ -(التوبة : ٨٠)

"তাদের জন্যে তোমার ক্ষমা চাওয়া বা না চাওয়া উভয় সমান। তুমি তাদের জন্যে সত্তরবার ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না।"-(সূরা আত তওবা : ৮০)

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا -(التوبة : ٨٤)

"ভবিষ্যতে (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে তার জানাযা যেন কখনও না কর।"

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ -(التحريم : ١)

"হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তা তুমি হারাম কর কেন ?"

এ আয়াতসমূহ নবীদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের সাক্ষ্য বহন করে।

কিছু লোক এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, নবীদের ভুল হতো। তারা ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধে ছিলেন না। বিশেষ করে হাদীস-বিরোধী আহলে কুরআন দল এ আয়াতগুলোর দ্বারা নবীর ভুল ধরতে বড় আনন্দ পান। অথচ এই আয়াতগুলো দ্বারাই এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাঁর নবীকে ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করার এবং তাঁদের জীবনকে সত্যের মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়টি শুধু উল্লিখিত আয়াতগুলোতেই বর্ণিত হয়নি, কুরআনের আরও কয়েক জায়গায় নীতিগতভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ ط وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط (النساء : ١١٣)

"তোমার ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকতো তাহলে তাদের মধ্যে একটা দল তোমাকে হক পথ থেকে হটিয়ে দেয়ার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তবে আসলে তারা নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। তারা তোমার কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। কেননা আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব নাযিল করেছেন। আর তোমাকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন যা তোমার পূর্বে ছিল না।"-(সূরা আন নিসা : ১১৩)

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ق وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝ وَلَوْلَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ۝ (بنى اسرائيل : ٧٣-٧٤)

"আমি তোমার কাছে যে অহী নাযিল করেছি তা থেকে তোমাকে তারা প্রায় বিচ্যুৎ করার উপক্রম করেছিল যাতে তুমি আমার নামে নতুন কিছু বানাও। তাহলে তারা তোমাকে বন্ধুরূপে বরণ করে নিতো। আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।"-(সূরা বনি ইসরাঈল : ৭৩-৭৪)

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ (الحج : ٥٢)

"তোমার আগে আমি যখনই কোনো নবী বা রসূল পাঠিয়েছি এবং যখন সে কোনো বিষয়ে আকাঙ্খা পোষণ করেছে তখন শয়তান তার আশা-আকাঙ্খায় কুমন্ত্রণা দিয়েছে। তবে আল্লাহর রীতি এই যে, নবীর মনে শয়তান যে কুমন্ত্রণাই দেয় আল্লাহ তা নির্মূল করে দেন। অতপর নিজের নিদর্শনাবলীকে সুদৃঢ় করেন।"–(সূরা আল হজ্ব ঃ ৫২)

এই মৌলিক উপদেশগুলো এবং পূর্ববর্তী ঘটনাগুলোর দৃষ্টান্তসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীর জীবনকে বাঞ্ছিত মানদণ্ডে বহাল রাখার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং নবীর কিছুমাত্র পদসঙ্খলন হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করার কঠোর ব্যবস্থা করেছেন—সে পদস্খলন কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হোক বা জন-জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারে। আর নীতিগতভাবে এ কথা মেনে নেয়া হলে এর থেকে আপনাআপনি এটাও প্রমাণিত হয় যে, নবীর যেসব কথায় আল্লাহ তায়ালা কোনো আপত্তি করেননি তা সবই আল্লাহর ইপ্সিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। ধরে নিতে হবে যে, আল্লাহ কর্তৃক সেগুলো সবই অনুমোদিত।

আপেক্ষিক পর্যালোচনা

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হলো তা থেকে নবুয়াতের তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত চারটি মতের প্রথমটির বক্তব্য অনুসারে নবুয়াতের তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, একজন মানুষ সারাজীবন সকল দিক দিয়ে অন্য মানুষের মতোই একজন মানুষ হয়ে একটা বিশেষ বয়সে উপনীত হলেই সহসা আল্লাহর অহী নাযিল করার জন্যে তাকে নির্বাচিত করা হয়। তার কাছে নাযিল করা কিতাবখানি ছাড়া তার কোনো মতামত, ধ্যান-ধারণা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ ইত্যাদি কোনভাবেই সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক ও বিশিষ্ট ধরনের হয় না। দ্বিতীয় মত অনুসারে নবুয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য থাকে যে, কিতাব নাযিল করার সাথে সাথে তাকে কিতাবের বিধিসমূহের বাস্তব খুঁটিনাটিও জানিয়ে দেয়া হয়। এটুকু বৈশিষ্ট্য অর্জনের পর তিনি সাধারণ নেতাদের মতোই একজন নেতা ও সাধারণ বিচারকদের মতোই একজন বিচারক। তৃতীয় মতটিতে নবুয়াত সম্পর্কে এরূপ ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নবুয়াত হলো নবীর মানবীয় সত্তার ওপর আপাতত একটি সাময়িক অবস্থা বা ভাবান্তর মাত্র এবং এ অবস্থা বা ভাবান্তর সৃষ্টির পরও নবীর মানবীয় সত্তা ও নবী সত্তা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে অবস্থান করে। এ ধারণা অনুসারে নবীর জীবনকে দু'টো ভাগে বিভক্ত করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় এবং শুধুমাত্র জীবনের নবুয়াত সম্পর্কিত অংশকেই অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় বলে বিবেচিত হয়। বলা বাহুল্য, এ তিনটি মতই ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত।

নবী পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম মানবীয় গুণে ভূষিত

পবিত্র কুরআন নবুয়াতের যে পরিচয় তুলে ধরেছে তা থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হচ্ছে এই যে, নবী একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মলাভ করে ও বড় হয়ে এক সময়ে হঠাৎ করে নবী নির্বাচিত হন না বরং তিনি নবুয়াতের জন্যেই জন্মলাভ করে

থাকেন। তিনি যদিও একজন মানুষ এবং একজন মানুষের জন্যে আল্লাহ যেসব স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা নির্ধারিত করেছেন তিনিও তার উর্ধে নন কিন্তু সেই সীমার মধ্যে তিনি পূর্ণতম ও উৎকৃষ্টতম মানুষ। একজন মানুষের মধ্যে যেসব শক্তি-সামর্থ ও ক্ষমতা সর্বাধিক পরিমাণ থাকা সম্ভব তা একজন নবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে ও পূর্ণাঙ্গভাবে থাকে। তাঁর দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিগুলো সর্বাধিক ভারসাম্য সহকারে বিদ্যমান থাকে। তাঁর উপলব্ধি-ক্ষমতা এতো সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে, তিনি ন্যায় ও অন্যায় সংক্রান্ত খোদায়ী জ্ঞানকে কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কেবল নিজের প্রখর প্রজ্ঞা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই লাভ করে থাকেন। প্রজ্ঞার সাহায্যে প্রাপ্ত এই খোদায়ী জ্ঞানের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এ আয়াতে ঃ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (অতপর সৎ ও অসৎ প্রবণতা তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন)। নবীর স্বভাব প্রকৃতি এতো সুস্থ ও সঠিক থাকে যে, তিনি বাইরের কোনো শিক্ষা লাভ ছাড়াই কেবলমাত্র স্বভাবসুলভ অনুভূতি ও প্রেরণার বলে পাপ পথ বর্জন করে তাকওয়া ও ন্যায়-নীতির পথ অবলম্বন করে থাকেন তাঁর বিবেক ও মন এতো নির্মল এবং নিষ্কলুষ থাকে যে, তিনি প্রয়োজনীয় সকল ব্যাপারে আল্লাহর মনোনীত কর্মপন্থা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারেন। কুরআনের এ আয়াতে ঃ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ [তাকে আমি (ভালো ও মন্দ) দুই পথই দেখিয়ে দিয়েছি] সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর সুস্থ স্বভাব-পকৃতি তাঁকে আপনাআপনি আল্লাহর অপছন্দনীয় পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে আল্লাহর অভিপ্রেত পথে চলেন। এটাই হচ্ছে পরিপূর্ণ মানবতা এবং এ গুণের বদৌলতেই তিনি সঠিক অর্থে এবং বাস্তবে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। বস্তুত নবীর এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিণতি ও পরিপক্কতা লাভের পর তাঁকে সর্বসাধারণের পথপ্রদর্শকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আরও জ্ঞানের আলো লাভ করে তিনি হন 'সিরাজাম মুনীর' বা উজ্জ্বল প্রদীপ। মানবতার সংস্কার ও কল্যাণের জন্যে শিক্ষাদীক্ষা ও নির্দেশাবলির মাধ্যম হিসেবে অভিহিত। আর একেই বলা হয় প্রচলিত ভাষায় নবুয়াত ও রিসালাত। সুতরাং এ কথা বলা ঠিক নয় যে, নবুয়াত একটি সাময়িক ব্যাপার—যা বিশেষ এক সময়ে নবীর মানব-প্রতিভার ওপর আরোপিত হয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সেটাই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ মানবতার প্রতিভা যা নবুয়াতের যোগ্যতাসহ বিকাশ লাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে তা সক্রিয়তা লাভ করে নবুয়াতে উন্নিত হয়। নবুয়াতের মর্যাদা এমন ব্যক্তির মতো নয় যাকে রাজ প্রতিনিধি (Viceroy) নিযুক্ত করা হয়। তার স্থলে অন্য কাউকে পাওয়া গেলে তাকেও অনুরূপ রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হতো। আসলে নবুয়াত একটা জন্মগত জিনিস। নবীর ব্যক্তিসত্তাই হলো তার নবী-সত্তা। পার্থক্য শুধু এই যে, অহী নাযিলের আগে তাঁর নবী-সত্তা নিষ্ক্রিয় ও সুপ্ত থাকে, অহী নাযিলের পর তা হয়ে ওঠে সক্রিয়। যেমন কোনো একটি মিষ্টি ফল। মিষ্টি ফল হিসেবেই তার জন্ম, কিন্তু তার মিষ্টতা প্রকাশ পায় একটা বিশেষ সময়ে উপনীত হওয়ার পর।

প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ

এবারে আল্লাহ তায়ালা নবুয়াত ও নবী-সত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় যেসব উক্তি করেছেন তার অর্থ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি এ আয়াতগুলোকে বিশেষ ধারাবাহিকতার সাথে উল্লেখ করছি ঃ

(١) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ ص فَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ج (ال عمران : ١٧٩)

"আল্লাহর এ নিয়ম এই যে, তিনি তোমাদেরকে সরাসরি অদৃশ্য সংক্রান্ত জ্ঞান দান করবেন। বরং এ কাজের জন্যে তিনি তাঁর রসূলদের মধ্য থেকে যাকে খুশী নির্বাচন করবেন কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান আন।"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৯)

(٢) وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط (النساء : ٦٤)

"আমি যে রসূলই পাঠিয়েছি তা এ জন্যে যে, আল্লাহর নির্দেশেই তার আনুগত্য করতে হবে।"* –(সূরা আন নিসা ঃ ৬৪)

(٣) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج (النساء : ٨٠)

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল।"

(٤) وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝ (النجم : ١-٤)

"অস্তমিত নক্ষত্রের শপথ। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্তও নন, বিপথগামীও নন। তিনি মনগড়া কিছু বলেন না। তিনি যাই বলেন তা তাঁর ওপরে অবতীর্ণ অহী ছাড়া আর কিছু নয়।"–(সূরা আন নাজম ঃ ১-৪)

(٥) اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَيَّ ط (الانعام : ٥٠)

"আমার কাছে যে অহী আসে আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।"
–(সূরা আল আনয়াম ঃ ৫০)

(٦) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -(الاحزاب : ٢١)

"আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"
–(সূরা আল আহযাব ঃ ২১)

(٧) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -(ال عمران : ٣١)

"(হে মুহাম্মদ!) তুমি বলে দাও ঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার কথা মত চল তাহলে আল্লাহ মাদের ভালবাসবেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

(٨) اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ ر سُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– ..... وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ....-(النور : ٥١-٥٤)

* অর্থাৎ রসূল ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্য লাভের অধিকারী নন, বরং আল্লাহর অনুমতি বা নির্দেশক্রমেই তাঁর আনুগত্য করতে হয়।–(গ্রন্থকার)

"ঈমানদারদের কর্তব্য এই যে, তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয়—যাতে করে তিনি (রসূল) তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন, তখন তারা শুধু বলবে, 'শুনলাম এবং মেনে নিলাম'। এ রকম লোকেরাই কৃতকার্য। ..... এবং তোমরা রসূলের আনুগত্য করলেই সুপথ পাবে।"-(সূরা আন নূর ঃ ৫১-৫৪)

(৯) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ০ (النساء : ٦٥)

"(হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! না, তারা কিছুতেই মু'মিন নয় যতক্ষণ না তারা তাদের দ্বন্দ্ব-কলহে তোমাকে সালিস মেনে নেবে। অতপর তোমার বিচার-ফায়সালায় কোনো রকম সংকোচ বোধ না করে নত মস্তকে পুরোপুরি মেনে নেবে।" -(সূরা আন নিসা ঃ ৬৫)

(১০) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ০ (الاحزاب : ٣٦)

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো একটা বিষয়ে একবার ফায়সালা করে দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ অথবা নারীর এ অধিকার থাকবে না যে, নিজেদের ব্যাপারে স্বয়ং কোনো ফায়সালা করার এখতিয়ার তাদের থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল সে প্রকাশ্য গোমরাহির মধ্যে পতিত হল।"-(সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

এ আয়াত কয়টির পর্যালোচনা করলেই বিষয়টির সকল মর্ম উদঘাটিত হবে।

নবী ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য

প্রথম আয়াতে নবী ও সাধারণ মানষের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং কি কারণে তার ওপর ঈমান আনতে হয় তাও বলা হয়েছে। আল্লাহর রীতি এই যে, গায়েব বা অদৃশ্য সংক্রান্ত* জ্ঞান প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে দান করেন না বরং কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দান করেন। এ জন্যে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর ঈমান আনা সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

নবীর আনুগত্য শর্তহীন ও সীমাহীন

দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য এই যে, রসূলের ওপর ঈমান আনার অর্থ তাকে শুধু রসূল বলে স্বীকার করে নেয়া নয় বরং সেই সাথে রসূলের আনুগত্য তথা তার নির্দেশাবলী মেনে চলাও অপরিহার্য। শুধু এ আয়াতে নয়, বরং কুরআনের যেখানে যেখানে এ আনুগত্যের

* যে কয়টি সত্য ব্যাপার মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতার বাইরে অবস্থিত অথচ পার্থিব জগতে মানুষের জন্যে কোনো বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা রচনায় সেগুলো জানা অপরিহার্য। কুরআনের ভাষায় তাকেই গায়েব বা অদৃশ্য বলা হয়েছে। যেমন মানুষের প্রকৃত পরিচয় কি ? সে স্বাধীন, না পরাধীন ? পরাধীন হলে কার অধীন ? সেই মনিবের সাথে তার সম্পর্ক কি ধরনের ? মনিবের কাছে তাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে কি ? করতে হলে কোথায় ? কিভাবে ? কোন্ মানদণ্ডে ? কি কি ব্যাপারে ? জবাবদিহি করে সফল হলেই বা কি প্রতিফল, ব্যর্থ হলেই বা কি পরিণতি ? এসব প্রশ্নের জবাব—তাও আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে নয়—নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে পাওয়ার আগে মানুষের জীবনের জন্যে কোনো বিধান রচিত হতে পারে না। আয়াতে আল্লাহ যে 'অদৃশ্য জ্ঞান'-এর কথা উল্লেখ করেছেন, সে অদৃশ্য জ্ঞান এটাই।-(গ্রন্থকার)

নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে নির্দেশটি শর্তহীন। কোনো একটি জায়গায়ও এমন কথা বলা হয়নি যে, রসূলের আনুগত্য অমুক অমুক ক্ষেত্রে করতে হবে এবং ঐগুলো ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রে আনুগত্যের দরকার নেই। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত যে, কুরআনের মতে রসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত এমন একজন শাসনকর্তা যার কর্তৃত্ব নিরংকুশ এবং যার নির্দেশ সর্বক্ষেত্রে সকল অবস্থায় পরিপূর্ণভাবে মান্য করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। অবশ্য রসূল নিজে যদি তাঁর শাসন ক্ষমতাকে খোদায়ী বিধানের অধীন কোনো বিশেষ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন তবে সেটা তাঁর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে তিনি তা করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সীমার বাইরে মানুষকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দিতে পারেন, স্বয়ং মু'মিনদেরকে রসূলের কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণ করার কোনো ক্ষমতা ও অধিকার দেয়া হয়নি। তাঁরা চূড়ান্তভাবে ও সর্বোতভাবে তাঁর কর্তৃত্বাধীন এবং তাঁর নির্দেশের অনুগত। রসূল যদি তাদেরকে কৃষি, বাণিজ্য ও কামারগিরি ইত্যাদিরও কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ দিতেন তাহলে নির্দ্বিধায় ও বিনা সংকোচে তাদের সে নির্দেশ মেনে নিতে হতো।

নবীর আনুগত্য সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মতো নয়

এ রকম শর্তহীন ও সীমাহীন আনুগত্যের নির্দেশ যখন দেয়া হয়েছে তখন সেটা যে একজন সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মতো নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল। কেননা অজ্ঞ কাফেররা তাঁকে নিছক একজন সাধারণ মানুষ বলেই ভাবত। তারা মানুষকে বলত ঃ هَلْ هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ "সে তোমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ নয় কি ?"

مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

"সে তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। উপরন্তু সে চায় তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে।"

لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ-

"তোমাদেরই মতো একজন মানুষের যদি আনুগত্য কর তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

বস্তুত নবীর আনুগত্য আসলে আল্লাহরই আনুগত্য। কেননা নবী যা কিছুই বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন এবং যা কিছুই করেন আল্লাহর নির্দেশের অধীন করেন। তিনি নিজের খেয়াল-খুশী মতো কিছু বলেন না, কেবলমাত্র আল্লাহর অহীর অনুসরণ করেন। কাজেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত যে তাঁর আনুগত্যে কোন রকম পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হওয়ার ভয় নেই।

নবীর পথনির্দেশের জন্যে অহী গায়ের-মতলু*

এ কথাই তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে যে জিনিসকে অহী বলা হয়েছে কেউ কেউ বলেন যে, তা আল্লাহর কিতাব এবং কিতাব ছাড়া অন্য কোনো অহী নবীর ওপর নাযিল হতো না কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পবিত্র কুরআন থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, নবীদের ওপর শুধু কিতাবই নাযিল করা হতো না বরং

* এমন অহী যা কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই এবং পঠনযোগ্য নয়।-(সম্পাদক)

তাদের হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা হর-হাশেমা তাদের ওপর অহী নাযিল করতেন। এ অহীর আলোকে তাঁরা নির্ভুল পথে চলতেন, দৈনন্দিন সমস্যাবলীতে সঠিক রায় দিতেন এবং ব্যবস্থাবলী কার্যকর করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হযরত নূহ (আ) তুফান প্রতিরক্ষার জন্যে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ও তাঁর অহী অনুযায়ী নৌকা বানিয়েছিলেন।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا-

"(হে নূহ!) তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার অহী মোতাবেক নৌকা বানাও।"

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করানো হয় এবং মৃতকে জীবিত করার প্রক্রিয়া দেখানো হয়। হযরত ইউসুফকে স্বপ্নের মর্ম শিক্ষা দেয়া হয়। ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ "যেসব জ্ঞান আল্লাহ আমাকে দান করেছেন, এ তার মধ্যে একটা।" হযরত মূসা (আ)-এর সাথে তূর পর্বতে কথা বলা হয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার হাতে ওটা কি ? তিনি বলেন, এ আমার লাঠি। এ দিয়ে আমি ছাগল চরাই। নির্দেশ দেয়া হলো লাঠি ফেলে দাও। লাঠি যখন সাপের আকার ধারণ করল তখন হযরত মূসা ভয় পেয়ে ছুটে পালাবার উপক্রম করলেন। তখন অহী এল, يَامُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ "হে মূসা! ভয় করো না, সামনে এগিয়ে যাও। তুমি নিরাপদ।" আবার হুকুম জারি হলো, اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى "ফেরাউনের কাছে যাও। সে বিদ্রোহী হয়েছে।" তিনি সাহায্যের জন্যে হযরত হারুনকে চাইলেন। তার আবেদন কবুল করা হলো। দু'ভাই ফেরাউনের কাছে যাবার সময় ভয় পাচ্ছেন। আল্লাহ অভয় দিয়ে বললেন, لَاتَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى "তোমরা ভয় কর না। আমি তোমাদের সাথে আছি। সবকিছু দেখছি এবং শুনছি।" তারপর ফেরাউনের দরবারে জাদুকরদের বানান সাপ দেখে হযরত মূসা ভয় পেয়ে যান। তখন অহী আসে, لَاتَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى "ভয় কর না, তুমিই জয়ী হবে।" ফেরাউনকে সুপথগামী করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মূসাকে হুকুম দেয়া হলো, اَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ "আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়। তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।" নদীর কিনারে পৌছুলে খোদায়ী ফরমান এল, اِضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ "নদীর ওপর লাঠি দিয়ে আঘাত কর।"

এখন প্রশ্ন হলো, এতসব অহীর মধ্যে একটাও কি সর্বসাধারণের হেদায়াতের জন্যে কিতাবের আকারে নাযিল করা হয়েছিল কি ? এ উদাহরণগুলো থেকে কারও এ কথা বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, নবীদের প্রতি আল্লাহ সবসময় লক্ষ্য রাখেন এবং যখনই মানব সুলভ চিন্তা ও মতামতে তাঁদের ভুল করার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই তিনি অহী দ্বারা তাঁদেরকে সঠিক পথে চালিত করেন। সকল মানুষের হেদায়াতের জন্যে যে অহী নবীদের মাধ্যমে পাঠানো হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি হেদায়াতনামা ও কার্যোপযোগী সংবিধান হিসেবে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় তার থেকে এ আলোচ্য অহী আলাদা ধরনের।

নবীর প্রতি অবতীর্ণ গায়ের মতলু অহীর কতিপয় দৃষ্টান্ত

এ ধরনেরই 'অহী গায়ের মতলু' এবং গোপন অহী নবী পাক (সা)-এর ওপর নাযিল হত। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নবী প্রথমে বায়তুল

মাকদেসকে কেবলা বানালেন। আল্লাহর কিতাবে সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন সেই কেবলাকে রহিত করে বায়তুল হারামকে (কা'বা) কেবলা করার নির্দেশ দেয়া হল, তখন বলা হল ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ط (البقرة : ١٤٣)

"আগে তোমার যে কেবলা ছিল তাকে আমি শুধু এ জন্যে নির্ধারিত করেছিলাম যেন রসূলকে মান্যকারী ও অমান্যকারীর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।"
–(সূরা আল বাকারাহ ঃ ১৪৩)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, প্রথমে বায়তুল মাকদেসকে যে কেবলা বানানো হয়েছিল তা ছিল অহীর ভিত্তিতেই।

ওহোদের যুদ্ধের সময় হযরত রসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্যে ফেরেশতা পাঠাবেন। পরে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে হযরতের সে উক্তিকে এভাবে উল্লেখ করেন ঃ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ "আল্লাহ ঐ প্রতিশ্রুতিকে তোমাদের জন্যে সুসংবাদে পরিণত করেছিলেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১২৬)

সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছিল তা সন্দেহাতীত।

ওহোদ যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে পড়তে আদেশ করেন। অথচ এ আদেশের উল্লেখ কুরআনে কোথাও নেই। কিন্তু পরে আল্লাহ নবীর এ আদেশ সত্যায়িত করে বলেন যে, এ আদেশ ছিল তাঁর পক্ষ থেকেই।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط (ال عمران : ١٧٢)

"যুদ্ধে আঘাত খাওয়ার পরও যারা পুনরায় আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে।"

বদর যুদ্ধের জন্যে হযরতের মদীনা থেকে বের হওয়ার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে ঃ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ "যেভাবে আল্লাহ তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করেছেন।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৫)

ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো নির্দেশ কুরআনে বর্ণিত হয়নি কিন্তু পরে আল্লাহ এর সত্যতা স্বীকার করে বলেন যে, তাঁর নির্দেশেই তিনি বেরিয়েছিলেন, স্বেচ্ছায় নয়।

পরে যুদ্ধ চলাকালে আল্লাহ তাঁর নবীকে স্বপ্ন দেখান ঃ

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً ط (الانفال : ٤٣)

"আল্লাহ যখন তাদেরকে স্বল্পসংখ্যক করে তোমাকে স্বপ্নে দেখান।"
–(সূরা আল আনফাল ঃ ৪৩)

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করলে মোনাফেকরা নাক সিটকাতে থাকে। তখন আল্লাহ জানিয়ে দেন যে, এ বন্টন স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ٭

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে যা দিয়েছিলেন তাতেই যদি তারা রাজী হয়ে যেত (তাহলে ভাল হত)।"–(সূরা আত তওবাহ ঃ ৫৯)

হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় সকল সাহাবীই সন্ধির বিরোধী ছিলেন। সন্ধির শর্তাবলী সবার কাছেই অগ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) তা মেনে নেন। পরে আল্লাহ তা সত্যায়িত করে বলেন যে, সে সন্ধি আল্লাহর পক্ষ থেকেই ছিল।

وَاِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ (الفتح : ١)

"আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"–(সূরা আল ফাতহ ঃ ১)

উল্লিখিত আয়াতগুলোর সারমর্ম

কুরআনের আয়াতগুলোর আলোকে এ ধরনের আরও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখানে সকল আয়াত উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এ কথা প্রমাণ করা যে, নবীদের সাথে আল্লাহর কেবল সাময়িক ও স্বল্পকালীন সম্পর্ক নয় যে যখনই তিনি মানুষের কাছে কোনো বাণী পৌছাতে চাইবেন, শুধু তখনই নবীর সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং তার পরেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনি যাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন তার প্রতি সবসময় বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখেন এবং সবসময়ই তাঁকে অহী দ্বারা পথ প্রদর্শন ও নির্দেশ প্রদান অব্যাহত রাখেন। এভাবে নবী যাতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নির্ভুলভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং তাঁর দ্বারা আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কাজ বা কথা সংঘটিত না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করেন। সূরা নাজমের প্রথম আয়াত ক'টিতে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে। এ আলোচনার প্রথমাংশেই আমি বলেছি এবং পবিত্র কুরআনও এ কথা সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে, নবীগণকে আল্লাহর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রাখা হয়, তাদেরকে ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করা হয়, মানবসুলভ দুর্বলতাবশত তাদের কোনো পদস্খলন হলে গোপন অহীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বুঝতে তাঁদের ভুল হলে অথবা তাঁরা নিজস্ব বিচার-বিবেচনা দ্বারা আল্লাহর সামান্যতম অপছন্দনীয় কোনো পদক্ষেপ করে ফেললে আল্লাহ তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করে দেন এবং ভুল ধরে দিয়ে সোজা পথে নিয়ে আসেন। পবিত্র কুরআনে হযরত রসূলে করীম (সা) ও অন্যান্য নবীদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং সে সম্পর্কে আল্লাহর সতর্কবাণীসমূহের যে উল্লেখ রয়েছে তার উদ্দেশ্য কখনও এ নয় যে, নবীদের ওপর থেকে মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলুক। তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, লোকেরা ভাবুক (নাউজুবিল্লাহ) নবীরা যখন আমাদেরই মতো ভুল করেন তখন নিশ্চিতভাবে তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য করা কি করে সম্ভব ? বস্তুত আল্লাহ নবীদেরকে নিজেদের খেয়াল-খুশী মত চলার কিংবা নিজ মতামত ও বিচার-বুদ্ধি অনুসারে চলার অবাধ স্বাধীনতা যে দেননি সে কথা জানিয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। যেহেতু তাঁরা সাধারণ মানুষকে সুপথে চালিত করার জন্যেই নিয়োজিত, তাই প্রতিনিয়ত আল্লাহর হুকুম কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে এবং কোনো ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও আল্লাহর অপছন্দনীয় পথ অনুসরণ না করতে তাঁদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে কুরআনে সাধারণ মানুষের জীবনে আদৌ গুরুত্ববহ নয় এমন সব নগণ্য বিষয়েও নবী (সা)-কে ভর্ৎসনা

করা হয়েছে। যেমন একজন মানুষের মধু খাওয়া বা না খাওয়া, একজন অন্ধের দিকে মনোযোগ না দেয়া এবং সে তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় হস্তক্ষেপ করল বলে বিরক্ত হওয়া অথবা কারও জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এগুলো মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় কিন্তু আল্লাহ নবীকে এমন সব ক্ষুদ্র ব্যাপারেও নিজে বা অন্যের মর্জি মতো চলতে দেননি। অনুরূপভাবে যুদ্ধে যাওয়া থেকে কাউকে অব্যাহতি দেয়া এবং কিছু যুদ্ধবন্দীকে পণ দিয়ে ছেড়ে দেয়া একজন নেতার পক্ষে মামুলী ব্যাপার কিন্তু নবীর ক্ষেত্রে এটাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফলে প্রকাশ্য অহীযোগে তাঁকে সাবধান করে দেয়া হল। কেন ? কারণ আল্লাহর নবী সাধারণ নেতাদের মতো নন যে, নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী যা খুশী তাই করতে পারবেন। নবুয়াতের মহান দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার কারণে নবীর নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ও অভ্রান্তভাবে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক হতে হবে। তিনি নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আল্লাহর গোপন অহীর ইঙ্গিত সার্থকভাবে বুঝতে যদি না পারেন এবং আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে যদি এক চুল পরিমাণও অগ্রসর হন, তাহলে প্রকাশ্য অহী দ্বারা তাঁর সংশোধন করা আল্লাহ জরুরী মনে করেন।

নবীর সত্যনিষ্ঠা পূর্ণ নির্ভরযোগ্য

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর এ গুণ-বৈশিষ্ট্য এ জন্যে বর্ণনা করেছেন যেন নবীর সত্যনিষ্ঠার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা জন্মে এবং আমরা অবিচল বিশ্বাস রাখতে পারি যে, নবীর কথা ও কাজ গোমরাহী, বক্রতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং মানব সুলভ চিন্তা-ধারণার ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি আল্লাহর বর্ণিত সিরাতুল মোস্তাকিমের ওপরে অটল। তাঁর পূত চরিত্র ইসলামী নৈতিকতার এমন এক নমুনা যার মধ্যে দোষ-ত্রুটির লেশমাত্র নেই। আল্লাহ তায়ালা বিশেষ করে এ পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত নমুনা এ জন্যে বানিয়েছেন যে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেউ তাঁর প্রিয় বান্দা হতে চাইলে যেন নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করতে পারে। ওপরে বর্ণিত ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়তদ্বয়ে এ উদ্দেশ্যই বর্ণনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের (সা) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। সপ্তম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণকে আল্লাহর ভালবাসার পাত্র হওয়ার একমাত্র উপায় বলা হয়েছে।

নবীর গোটা জীবনই "উত্তম আদর্শ"

এখানেও আমরা দেখতে পাই নবী-জীবনকে যে উত্তম আদর্শ বলা হয়েছে, তাতে কোনো শর্ত বা সীমার উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে নবীর সমগ্র জীবন, সর্বতোভাবে সকল মানুষের জন্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ। এ ক্ষেত্রে কোনো দিক দিয়েই কোনোরূপ শর্ত বা সীমারেখা আরোপের কোনোই অবকাশ নেই। নবী-সত্তাকে সামগ্রিকভাবে উত্তম আদর্শ বলা হয়েছে এবং তাঁর সার্বিক আনুগত্যই অপরিহার্য। এর মানে দাঁড়ায় এই যে, তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ যত বেশী করা হবে এবং নিজ জীবনে তাঁর গুণগত সাদৃশ্য যত বেশী সৃষ্টি করা যাবে ততই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব হবে এবং ততই আল্লাহর প্রিয় হওয়া যাবে।

ব্যতিক্রমের পরিধি

কিন্তু হযরতের জীবনকে সামগ্রিকভাবে অনুকরণীয় আদর্শ বা নমুনা ঘোষণা এবং তার সার্বিক আনুগত্যের নির্দেশ দানের অর্থ এই নয় যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি যা কিছুই

করেছেন এবং যেভাবে করেছেন, সকল মানুষকে হুবহু সে কাজ ঠিক সেভাবেই করতে হবে এবং তাঁর পবিত্র জীবনকে এমনভাবে অনুসরণ করতে হবে যে, কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল তা ধরাই যাবে না। কুরআনের উদ্দেশ্য তা নয় এবং হতেও পারে না। আসলে এ একটা সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক নির্দেশ। এ নির্দেশ কিভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে তা আমরা স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা ও সাহাবীদের জীবন পদ্ধতি থেকে জানতে পারি। এখানে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলতে চাই যে, যেসব কাজ ফরয, ওয়াজিব ও ইসলামের মূল স্তম্ভের মর্যাদাসম্পন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর হুবহু ও অবিকল আনুগত্য ও অনুকরণ করতে হবে, এক চুল পরিমাণও এদিক-ওদিক করা চলবে না। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, পবিত্রতা অর্জন ইত্যাদির মাসলা-মাসায়েল। এগুলোতে তিনি যা-ই নির্দেশ দিয়েছেন এবং যেভাবে নিজে করে দেখিয়েছেন তার হুবহু অনুকরণ অপরিহার্য। তবে সেসব বিষয় ইসলামী জীবনের সাধারণ নিয়মাবলী সংক্রান্ত যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যধারা ও তার খুঁটিনাটি বিধি। এসবের মধ্যে কোনো কোনোটা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা) শুধু নৈতিকতা ও শালীনতা বজায় রাখা এবং যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছেন। আর কোনো কোনোটা এরূপ যে, তার আলাকে আমরা কোন্ কর্মপদ্ধতি ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর কোন্‌টা সামঞ্জস্যশীল নয় তা নির্ণয় করতে পারি। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে রসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুকরণ করতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর হাদীস ও আচরণ বিধি অধ্যয়ন করে সে ব্যক্তি সহজেই জেনে নিতে পারে যে, কোন্ কোন্ ব্যাপারে রসূলের (সা) অনুকরণ হুবুহু করতে হবে আর কোন্ কোন্ ব্যাপারে তাঁর হাদীস ও আচরনবিধি থেকে কেবলমাত্র নৈতিকতা, যৌক্তিকতা এবং হিত ও কল্যাণের সাধারণ মূলনীতিসমূহ রচনা করতে হবে। কিন্তু যারা ঝগড়াটে স্বভাবের লোক, তারা এ ক্ষেত্রে নানারকম ওজুহাত খাড়া করে থাকে। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) তো আরবীতে কথা বলতেন, আমাদেরও আরবীতে কথা বলতে হবে না কি? তিনি আরব মহিলাদের বিয়ে করেছিলেন, আমাদেরও আরব মহিলাদের বিয়ে করতে হবে না কি? তিনি বিশেষ এক ধরনের পোশাক পরতেন, আমরাও কি সেই রকম পোশাক পরব? তিনি বিশেষ ধরনের খাবার খেতেন। আমরাও কি সেই খাবার খাব? তিনি বিশেষ এক পদ্ধতিতে লোকজনের সাথে মেলামেশা, উঠাবসা ও আচার-ব্যবহার করতেন আমাদেরও কি হুবহু সেই পদ্ধতিতে এসব করতে হবে? পরিতাপের বিষয়, তারা একটু ভেবেও দেখে না যে, আসল জিনিস ভাষা নয় বরং কথা বলার সেই নৈতিক বিধি যা তিনি সবসময় পালন করে চলতেন। আরব মহিলা বিয়ে করতে হবে, না অনারব মহিলা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো যে মহিলাকেই বিয়ে করা হোক তার সাথে আমাদের আচরণটা কি রকম হবে, তার অধিকারগুলো আমরা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করবো এবং আমাদের বৈধ আইনগত কর্তৃত্ব তার ওপর কিভাবে প্রয়োগ করব। এ ব্যাপারে নবী (সা) তাঁর মহিষীদের সাথে আচরণের যে আদর্শ রেখে গেছেন তার চেয়ে উত্তম আদর্শ একজন মুসলমানের পারিবারিক জীবনের জন্যে আর কিছু হতে পারে না। হযরত (সা) যে ধরনের পোশাক পরতেন, হুবহু সেই ধরনের পোশাক পরাই শরীয়াতের বিধি, এ কথা কে বলেছে? আর যে খাদ্য তিনি খেতেন হুবহু সেই খাদ্যই প্রত্যেক মুসলমানের খাওয়া উচিত, এটাই বা কে আদেশ করল? এসব ক্ষেত্রে অনুকরণের যোগ্য জিনিস হল তাকওয়া, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা যা তিনি খাওয়া-পরার

ক্ষেত্রে মেনে চলতেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধবর্তী যে ভারসম আচরণের সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কুরআন আমাদের দিয়েছে, তাকে কিভাবে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে যাতে করে একদিকে অপব্যয় ও অপচয় না হয়, অপরদিকে হালাল জিনিস অনর্থক এড়িয়ে চলাও না হয়। হযরত (সা)-এর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের অন্য সকল ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তাঁর সে মহান পবিত্র জীবনের সমগ্রটাই একজন সত্যিকার খোদাভীরু মুসলমানের জীবনের জন্যে একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ। হযরত আয়েশা (রা) যথার্থই বলেছিলেন যে, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ তোমরা যদি জানতে চাও যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ভাবধারা অনুযায়ী একজন ঈমানদার মানুষের দুনিয়ায় কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনধারা অনুশীলন করো। দেখবে, যে ইসলাম কুরআনে সংক্ষিপ্ত, আল্লাহর রসূলের (সা) জীবনে তা বিস্তৃত।

রসূল সার্বক্ষণিক রসূল

আনন্দের বিষয় এই যে, তৃতীয় দলটি প্রথম ও দ্বিতীয় দলের সমমনা নয়। তথাপি কোন কোন হাদীসের দ্বারা তাদের মনে এ সন্দেহ জন্মেছে যে, "রসূলুল্লাহ (সা) হয়তো সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে রসূল ছিলেন না এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ রসূল হিসেবে বলা ও করা হত না।" যেসব রেওয়ায়াত থেকে এই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো আসলে অন্য বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। বস্তুত নবী (সা) প্রতি মুহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর রসূলই ছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁকে নবী করে পাঠান হয়েছিল সেদিকে সবসময় লক্ষ্য রাখাই ছিল তাঁর কাজ। মানুষের চিন্তা ও মতামতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেয় এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে অচল অকর্মণ্য করে দেয়ার জন্যে তিনি নবী হননি। তিনি দুনিয়ার মানুষকে কৃষি, শিল্প ও কারিগরি শেখাতে আসেননি এবং লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত কাজ-কারবার পরিচালনা করার জন্যেও তাঁকে পাঠান হয়নি।

রিসালাতের আসল উদ্দেশ্যের প্রতি নবীর দৃষ্টি

নবী পাকের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল মাত্র একটাই এবং তা ছিল ইসলামকে আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা এবং বাস্তব কাজের দিক দিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রে ও সমাজ ব্যবস্থা কার্যকর করা। এ মূল উদ্দেশ্যটি ছাড়া আর কোনো জিনিসের দিকে তিনি কখনও মনোযোগ দেননি। আর কদাচিৎ কখনও কোনো সময়ে কোনো কিছু বললেও সাথে সাথে তিনি বলে দিয়েছেন, তোমরা তোমাদের মতামত ও কাজকর্মে স্বাধীন। তিনি বলেছেন, اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ "তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়ে তোমরাই ভাল জান। সাহাবীগণ অবশ্য নবীর প্রতিটি কথাই রসূলের কথা মনে করে সর্বান্তকরণে তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত থাকতেন এবং সর্ববিষয়ে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা জরুরী মনে করতেন। এ জন্যেই নবী যখনই কোনো দুনিয়াবী বিষয়ে কিছু বলতেন, তখন সাহাবীগণ ভাবতেন, এও হয়তো রসূল হিসেবে দেয়া নির্দেশ। কিন্তু কখনো এমনটি হয়নি যে, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত নয়, এমন কোনো বিষয়ের নির্দেশ তিনি সাহাবীগণকে দিয়েছেন এবং তা মানতে বাধ্য করেছেন। তেইশ বছরের মধ্যে একটি মুহূর্তের জন্যেও নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসীন না হওয়া, কোন্ বিষয়টি তাঁর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন্‌টি নয় প্রতি মুহূর্তে সেই সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকা

এবং নিজের অনুসারীদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কোনো অবান্তর বিষয়ে নির্দেশ না দেয়া—এ কথারই প্রমাণ যে, নবীসুলভ পদমর্যাদা কখনো তাঁর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না। তবে দুনিয়াবী ব্যাপারে হযরত যা কিছু বলেছেন তার উৎস অহী ছিল না—এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। অবশ্য এ ধরনের কথাবার্তা তাঁর নির্দেশ ছিল না, নির্দেশ দেয়ার ভঙ্গীতেও তিনি বলেননি, কেউ তাকে নির্দেশ বলে গ্রহণও করেনি। তথাপি যে কথাই তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বেরিয়েছে, তা আগাগোড়াই নির্ভুল ও সত্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ হযরতের চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত যেসব হাদীস পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত কথায় পরিপূর্ণ। সেসব হাদীস দেখলে ভাবতেও অবাক লাগে যে, আরবের একজন নিরক্ষর মানুষ, যিনি কখনো চিকিৎসক ছিলেন না, চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে যিনি কোনো গবেষণাও করেননি, তিনি কিভাবে এ বিজ্ঞানের এমন সব তথ্য জানালেন যা আজ শত শত বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার পর সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। হযরতের জ্ঞানগর্ব কথাবার্তায় এ ধরনের শত শত উদাহরণ পাওয়া যায়। এগুলো যদিও রিসালাতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার নয়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর রসূলদের জন্মগতভাবে এমন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী করেন যা শুধু রিসালাতের দায়িত্ব পালনেই কাজে লাগে তা নয়, বরং সব ব্যাপারেই বিশিষ্টতার নিদর্শন রাখে। জানা কথা যে, কামারি বর্ম নির্মাণ শিল্পের সাথে রিসালাতের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। তথাপি হযরত দাউদ (আ) এ কাজেও অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন যে, এ শিল্পকর্ম তাঁকে আমিই শিখিয়েছি। وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ "তাকে আমি বর্ম নির্মাণ শিল্প শিখিয়েছি যাতে তোমরা তার সাহায্যে পরস্পরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাও।"–(সূরা আম্বিয়া ঃ ৮০)। পাখীর ভাষা শেখার সাথে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ) এ কাজে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি নিজেই বলেন, عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ "আমাকে পাখীর ভাষা শেখানো হয়েছে।"–(সূরা আন নামল ঃ ১৬) কাঠমিস্ত্রীগিরি ও নৌকা তৈরি করার সাথে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের কি সম্পর্ক ? কিন্তু আল্লাহ হযরত নূহ (আ)-কে এ কথা বলেননি, একটা মজবুত নৌকা বানিয়ে নাও। বরং বলেছেন وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا "আমার তদারকীতে আমার অহীর নির্দেশ অনুসারে নৌকা বানাও।"–(সূরা হূদ ঃ ৩৭)

নবী জীবনের দুই অংশ

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, নবীদের কাছে কেবল রিসালাতের দায়িত্ব পালনের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখে এমন অহী আসতো তা ঠিক নয়। বস্তুত তাঁদের গোটা জীবনই আল্লাহর নির্দেশের অধীন থাকতো। পার্থক্য শুধু এই যে, তাঁদের জীবনের একটা অংশ এরূপ যে, তার অবিকল অনুকরণ করা মুসলমান হওয়ার জন্যে অপরিহার্য শর্ত। আর একটি অংশ এরূপ যে, তার শতকরা একশো ভাগ অনুকরণ সকল মুসলমানের ওপর ফরয তথা অপরিহার্য নয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বান্দাহ হতে চায়, তার জন্যে নবীর সুন্নাতের অনুকরণ পুরোপুরিভাবে করা ছাড়া গত্যান্তর নেই। এ ব্যাপারে এক চুল পরিমাণ ত্রুটি থাকলেও নৈকট্য লাভে ও প্রিয় বান্দাহ হতে ঠিক সেই অনুপাতে কমতি থেকে যাবে। কেননা আল্লাহর প্রিয় হওয়ার জন্যে নবীর অনুকরণ ছাড়া আর কোনো পথ

আদৌ নেই। فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ "আমার পদানুসরণ করো, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।"

নবীর নেতৃত্ব ও অন্য নের্তৃত্বে পার্থক্য

নবীর নেতৃত্ব ও অন্যান্য নেতার নেতৃত্বে কি পার্থক্য এবং নবীর বিচার-ফায়সালা ও অন্যান্য বিচারকের বিচার-ফায়সালায় কি ব্যবধান, উপরোক্ত আলোচনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তথাপি আমি শেষের দিকে তিনটি আয়াত উদ্ধৃত করেছি—যা বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এ আয়াত ক'টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রসূল (সা)-এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেয়া এবং তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ মেনে নেয়া মু'মিন হওয়ার জন্যে অপরিহার্য শর্ত। যে তা করতে অস্বীকার করবে সে মু'মিনই থাকবে না। এ মর্যাদা কি আর কোনো নেতা বা বিচারকের আছে ? যদি না থেকে থাকে তবে এ কথা বলা কত বড় মারাত্মক ভুল যে, "কুরআনে 'আল্লাহ' ও 'রসূল' শব্দ দু'টি যেখানে যেখানে একত্রে উল্লিখিত হয়েছে সেখানে তার অর্থ নেতৃত্ব।" মাওলানা আসলাম জয়রাজপুরীর এ উক্তিটিই আমার কাছে আপত্তিকর। এ বক্তব্যকে আমি সর্বতোভাবে কুরআনের পরিপন্থী বলে মনে করি। 'উলিল আমর' এর আনুগত্য করার বিষয়টা আমিও স্বীকার করি। রসূলুল্লাহ (সা)-এর পর 'উলিল আমরের আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। রসূলুল্লাহ (সা) জীবদ্দশায় ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব কাজ সমাধা করতেন, এই 'উলিল আমর' সেসব কাজ সমাধা করবেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যাপারে 'উলিল আমরের সিদ্ধান্ত হবে অকাট্য ও চূড়ান্ত। এমনকি কেউ যদি নিজ জ্ঞানে উলিল আমরের সিদ্ধান্তকে আল্লাহ ও রসূলের পরিপন্থী বলে বুঝতে পারে, তাহলেও নিজের মতের ওপর অবিচল থেকেও তার সিদ্ধান্তকে একটা সীমা পর্যন্ত মেনে চলতে হবে। তাই বলে কুরআনে 'আল্লাহ ও রসূল' বলে যা বুঝানো হয়েছে, সেটাই নেতৃত্ব নয় এবং নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জারী করা হুকুম অবিকল আল্লাহ ও রসূলের হুকুম নয়। তাই যদি হয় তবে নেতা ও কর্তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে এবং ক্ষমতাসীন ও দায়িত্বশীলগণ কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কার্যকলাপ শুরু করে দিলে মুসলমানরা নিরুপায় ও অসহায় হয়ে পড়বে। অনিবার্য ধ্বংসের পথে ধাবমান জেনেও তাদের পদানুসরণ ও আনুগত্য করা ছাড়া তাদের আর উপায়ান্তর থাকবে না। এ রকম অবস্থায় কেউ যদি রুখে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ ও রসূলের পথে চলার দাবী জানায়, তবে মাওলানা আসলাম জয়রাজপুরীর ফতোয়া অনুযায়ী পথভ্রষ্ট জালেম শাসকরা সেই বেচারাকে খোদাদ্রোহী ঘোষণা করে হত্যা করতে পারবেন, তাতে কোনো দোষ হবে না। তাঁরা বলতে পারবেন, "আরে ব্যাটা আল্লাহ ও রসূল তো আমরাই। তুই আবার কোন্ আল্লাহ-রসূলের পথে আমাদের চালাতে চাস ?"[১০৫]

রসূল (সা)-এর ব্যক্তি জীবন ও নবী-জীবনের পর্যালোচনা

"স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী" এবং "রসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ" শীর্ষক আমার দু'টো প্রবন্ধের আরবী অনুবাদ দামেস্কের 'আল-মুসলিমুন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন সিরিয়ার সুধীবৃন্দ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রবন্ধ দু'টোতে একটু গরমিল দেখা যায়। এ গরমিল দূর করা দরকার। দামেস্কের এক ভদ্রলোক আমার প্রথম প্রবন্ধটিতে নিম্নলিখিত প্রশ্ন তোলেন ঃ

"মানুষ হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কি আমাদের একজন সাধারণ মানুষের মতই ? মানুষ হিসেবে তাঁর মনেও কি অন্যান্য মানুষের ওপর নিজের ব্যক্তিগত আধিপত্য বিস্তারের লিপ্সা ও তাদের নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমা ও প্রতাপের অধীনে আনার অভিলাষ বিদ্যমান ছিল? তা যদি থেকে থাকে তবে নবী হিসেবে তাঁর নিষ্পাপ হওয়া এবং মানুষ হিসেবে তাঁর রক্ষাকবচ লাভের কি অর্থ থাকতে পারে ? তাঁর নবুয়াত পূর্ব মানবিক জীবনের বিস্তারিত বিবরণ জেনেই বা কি লাভ ? রসূল হওয়ার পর তাঁর মানবিক জীবন ও নবী-জীবন কি এক হয়ে গেছে, না আলাদা আলাদা রয়ে গেছে ? তাঁর জীবনের এ দু'টো দিককে বিচ্ছিন্ন করা কি সম্ভব, যাতে করে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য করা এবং মানুষ মুহাম্মদের বিরোধিতা করার স্বাধীনতা লাভ করা চলে ? তিনি নবী হিসেবে যা বলেছেন তা অবশ্য পালনীয় এবং মানুষ হিসেবে যা বলেছেন, তার বিরোধিতা করার অধিকার আমাদের রয়েছে। কিন্তু কোন্ মূলনীতির আলোকে আমরা এ দু' ধরনের কথার মাঝে ভেদরেখা টানতে পারি ? নবীর ব্যক্তিগত মতের বিরোধিতা করায় কি কোনোই বাধা নেই ? মুহাম্মদ (সা) কি মুসলমানদের এরূপ ধারণা দিতেন যে, মানুষ হিসেবে তাঁর আনুগত্য করা জরুরী নয় ? নিজের ব্যক্তিগত মতের সাথে দ্বিমত পোষণে কি তাদের উৎসাহিত করতেন ? এ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই হযরত ওমর (রা) মানুষ হিসেবে হযরতের বিরোধিতা করেছিলেন এ কথা কি সত্য ?"

আমার নিম্নলিখিত নিবন্ধটি এসব প্রশ্নের উত্তরেই লেখা হয়েছিল ঃ

'আল-মুসলিমুন'-এর ষষ্ঠখণ্ডের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যায় আমার যে দু'টো প্রবন্ধ "স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি" এবং "রসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ" শিরোনামে ছাপা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, নিবন্ধ দু'টিতে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে যার সুরাহা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রথম প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, নবীর ব্যক্তি জীবন ও নবী-জীবন আলাদা আলাদা। ইসলাম দাওয়াত দেয় নবী-জীবনের আনুগত্যের, ব্যক্তি জীবনের আনুগত্যের নয়। কিন্তু 'দ্বিতীয় প্রবন্ধে নবীর এ দুই পৃথক জীবনের কথা অস্বীকার করা হয়েছে এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, নবীর একই জীবন—নবী-জীবন। এ স্ববিরোধিতা নিরসনের উপায় জানতে চাওয়া হয়েছে। এছাড়া আমার প্রথম প্রবন্ধ "স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি" সম্পর্কে দামেস্কের এক ভদ্রলোক কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নগুলো আল-মুসলিমুনের ৭ম সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। শুরুতে আমরা তা উদ্ধৃত করেছি। উভয় প্রশ্ন অনেকটা অভিন্ন ধরনের। তাই একই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে উভয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

আসলে সমস্যাটির দু'টো দিক রয়েছে। একটা হলো তাত্ত্বিক দিক। এতে বিচার-বিবেচনার বিষয় হলো, আসল নিরেট সত্যটা কি। আর দ্বিতীয় হলো, বাস্তব দিক। এতে বিচার্য বিষয় হলো, নবীর ব্যক্তিত্ব থেকে পথনির্দেশ লাভ করতে হলে কি তাঁর গোটা জীবনকেই আমাদের জন্যে নবী বলে মেনে নিতে হবে এবং তিনি কি শুধুই নবী ? অথবা তাঁকে দু' ভাগে ভাগ করে তার নবী-জীবনের আনুগত্য করতে হবে এবং বাকীটা বাদ দিতে হবে ?

এক ঃ আলোচনার তাত্ত্বিক দিক

প্রথমে তাত্ত্বিক দিকটা আলোচনা করা যাক। পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, নবীদের ব্যক্তি জীবন ও নবী-জীবনে পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করতে আসেন না, তাঁরা আসেন মানুষকে আল্লাহর বান্দাহ বা গোলাম বানাতে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ ـ(ال عمران : ٧٩)

"কোনো মানুষের জন্যে এটা মোটেই সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, শাসন ক্ষমতা ও নবুয়াত দান করবেন আর পরক্ষণেই সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহর বান্দাহ না হয়ে আমার বান্দাহ হও। সে শুধু এ কথাই বলবে যে, তোমরা আল্লাহর খালেছ বান্দাহ হয়ে যাও।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯)

তাদের ওপর এক সাথে দু'টো দায়িত্ব অর্পণ করা হতো। প্রথমতঃ মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল মানুষ বা বস্তুর গোলামি থেকে মুক্ত করা, এমনকি তাঁর নিজের গোলামি থেকেও। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে আল্লাহর একক গোলামির অধীনে আনা।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রসূল পাঠিয়েছি এই বাণীসহ যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।"-(সূরা আন নাহল ঃ ৩৬)

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط (ال عمران : ٦٤)

"(হে নবী,) আপনি বলুন ঃ হে আহলে কিতাবগণ! এসো এমন একটা কথার দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান। সে কথা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাসত্ব করবো না, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে নিজের রব বানাবো না।"-(আলে ইমরান ঃ ৬৪)

ইসলাম সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে রসূলের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার বলে নয়, বরং তা শুধু এ জন্যে যে, আল্লাহ কিসে খুশী হন এবং কি তাঁর নির্দেশ, তা কেবল রসূলের মাধ্যমেই তিনি জানান। তাই রসূলের আনুগত্য স্বয়ং আল্লাহরই আনুগত্য বলে ঘোষিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ -(النساء : ٦٤)

"আমি যে রসূলই পাঠিয়েছি তা এ জন্যে যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হোক।"-(সূরা আন্ নিসা ঃ ৬৪)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ -(النساء : ٨٠)

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।"

-(সূরা আন নিসা ঃ ৮০)

এর সাথেই এ কথাও কুরআন ও বহুসংখ্যক হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সা) যে কথা বা কাজ আল্লাহর নির্দেশে নয় বরং নিজের মতানুসারে বলেছেন বা করেছেন সে কথা বা কাজের সে রকম নিরঙ্কুশ আনুগত্য তিনি কখনো দাবী করেননি যে রকম আনুগত্য তিনি আল্লাহর নির্দেশে কিছু বলে বা করে থাকলে দাবী করেছেন। আমার "স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি" শীর্ষক প্রবন্ধে এর বহু দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি। বিশেষত নবীর নিষেধ সত্ত্বেও হযরত যায়েদের জয়নব (রা)-কে তালাক দেয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তাতে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ না করা—একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমি এর যে ব্যখ্যা ঐ প্রবন্ধে দিয়েছি তাছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়াই যেতে পারে না। আর খেজুর গাছের প্রজনন সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من دينكم فخويه واذا امرتكم بشئ من رائى فانما انا بشر - انما ظننت ظنا فلا تواخذونى بالظن ولكن اذا حدثتكم من اللّه شيئا فخذوابه فانى لم اكذب على اللّه - انتم اعلم بامور دنياكم (صحيح مسلم باب امتثال ماقاله شرعا دون ماذكره صلى اللّه عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الراى)

"আমিও একজন মানুষই বটে। যখন আমি তোমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দিলেই তা মেনে নিও। কিন্তু যখন নিজের মতানুসারে কিছু বলি, তখন মনে রেখ, আমি একজন মানুষ মাত্র।—আমি অনুমান করে একটা কথা বলেছিলাম। এ রকম আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে যা বলি তা গ্রহণ করো না। তবে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু বলি তখন তা গ্রহণ করো। কেননা আমি আল্লাহ সম্পর্কে কখনো অসত্য বলিনি।—তোমাদের পার্থিব জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে তোমরাই ভাল জান।"

-(মুসলিম)

এতো হচ্ছে নীতিগত পার্থক্য। এখন তার বাস্তব দিকটা দেখা যাক।

দুই ঃ বাস্তব ও ব্যবহারিক দিক

মূলত ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত নাজুক ও জটিল। আল্লাহ তায়ালা একজন মানুষকে নিজের একমাত্র প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন এরূপ দ্বৈত দায়িত্ব দিয়ে যে, একদিকে তিনি সমগ্র মানব জাতিকে নিজের ব্যক্তিত্বসহ সকল সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করবেন এবং তাদেরকে তিনি স্বয়ং এ স্বাধীনতার ট্রেনিং দেবেন। অপর দিকে সেই মানুষটিই আবার তাদেরকে আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং আল্লাহর সেই আনুগত্যের উৎস হবে রসূল হিসেবে তাঁরই ব্যক্তিসত্তা। এ দু'টো পরস্পর বিরোধী কাজ একই ব্যক্তিকে

একই সময়ে করতে হতো এবং এ দু'টো কাজের সীমানা পরস্পরের সাথে এমন ওৎপ্রোত জড়িত যে, স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কেউ এ দু'য়ের মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করতে পারতো না। অধিকন্তু তিনটি বিষয় বিবেচনা করলে এর জটিলতা ও নাজুকতা তীব্রতর হয়ে ওঠে। প্রথমত হযরত রসূলুল্লাহ (সা) যখন আল্লাহর নির্দেশের অধীন নিজের আনুগত্য করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন তখন তিনি যে রিসালাতের দায়িত্বই পালন করছেন, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতো না। কিন্তু যখন তিনি তাঁর একান্ত অনুগত সাহাবীদেরকে তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বের মানসিক গোলামি থেকে মুক্তি দিয়ে চিন্তা ও মতামতের স্বাধীনতা প্রয়োগের শিক্ষা দিতেন, যখন তিনি নিজের ব্যক্তিগত মতামতের মোকাবিলায় তাঁর সামনেই চিন্তার স্বাধীনতা প্রয়োগে উৎসাহ দিতেন এবং দেখিয়ে দিতেন যে, এ ক্ষেত্রে তোমরা স্বাধীন এবং এ ক্ষেত্রে পূর্ণ আনুগত্য করতে তোমরা বাধ্য, তখনও তিনি প্রকৃতপক্ষে রিসালাতের দায়িত্বেরই একটা অংশ পালন করতেন। এ এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে এসে তাঁর ব্যক্তি জীবন ও নবী-জীবনের পার্থক্য বুঝা এবং সেই পার্থক্য অনুসারে কাজ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এখানে এ দু'টি জীবন পরস্পর এমন ওৎপ্রোত জড়িত যে, উভয়ের মধ্যে কার্যত কেবল তাত্ত্বিক পার্থক্যটাই থেকে যায়। নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদায় কোনো কাজ করতে গিয়েও কার্যত তাকে নবুয়াতের দায়িত্বই পালন করতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, যেগুলো বাহ্যত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার যেমন খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিয়ে-শাদী, স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে বসবাস, সাংসারিক কাজকর্ম, গোসল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি—এগুলোও রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের পুরোপুরি ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বরং এগুলোর মধ্যেও শরীয়াতের সীমা, বিধি ও নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে মানুষের পক্ষে স্থির করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, এগুলোর মধ্যে কোথায় গিয়ে রসূল মুহাম্মদের কাজ শেষ হয় এবং কোথায় গিয়ে ব্যক্তি মুহাম্মদের কাজ শুরু হয়।

তৃতীয়ত পবিত্র কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, নবী-জীবন সামগ্রিকভাবেই একটা আদর্শ—যার প্রতিটি দিক আমাদের জন্যে সত্য ও ন্যায়ের আলোকবর্তিকা। তাঁর কোনো একটা কথা ও কাজ প্রবৃত্তির প্ররোচনা, গোমরাহি ও বিভ্রান্তি দ্বারা বিন্দুমাত্রও কলুষিত নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের কয়েকটি বাণী লক্ষণীয় ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ(الاحزاب : ٢١)

"তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের জীবনে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে।"

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًاOوَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًاO(الاحزاب : ٤٦ـ٤٧)

"হে নবী! আমি তোমাকে (মানবজাতির জন্যে) সাক্ষী, সুসংবাদ দানকারী, সতর্ককারী, আল্লাহর ইচ্ছানুসারে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ করে পাঠিয়েছি।"

مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰىO وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰىO اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰىO

"তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্টও হয়নি, কুপথগামীও হয়নি। সে প্রবৃত্তির খেয়ালবশে কিছু বলে না, সে যা-ই বলে, তা তার কাছে পাঠানো অহী ছাড়া আর কিছু নয়।"

–(সূরা আন নাজ্‌ম ঃ ২-৪)

এসব কারণে নবীর নবী-জীবন ও ব্যক্তি জীবনে পার্থক্য করার কোনো অধিকার শরীয়াত অনুসারে আমাদের নেই, আর কার্যত সে পার্থক্য করা সম্ভবও নয়। আমরা নবী-জীবনের এ দু'ভাগের সীমানা নিজেরা নির্ধারণ করতে পারি না। আমরা নির্দিষ্ট করে এ কথা বলতে সক্ষম নই যে, অমুক অমুক বিষয় নবীর নবী-জীবনের আওতাধীন আর অমুক অমুক বিষয় নবীর ব্যক্তি জীবনের আওতাধীন। এ জন্যে একটিকে মেনে নেয়া জরুরী ও অপরিটিকে মেনে নেয়া ঐচ্ছিক বলে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার আমাদের নেই। স্বয়ং রসূলুল্লাহরই কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা অথবা তাঁর একাধিক শিক্ষার আলোকে রচিত মূলনীতিই এ পার্থক্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

কয়েকটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত

হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, সাহাবীগণ তাঁর কোনো কথা বা কাজ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করার আগে জিজ্ঞেস করে নিতেন যে, উক্ত কথা বা কাজ আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে, না তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে। যখন তাঁরা জানতে পারতেন যে, এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত কেবল তখনই তাঁরা নিজের বক্তব্য পেশ করতেন। বদর যুদ্ধে হযরত খাব্বাব ইবনুল মুনযির নিজের মত ব্যক্ত করার আগে জিজ্ঞস করে নেন যে, স্থানটির নির্বাচন অহীর ভিত্তিতে হয়েছে, না নিছক সমর কৌশল হিসেবে। কেননা অহীর ভিত্তিতে হয়ে থাকলে একটুও আগে-পিছে করা আমাদের জন্যে জায়েয হবে না। খন্দক যুদ্ধে হযরত সা'দ বিন মায়া'য বনি গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজের মতামত ব্যক্ত করার আগে জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রসূল! এ সিদ্ধান্ত কি অহীর ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে—যে সম্পর্কে আমাদের কথা বলার অবকাশ নেই, না, আপনি কেবল নিজের ইচ্ছায় এরূপ করতে চাচ্ছেন ?"

কোনো কোনো সময় হযরত রসূলুল্লাহ (সা) নিজেই জানিয়ে দিতেন যে, অমুক বিষয় নিয়ে তিনি যা বলেছেন তা আল্লাহর হুকুমে বলেননি এবং ইসলামের বিধি হিসেবে জারী করেননি বরং কেবল নিজের ব্যক্তিগত মতই প্রকাশ করেছেন মাত্র। এর উদাহরণস্বরূপ খেজুর গাছের প্রজনন সম্পর্কে তাঁর দেয়া ব্যখ্যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কোনো কোনো সময় নির্দেশের ধরন দেখেই বুঝা যেত যে, তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়েই দিয়েছেন। যেমন হযরত যায়েদকে তিনি বললেন ঃ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ "তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিও না। আল্লাহকে ভয় করো।" এ নির্দেশ যে একজন মুমিনকে দেয়া নবীর আইনগত নির্দেশ নয়, বরং পরিবারের একজন কনিষ্ঠ সদস্যকে দেয়া পরিবার প্রধানের উপদেশ—তা স্পষ্টই বুঝা গিয়েছিল। এ জন্যেই হযরত যায়েদ নবীর নির্দেশ সত্ত্বেও যয়নবকে তালাক দিয়ে দেন। এতে আল্লাহ ও রসূল (সা) কোনো প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করায় বুঝা যায় যে, নবীর নির্দেশ কোন্ পর্যায়ের, তা হযরত যায়েদ ঠিকমতই বুঝতে পেরেছিলেন।

পরবর্তী যুগে নবী—মর্যাদা নির্ণয়ের উপায়

এমন অনেক দৃষ্টান্ত—যা নবী পাক (সা)-এর জীবদ্দশায় দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া আরও অনেক ব্যাপারে এখনও শরীয়াতের মূলনীতির আলোকে এ পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। যেমন নবীর পোশাক ও খানাপিনার ব্যাপারটাই ধরা যাক। এর একটা দিক এই ছিল যে, তিনি যে বিশেষ ধরনের মাপজোখ ও কাটিং-এর পোশাক পরতেন তা সেকালে আরব দেশে প্রচলিত ছিল এবং সে পোশাক তিনি আপন রুচি মতো বেছে নিতেন। এভাবে তিনি যে খাদ্য খেতেন তা তাঁর আমলে আরবদের বাড়ীতে সচরাচর রান্না করা হতো এবং এসব খাদ্য তাঁর রুচি মাফিকই ছিল। এর আর একটা দিক ছিল এই যে, এ খাওয়া-পরার ব্যাপারে তিনি নিজের কথা ও কাজ দ্বারা খাওয়া-পরা সংক্রান্ত ইসলামী রীতি ও ইসলামী বিধি শিক্ষা দিতেন। এর মধ্যে প্রথমটি যে নবীর ব্যক্তিগত জীবনের এবং দ্বিতীয়টি নবী-জীবনের আওতাভুক্ত, সে কথা আমরা স্বয়ং নবীর শিখানো মূলনীতি থেকেই জানতে পারি। কেননা তিনি যে শরীয়াতের বিধান শিক্ষা দেয়ার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সে শরীয়াত মানব জীবনের এ ব্যাপারটিকে তার আওতাভুক্ত করেনি যে, মানুষ তার পোশাকের কাটছাঁট কি ধরনের করবে এবং তাদের খানা কিভাবে পাকাবে। অবশ্যি শরীয়াত এ জিনিসটিকে তার আওতাভুক্ত করছে যে, সে পোশাক এবং খাদ্যের ব্যাপারে হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয সীমা নির্ধারণ করে দিবে এবং মুমিনদের চরিত্র ও সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ভদ্রতা ও শিষ্টাচার মানুষকে শিক্ষা দিবে।

এ পার্থক্য আমরা নবীর কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা জানতে পারি অথবা তাঁর শেখানো শরীয়াতের মূলনীতি থেকে জানতে পারি উভয় ক্ষেত্রেই নবীর শিক্ষাই এ জ্ঞানের উৎস্য। অতএব নবীর ব্যক্তি জীবনের আওতাভুক্ত কাজকর্ম নির্ণয় করতেও আমাদেরকে নবী-জীবনেরই শরণাপন্ন হতে হবে। আর নবী-জীবনকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি জীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপনের কোনো অবকাশ আমাদের নেই। "রসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ" শিরোনামে লিখিত আমার নিবন্ধে এ বিষয়েই আমি হাদীস বিরোধীদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। তাঁদের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে, তাঁরা আপন উদ্যোগেই রসূল হিসেবে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ এবং মানুষ হিসেবে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ-এর মধ্যে পার্থক্য করে উভয়ের আওতাভুক্ত কাজগুলোর মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে দেন। অতপর নবী-জীবনের যে অংশকে তাঁরা নিজেরাই তাঁর নবী-জীবনের বহির্ভূত মনে করে নিয়েছে, তাঁর আনুগত্য ও অনুকরণ থেকে নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছেন। অথচ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যক্তি জীবন ও নবী-জীবনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যে পার্থক্যই থাক, তা কেবল আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদেরকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে শুধু এ জন্যে যে, আমরা যেন আকীদার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদকেই প্রকৃত আনুগত্যের অধিকারী মনে করে না বসি। কিন্তু উম্মতের জন্যে কার্যত তাঁর একটা মাত্রই মর্যাদা এবং তাহলো তাঁর রসূল হওয়ার মর্যাদা। এমনকি মানুষ মুহাম্মদের আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদের কোনো স্বাধীনতা থাকলে তা রসূল মুহাম্মদেরই প্রদত্ত। রসূল মুহাম্মদই আমাদের সে স্বাধীনতার সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সে স্বাধীনতা প্রয়োগের শিক্ষাও তিনিই দেন।

এটুকু ব্যখ্যা বিশ্লেষণের পর আমার নিবন্ধ দু'টি পড়লে আর কোনো ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকতে পারে না।[১০৬]

কুরআনের দৃষ্টিতে নবুয়াতের পদ ও দায়িত্ব*

রসূলের কাজ চার প্রকারের

পবিত্র কুরআনের চার জায়গায় নবী (সা)-এর দায়িত্ব সম্পর্কে নিম্ন বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ..... رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط (البقرة : ١٢٧-١٢٩)

"এবং স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল এ ঘরের (কা'বা) ভিত্তিস্থাপন করছিলেন .... (তখন তাঁরা দো'য়া করেন) হে আমাদের রব ! এ লোকদের জন্যে তাদের মধ্য থেকেই এমন একজন রসূল পাঠাও, যিনি তাঁদেরকে তোমার আয়াত পড়ে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৭-১২৯)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

"যেমন আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের ভেতর থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছি যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনান, তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন, তোমাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন এবং এমন আরো অনেক কিছু শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১)

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج (ال عمران : ١٦٤)

"আল্লাহ মুমেনদের ওপর যথার্থ অনুগ্রহ করেছেন যখন তাদের জন্যে তাদের ভেতর থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত পড়ে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।"

-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق (الجمعة : ٢)

"তিনিই সেই আল্লাহ যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্যে তাদের ভেতর থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।"-(সূরা আল-জুমুআ ঃ ২)

---

* হাদীস অস্বীকারকারীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সন্দেহ-সংশয় নিরসনার্থে এ প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল।-(সংকলক)

এ আয়াতগুলোতে বার বার যে কথা বলা হয়েছে তা এই যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে শুধু কুরআনের আয়াত পড়ে শুনিয়ে দেয়ার জন্যে পাঠাননি, বরং তাঁকে পাঠানোর আরও তিনটি উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমত, তিনি মানুষকে কিতাব শিক্ষা দেবেন।

দ্বিতীয়ত, উক্ত কিতাবের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার কৌশল ও পদ্ধতি শিক্ষা দেবেন।

তৃতীয়ত, তিনি ব্যক্তি ও সমাজ কাঠামোকে পরিশুদ্ধ করবেন। অর্থাৎ স্বয়ং প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দোষত্রুটি দূর করবেন যাতে করে তাদের মধ্যে উত্তম গুণাবলী সৃষ্টি হয় এবং নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে।

এটা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের আয়াত পড়ে শুনাবার পর কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়া শুধু মাত্র অতিরিক্ত কোনো কাজ ছিল। নতুবা তা আলাদাভাবে উল্লেখ করা নিরর্থক হতো। অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও সমাজের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি যেসব কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন তাও কুরআন আবৃত্তির অতিরিক্ত কাজই ছিল। নতুবা প্রশিক্ষণ কাজের পৃথকভাবে উল্লেখ করার কোনো অর্থ হয় না। এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন আবৃত্তি করে শুনিয়ে দেয়া ছাড়া শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদাতার এই যে দু'টি দায়িত্ব তিনি লাভ করেছিলেন তা কি তিনি নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রহণ করেছিলেন, না আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ঐ দু'টি দায়িত্বে নিয়োগ করেছিলেন ? পবিত্র কুরআনের এ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর এ কিতাবের ওপর যার ঈমান আছে, সে কিভাবে এ কথা বলার দুঃসাহস করতে পারে যে, এ দায়িত্ব দু'টি তাঁর রিসালাতের অংশ ছিল না এবং এ দায়িত্বের অধীন তিনি যেসব কাজ সম্পাদন করতেন তা রসূল হিসেবে নয় বরং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পাদন করতেন ? এমন দুঃসাহস করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে কুরআনের কথাগুলো কেবল আবৃত্তি করে শুনিয়ে দেয়ার পর অতিরিক্ত যে কাজ নবী (সা) কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে করলেন এবং নিজের কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের প্রশিক্ষণের যে কাজ সমাধা করলেন, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্জিত ও প্রামাণ্য সনদ বলে স্বীকার না করা খোদ রিসালাতকেই অস্বীকার করার শামিল নয় কি ?

আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা দানকারী হিসেবে রসূলের ভূমিকা

সূরা আন নাহলে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ -(النحل : ٤٤)

"(হে নবী!) আমি এ গ্রন্থ তোমার কাছে নাযিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি মানুষের জন্যে নাযিল করা এ শিক্ষা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবে।"-(আয়াত ঃ ৪৪)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুরআনে আল্লাহ যেসব নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাও নবীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোকও অন্ততপক্ষে এ কথাটা বুঝতে পারে যে, কোনো বই পড়ে শুনিয়ে দেয়াতেই তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়ে যায় না, বরং ব্যাখ্যাকারীকে বইয়ের মূল কথার চেয়ে বেশী কিছু বলতে হয় যাতে শ্রোতা বইয়ের বক্তব্য ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতে

পারে। যদি বইয়ের কোনো কথা কোনো ব্যবহারিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে ব্যাখ্যাকারী বাস্তব কর্মপ্রদর্শনের (Practical Demonstration) দ্বারা জানিয়ে দেন যে, এভাবে কাজ করাকে গ্রন্থকার পছন্দ করেন। তা না হলে, কেউ যদি কিতাবের বিষয়বস্তুর অর্থ ও ব্যখ্যা বিশ্লেষণ জিজ্ঞেস করে এবং তাকে কিতাবেরই শব্দগুলো শুনিয়ে দেয়া হলে এটাকে কোনো শিশুও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বলে গ্রহণ করবে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এ আয়াতের বক্তব্য অনুসারে নবী (সা) ব্যক্তি হিসেবে কি কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ছিলেন, না তাকে ব্যাখ্যাকারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখানে তো আল্লাহ তায়ালা রসূলের উওর কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যেই এটা বলছেন যে, রসূল তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা এর মর্ম বিশ্লেষণ করবেন। তাহলে কুরআনের ব্যাখ্যা দানের যে দায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল, তাকে কি করে তাঁর রিসালাতের সামগ্রিক দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করা সম্ভব ? কিভাবেই বা তাঁর আনিত কুরআনকে গ্রহণ করার পর তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে অস্বীকার করা যায় ? এটা কি খোদ রিসালাতকেই অস্বীকার করার নামান্তর হবে না ?

বস্তুত, যারা তৎকালে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতকে এই বলে অস্বীকার করতো যে, আল্লাহর কিতাব কোনো মানুষের মাধ্যমে আসতে পারে না, তাদের বিরুদ্ধে যেমন এ আয়াতটি একটি অকাট্য দলিল, তেমনি আজকে যারা হাদীস অস্বীকার করে এবং নবীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই শুধুমাত্র কুরআনকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী, তাদের বিরুদ্ধেও এ আয়াত অকাট্য প্রমাণ। তারা এ প্রসঙ্গে সাধারণত চারটি বক্তব্য পেশ করে থাকে। কখনো বলে, নবী আদৌ কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেননি, কেবল আল্লাহর কিতাব পৌঁছে দিয়েছেন। কখনো বলে, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাবই অনুসরণযোগ্য, নবীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়। কখনো বলে, এ যুগে আমাদের জন্যে কেবল আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট, নবীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কখনো বলে, এখন শুধু আল্লাহর কিতাবই নির্ভরযোগ্য অবস্থায় বর্তমান আছে, নবীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয় আদৌ নেই, নতুবা থাকলেও নির্ভরযোগ্য অবস্থায় নেই। এই চারটি মতই কুরআনের উক্ত আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। বিশেষভাবে প্রথম মতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর কিতাবকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে না পাঠিয়ে অথবা সরাসরি মানুষের হাতে না পৌঁছে দিয়ে নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল, নবী সেই উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর চতুর্থ মতটি কুরআন ও নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াত উভয়কেই অস্বীকার করার ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ ঘোষণাকারীদের জন্যে অতপর নতুন নবুয়াত ও নতুন অহীর দাবীদারদের পথ অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কেননা আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা নবীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে নবুয়াতের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যেমন অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন তেমনি নবীর নবুয়াতের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বার্থকতাও কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যাদানের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হতে পারে বলে ঘোষণা করছেন। এমতাবস্থায় নবীর দেয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুনিয়ায় অবশিষ্টই নেই, হাদীস অস্বীকারকারীদের এ উক্তি যদি সঠিক বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে দু'টো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ একটা অনুকরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে নবুয়াতে মুহাম্মদীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত বলে ধরে নিতে হয় (নাউযুবিল্লাহ) এবং নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক হযরত হুদ, সালেহ, শোয়াইব প্রমুখ পূর্বতন নবীদের সম্পর্কের অনুরূপ বলে মেনে নিতে হয়। পূর্বতন নবীদের প্রতি আমাদের ঈমান

আনতে হয়, তাঁদের দাওয়াত সত্য বলে স্বীকৃতিও দিতে হয় কিন্তু তাঁদের কোনো অনুকরণযোগ্য আদর্শ আমাদের কাছে নেই বলে আমরা তাঁদের অনুকরণ করতে পারি না এবং বাধ্যও নই। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলে নতুন নবীর প্রয়োজন অনুভূত হওয়া একটা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এর পরে একজন নির্বোধই খতমে নবুয়াত নিয়ে জিদ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, নবীর ব্যাখ্যা ছাড়া কুরআন এককভাবে হেদায়াতের জন্যে স্বয়ং আল্লাহর বিবেচনাতেই যখন যথেষ্ট নয় তখন কুরআনের তথাকথিত মান্যকারীরা যত বড় গলায়ই তাকে যথেষ্ট বলে ঘোষণা করুক, সে কথা গ্রহণীয় হতে পারে না। বাদীর দাবী এক রকম, আর সাক্ষীর সাক্ষ্য আর এক রকম হলে দু'টোর কোনোটাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলে বলতেই হয় যে, স্বয়ং কুরআনই একখানা নতুন কিতাবের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দিচ্ছে। আল্লাহর অভিসম্পাত হোক এহেন ঈমান-বিধ্বংসী মতামত প্রচারকারীদের ওপর। বস্তুত এভাবে তাঁরা হাদীস বর্জনের মাধ্যমে আসলে ইসলামেরই সর্বনাশ করতে চেষ্টা করছে।[১০৭]

নেতা ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে রসূল

সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ..... قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ٥ (ال عمران : ٣١-٣٢)

"(হে নবী!) তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন। .... আরো বল, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (জেনে রাখ) আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১-৩২)

সূরা আহ্যাবে তিনি বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ـ

"তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আর্দশ রয়েছে। আল্লাহ ও শেষ দিনের সম্পর্কে আশাবাদী এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই এ আদর্শ।"–(আয়াত ঃ ২১)

এ দু'টো আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর রসূল (সা)-কে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করছেন। তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর জীবনকে অনুকরণযোগ্য বলে ঘোষণা করছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, রসূলের আনুগত্য না করলে আমার কাছ থেকে কোনো কল্যাণ প্রত্যাশা করো না। এ আনুগত্য ছাড়া তোমরা আমার ভালবাসা পেতে পার না। আনুগত্য থেকে বিরত থাকা কুফরী। এখন জিজ্ঞেস্য এই যে, নবী মুহাম্মদ (সা) কি নিজেই মানুষের নেতা সেজেছিলেন, না মুসলমানরা তাঁকে নির্বাচিত করেছিল, না আল্লাহ তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন ? কুরআনের ভাষায় তাঁকে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ও মনোনীত নেতা বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় তাঁর আনুগত্য ও অনুকরণ করতে অস্বীকার করা কি করে সম্ভব ? এর জবাবে যদি কেউ

বলে যে, রসূলের আনুগত্যের অর্থ কুরআনের আনুগত্য, তবে তাকে প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কেননা অর্থ যদি তাই হতো তাহলে فاتبعونى-এর পরিবর্তে فاتبعوا القران (কুরআনের অনুসরণ কর) বলা হতো। আর সে ক্ষেত্রে রসূলের জীবনকে 'উত্তম আদর্শ' বলার কোনো অর্থই থাকতে পারে না।

আইন প্রণেতা হিসেবে রসূলের ভূমিকা

সূরা আ'রাফে আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেনঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط (اعراف : ١٥٧)

"তিনি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, তাদের জন্যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করেন, অপবিত্র জিনিসগুলো হারাম করেন এবং তাদের ওপর আগে থেকে যেসব বিধি-নিষেধের বোঝা চাপানো ছিল তা থেকে তাদের মুক্ত করেন।" –(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৫৭)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ তায়ালা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা (Legislative Powers) প্রদান করেছেন। কুরআনে যেসব হালাল হারাম এবং ভালো কাজ ও মন্দ কাজের বর্ণনা রয়েছে, আল্লাহর বিধি-নিষেধের তালিকা তাতেই সমাপ্ত নয় বরং নবী যা যা করতে বলেছেন বা নিষেধ করেছেন, তাও আল্লাহর আইনের অংশ। কেননা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করেই নবী এসব বিধি-নিষেধ রচনা করেছেন। সূরা হাশরেও অনুরূপ স্পষ্টোক্তি দেখতে পাওয়া যায় ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ (الحشر : ٧)

"রসূল তোমাদের যা দেন, গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা বর্জন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"–(আয়াত ঃ ৭)

এ দু'টি আয়াতের কোনোটারই এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে না যে, এতে কুরআনে সন্নিবেশিত বিধি-নিষেধের কথাই বলা হয়েছে। একে ব্যাখ্যা নয় বরং আল্লাহর আয়াতকে সংশোধন তথা পরিবর্তনের অপচেষ্টা বলাই সংগত হবে। কেননা আল্লাহ এখানে সুস্পষ্টভাবে ভাল কাজের আদেশ দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং হালাল ও হারাম নির্ধারণ করাকে রসূলের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন—কুরআনের কাজ বলে নয়। এখন কেউ কি এ কথা বলতে চায় যে, আল্লাহর ভুল হয়ে গেছে এবং তিনি কুরআনের পরিবর্তে ভুল করে রসূলের নাম করেছেন ? –(মায়াযাল্লাহ)

বিচারক হিসেবে রসূল (সা)-এর ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সা)-কে বিচারক নিযুক্ত করার কথা কুরআনের একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত লক্ষণীয় ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ ط (النساء : ١٠٥)

"(হে নবী!) আমি সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেছি তোমার কাছে, যেন তুমি আল্লাহর দেখানো যুক্তির আলোকে মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পার।"
–(সূরা আন্ নিসা ঃ ১০৫)

وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ (الشورى : ١٥)

"(হে নবী!) বল, আমি আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের ওপর ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"
–(সূরা আশ্ শুরা ঃ ১৫)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۖ (النور : ٥١)

"মু'মিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয় যাতে করে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তারা বলে আমরা শুনেছি ও মেনেছি।"
–(সূরা আন্ নূর ঃ ৫১)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۚ (النساء : ٦١)

"যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাযিল করা কিতাব ও রসূলের দিকে এসো— তখন দেখবে যে মুনাফিক্‌রা তোমার থেকে কেটে পড়ছে।"–(সূরা আন্ নিসা ঃ ৬১)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۚ (النساء : ٦٥)

"অতএব, হে নবী তোমার রবের কসম, তারা কখনোই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের ঝগড়া-বিবাদে তোমাকে সালিস মানবে এবং তোমার সিদ্ধান্তের প্রতি মনে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে।"
–(সূরা আন্ নিসা ঃ ৬৫)

এসব আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) স্বনিয়োজিত বা মুসলমানদের নির্বাচিত বিচারক ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক। তৃতীয় আয়াতটি থেকে জানা যায় যে, বিচারক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব রিসালাতের দায়িত্ব থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি রসূল হিসেবে বিচারকও ছিলেন। তাই একজন মু'মিন যতক্ষণ রসূলকে বিচারক হিসেবেও তাঁর আনুগত্য মেনে না নেয় ততক্ষণ রিসালাতের প্রতি তার ঈমান সঠিক হতে পারে না। চতুর্থ আয়াতে ما انزل الله কুরআন ও রসূল এ উভয়কে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন—যার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে দু'টি শাশ্বত উৎস রয়েছে ঃ একটি হলো কুরআন আইনের দিক দিয়ে এবং অপরটি হলো বিচারক হিসেবে রসূল। এ দু'য়ের যে কোনোটিই অমান্য করা হবে মুনাফিকের কাজ, মু'মিনের কাজ নয়। শেষ আয়াতে অকাট্যভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা

হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রসূলকে বিচারক হিসেবে মানে না সে মু'মিন নয়। এমনকি কেউ রসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত বা সংকোচ বোধ করলেও ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কুরআনের এসব স্পষ্টোক্তির পর কারো এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, নবী মুহাম্মদ (সা) বিচারক ছিলেন বটে, তবে রসূল হিসেবে নয়, সাধারণ জজ, ম্যাজিস্ট্রেটদের মতই একজন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাই সাধারণ জজ, ম্যাজিস্ট্রেটদের রায় যেমন আইনের উৎস নয়, তেমনি নবীর বিচার-ফায়সালাও আইনের উৎস নয়। কেননা দুনিয়ার সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটদের কেউ এমন মর্যাদার অধিকারী নয় যে, তাঁর রায় না মানলে, তাঁর সমালোচনা করলে বা তা মানতে ইতস্তত বোধ করলে ঈমান হারানোর আশংকা থাকবে।

শাসক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে রসূলের ভূমিকা

কুরআন বার বার সুস্পষ্ট করে এ কথা বলেছে যে, নবী (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত শাসক ও রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন এবং এ পদমর্যাদাও তাঁকে রসূল হিসেবেই দেয়া হয়েছিল।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط (النساء : ٦٤)

"আমি যে রসূলই পাঠিয়েছি, তা শুধু এ জন্যে যে, তাঁকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে (Sanction) অনুসরণ করতে হবে।"-(সূরা আন্ নিসা ঃ ৬৪)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج (النساء : ٨٠)

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।"
-(সূরা আন্ নিসা ঃ ৮০)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط (الفتح : ١٠)

"(হে নবী!) নিশ্চয়ই যারা তোমার কাছে বায়আত করে তারা আল্লাহর কাছেই বায়আত করে।"-(সূরা আল ফাত্হ ঃ ১০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ○

"ও হে! তোমরা যারা ঈমান এনেছো—আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের। আর নিজেদের নেক আমল বিনষ্ট করো না।"-(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৩)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا ○(احزاب : ٣٦)

"কোনো মু'মিন পুরুষ বা নারীর এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ের মীমাংসা করে দেন, তখন কোনো মু'মিন পুরুষ ও নারীর এ অধিকার থাকে না যে, তারা সে ব্যাপারে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত হয়।"

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط

"ও হে ! তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের। আর তোমাদের উলুল আমর-এর আনুগত্য করো। অতপর যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে দেখ আল্লাহ ও রসূল এ বিষয়ে কি বলেছেন—যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক।"

–(সূরা আন্ নিসা ঃ ৫৯)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, রসূল নিজের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্বঘোষিত শাসক নন, অথবা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়কও নন বরং তিনি আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা, তাঁর রিসালাতের পদমর্যাদা ও দায়িত্ব থেকে বিছিন্ন ও আলাদা কোনো কিছু নয়। বরং তাঁর রসূল হওয়ার অর্থই হলো এমন একজন শাসক হওয়া যার সর্বতোভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। তাঁর আনুগত্য স্বয়ং আল্লাহরই আনুগত্য। আর তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ (বায়আত) স্বয়ং আল্লাহর আনুগত্যেরই শপথ গ্রহণ। তাঁর নাফরমানি করার অর্থ স্বয়ং আল্লাহরই নাফরমানি এবং তাঁর পরিণতি এই যে, আল্লাহর কাছে মানুষের কোনো ভাল কাজই কবুল হবে না। আর রসূল যে বিষয়ে ফায়সালা করে দিয়েছেন সে বিষয়ে ঈমানদারগণ (যার মধ্যে সমগ্র উম্মত, তার শাসক এবং "কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব" সবই শামিল) আপনা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী নয়।

সর্বশেষে আয়াতে আরও বেশী স্পষ্ট করে অকাট্যভাবে এ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এ আয়াতে পর পর তিনটি আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

প্রথমে আল্লাহর আনুগত্য।

তারপর রসূলের আনুগত্য।

তৃতীয় পর্যায়ে উলুল আমর (যাকে হাদীস অমান্যকারীরা "কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব" বলে উল্লেখ করে থাকেন)-এর আনুগত্য।

এর থেকে প্রথম যে কথাটি জানা গেল তা এই যে, রসূল উলুল আমরের অন্তর্ভুক্ত নন বরং তাঁর মর্যাদা তাদের থেকে আলাদা এবং উর্ধে। আল্লাহর পর তাঁর মর্যাদা দ্বিতীয় স্তরে। দ্বিতীয়তঃ উলুল আমর তথা দায়িত্বশীল ও কর্তৃত্বশীলদের সাথে মতবিরোধ করা যেতে পারে। কিন্তু রসূলের সাথে মতবিরোধ চলতে পারে না। তৃতীয়তঃ মতবিরোধের মীমাংসার জন্যে দু'টো গ্রহণযোগ্য উৎসের শরণাপন্ন হতে হবে। এক হলো, আল্লাহ, দ্বিতীয় তারপরই আল্লাহর রসূল। মীমাংসার এ উৎস যদি শুধু আল্লাহ হতেন তাহলে নবীর কথা উল্লেখ করার কোনো অর্থই থাকতো না। এখানে আল্লাহর শরাণাপন্ন হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর কিতাবের শরাণাপন্ন হওয়া আর রসূলের শরাণাপন্ন হওয়া মানে রসূলের জীবদ্দশায় স্বয়ং রসূলের কাছে হাজির হওয়া। আর রসূলের ইন্তেকালের পর তাঁর সুন্নাহ বা হাদীসের শরণাপন্ন হওয়া।

এমনকি একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, স্বয়ং রসূলের জীবদ্দশাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রসূলের হাদীস বা সুন্নাহ অবলম্বনেই সমস্যার সূরাহা করা হতো। রসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের শেষের দিকে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামী শাসন বিস্তৃতি লাভ করে। দশ বারো লাখ বর্গমাইল আয়তনের এমন বিরাট ও বিশাল দেশে প্রতিটি বিষয়ে সরাসরি

রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে বিচার-ফায়সালা গ্রহণ করা কোনো মতেই সম্ভব ছিল না। তাই অনিবার্যরূপে সে যুগের ইসলামী সরকারে গভর্নর, বিচারক ও অন্যান্য প্রশাসকদের বিচার-ফায়সালা করার জন্যে কুরআনের পরেই আইনের অপর যে উৎসের সাহায্য নিতে হতো তা রসূলের সুন্নাহ বা হাদীস ছাড়া আর কিছু নয়।১০৮

নবী (সা)-এর আমলে বিচার বিভাগের কার্যপদ্ধতি

নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় যেসব সমস্যা সরাসরি তাঁর নিকট হাজির করা হতো সেসব ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূলের অভিপ্রায় কি তা ব্যক্ত করে নিজেই তার মীমাংসা করে দিতেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত সকল অধিবাসী যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতো, সেসব না তাঁর কাছে পেশ করা হতো, আর না তাঁর নিকট থেকে সরাসরি তার সমাধান করে নেয়া হতো। তার পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর পক্ষ থেকে এমন সব লোক নিযুক্ত থাকতেন যাঁরা জনসাধারণকে দ্বীনের শিক্ষা দান করতেন এবং জনগণ তাদের দৈনন্দিন ব্যাপারসমূহে তাঁদের কাছ থেকেই জেনে নিত যে, আল্লাহর কিতাবের কি নির্দেশ এবং আল্লাহর রসূল কোন্ ধরনের শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়া প্রত্যেক এলাকায় আমীর, সরকারী কর্মচারী ও কাজী নিযুক্ত থাকতেন যাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মীমাংসা নিজেরাই করে ফেলতেন। এসব লোকের জন্যে فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -এর উদ্দেশ্য পূরণ করার যে পদ্ধতি নবী নিজে পছন্দ করতেন তা হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা)-এর প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال كيف تقضى قال اقضى بما فى كتاب اللّٰه قال فان لم يكن فى كتاب اللّٰه ؟ قال فبسنة رسول اللّٰه قال فان لم يكن فى سنة رسول اللّٰه ؟ قال اجتهد برائى قال الحمد للّٰه الذى وفق رسول رسول اللّٰه -(تومذى، ابو داؤد)

"রসূলুল্লাহ (সা) যখন মুয়ায বিন জাবালকে বিচারক নিযুক্ত করে ইয়ামানে পাঠান তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিভাবে বিচার-ফায়সালা করবে ? তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবে যে পথনির্দেশ আছে সেই অনুসারে। তখন নবী বলেন, আল্লাহর কিতাবে যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে ? মুয়ায (রা) বলেন, তাহলে রসূলের সুন্নাহ অনুসারে। নবী পুনরায় বলেন, রসূলের সুন্নাহতেও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ? তিনি বলেন, আমি নিজের বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে ইজতেহাদ করার (সঠিক সিদ্ধান্ত) চেষ্টা করবো। তখন নবী (সা) বলেন, আল্লাহর শোকর—যিনি রসূলের প্রতিনিধিকে রসূলের মনোনীত পন্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দিয়েছেন।'—(তিরমিজি, আবু দাউদ)১০৯

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক মূলনীতিতে রসূলের মর্যাদা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝ (النساء : ٥٩)

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রসূলের এবং ঐসব লোকের যারা তোমাদের ওপর আদেশ করার অধিকার রাখে। অতপর তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলে তা বিবেচনার জন্যে আল্লাহ ও রসূলের দিকে আরোপ কর, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক। এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ কর্মপন্থা এবং পরিণামের দিক দিয়েও উত্তম।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৯)

এ আয়াতটি ইসলামের গোটা ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শাসণতন্ত্রের প্রথম দফা। এতে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো স্থায়ীভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে ঃ

এক ঃ ইসলামী বিধানে আসল আনুগত্য আল্লাহ তায়ালার জন্যে নির্দিষ্ট। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম আল্লাহর বান্দাহ। আর যা কিছুই হোক, তা এর পরে। প্রত্যেক মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক ব্যবস্থা—এ উভয়েরই কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহর ফরমাবরদারি ও আনুগত্য। আর যত আনুগত্য তা শুধু তখনই করা যেতে পারে, যদি খোদার আনুগত্যের সাথে তা সংঘর্ষশীল না হয় বরং তাঁর আনুগত্যের অধীন হয়। অন্যথায় আসল এবং মৌলিক আনুগত্যের মোকাবেলায় অন্যান্য সকল আনুগত্যের দাবীদারকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। এ কথাটাই রসূলুল্লাহ (সা) এভাবে বলেছেন ঃ لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق "স্রষ্টার নাফরমানি করে সৃষ্টির আনুগত্য করা চলবে না।"

দুই ঃ ইসলামী বিধানের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো রসূলের আনুগত্য। এটা কোনো আলাদা আনুগত্য নয় বরং আল্লাহর আনুগত্যেরই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকররূপ। রসূল অনুসরণযোগ্য এ জন্যে যে, তিনিই আমাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছানোর একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। তাই রসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্যের একমাত্র উপায় ও পন্থা। রসূলের অনুমোদিত উপায় ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি রসূলের আনুগত্য অস্বীকৃতি খোদাদ্রোহিতার শামিল। এ বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله -

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করলো সে আল্লাহকে অমান্য করলো। কুরআনেও এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যা পরে আলোচিত হবে।"

তিন ঃ উল্লিখিত দু'রকমের আনুগত্যের পর তৃতীয় যে আনুগত্য মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য তাহলো এসব উলুল আমর-এর যারা মুসলমানদের মধ্য থেকেই হবে। মূলতঃ এ আনুগত্য উল্লিখিত দু' আনুগত্যেরই অধীন—তা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। কুরআনে এদেরকে 'উলুল আমর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ঐসব লোক শামিল যাঁরা মুসলমানদের সমষ্টিগত জীবনের যাবতীয় বিষয়ের পরিচালক হবেন। তাঁরা মানসিক ও চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী আলেম হতে পারেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসক,

বিচারক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যাপারে নেতৃত্ব দানকারী মহল্লা ও বস্তির সরদার মাতব্বরও হতে পারেন। মোটকথা যিনি যে হিসেবে মুসলমানদের ওপর আদেশ করার অধিকারী হবেন তিনি সে হিসেবে মুসলমানদের আনুগত্য পাবারও অধিকারী হবেন। তাঁর সাথে মতবিরোধ করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বিশৃংখলা ডেকে আনা ঠিক হবে না। তবে শর্ত এই যে, তাঁকে মুসলমান হতে হবে এবং আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হতে হবে এবং এ দু'টি শর্ত তাঁর আনুগত্যের জন্যে অপরিহার্য। এ শর্ত যেমন উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি হাদীসেও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নের হাদীসগুলো প্রণিধানযোগ্য ঃ

السمع والطاعة على المرء المسلم فى ما احب وكره مالم يومن بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة -(بخارى، مسلم)

"উলুল আমর-এর কথা মেনে চলা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য—তা মনঃপুত হোক বা না হোক, অবশ্যি যদি পাপ কাজের আদেশ করা না হয়। আর যদি পাপ কাজের আদেশ করা হয়, তাহলে তা কিছুতেই মানা চলবে না।"

لاطاعة فى معصية انما الطاعة فى المعروف -(بخارى، مسلم)

"আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানি হয় এমন কাজে কারও আনুগত্য করা চলবে না—আনুগত্য করতে হবে শুধু ভাল কাজে।"-(বুখারী ও মুসলিম)

يكون عليكم امراء تعرفون وتنكون فمن انكر فقد برىء، ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع فقالوا افلا نقاتلهم قال لاما صلوا -(مسلم)

"নবী (সা) বলেন, এমন কিছু লোক তোমাদের শাসক হবে যাদের কিছু কাজ ভালো এবং কিছু কাজ মন্দ হবে। যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করবে সে অব্যাহতি পাবে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করবে সে-ও রেহাই পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে খুশী থাকবে এবং তা মেনে চলা শুরু করবে তার রেহাই নেই। সাহাবীগণ বললেন, এ ধরনের শাসকদের বিরুদ্ধে আমরা কি যুদ্ধ করবো না ? নবী বললেন, যতক্ষণ তারা নামায পড়া অব্যাহত রাখে ততক্ষণ যুদ্ধ নয়।"-(মুসলিম)

অর্থাৎ নামায পরিত্যাগ করলে বুঝতে হবে যে, তারা আল্লাহর ও রসূলের আনুগত্য ত্যাগ করেছে। সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বৈধ হবে।

شرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فلنا يارسول الله افلا ننابذهم عند ذالك ؟ قال لا مااقاموا فيكم الصلوة لاما اقاموا فيكم الصلوة -(مسلم)

"নবী (সা) বলেন, তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা হবে তারাই যাদের নিকট তোমরা ক্রোধভাজন হবে এবং তারাও তোমাদের নিকট ক্রোধভাজন হবে। তোমরা তাদের ওপর অভিসম্পাৎ করবে আর তারা তোমাদের ওপর অভিসম্পাৎ করবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ রকম অবস্থা দেখা দিলে আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করবো না ? তিনি বললেন, তারা যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে নামাযের ব্যবস্থা চালু রাখে ততক্ষণ তা করো না।"–(মুসলিম)

এ হাদীসটিতে ওপরে বর্ণিত শর্তকে আরো কঠোর করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী হাদীস থেকে এরূপ ধারণা করার অবকাশ ছিল যে, শাসকরা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে নামাযের পাবন্দি করলেই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, নামায পড়ার অর্থ আসলে মুসলমানদের সমষ্টিগত জীবনে নামাযের ব্যবস্থা চালু করা। অর্থাৎ শুধু নিজেরা নামায পড়াই যথেষ্ট নয় বরং সেই সাথে তাদের সরকার নামাযের ব্যবস্থা চালু করবে—এটাও অপরিহার্য। তাতে করে বুঝা যাবে যে, তাদের সরকার অন্তত নীতিগতভাবে একটি ইসলামী সরকার। অন্যাথায় বুঝতে হবে যে, সে সরকার ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে মুসলমানদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া বৈধ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, আমাদের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ (সা) যে কয়টি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তার একটি হলো ঃ

ان لانـنازع الامر اهله الا ان تروا كفروا بـواحا عندكم من اللّه فـيـه برهان-

অর্থাৎ "আমরা যেন আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং শাসকদের বিরুদ্ধ সংগ্রাম না করি। তবে তাদের কাজকর্মে যদি সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে—খোদার কাছে পেশ করার জন্যে আমাদের যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যামন থাকবে।" (বুখারী, মুসলিম)

চার ঃ আলোচ্য আয়াতে এটা একটা চিরন্তন ও অকাট্য মূলনীতিরূপে নির্ধারিত হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলের হাদীস নীতি-পদ্ধতি (কুরআন ও সুন্নাহ) হলো আইনের মূল উৎস (Final Authority). মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে অথবা শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে ব্যাপারেই বিরোধ দেখা দেবে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তার মীমাংসা করতে হবে এবং সেই মীমাংসা সকলকে বিনা বাক্য ব্যয়ে নতমস্তকে মেনে নিতে হবে। এভাবে জীবনের সকল সমস্যায় আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত উৎস, অবলম্বন ও সনদরূপে মেনে নেয়াই হলো ইসলামী ব্যবস্থার সেই অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য, যা তাকে অনৈসলামী ও খোদাদ্রোহী ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে। এ বৈশিষ্ট্য যে ব্যবস্থায় অনুপস্থিত তা নিসন্দেহে একটা অনৈসলামী ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন যে, জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্যে আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহর সুন্নাহকে একমাত্র উৎস ও সনদরূপে কিভাষে গ্রহণ করা যায় ? কুরআন ও হাদীসে তো পৌরসভা, রেলওয়ে, ডাকঘর প্রভৃতি সংক্রান্ত বিধি আদৌ লিপিবদ্ধ নেই। আসলে ইসলামের মূলনীতিগুলো বুঝতে না পারার কারণেই এ জাতীয় প্রশ্ন মনে জাগে। মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের অবাধ ও লাগামহীন স্বাধীনতা চায়। আর মুসলমান নিজেকে মূলত আল্লাহর বান্দাহ বা অনুগত দাস বলে স্বীকৃতি দেয়ার পর শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে, যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কাফের তার যাবতীয় ব্যাপারে স্বরচিত আইন-কানুন ও নিয়মবিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং খোদাপ্রদত্ত কোনো সনদ বা উৎসের আদৌ কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না। পক্ষান্তরে মুসলমান তার প্রতিটি কাজে

সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান কি জানতে চেষ্টা করে। সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো নির্দেশ পেলে তাই মেনে নেয় ও তদনুসারে কাজ করে। সেখানে কোনো নির্দেশ না পেলে কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই নিজে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের কোনো নির্দেশ না দেয়া থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ ক্ষেত্রে তাকে মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং এ কারণেই সে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রয়োগ করে।[১১০]

নবী (সা)-এর প্রতি কুরআন ছাড়া অতিরিক্ত অহী নাযিল

لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖO اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗO فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗO

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗO (القيمة : ١٦-١٩)

"হে নবী! এ অহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্যে জিহ্বা নাড়িও না। তা মনে করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। আমরা যখন পড়তে থাকি তখন তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। পরে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদের দায়িত্ব।"

এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এ থেকে এমন কয়েকটি মূলনীতি প্রমাণিত হয় যা ভালো করে বুঝে নিলে অতীত ও বর্তমানে অনেক বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমত এথেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর শুধু কুরআনে সন্নিবেশিত অহীই নাযিল হতো না বরং তাছাড়াও অহীর মাধ্যমে তাঁকে কুরআন বহির্ভূত জ্ঞানও দান করা হতো। কেননা কুরআনের নির্দেশাবলী, তার সূক্ষ্ম ইশারা ইঙ্গিত এবং তার বিশেষ পরিভাষাসমূহের যে মর্মার্থ নবীকে বুঝানো হতো তা যদি কুরআনেই থাকতো তাহলে এ কথা বলার দরকার ছিল না যে, এর মর্ম বুঝানো বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্ব আমার। কারণ সে ক্ষেত্রে ঐসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কুরআনেই পাওয়া যেত। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, কুরআনের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হতো তা অবশ্যই কুরআন বহির্ভূত। এভাবে কুরআন থেকে আমরা গোপন অহীর আর একটা প্রমাণ পেলাম।

দ্বিতীয়ত, কুরআনের মর্ম ও তার নির্দেশাবলীর যে ব্যাখ্যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে জানানো হয়েছিল তা এজন্যেই যে, তিনি তদনুযায়ী লোকদেরকে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআন বুঝিয়ে দেবেন এবং তার নির্দেশাবলী অনুসারে কাজ করা শিখাবেন। এটা যদি উদ্দেশ্য না হতো এবং এ জ্ঞানকে কেবল নিজের মধ্যেই সীমিত রাখবেন বলে তাকে জানানো হতো, তাহলে তাহতো একটা নিরর্থক কাজ। কেননা নবুয়াতের দায়িত্ব পালনে তার দ্বারা কোনো সাহায্য হতো না। তাই এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত জ্ঞান শরীয়াতের আইন প্রণয়নের উৎস বলে গণ্য হতে পারে না—এ কথা বলা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সূরা আন নাহলের ৪৪ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ-

"আমি তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি মানুষকে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবে।"* এ ছাড়া কুরআনের চার জায়গায় আল্লাহ তায়াল সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাজ শুধু আল্লাহর কিতাব পড়ে শুনিয়ে দেয়া নয়—বরং এ কিতাবের শিক্ষা দেয়াও।–(সূরা আল বাকারা, ১২৯ ও ১৫১ ; সূরা আলে ইমরান, ১৬৪ ; সূরা জুমুয়া, ২ আয়াত)**

---

* আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সপ্তম খণ্ড, আন্ নহল টীকা ঃ ৪০)

** এসব আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি 'সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত' (সুন্নাতের আইনগত মর্যাদা) নামক গ্রন্থের ৭৪ থেকে ৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত করেছি।–গ্রন্থকার

এরপর কুরআনকে মেনে নিয়ে এমন কোনো লোক এ কথা স্বীকার না কারে পারে না যে, রসূলুল্লাহ (সা) নিজের কথা ও কাজ দ্বারা কুরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই কুরআনের বিশুদ্ধতম, বিশ্বস্ততম ও আসল সরকারী ব্যাখ্যা। কারণ সেটি তার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয়, বরং কুরআনের রচয়িতা আল্লাহ্ তায়ালারই শিখানো ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে কুরআনের কোনো আয়াত বা শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া বিরাট ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ—যা কোনো ঈমানদার মানুষ করতে পারে না।

তৃতীয়ত, কুরআন অধ্যয়নকারী মাত্রই জানে যে, এতে এমন অনেক কথা আছে যা একজন আরবী জানা মানুষ শুধু তার শব্দগুলো পড়েই বুঝতে পারে না যে, তার প্রকৃত মর্ম কি এবং তাতে যে নির্দেশ রয়েছে তা কিভাবে কার্যে পরিণত করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ 'সালাত' (صلوة) শব্দটিই ধরুন পবিত্র কুরআনে ঈমানের পর যে কাজটি সবচেয়ে বেশী তাকীদ সহকারে করতে বলা হয়েছে, তা এই 'সালাত' কিন্তু শুধুমাত্র আরবী অভিধানের সাহায্যে কেউ এর সঠিক মর্ম উদ্ধার করতে পারে না। কুরআনে এটির বারবার উল্লেখ দেখে বড়জোর এটুকু বুঝা যায় যে, আরবী ভাষার এ শব্দটাকে কোনো বিশেষ ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সম্ভবত বিশেষ এক ধরনের কাজকেই 'সালাত'বলা হয়েছে —যা ঈমানদার লোকদের করতে হবে। কিন্তু শুধু কুরআন পড়ে কেউ নির্ণয় করতে পারবে না সেই বিশেষ কাজটা কি এবং তা কিভাবে করতে হয়। প্রশ্ন এই যে, আল্লাহ স্বয়ং কুরআন পাঠানোর সাথে সাথে যদি নিজের পক্ষ থেকে একজন শিক্ষক পাঠিয়ে তাকে এই পরিভাষাটির সঠিক মর্ম জানিয়ে না দিতেন এবং 'সালাত' সংক্রান্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের পদ্ধতি তাকে ভালো করে বুঝিয়ে না দিতেন তাহলে শুধু কুরআন পড়ে দুনিয়ার কোনো দু'জন মুসলমানও কি 'সালাত' সংক্রান্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের একটি মাত্র পদ্ধতি অবলম্বনে একমত হতে পারতো ? অথচ আজ দেড় হাজার বছর ধরে মুসলমানরা বংশানুক্রমিকভাবে একই পদ্ধতিতে নামায পড়ে আসছে। দুনিয়ার সকল এলাকায় কোটি কোটি মুসলমান একইভাবে নামাযের হুকুম প্রতিপালন করে আসছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শুধু কুরআনের শব্দগুলোই নাযিল করে ক্ষান্ত হননি, বরং সেই শব্দগুলোর মর্মও তাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করিয়ে দেন। আর সেসব মর্ম রসূলুল্লাহ (সা) ঐসব লোকদেরকে বলে শিখিয়ে দিতে থাকেন যারা কুরআনকে আল্লাহর কিতাব এবং তাকে আল্লাহর রসূল বলে মেনে নিয়েছে।

চতুর্থত, কুরআনের শব্দগুলোর যে ব্যাখ্যা আল্লাহ তাঁর রসূলকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং রসূল তাঁর কাজ ও কথা দ্বারা উম্মতকে তার যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা জানার মাধ্যম হিসেবে আমাদের কাছে রসূলের সুন্নাহ ও হাদীস ছাড়া আর কিছুই নেই। হাদীস অর্থ নবীর কথা ও কাজ সংক্রান্ত সেসব বর্ণনা—যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে এবং বর্ণনাকারীদের নামোল্লেখসহ পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে পরবর্তীদের কাছে পৌছানো হয়েছে। আর সুন্নাহ বলতে সেই রীতি-পদ্ধতি বুঝায় যা নবীর কথা ও কাজের দ্বারা প্রদত্তশিক্ষার ফলে মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে কার্যকরভাবে চালু হয়েছে। সেই রীতি-পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরগণ পূর্ববর্তী বংশধরের কাছ থেকে পেয়েছে এবং পরবর্তী বংশধরগণ পূর্ববর্তী বংশধরদের সমাজে তা চালু হতেও দেখেছে। জ্ঞানের এ মাধ্যমকে অস্বীকার করলে তার অর্থ দাঁড়াবে,

আল্লাহ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ বলে কুরআনের মর্ম রসূলকে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সে দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন (মায়াযাল্লাহ)। কারণ এ দায়িত্ব শুধু রসূলকে ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের মর্ম বুঝানোর জন্যে আল্লাহ গ্রহণ করেননি, বরং রসূলের মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে বুঝানোর জন্যেই গ্রহণ করেছেন। তাই হাদীস ও সুন্নাহকে আইনের উৎসরূপে মানতে অস্বীকার করা মাত্রই ঐ দায়িত্ব পালনে আল্লাহর ব্যর্থতা মেনে নেয়া আপনা থেকেই অনিবার্য হয়ে ওঠে (মায়াযাল্লহ)। এর জবাবে কেউ কেউ বলেন, অনেক জাল হাদীসও তৈরী হয়েছে। আমি বলবো, জাল হাদীস তৈরী হওয়াটাই সবচেয়ে বেশী করে এ কথা প্রমাণ করে যে, ইসলামের প্রাথমিকযুগে সমগ্র উম্মত রসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা ও কাজ যে আইনের মর্যাদা দিত। তা না হলে যারা বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইত, তারা মিথ্যা হাদীস তৈরী করার প্রয়োজন অনুভব করবে কেন? যারা জালনোট তৈরী করে তারা বাজারে যে মুদ্রা চালু আছে, সেই মুদ্রাই জাল করে। অচল মুদ্রা জাল করবে এমন আহম্মক কে আছে? তাছাড়া যারা জাল হাদীসের ওজুহাত তোলেন তারা হয়তো জানেন না যে, যে মহা মানবের কথা ও কাজ আইনের মর্যাদা রাখে, তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো নকল হাদীস যাতে ছড়ানো সম্ভব না হয়, সেজন্যে মুসলিম জাতি প্রথম থেকেই কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করেছে। আর ক্রমশ এ জাল ও নকল হাদীস প্রকাশের প্রবণতা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, উম্মতের হিতাকাঙ্খী মনীষীগণ আসল ও নকল বাছাই করার ততই কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হাদীস বাছাই করার এ বিদ্যা এমন এক অসাধারণ বিদ্যা, যা মুসলমান ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো জাতি আজ পযর্ন্ত উদ্ভাবন করতে পারেনি। এ বিদ্যা অর্জন না করে কেবল প্রাচ্যবিদদের ধোঁকায় বিভ্রান্ত হয়ে যারা হাদীস ও সুন্নাহকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন, তাঁরা চরম হতভাগ্য। এ অজ্ঞতাসুলভ ধৃষ্টতা দেখিয়ে তাঁরা যে ইসলামের কত বড় ক্ষতি সাধন করছেন তা তারা জানেন না।[১১১]

কেবলা নির্ধারণ

কুরআন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীর কাছে কুরআন ছাড়াও অহীযোগে নির্দেশ আসতো এবং উভয় প্রকারের অহীও মেনে চলতে তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন।

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ط (البقرة : ١٤٣)

"তুমি এযাবত যে কেবলা মেনে চলতে, তা আমি এ জন্যেই নির্ধারণ করেছি যে, কে রসূলের আনুগত্য করে আর কে আনুগত্য করে না তা দেখে নেব।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

এটাই সবচেয়ে সুস্পষ্ট আয়াত যা সবরকমের অপব্যাখ্যার মূল্যচ্ছেদ করে দেয়। নবীর কাছে কুরআন ছাড়া আর কোনো অহী আসতো না—এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় এ আয়াত থেকে। কেননা কা'বা শরীফকে কেবলা ঘোষণা করার আগে পর্যন্ত মুসলমানদের যে কেবলা ছিল, সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশ কুরআনে নেই। অথচ ইসলামের শুরুতেই যে নবী মুহাম্মদ (সা) সে কেবলা নির্ধারণ করেছিলেন এবং প্রায় চৌদ্দ বছর পর্যন্ত তিনি ও সাহাবীগণ সেদিকেই মুখ করে নামায পড়তে থাকেন, সে কথা অনস্বীকার্য। চৌদ্দ বছর

পর আল্লাহ তায়ালা সূরা আল বাকারার এ আয়াতে নবীর এ পদক্ষেপকে সমর্থন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ঐ কেবলা আমি নির্ধারণ করেছিলাম। আমি রসূলের মাধ্যমে ঐ কেবলা নির্ধারণ করেছিলাম এ জন্যে, কে রসূলের কথামত চলে আর কে চলে না তা আমি দেখতে চেয়েছিলাম। এ থেকে একদিকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর কুরআন ছাড়াও অহী নাযিল হতো। অপর দিকে এও জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর যেসব নির্দেশের উল্লেখ কুরআনে নেই, সেসব নির্দেশও মুসলমানরা মেনে চলতে আদিষ্ট। এমনকি রসূলের প্রতি মুসলমানদের ঈমান আছে কি নেই, তার পরীক্ষাও আল্লাহ এভাবেই করেন যে, রসূলের মাধ্যমে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা তারা মানে কিনা।[১১২] এখন যদি 'মেনে নেয়া হয় যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর কুরআন ছাড়া আর কোনো অহী নাযিল হতো না, তাহলে কেবলা সংক্রান্ত সেই নির্দেশ তিনি কিভাবে পেলেন ? এ থেকে কি বুঝা যায় না যে, কুরআনে নেই এমন নির্দেশও তিনি পেতেন ?[১১৩]

মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

রসূলুল্লাহ (সা) মদিনায় স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ করছেন। তিনি সাহাবীদেরকে সে কথা জানালেন এবং চৌদ্দশ' সাহাবীকে সাথে নিয়ে ওমরাহ করতে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কার কাফেররা হোদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁর গতিরোধ করলো। পরিণামে হলো হোদাবিয়ার সন্ধি। কিছু সাহাবীর মনে দেখা দিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। হযরত ওমর (রা) তাঁদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আমাদেরকে জানাননি যে, আমরা মক্কায় প্রবেশ করবো এবং ওমরাহ করবো ?

নবী বললেন, "এ যাত্রায়ই তা হবে—এ কথা কি বলেছি ?"

এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

اٰمِنِيْنَ لا مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لَاتَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ

مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○ (الفتح : ٢٧)

"আল্লাহ তাঁর রসূলকে নিশ্চয়ই সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তোমরা ইনশাআল্লাহ অবশ্যই শান্তির সাথে মাথা কামিয়ে ও চুল ছেঁটে নির্ভয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। তোমরা যা জানতে না আল্লাহ তা জানতেন। তাই তার আগেই তিনি এ নিকটবর্তী বিজয় (হোদায়বিয়ার সন্ধি) দান করলেন।"–(সূরা আল-ফাত্হ ঃ ২৭)

এ থেকে বুঝা যায় যে, স্বপ্নের মাধ্যমে নবীকে মক্কায় প্রবেশের পদ্ধতি জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মক্কার দিকে যাবেন। কাফেররা তাঁকে বাধা দেবে এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধি হবে, সেই সন্ধিসূত্রে পরবর্তী বছর ওমরাও করা যাবে এবং ভবিষ্যতের বিজয়ের পথও খুলে যাবে। এ থেকেও কি বুঝা যায় না যে, কুরআন ছাড়া অন্যান্য উপায়েও তিনি পথনির্দেশ লাভ করতেন ?

গোপন আলাপ

নবী করীম (সা) তার এক বিবিকে গোপনে একটা কথা বললে তিনি সে কথা অন্যদেরকে বলে দেন। নবী তাঁর স্ত্রীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বিবি বলেন, আমি যে কথাটা অন্যদেরকে বলে দিয়েছি, তা আপনি কি করে জানলেন ? নবী জবাব দেন, যিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ, তিনিই আমাকে জানিয়েছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○ (التحريم : ٣)

> "এবং যখন নবী (সা) তার এক বিবিকে গোপনে একটা কথা বললেন এবং সে বিবি সে কথা অন্যদেরকে জানিয়ে দিলেন এবং তারপর আল্লাহ যখন নবীকে ব্যাপারটা সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন নবী সে বিবিকে তাঁর ক্রটির একটা অংশ জানালেন এবং অপরটা এড়িয়ে গেলেন। নবী যখন তার বিবিকে তাঁর ক্রটির কথা জানালেন তখন তিনি বললেন, আপনাকে একথা কে জানালো ? নবী বললেন, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহই আমাকে জানিয়েছেন।"–(সূরা আত তাহরীম ঃ ৩)

যে অহীর মাধ্যমে আল্লাহ নবীকে তাঁর বিবির গোপন কথা ফাঁস করার বিষয় অবহিত করেছিলেন, সে অহী কুরআনের কোথাও নেই। যদি না থাকে তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে কুরআন ছাড়াও অনেক পয়গাম পাঠাতেন।

যয়নবের বিয়ে

নবী (সা)-এর পালকপুত্র যায়েদ বিন হারেসা (রা) আপন বিবিকে তালাক দেন এবং তারপর নবী তার তালাক দেয়া বিবিকে বিয়ে করেন। এতে মুনাফিক ও বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে এক মারাত্মক প্রচারাভিযান শুরু করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। আল্লাহ সূরা আহযাবের একটা গোটা রুকূ'তে এসব অভিযোগের জবাব দেন। তিনি জানিয়ে দেন, আমার নবী এ বিয়ে নিজ উদ্যোগে করেননি, বরং আমার হুকুমে করেছেন।

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ

> "অতপর যায়েদ যখন তার বিবিকে তালাক দিল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম, যাতে করে পালক পুত্রের তালাক দেয়া বিবিকে বিয়ে করতে মু'মিনদের কোনো দ্বিধা না থাকে।"–(আয়াত ঃ ৩৭)

এ আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, আমি তা আগেই বলেছি। এখন প্রশ্ন হলো, এ ঘটনার আগে আল্লাহ তায়ালা যায়েদের তালাক দেয়া বিবিকে বিয়ে করার যে নির্দেশ হযরত (সা)-কে দেন, তা কুরআনের কোথায় আছে ?

গাছ কাটার অনুমতি

রসূলুল্লাহ (সা) বনু নাযীরের ক্রমাগত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অতিষ্ঠ হয়ে মদিনা-সংলগ্ন তাদের বস্তিগুলো অবরোধ করেন। অবরোধ চলাকালে ইসলামী বাহিনী আশপাশের বাগ-বাগিচার বহু গাছ কেটে ফেলেন, যাতে সৈন্য চলাচলের জন্যে রাস্তা পরিষ্কার হয়। এতে বিরোধীরা হৈ-চৈ করে যে, মুসলমানরা ফলবান গাছ কেটে বাগান নষ্ট করে দুনিয়ায় অরজাকতা সৃষ্টি করেছে। এর জবাবে আল্লাহ বলেন ঃ

مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ ـ(الحشر : ٥)

"তোমরা যেসব খেজুরের গাছ কেটেছ আর যা কাটনি, সবই আল্লাহর অনুমতিক্রমে।"

কেউ কি বলতে পারেন, গাছ কাটার এ অনুমতি কুরআনের কোন্ আয়াতে নাযিল হয়েছে ?

বদর যুদ্ধের পূর্বেকার একটি প্রতিশ্রুতি

বদর যুদ্ধের অবসানের পর যখন গণিমতের মাল বন্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন সূরা আনফাল নাযিল হয় এবং গোটা যুদ্ধের পর্যালোচনা করা হয়। রসূলুল্লাহ (সা) যখন যুদ্ধের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়েছেন, তখন থেকেই পর্যালোচনা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ۝ (الانفال : ٧)

"যে সময় আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে, দু'দলের মধ্যে (অর্থাৎ বণিক দল ও কুরাইশ সেনাদল) একটি দল তোমাদের হাতে আসবে এবং তোমরা চেয়েছিলে যে, দুর্বল দলটি (বণিক দল) তোমাদের হস্তগত হোক। অথচ আল্লাহ চেয়েছিলেন তার বাণীর দ্বারা সত্যকে সত্য করে দেখাতে এবং কাফেরদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৭)

এখন সমগ্র কুরআনের মধ্যে এমন একটি আয়াত কি চিহ্নিত করা যায় যেখানে আল্লাহ তায়ালা বদরগামী মুসলমানদের কাছে এ ওয়াদা করেছেন যে, দু'টি দলের মধ্যে একটির ওপর তাদেরকে বিজয়ী করবেন ?

মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনার জবাব

এ বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ۝

"যখন তোমরা কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন আল্লাহ তার জবাবে বললেন, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্যে পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি।"
–(সূরা আল আনফাল ঃ ৯)

আপনারা কি বলতে পারেন মুসলমানদের ফরিয়াদের এ জবাব কুরআনের কোন্ আয়াতে নাযিল হয়েছিল।

আপনারা (হাদীস অমান্যকারীগণ) মাত্র একটা উদাহরণ চেয়েছিলেন। আমি কুরআন শরীফ থেকে সাতটি উদাহরণ পেশ করলাম। এগুলো থেকে অকাট্যভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নবীর কাছে কুরআন ছাড়াও অহী নাযিল হতো। এরপর আর কোনো আলোচনা করার আগে আমি দেখতে চাই, আপনারা সত্যের কাছে মাথা নত করতে প্রস্তুত কি না?[১১৪]

আযান ও জুময়ার নামায

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِذَا نُودِىَ لِلصَّلٰوةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط (الجمعة : ٩)

"হে সেসব লোকেরা, যারা ঈমান এনেছ। জুমআর দিন যখন নামাযের জন্যে ডাকা হয় তখন যিক্‌রের দিকে ছুটে যাও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।"–(সূরা জুমুয়া ঃ ৯)

এ আয়াতটিতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, এতে নামাযের জন্যে মানুষকে ডাকার উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এতে একটি বিশেষ নামাযের জন্যে ডাকার কথা বলা হয়েছে—যা কেবল জুময়ার দিনই পড়তে হয়। তৃতীয়ত, এ আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, তোমরা নামাযের জন্যে ডাক এবং জুময়ার দিন একটা বিশেষ ধরনের নামায পড়। বর্ণনাভঙ্গী ও পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, লোকেরা নামাযের জন্যে ছুটে যেতে শৈথিল্য দেখাতো এবং বেচাকেনায় মগ্ন হয়ে থাকতো। এ জন্যে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করে ঐ ডাক ও ঐ বিশেষ নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর উদ্যোগ নেন, যাতে করে লোকেরা তাকে একটা ফরয কাজ মনে করে তাড়াতাড়ি তা সম্পন্ন করতে চলে যায়। এ তিনটি বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে যে মৌল সত্যটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরআনে নাযিল হয়নি এমন কতগুলো নির্দেশও নাযিল করতেন এবং সেসব নির্দেশ কুরআনে নাযিল হওয়া নির্দেশাবলীর মতই অবশ্য পালনীয় ছিল।

নামাযের এ ডাক হলো আযান—যা সারা দুনিয়ার মসজিদগুলো থেকে প্রতিদিন পাঁচবার ধ্বনিত হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনের কোথাও এ আযানের বাক্যগুলো নেই, আর প্রতিদিন পাঁচবার আযান দিতে হবে এমন নির্দেশও কোথাও নেই। এটা নবীর নির্দেশেই চালু হয়েছে। কুরআনে দু'জায়গায় সূরা জুময়ার এ আয়াতে এবং সূরা আল মায়েদার ৩৮তম আয়াতে একে সমর্থন করা হয়েছে। জুময়ার এ বিশেষ নামাযটি—যা দুনিয়ার সকল মুসলমান আদায় করে থাকেন—এ সম্পর্কেও কুরআনের কোথাও কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং এর সময় পদ্ধতিও জানানো হয়নি। এর সময় এবং পদ্ধতি নবী করীম (সা) নিজেই নির্ধারণ করেছেন। কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি কেবল এর অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার জন্যেই নাযিল হয়েছে। এ সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বলে যে, কেবলমাত্র কুরআনে বর্ণিত নির্দেশই শরীয়াতের নির্দেশ, সে ব্যক্তি আসলে সুন্নাহ ও হাদীসই শুধু অস্বীকার করে না, বরং কুরআনও অস্বীকার করে।[১১৫]

নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি

أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝ (العلق : ٩-١٠)

"সেই ব্যক্তিকে দেখেছ কি যে, এক বান্দাকে তখন বাধা দেয় যখন সে নামায পড়তে থাকে।"-(সূরা আল আ'লাক ঃ ৯-১০)

এখানে বান্দা অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)। কুরআনের একাধিক জায়গায় এভাবে নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বান্দা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন ঃ

سُبْحَٰنَ الَّذِيْ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا -

"পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আপন বান্দাকে এক রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান।"-(সূরা বনী ইসরাইল ঃ ১)

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَٰبَ -(الكهف : ١)

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি আপন বান্দার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন।"-(সূরা আল কাহাফ ঃ ১)

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝ (الجن : ١٩)

"আর যখন আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকার জন্যে দাঁড়ালো, তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করলো।"-(সূরা আল্ জ্বিন ঃ ১৯)

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর রসূলকে যে বান্দা বলে উল্লেখ করেছেন সেটি তার এক বিশেষ স্নেহসূচক বর্ণনাভঙ্গী। এ আয়াতগুলো থেকে আরো জানা যায় যে, আল্লাহ রসূলুল্লাহ (সা)-কে নবুয়াত দান করার পর নামায পড়ার নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে নিয়ম-পদ্ধতির উল্লেখ কুরআনের কোথাও নেই। কাজেই এখানে আবারও প্রমাণিত হলো যে, রসূলুল্লাহর কাছে শুধু কুরআনের অহীই নাযিল হতো না, বরং কুরআনে নেই এমন অনেক জিনিসও তাকে অহীর মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো।[১১৬]

অধ্যায় ঃ ৭

রসূলের মানবত্ব

নবীত্ব ও মানবত্ব

জাহেলী দৃষ্টিভঙ্গী ঃ পয়গম্বর মানুষ হতে পারে না

প্রত্যেক যুগেই অজ্ঞ লোকেরা এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করতো যে, মানুষ কখনো নবী হতে পারে না। তাই যখনই কোনো নবী এসেছেন তখন তাকে পানাহার, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসহ রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে জীবন যাপন করতে দেখে সিদ্ধান্ত করে যে, ইনি নবী নন, মানুষ ; আবার তার ইন্তিকালের বেশ কিছুকাল পর তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের মধ্যে এমন কিছু লোক জন্মগ্রহণ করে যারা প্রচার করতে শুরু করে যে, তিনি মানুষ ছিলেন না। কেননা তিনি নবী ছিলেন। এভাবে কেউ নবীকে খোদা, কেউ বা খোদার পুত্র, আবার কেউ খোদার অবতাররূপে বরণ করে নিয়েছে। মোটকথা একই ব্যক্তি কি করে নবী ও মানুষ—দুই-ই হতে পারে, তা ছিল অজ্ঞ লোকদের বুদ্ধির অগম্য।১১৭

মক্কার মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গী

প্রথমত মক্কাবাসীরা মানুষের নবী হওয়াটাই আশ্চর্যজনক মনে করতো। তারা ভাবতো, আল্লাহর বাণী বহন করে আসতে হলে ফেরেশতা আসবে, রক্ত-মাংসের মানুষ আসতে পারে না—যার বেঁচে থাকার জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন। তবুও যদি মানুষকে রসূল করে পাঠানো হয়ে থাকে তবে তার রাজা-বাদশাহ বা দুনিয়ার মহান ব্যক্তিদের মতো কোনো সত্তা হওয়া উচিত ছিল—যাকে এক নজর দেখার জন্যে মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকবে এবং যার সাক্ষাৎ লাভ অতি কষ্টসাধ্য ও দুর্লভ ব্যাপার হবে। এমন তো হতে পারে না যে, যে ব্যক্তি জুতা পায়ে খটাখট শব্দ করে বাজারে চলাফেরা করবে তার মতো একজন সাধারণ মানুষকে খোদার পয়গম্বর বানানো হবে। তারা ভাবতো, প্রত্যেক পথচারী প্রতিদিন অবাধে যার সাক্ষাৎ পায়, যার মধ্যে কোনো দিক দিয়েই কোনো রকম অসাধারণত্ব কেউ দেখতে পায় না, তাকে কে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে ? অন্য কথায়, তাদের মতে নবীর প্রয়োজন যদি আদৌ থেকে থাকে, তবে তা সাধারণ মানুষের হেদায়াতের জন্যে নয়, বরং মানুষকে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখাবার এবং জারিজুরি দেখিয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করার জন্যে। অথবা নিদেনপক্ষে একজন ফেরেশতা তার সাথে থাকবে যে হর-হামেশা একটা চাবুক হাতে নিয়ে লোকদের বলবে, "এ ব্যক্তির কথা মেনে চল, নইলে এখনই আল্লাহর আযাব নামিয়ে দিচ্ছি।" তাদের মতে এ তো বড় আশ্চর্যের ব্যাপারে যে, বিশ্বস্রষ্টা একজন মানুষকে নবুয়াতের মত বিরাট পদমর্যাদা দিয়ে একেবারে একাকী পাঠিয়ে দিলেন, আর সে লোকের কাছ থেকে গালি ও ইটপাটকেল খেতে থাকবে। তাদের সর্বশেষ দাবী ছিল এই যে, অন্ততপক্ষে রসূলের ভালো রোজগারের একটা ব্যবস্থা করে দেয়া আল্লাহর উচিত ছিলো। আল্লাহর রসূলের আর্থিক অবস্থা আমাদের একজন মামুলী সরদারের চেয়েও শোচনীয় হবে, এ কেমন কথা! যার হাতে নেই টাকা কড়ি, যার কপালে জোটেনি একটা ফলমূলের বাগান, সে কি না দাবী করে আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর নবী।১১৮

নবুয়াত ও খোদা-প্রেরিত সম্পর্কে জাহেলী ধ্যান-ধারণা

অজ্ঞ লোকদের মধ্যে সর্বদা এ ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, যে ব্যক্তি খোদা কর্তৃক প্রেরিত হবেন, তিনি অবশ্যই মানব ঊর্ধ্ব কোনো সত্তা হবেন। তাঁর দ্বারা অলৌকিক ঘটনা

সংঘটিত হওয়া উচিত। তিনি এক ইশারায় পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দিবেন। তিনি হুকুম করবেন আর অমনি পাহাড় সোনা হয়ে যাবে। মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের সব অবস্থা তার জানা থাকবে। তিনি বলে দেবেন হারানো জিনিস কোথায় আছে, রোগী মরবে না বাঁচবে, গর্ভবতীর পেটে পুত্র অথবা কন্যা, নর অথবা মাদী আছে। তারপর তাকে হতে হবে মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। যার ক্ষুৎ পিপাসা লাগে, ঘুমোতে হয়, যার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন আছে, যার কেনাবেচা করে প্রয়োজন মেটাতে হয়, যার ধার-কর্জ করার দরকার পড়ে এবং যাকে অভাব-দৈন্যে বিব্রত অবস্থায় দিন কাটাতে হয়, সে খোদার প্রেরিত পুরুষ কিভাবে হতে পারে ? এ ধরনের ধ্যান-ধারণা হযরত রসূলে করীম (সা)-এর সমসাময়িক লোকদের মনে বদ্ধমূল ছিল। তারা যখন মুহাম্মদ (সা)-এর পয়গম্বর হওয়ার দাবী শুনতো তখন তার কাছ থেকে অদৃশ্য জগতের তত্ত্ব ও তথ্য জানতে চাইত এবং অলৌকিক ঘটনাবলীর দাবী করতো। তাকে সাধারণ মানুষের মত দেখে বলতো, ইনি কেমন নবী, যিনি পানাহার করেন, স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে গৃহসংসার করেন—এবং হাটবাজারে যত্রতত্র চলাফেরা করেন ![১১৯]

নবীর মানুষ হওয়া অপরিহার্য কেন ?

আল্লাহ তায়ালা নবীর ওপর তাঁর বাণী (ইলহামী পয়গাম) প্রেরণের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ -(النحل : ٤٤)

"হে নবী ! আমি এ বাণী তোমার ওপর এ জন্যে নাযিল করেছি যাতে করে তুমি মানুষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অহীর ব্যাখ্যা করে তাদের বুঝিয়ে দিতে।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ৪৪)

অহী প্রেরণের এ উদ্দেশ্য সফল হবার জন্যে একজন মানুষেরই নবী হওয়া অপরিহার্য ছিল। আল্লাহর বাণী ফেরেশতার মাধ্যমেও পাঠানো যেত। এমনকি ছাপানো বইয়ের আকারে সরাসরি প্রত্যেক মানুষের কাছেও পাঠানো যেত। কিন্তু মহাজ্ঞানী, অসীম দয়ালু এবং মহিমান্বিত প্রতিপালক আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী পাঠিয়েছেন, শুধু মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দিয়েই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। সে জন্যে প্রয়োজন ছিল একজন সুযোগ্য মানুষের—যিনি সাথে করে ঐ বাণী নিয়ে আসবেন এবং অল্প অল্প করে মানুষকে পড়ে শোনাবেন। যে ভালো করে বুঝতে না পারে তাকে বুঝিয়ে দেবেন। যার মনে কোনো সংশয় থাকে তিনি তা দূর করবেন। যার মনে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তিনি তার জবাব দেবেন। যে তার কথা মানবে না এবং বিরোধিতা ও বাধাদান করবে, তার মোকাবিলায় তিনি এমন আচরণ করে দেখাবেন যা একজন আল্লাহর বাণী বহনকারীর পক্ষে শোভা পায়। যারা মেনে নেয় তাদেরকে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে নির্দেশ দেন। নিজের জীবনকে তাদের সামনে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরবেন এবং তাদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে সারা দুনিয়ার সামনে এমন একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে দেখাবেন, যার সামগ্রিক বিধি ব্যবস্থা উক্ত আল্লাহর বাণীর বাস্তব ব্যাখ্যারূপে গণ্য হবে।[১২০]

মানুষের হেদায়াতের জন্যে মানুষই নবী হতে পারে

বাণীবাহকের (পয়গাম্বর) কাজ শুধু এতটুকু নয় যে, তিনি এসে শুধু তার বাণী শুনিয়ে দিবেন। বরং তার কাজ এটাও যে, তিনি যে বাণীর আলোকে মানব জীবনের সংস্কার-সংশোধন করবেন সে বাণীর মূলনীতিসমূহ মানুষের সকল অবস্থার ওপর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করে তাকে দেখাতে হয়। তাঁর নিজের জীবনেও সেসব মূলনীতি বাস্তব বহিঃপ্রকাশ হতে হবে। যেসব অসংখ্য রকমারী মানুষ তাঁর বাণী শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করে তাদের মনের বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান তাঁকে বের করে দিতে হয়। যারা তাঁর দাওয়াত শোনে ও মানে তাদেরকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দিতে হয় যাতে করে ঐ বাণীর শিক্ষা অনুসারে একটা সমাজ গড়ে উঠতে পারে। যারা তার দাওয়াতকে অমান্য করে, বিরোধিতা করে ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়, যাতে করে বিকৃত ও ভ্রষ্টতার সমর্থকদেরকে পরাজিত করা যায় এবং যে সংস্কার সংশোধনের কাজে আল্লাহ নবীকে পাঠিয়েছেন তা সম্পন্ন করা যায়। এসব কাজ যখন মানুষের সমাজেই করতে হবে, তখন তার জন্যে মানুষ ছাড়া আর কোন্ প্রাণী পাঠানো যেতে পারে? ফেরেশতা পাঠানো হলে তিনি বড় জোর আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতেন এবং তারপর চলে যেতেন। মানুষের মধ্যে মানুষের মত বাস করে এবং মানুষের মত কাজ করে মানুষের জীবনে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সংস্কার-সংশোধনের কাজ করে দেখানো ফেরেশতার সাধ্যাতীত। এ কাজের জন্যে একজন মানুষই সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে।[১২১]

নবীদের মানবত্ব*

হযরত আদম (আ) মানুষ ছিলেন

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق

"আমি প্রথমে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম, তারপর তোমাদের আকৃতি দান করলাম। অতপর ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলাম, আদমকে সিজদা করো।"
–(সূরা আল্ আরাফ ঃ ১১)

ওপরে যা বলা হলো তার পরিষ্কার অর্থ এই ঃ

"আমি প্রথমে তোমাদের সৃষ্টির পরিকল্পনা করলাম এবং সৃষ্টির উপাদান তৈরী করলাম। তারপর সেই উপাদানকে মানবীয় আকৃতি দান করেছি। অতপর যখন একজন জীবন্ত মানুষ হিসেবে আদম (আ) অস্তিত্ব লাভ করলো তখন তাকে সিজদা করতে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলাম।"

আদম (আ)-কে যে সিজদা করানো হলো তা আদম হওয়ার কারণে নয়, বরং মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে, কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা সাদের ৫ম রুকূতে আছে ঃ

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○ (ص : ٧١-٧٢)

"সে সময়টার কথা ভেবে দেখ যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দিয়ে একজন মানুষ তৈরী করার সিদ্ধান্ত করেছি। যখন আমি তাকে পুরাপুরি তৈরী করে ফেলব আমার রূহগুলোর মধ্য থেকে একটা তার মধ্যে ফুঁকে দিব তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।"–(সূরা সাদ ঃ ৭১-৭২)**১২২

হযরত নূহ (আ) মানুষ ছিলেন

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ج اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ (هود : ٣١)

"(হযরত নূহ) বললেন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি এও বলি না যে, আমি অদৃশ্য জগতের জ্ঞান রাখি। আমি এমন দাবীও করি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি এ কথাও বলতে পারি না যে তোমাদের

---

* এখানে মাত্র কয়েকজন নবীর উল্লেখ করা হয়েছে—যারা মানুষ ছিলেন বলে কুরআনে স্পষ্টোক্তি করা হয়েছে কিংবা গ্রন্থাকার তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।–(সংকলকদ্বয়)

** এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রথম নবীই মানুষ ছিলেন। কেননা আদম (আ) নবী ছিলেন—এটা ইসলামের সর্ববাদীসম্মত আকীদা।–(গ্রন্থকার)

চোখে যারা ঘৃণ্য আল্লাহ তাদেরকে কখনোই কোনো কল্যাণ দান করেননি। তাদের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি এমন কথা বললে যালেমের মধ্যে গণ্য হবো।"–(সূরা হূদ ঃ ৩১)

বিরোধীরা যে বলতো, তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, তারই জবাবে এ কথা বলা হয়েছে। হযরত নূহ বলেন, সত্যি আমি একজন মানুষই বটে। আমি মানুষ ছাড়া অন্যকিছু হওয়ার দাবী কি কখনো করেছি যে, তোমরা এসব আপত্তি তুলছ? আমার কেবল এটুকুই দাবী যে, আল্লাহ আমাকে জ্ঞান ও কর্মের সোজা ও সঠিক পথ দেখিয়েছেন। এ কথার সত্যতা তোমরা যেভাবে খুশি যাচাই করে দেখে নাও। কিন্তু এটা কেমন যাঁচাই যে, তোমরা কখনো আমাকে গায়েবী খবরাদি জিজ্ঞেস করো, কখনো এমন সব উদ্ভট জিনিস চাও যেন আল্লাহর ধনভাণ্ডারের সমস্ত চাবিকাঠি আমার হাতেই রয়েছে ! আবার কখনো আমার মানুষের মত আহার বিহার নিয়ে প্রশ্ন তোল, যেন আমি ফেরেশতা হওয়ার দাবী করেছি। যে ব্যক্তি আকীদা-বিশ্বাস, আখলাক ও সমাজ ব্যবস্থার সঠিক পথ দেখবার দাবী করে, তাকে ঐসব ব্যাপারে যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পার। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, অমুকের গর্ভবতী মহিষী নর, না মাদী প্রসব করবে, তোমরা তাই জিজ্ঞেস করছ ! মনে হয় যেন মানব জীবনের জন্যে নির্ভুল নৈতিক ও তামাদ্দুনিক মূলনীতি নির্ণয়ের সাথে মহিষীর গর্ভধারণের কোনো সম্পর্ক আছে।১২৩

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَاهٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ج مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۝ (المؤمين : ٢٤-٢٥)

"তাঁর (হযরত নূহের) জাতির যেসব সর্দার তাঁকে মানতে অস্বীকার করেছিল তারা বললো, এ লোকটি তোমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমাদের ওপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করাই তার উদ্দেশ্য। আল্লাহর কাউকে পাঠাতে হলে ফেরেশতাই পাঠাতেন। মানুষ নবী হয়ে আসবে এমন কথা আমরা আমাদের বাপ-দাদার আমলে কখনো শুনিনি। না ওসব কিছু নয়। আসলে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আরো কিছুদিন দেখে নাও (হয়তো মাথা ঠিক হয়ে যাবে)।"

–(সূরা আল্ মু'মিনুন ঃ ২৪-২৫)

মানুষ নবী হতে পারে না—সকল পথভ্রষ্ট লোকদের এ এক সাধারণ ধারণা। এ জন্যেই কুরআন বারবার এ জাহেলী ধারণার উল্লেখ করে তা খতম করেছে। সে জোর দিয়ে বলেছে যে, সকল নবীই মানুষ ছিলেন এবং মানুষের জন্যে নবী মানুষেরই হওয়া উচিত।১২৪

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَانَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ج (هود : ٢٧)

"জবাবে তাঁর (হযরত নূহের) জাতির নেতৃস্থানীয় যেসব সর্দার তাকে মানতে অস্বীকার করেছিল—তারা প্রত্যুত্তরে বললো আমাদের দৃষ্টিতে তুমি তো আমাদের মতই একজন

মানুষ। আর আমরা দেখছি যে, আমাদের মধ্যে যারা নিম্ন শ্রেণীর লোক, কেবল তারাই না বুঝে-শুনে তোমার আনুগত্য গ্রহণ করেছে।"–(সূরা হূদ ঃ ২৭)

এটা সেই পুরানো জাহেলি ওজর-আপত্তি যা মক্কার লোকেরা মুহাম্মদ (সা)-এর বেলায় উত্থাপন করে বলতো, যে ব্যক্তি আমাদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ। খায়-দায় ও চলাফেরা করে ঘুমায়-জাগে এবং পরিবার-পরিজন রাখে। সে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হয়ে এসেছে, তা আমরা কিভাবে মেনে নেব।১২৫

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○(الاعراف : ٦٣)

"[হযরত নূহ (আ) বললেন,] তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই আপন জাতির এক লোকের মাধ্যমে তোমাদের প্রভুর স্মারকবাণী এলো যাতে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যায়, তোমরা ভ্রান্ত পথ থেকে বেঁচে যেতে পার- এর তোমরা অনুগৃহীত হতে পার ?"–(সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৬৩)

হূদ (আ) মানুষ ছিলেন

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَاهٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ○ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ○(المؤمنون : ٣٣ـ٣٤)

"তাঁর (হযরত হূদের) জাতির যেসব নেতৃস্থানীয় লোক কুফরী করেছিল, আখেরাতকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি দিয়েছিলাম, তারা বললো, এ লোকটি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা যা খাও সে-ও তাই খায়, তোমরা যা পান করো সে-ও তাই পান করে। এখন তোমরা যদি তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য মেনে নাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"–(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ৩৩-৩৪)

কিছু লোক ভুল বুঝেছে যে, এসব কথা তারা পরস্পরে বলাবলি করতো। না, তা নয়। সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে তাদের নেতারা এসব কথা বলতো। নেতাদের আশঙ্কা ছিল যে, নবীর পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং মনোমুগ্ধকর কথাবার্তায় লোকেরা হয়তো প্রভাবিত হয়ে পড়বে এবং তারা প্রভাবিত হয়ে পড়লে আমরা কাদের সর্দারি চালাব ? তাই তারা এভাবে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে লাগলো। তারা বলতো ওসব নবুয়াত-টবুয়াত আসলে কিছু নয়। নিছক ক্ষমতার লোভ ও গদির মোহে সে এসব কথা বলছে। ভায়েরা! একটু ভেবে দেখতো দেখি এ লোকটা তোমাদের থেকে আলাদা কোন্ দিক দিয়ে। তোমাদের মতই সে রক্ত মাংসের মানুষ। তার মধ্যে আর তোমাদের মধ্যে কোনোই প্রার্থক্য নেই। তা যখন নেই, তখন সে কেন নেতা হবে, আর তোমরাই বা কেন তার আনুগত্য করতে যাবে ? এসব কথাবার্তার মধ্যে এ ব্যাপারটা যেন অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত ছিল যে, তারা যে তাদের নেতা ও সরদার আছে। তা তাদেরই হওয়া উচিত।

তাদের ধারণা—তারা যে রক্ত মাংসের মানুষ এবং খানাপিনা করে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। কেননা ওটা তো আপনা থেকেই বহাল আছে এবং তা এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হলো—এ নতুন নেতৃত্বের ব্যাপারে যা এখন প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। পরবর্তীকালেও যারা কোনো নবাগত লোকের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, একমাত্র 'ক্ষমতার মোহ' এ অভিযোগ তুলেই তা করেছে। নবাগত লোকের মধ্যে এ জিনিসটির অস্তিত্ব যখনই অনুভব করেছে বা অস্তিত্ব থাকার সন্দেহ করেছে, তখন তাদের কথাবার্তায় অবিকল ঐ সরদারদের কথাবার্তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ক্ষমতা ও পদমর্যাদার লোভ ছাড়া আর কোনো জিনিস তাদের কাছে আপত্তিযোগ্য বলে মনে হয়নি। তবে তাদের নিজেদের বেলায় 'ক্ষমতা লোভের' অভিযোগ তোলার জো ছিল না। যেন ওটা তাদের স্বাভাবিক খাদ্য। এ খাদ্য অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ার দরুন তাদের বদহজম দেখা দিলেও তাতে আপত্তি তোলা চলবে না।১২৬

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ۝ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ط (الاعراف : ٦٧-٦٩)

"তিনি (অর্থাৎ হযরত হূদ) বলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি কোনো নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত নই। আমি রাব্বুল আলামীনের রসূল। আমার রবের বাণীগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেই। আর আমি তোমাদের জন্যে নির্ভরযোগ্য হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমাদের সাবধান করার জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের কাছে আল্লাহর স্মারকবাণী এসেছে। এতে কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছো?"

–(সূরা আল-আরাফ ঃ ৬৭-৬৯)

قَالُوْا لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ۝

"তারা বললো, আমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছা থাকলে ফেরেশতা পাঠাতেন। তাই তোমাদেরকে যে জন্যে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা মানি না।"

–(সূরা হা-মীম আস-সিজদাহ ঃ ১৪)

হযরত সালেহ ও শোয়াইব মানুষ ছিলেন

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ۝ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ج فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۝ (الشعراء : ١٥٣-١٥٤)

"তারা (সামুদ জাতির লোকেরা) জবাব দিল, তোমাকে যাদু করা হয়েছে। তুমি আমাদেরই মত মানুষ ছাড়া আর কি? তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে একটা নিদর্শন নিয়ে এস।"–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৫৩-১৫৪)

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ۝ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ۝

"তারা বললো ঃ তোমাকে যাদু করা হয়েছে। আর তুমি আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।"
–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৮৫-১৮৬)

হযরত মূসা ও হারুন মানুষ ছিলেন

ফেরআউন তার পরিষদগণ হযরত মূসা ও হারুন সম্পর্কে বলেন ঃ

فَقَالُوْآ اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ (المؤمنون : ٤٧)

"ফেরআউন বলতে লাগলো, আমাদেরই মত দু'জন মানুষের ওপর আমরা ঈমান আনবো নাকি ? আর তাও এমন দু'জন লোক—যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস।"

সকল নবীই মানুষ ছিলেন

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط (ابراهيم : ١١)

"তাদের রসূলগণ তাদেরকে বললো, সত্যিই আমরা তোমাদের মতই মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগৃহীত করেন।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ১১)

অর্থাৎ আমরা মানুষ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আল্লাহ অনুগ্রহপ্রর্বক তোমাদের মধ্য থেকে আমাদেরকে সত্যজ্ঞান ও পরিপূর্ণ দূরদর্শিতা দান করার জন্যে নির্বাচিত করেছেন। এতে আমাদের কোনো হাত নেই। এটা আল্লাহর এখতিয়ারের ব্যাপার—তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে যা দিতে চান তাই দেন। আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, যা কিছু আমাদের কাছে এসেছে তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেব। আর এটাও করতে পারি না যে, যেসব তত্ত্ব আমরা জানতে পারি—তা থেকে চোখ বন্ধ করে থাকব।[১২৭]

قَالُوْآ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ط تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (ابراهيم : ١٠)

"তারা (রসূলদেরকে) জবাব দিল, তোমরা আমাদেরই মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। বাপ-দাদার আমল থেকে আমরা সত্তার যেসব পূজা করে আসছি তা থেকে তোমরা আমাদেরকে দূরে রাখতে চাও। আচ্ছা, তাহলে কোনো সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে এসো।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ১০)

তাদের বক্তব্য ছিল ঃ তোমরা সর্বতোভাবে আমাদের মতই মানুষ। পানাহার করো, ঘুমাও, বিবি-বাচ্চা রাখ, ক্ষুৎ-পিপাসা, রোগ, শোক, ঠাণ্ডা, গরম সবকিছু আমাদের মতই অনুভব করো এবং যেসব মানবিক দুর্বলতা আমাদের আছে, তোমাদেরও তা আছে। তোমাদের মধ্যে কোনো অসাধারণত্ব আমরা দেখতে পাই না। এমতাবস্থায় আমরা কি করে মেনে নেব যে, তোমরা প্রেরিত পুরুষ এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে কথা বলেন এবং তোমাদের কাছে ফেরেশতা আসে ?[১২৮]

নবী মুহাম্মদ (সা)-ও মানুষ ছিলেন

মক্কায় কাফেররা বলতো যে, মুহাম্মদ (সা) রসূল নন। কেননা তিনি মানুষ।

وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ط (الفرقان : ٧)

"তারা বলে যে, এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে?"

وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ق الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ق هَلْ هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ج أَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ○ (الانبياء : ٣)

"এ যালেমরা পরস্পরে এই বলে কানাঘুষা করে ঃ এ লোকটি [মুহাম্মদ (সা)] তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কি? তা সত্ত্বেও তোমরা কি দেখে শুনে যাদুর শিকার হবে?"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩)

প্রাচীন জাহেলী ধ্যান-ধারণা

পবিত্র কুরআন মক্কার কাফেরদের এ জাহেলী ধ্যাণ-ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে বলে যে, এটা কোনো নতুন অজ্ঞতা নয় যা প্রথমবারের মত তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। বরং অতি প্রাচীনকাল থেকে সকল অজ্ঞ লোক এ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত ছিল যে, মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না আর রসূল কখনো মানুষ হতে পারে না। নূহ (আ)-এর জাতির নেতা ও সর্দাররা যখন হযরত নূহের রিসালাত অস্বীকার করে তখন তারা এ কথাই বলেছিল ঃ

مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يُرِيْدُ أَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلٰئِكَةً ج مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ ○ (المؤمنون : ٢٤)

"এ লোকটি তোমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। সে চায় তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে ফেরেশতা পাঠাতেন। আমরা তো আমাদের বাপ-দাদার কাছে এমন কথা কখনো শুনিনি যে, মানুষ রসূল হয়ে আসে।"

আ'দ জাতিও হযরত হূদ সম্পর্কে একই কথা বলেছিল ঃ

مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ○ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○ (المؤمنون : ٣٣-٣٤)

"এ ব্যক্তি তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা খাও তাই খায় এবং তোমরা যা পান করো তাই পান করে। এখন যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য মেনে নাও, তাহলে তোমরা বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

–(সূরা মু'মিনুন ঃ ৩৩-৩৪)

সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কেও একই কথা বলেছিল ঃ

أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ لا (القمر : ٢٤)

"আমরা কি নিজেদের মধ্যকার একজন মানুষেরই আনুগত্য মেনে নেব ?"
–(সূরা আল কামার ঃ ২৪)

প্রায় সকল নবীই এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। কাফেররা এ কথাই বলতো যে- إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا "তোমরা আমাদেরই মত মানুষ ছাড়া কিছু নও।" আর নবীরা তাদের জবাব দিতেন যে,

إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط

"বস্তুত আমরা তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। তবে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ১১)

হেদায়াত প্রাপ্তির পথে বাধা

এরপর কুরআন শরীফ বলে যে, এ জাহেলী ধারণাই প্রত্যেক যুগে মানুষকে হেদায়াত গ্রহণ করা থেকে দূরে রেখেছে। আর এ কারণেই বিভিন্ন জাতির ঘাড়ে নেমে এসেছে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ○ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَّأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا أَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا ـ

"ইতিপূর্বে যারা কুফরী করেছে এবং নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ উপভোগ করেছে, অতপর আরো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যাদের জন্যে রয়েছে, তাদের খবর কি তোমরা পাওনি ? তাদের এমন অবস্থা এ জন্যে হয়েছিল যে, তাদের কাছে তাদের রসূল অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে আসতো। কিন্তু তারা বলতো, একজন মানুষ আমাদের হেদায়াত করবে নাকি ? এ জন্যে তারা কুফরী করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।"
–(সূরা আত্ তাগাবুন ঃ ৫-৬)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى إِلَّا أَنْ قَالُوْا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا○

"মানুষের কাছে যখন হেদায়াত এসেছে তখন তার প্রতি ঈমান আনার পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল তাদের এ কথা যে, আল্লাহ কি মানুষকে রসূল করে পাঠিয়েছেন ?"
–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৪)

পূর্বেই এ কথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক যুগেই লোকেরা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো যে, মানুষ কখনো নবী হতে পারে না। এ জন্যে যখনই কোনো রসূল এসেছেন, তখন তাকে পানাহার করতে, পরিবারসহ বাস করতে এবং রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে দেখে তারা মত স্থির করে ফেলেছে যে, তিনি নবী নন। কেননা তিনি মানুষ। আবার নবীর ইন্তিকালের কিছুকাল পর তার ভক্ত-অনুরক্তের মধ্যে একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটলো যারা বলতে লাগলো যে, তিনি মানুষ ছিলেন না। কেননা তিনি নবী ছিলেন। এরপর কেউ তাকে খোদার পুত্র আবার কেউ বা খোদার অবতার বলতে লাগলো। মোটকথা একই সত্তার মধ্যে নবীত্ব ও মানবত্বের সমাবেশ কি করে হতে পারে—তা ছিল অজ্ঞদের কাছে চিরকাল এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।[১২৯]

মানুষকেই চিরকাল রসূল বানানো হয়েছে

পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ চিরদিন মানুষকেই রসূল করে পাঠিয়েছেন বস্তুত মানুষের হেদায়াতের জন্যে মানুষই রসূল হতে পারে, কোনো ফেরেশতা বা মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোনো সত্তা নয়।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ○

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لاَّيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ○(الانبياء : ٧-٨)

"হে নবী! আমি তোমার আগে মানুষদেরকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি—যাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম। তোমরা যদি এ কথা না জান, তাহলে জ্ঞানীজনদের কাছ থেকে জেনে নাও। আমি তাদের (নবীদের) এমন শরীর দিয়েছিলাম না যে তারা খাদ্য খাবে না আর তারা চিরঞ্জীবও ছিল না।"–(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৭-৮)

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا

رَّسُوْلاً ○(بنى اسرائيل : ٩٥)

"হে নবী! তাদেরকে বলে দাও যে, পৃথিবীতে যদি ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতো তবে তাদের কাছে আমি ফেরেশতাই রসূল করে পাঠাতাম।"১৩০

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ط اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى

الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ طوَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ

اتَّقَوْا ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ○ (يوسف : ١٠٩)

"হে মুহাম্মদ! তোমার আগে যত নবী পাঠিয়েছি তারা সকলেই ছিল মানুষ। যেসব জনপদের বাসিন্দাই তারা ছিল এবং তাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম। তারা কি পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি দেখতে পায়নি? বস্তুত যারা নবীদের কথামত তাক্ওয়ার জীবন যাপন করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যে আখেরাতের বাসস্থান অনেক ভালো। এখনো কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?"

–(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯)

এখানে একটা বিরাট বিষয়কে মাত্র দু' তিনটি বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা করলে এ দাঁড়াবে ঃ

তারা তোমার কথায় এ জন্যে কর্ণপাত করে না যে, যে ব্যক্তি মাত্র সেদিন তাদেরই শহরে জন্মগ্রহণ করলো এবং তাদের চোখের সামনেই শিশু থেকে যুবক এবং যুবক থেকে বৃদ্ধ হলো, তাকেই যে আল্লাহ হঠাৎ করে একদিন আপন দূত নিযুক্ত করেছেন, তা তারা কি করে বিশ্বাস করবে? কিন্তু এটা কোনো অভিনব ব্যাপার নয় যে, দুনিয়াতে তারাই প্রথম এর সম্মুখীন হয়েছে। ইতিপূর্বেও আল্লাহ তাঁর বহু নবী পাঠিয়েছেন এবং তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন। নবী কখনো এভাবেও আসেননি যে, হঠাৎ করে একজন অচেনা মানুষ কোনো শহরে আবির্ভূত হলো এবং সে বললো যে, তাকে নবী করে পাঠানো হয়েছে। বরং মানুষে

সংস্কার-সংশোধনের জন্যে যাদেরকেই পাঠানো হয়েছে তারা সবাই সংশ্লিষ্ট জনপদেরই বাসিন্দা ছিলেন। হযরত ঈসা, মূসা, ইবরাহীম এবং নূহ (আ) কোনো অচেনা-অজানা লোক ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও যেসব জাতি ও সম্প্রদায় নবীদের পরিশুদ্ধির আহ্বানে কর্ণপাত করেনি এবং নিজেদের ভিত্তিহীন চিন্তা, অলীক কল্পনা ও লাগামহীন প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলা অব্যাহত রেখেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে, তা তোমরা নিজেরাই গিয়ে দেখে এস। বাণিজ্যিক সফরে তোমরা আ'দ, সামুদ, মাদিয়ান ও লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত এলাকা দিয়ে চলাচল করেছ। সেখানে কি তোমরা কোনো শিক্ষা পাওনি ? আর দুনিয়াতে তারা যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকেই বুঝা যায় যে, পরকালে তারা আরো ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করবে। আর যারা দুনিয়াতে নিজেদের শুধরে নিয়েছে তারা শুধু দুনিয়াতেই সুখী হয়নি, পরকালেও তাদের পরিণাম হবে আরো ভাল।[১৩১]

অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের পার্থক্য

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ○

"হে মুহাম্মদ! তুমি তাদেরকে বলো ঃ "আমি তোমাদের এ কথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে। আমি ফেরেশতা হওয়ার দাবীও করি না। আমার কাছে যে, অহী আসে আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান উভয়ে কি সমান হতে পারে ? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না ?"-(সূরা আল আনআম ঃ ৫০)

অর্থাৎ আমি যেসব তত্ত্ব ও তথ্য তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং সেগুলো সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। অহীর দ্বারা আমাকে ঐ সব তথ্য নির্ভুলভাবে জানানো হয়েছে এবং সেগুলো সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য চাক্ষুস সাক্ষ্য। পক্ষান্তরে তোমরা এসব তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা এগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধ্যান-ধারণা নিছক কল্পনাভিত্তিক অথবা অন্ধ অনুকরণভিত্তিক। তাই অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের মধ্যে যে পার্থক্য, তোমাদের ও আমার মধ্যে সেই পার্থক্য। এ কারণেই আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ জন্যে নয় যে, আল্লাহর ধনভাণ্ডার আমার হাতে আছে, আমি গায়েবের কথা জানি অথবা আমি মানবিক দুর্বলতার উর্ধে।[১৩২]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ (الرعد : ٣٨)

"হে নবী! তোমার আগেও আমি অনেক রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের সবাইকে আমি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী করেছিলাম।"-(সূরা আরা'দ ঃ ৩৮)

এ হচ্ছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আরোপিত কিছু সমালোচনার জবাব। তারা বলতো, ইনি কেমন নবী যে বিবি-বাচ্চা রাখে ? নবীর আবার প্রবৃত্তির লালসার সাথে কি সম্পর্ক ?[১৩৩]

নবীর ফেরেশতা হওয়া উচিত ছিল (?)

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ○ (الحم السجدة : ١٤)

"যখন আল্লাহর রসূলগণ তাদের কাছে সামনে ও পেছনে থেকে এলো এবং তাদেরকে বলল, আল্লাহ ছাড়া আর কার দাসত্ব কর না, তখন তারা বলল, আমাদের রব ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতেন। কাজেই তোমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তা আমরা মানি না।"–(সূরা হা-মীম আস-সিজদা ঃ ১৪)

অর্থাৎ আমাদের বর্তমান ধর্ম যদি আল্লাহর পছন্দ না হতো এবং আমাদেরকে এ ধর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যে কোনো রসূল পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতা পাঠিয়ে দিতেন। তোমরা যেহেতু ফেরেশতা নও বরং আমাদের মতই মানুষ, তাই আমরা বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে সেই দ্বীন গ্রহণ করবো যা তুমি পেশ করছ। যে জন্যে তোমাকে পাঠানো হয়েছে তা আমরা মানি না—কাফেরদের এ উক্তি বিদ্রূপাত্মক। এর অর্থ এ নয় যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর প্রেরিত বলে স্বীকার করতো এবং শুধু তারা কথা অমান্য করতো। এ ধরনের বিদ্রূপ ফেরাউন ও হযরত মূসার সাথে করেছিল। সে তার পরিষদগণকে বলেছিলঃ

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ○ (الشعراء : ٢٧)

"যে রসূলকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তাকে তো একেবারে পাগল মনে হচ্ছে।"–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ২৭)১৩৪

নবী হলে তো বড়লোক হবে

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ○ (الزخرف : ٣١)

"তারা বলে, এ কুরআন দু'টি শহরের কোনো একজন বড়লোকের ওপর নাযিল হল না কেন?"–(সূরা আয যুখরুক ঃ ৩১)

এখানে দু'টি শহর অর্থ মক্কা ও তায়েফ। কাফেরদের বক্তব্য ছিল, আল্লাহর যদি সত্যিই কোনো রসূল পাঠানো দরকার হত এবং তিনি তার ওপর কিতাব নাযিল করতে চাইতেন, তাহলে আমাদের এ কেন্দ্রীয় শহর দু'টির কোনো নামকরা লোককেই তিনি এ জন্যে বেছে নিতেন। রসূলরূপে মনোনীত করার জন্যে তিনি কিনা খুঁজে পেলেন এমন একজনকে যে আজন্ম এতীম, যার এক কানাকড়িও পৈর্তৃক সম্পত্তি নেই, যে ছাগল চরিয়ে যৌবন অতিবাহিত করেছে, যে বর্তমানে কালযাপন করছে স্ত্রীর টাকায় ব্যবসা করে, যে কোনো গোত্রের সরদারও নয়, কোনো বংশের মুরুব্বীও নয়। মক্কায় কি অলিদ ইবনে মুগিরা এবং উতবা ইবনে রাবিয়ার মত নামকরা সরদার ছিল না? তায়েফে উরওয়াহ বিন মাস'উদ, হাবিব বিন আমর, কিনানা বিন আবদে আমর এবং ইবনে আবদে ইয়ালিলের মত নেতৃস্থানীয় লোক কি ছিল না? এ ছিল কাফেরদের যুক্তি। প্রথমে তো তারা মানুষের রসূল হওয়াটা মানতেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কুরআনে বার বার যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাদের

এ ধারণা পুরোপুরিভাবে খণ্ডন করা হল এবং তাদেরকে বলা হল যে, এর আগে সবসময় মানুষই রসূল হয়ে এসেছেন, মানুষের হেদায়াতের জন্যে একমাত্র মানুষেরই রসূল হওয়া সম্ভব, মানুষ ছাড়া অন্য কারো এ কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া যে রসূলই দুনিয়ায় এসেছেন, তিনি হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে আসেননি বরং মানুষের আবাসস্থলেই জন্মেছেন, হাটে-বাজারে চলাফেরা করেছেন, সন্তানাদির পিতা ছিলেন, তিনি পানাহার থেকেও নিবৃত্ত ছিলেন না।

কুরআনের এসব যুক্তি শুনে তারা নতুন পাঁয়তারা শুরু করলো এবং বলতে লাগল, বেশ মানুষই রসূল হয়ে আসুক তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তাকে অবশ্যই একজন নামকরা, ধনী ও প্রভাবশালী লোক হতে হবে। একটা বিরাট দলপতি হতে হবে এবং জনগণের ওপর তার বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকতে হবে। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ এ মর্যাদার উপযুক্ত কি করে হতে পারে?[১৩৫]

নবী (সা)-এর জীবিকা অন্বেষণ নিয়ে প্রশ্ন

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ط لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًاO (الفرقان : ٧)

"তারা বলে, এ কেমন রসূল, যে পানাহার করে এবং হাটবাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠানো হল না কেন—যে তার সাথে থাকত এবং (অমান্যকারীদেরকে) ধমক দিত?"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৭)

অর্থাৎ প্রথমতঃ মানুষের রসূল হওয়াটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। আল্লাহর বাণী নিয়ে কাউকে আসতে হলে ফেরেশতাই আসত। রক্ত-মাংসের মানুষ নয়—যার বেঁচে থাকার জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন। তবুও যদি ধরে নেয়া যায় যে, মানুষকেই রসূল বানানো হয়ে থাকে, তাহলে তার নিদেন পক্ষে রাজা-বাদশাহ বা দুনিয়ার অন্য কোনো বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক হওয়া উচিত ছিল—যাকে একনজর দেখার জন্যে সবাই উদগ্রীব হত এবং বহু সাধ্য-সাধনার পর যার দর্শন লাভ ভাগ্যে জুটতো। তা না হয়ে একজন সাধারণ মানুষকে বিশ্বস্রষ্টার পয়গাম্বর বানানো হল। যে জুতা পায়ে খট্ খট্ করে বাজারে ঘুরে বেড়ায়। একজন সাধারণ পথচারী যাকে প্রতিদিন দেখতে পায়, যার মধ্যে কোনোই অসাধারণত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। তাকে কে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে? অন্য কথায় বলা যায়, তাদের মতে, নবীর কোনো দরকার যদি থেকেও থাকে তবে তা মানুষের হেদায়াতের জন্যে নয়, বরং অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম দেখাবার জন্যে অথবা নিজের জারিজুরি দেখিয়ে মানুষের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার জন্যে।[১৩৬]

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّاۤ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ط وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ط اَتَصْبِرُوْنَ ج وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًاO (الفرقان : ٢٠)

"হে মুহাম্মদ! তোমার আগে আমি যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম, তারাও সকলে পানাহার করত এবং বাজারে চলাফেরা করত। আসলে আমি তোমাদেরকে পরস্পরের

পরীক্ষার উপায় বানিয়ে দিয়েছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে ? তোমাদের প্রতিপালক সব কিছু দেখতে পান।”–(সূরা আল ফুরকান ঃ ২০)

‘এ কোন্ ধরনের রসূল যে খানাপিনা করে এবং বাজারে চলাফেরা করে ?’ মক্কার কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাব ওপরের আয়াতে দেয়া হয়েছে। এখানে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, মক্কার কাফেরগণ হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসমাঈল, হযরত মূসা এবং আরো অনেক নবী সম্পর্কে অবহিত ছিল। এমনকি তাদের রিসালাতকেও তারা স্বীকার করতো। আগের কোন্ নবী এমন ছিলেন যিনি খাদ্য গ্রহণ করেননি এবং বাজারে চলাফেরা করেননি ? এ জন্যেই বলা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে তোমাদের এ অভিনব প্রশ্ন কেন ? স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-এর কথাই ধরা যাক, যাঁকে খৃস্টানরা আল্লাহর পুত্র বানিয়ে রেখেছে এবং যার মূর্তি মক্কার কাফেরগণ কাবা ঘরে রেখেছিল। সেই হযরত ঈসাও বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আহার করতেন ও বাজারে ঘোরাফিরা করতেন।১৩৭

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ○

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لاَّيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ○(الانبياء : ٧ - ٨)

“হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বেও আমি মানুষকেই রসূল করে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। তোমরা যদি তা না জান তাহলে আহলে কিতাবকে জিজ্ঞেস কর। তাদেরকে আমি এমন শরীর দেইনি, যার খাওয়ার প্রয়োজন হতো না ? আর তারা চিরঞ্জীবও ছিল না।”–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭-৮)

“এ লোকটি তো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নয়।” কাফেরদের এ কথার জবাব ওপরের আয়াতে দেয়া হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মানুষ হওয়াকেই তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করতো যে, তিনি নবী ছিলেন না। তার জবাবে বলা হচ্ছে যে, আগের জামানার যেসব মহান ব্যক্তিকে তোমরা আল্লাহর প্রেরিত বলে স্বীকার করতে তারা সকলেই মানুষ ছিলেন এবং মানুষ থাকা অবস্থাতেই তারা আল্লাহর ওহী লাভ করতেন।১৩৮

অধ্যায় ঃ ৮

দ্বীনে হক

ধর্ম সম্পর্কে জাহেলী ধারণা ও ইসলামী ধারণা

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াত লাভের আগে পৃথিবীতে ধর্ম সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা প্রচলিত ছিল তা হলো এই যে, জীবনের অনেকগুলো বিভাগের মধ্যে এও একটা দিক বা বিভাগ। অন্য কথায় বলা যায়, ধর্ম মানুষের পার্থিব জীবনের একটা পরিশিষ্ট। যাতে করে পরকালীন জীবনের মুক্তির ব্যাপারে একে সার্টিফিকেট হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মানুষ ও খোদার মধ্যে যে সম্পর্ক ধর্ম কেবলমাত্র তার সাথেই সংশ্লিষ্ট। যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনে উচ্চতর মর্যাদা সহকারে মুক্তি কামনা করে, তার উচিত জীবনের অন্য সব বিভাগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র এ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তবে যার এত বড় মর্যাদা কাম্য নয় বরং কোনো মতে মুক্তি পাওয়াকেই যে যথেষ্ট মনে করে, আর সেই সাথে পার্থিব জীবনে খোদা তার ওপর একটু কৃপাদৃষ্টিও রাখুক এবং দুনিয়ার কায়কারবারে অব্যাহত সাফল্য ও উন্নতিও দান করতে থাকুক—এ বাসনা যে পোষণ করে পার্থিব জীবনের সাথে ধর্মকে পরিশিষ্ট হিসেবে সন্নিবেশিত রাখাকে যথেষ্ট মনে করে। জাহেলী ধারণা মতে দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম যে নিয়ম-কানুন অনুসারে চালু রয়েছে, সেভাবেই চালু থাকবে আর তার সাথে কতিপয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রসম রেওয়াজ পালন করে খোদাকেও তুষ্ট রাখা হবে। মানুষের নিজের সত্তার সাথে অন্যান্য মানুষের সাথে এবং পরিবেশ প্রতিবেশের সাথে যে সম্পর্ক সেটা তার ও তার খোদার মধ্যকার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উভয়ের মধ্যে কোনো সংশ্রব নেই।

ধর্ম সম্পর্কে এ ছিল জাহেলিয়াতের ধারণা। এর ভিত্তিতে কোনো মানবীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। সভ্যতা ও কৃষ্টি অর্থে সমগ্র মানব জীবনকেই বুঝায়। তাই যে জিনিস জীবনের একটা পরিশিষ্ট তার ওপর সমগ্র জীবনের ভিত্তি স্থাপন স্পষ্টতঃই সম্ভব নয়। এ জন্যেই চিরকাল দুনিয়ার সর্বত্র ধর্ম একদিকে আর সভ্যতা ও কৃষ্টি অন্যদিকে পরস্পর থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। যদিও এ দু'টি জিনিস একে অপরকে কম বেশি প্রভাবিত না করে পারেনি, কিন্তু সে প্রভাব ছিল বিপরীত ধর্মী ও বিভিন্নমুখী, বহু জিনিসের সমাবেশের ফলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। তাই সে প্রভাবকে কোথাও ফলপ্রসূ হতে দেখা যায়নি। ধর্ম যখন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে, তখন সেখানে বৈরাগ্যবাদ, বস্তুগত বন্ধনের প্রতি ঘৃণা, পার্থিব সুখ-সম্ভোগে অনীহা, উপকরণ নির্ভর জগতের সাথে সম্পর্কহীনতা, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, বিদ্বেষ এবং সংকীর্ণতার প্রবণতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ প্রভাব কোনো অর্থেই উন্নয়নমূলক ছিল না বরং ছিল পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এক জগদ্দল পাথর। অপরদিকে যে সভ্যতা-সংস্কৃতির বুনিয়াদ ছিল বস্তুবাদ ও প্রবৃত্তি পূজা-তা যখনই ধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে তখন তাকে কলুষিত করে দিয়েছে। এ সভ্যতা-সংস্কৃতি ধর্মের ভিতর প্রবৃত্তি পূজার যাবতীয় নোংরামি ও অপবিত্রতা প্রবিষ্ট করে দিয়েছে। ফলে মন যেসব অতি নোংরা ও কদর্য কাজকর্ম করতে চায় সেগুলোকে ধর্মীয় খোলস পরিয়ে দেয়া হয়, যাতে করে না আপন বিবেক ভর্ৎসনা করতে পারে, আর না অন্য কেউ এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে। তারই প্রভাবস্বরূপ কতিপয় ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের

আমরা ভোগ-লালসা পূজা ও নির্লজ্জতার এমন সব রীতি পদ্ধতি দেখতে পাই, যাকে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরের স্বধর্মীগণও চরিত্রহীনতা বলে আখ্যায়িত করে।

ধর্ম ও সভ্যতার এ পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বাদ দিলেও এ সত্যটি পরিস্ফুট হয় যে, পৃথিবীর সর্বত্রই সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাসাদ ধর্মহীনতা ও চরিত্রহীনতার ভিত্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সত্যিকার ধার্মিক যারা তারা নিজেদের মুক্তির চিন্তায় দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর দুনিয়াদারীর যাবতীয় কাজ-কর্ম দুনিয়াদার লোকেরা আপন প্রবৃত্তির বাসনা ও নিজেদের ত্রুটিপূর্ণ অভিজ্ঞার ভিত্তিতে যেমন খুশী তেমনভাবে চালিয়েছে। সেই সাথে প্রয়োজনবোধে নিজেদের খোদাকে খুশী করার জন্যে কিছু ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানও পালন করেছে। অবশ্যি এসব কাজ-কর্ম আপন আপন যুগে ত্রুটিহীন মনে করা হলেও পরবর্তীকালে তা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য ধর্ম তাদের জন্যে জীবনের একটা নিছক পরিশিষ্ট ছাড়া আর কিছু ছিল না বলে তা সঙ্গে থাকলেও নিছক পরিশিষ্ট হিসেবেই রয়ে গেছে। সব রকমের রাজনৈতিক যুলুম, অত্যাচার, সব রকমের অর্থনৈতিক বেইনসাফী ও অবিচার, সব রকমের সামাজিক বৈষম্য এবং সব রকমের সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তির সাথেই এ পরিশিষ্ট সংশ্লিষ্ট হতে পারতো। পরিশিষ্ট হিসেবে এ ধর্ম প্রতারণা ও দস্যুবৃত্তি, ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ, সুদখুরি, কার্পণ্য, ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তির সাথে সহ অবস্থান করেছে।

দ্বীনের ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীন ধ্যান-ধারণা

নবী মুহাম্মদ (সা) যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন তা এছাড়া আর কিছু ছিল না, যে ধর্ম সম্পর্কে জাহেলী তথা অনৈসলামী ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করে তিনি একটা বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তামূলক ধারণা উপস্থাপিত করবেন। আর শুধু উপস্থাপিত করেই ক্ষ্যান্ত হবেন না বরং তার ভিত্তিতে সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সাফল্যের সাথে তা পরিচালনা করে দেখাবেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ধর্ম মানুষের জীবনের নিছক একটা পরিশিষ্ট হলে তা হবে একেবারে অর্থহীন। এমন জিনিসকে ধর্ম নামে আখ্যায়িত করাও ভুল। আসলে 'দ্বীন' হলো সেই জিনিস—যা জীবনের অংশ নয় বরং গোটা জীবন। জীবনের প্রাণশক্তি এবং তার প্রেরণা শক্তি, বোধ ও অনুভূতি শক্তি, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী, ভালমন্দ নিরূপণের মানদণ্ড। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং পদে পদে যা সঠিক, সরল ও বক্র পথকে আলাদা করে দেখায়, বিপদগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং সত্য সঠিক পথে অবিচল থাকার ও সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শক্তি যোগায় এবং দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত জীবনের এ অফুরন্ত অভিযাত্রায় মানুষকে সফলতা ও সৌভাগ্যের সাথে প্রত্যেকটি স্তর পাড়ি দিতে সাহায্য করে।

এ ধর্মেরই নাম ইসলাম। এটা জীবনে পরিশিষ্ট হওয়ার জন্যে আসেনি। বরং সত্যি কথা এই যে, পুরানো সেই জাহেলী ধারণা অনুসারে তাকে যদি জীবনের একটা পরিশিষ্ট হিসেবেই গ্রহণ করা হয় তাহলে তার আগমন ও আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। খোদা ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিয়ে এ যেমন কথা বলে, তেমনি কথা বলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে সমগ্র সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নিয়ে। মানুষকে এ সত্যটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে সে এসেছে যে, সম্পর্কের এ বিভাগগুলো আলাদা-আলাদা নয় এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নও নয় বরং তা একটি সমষ্টির কয়েকটি অবিচ্ছিন্ন

ও সমন্বিত অংশ মাত্র। এগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের ওপরই মানুষের সার্বিক মুক্তি ও সাফল্য নির্ভরশীল। মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা সুষ্ঠু না হলে মানুষের সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক সুষ্ঠু হতে পারে না। সুতরাং এ সম্পর্ক দু'টি একে অপরের বিশুদ্ধি ও পূর্ণতা সাধন করে এবং উভয়ে মিলে একটি সফল জীবন গড়ে তোলে। এ সফল জীবনের জন্যে মানুষকে মানসিকভাবে ও সক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করাই ধর্মের আসল কাজ। যে ধর্ম এ কাজটি করে না, সেটা ধর্মই নয়। আর যে ধর্ম এ কাজ সম্পন্ন করে, সে ধর্মই ইসলাম। এ জন্যেই আল্লাহ বলেছেন, اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ 'আল্লাহর কাছে দ্বীন বলতে একমাত্র ইসলাম।'

একটা বিশেষ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলাম একটা বিশেষ মনোভঙ্গী (Attitude of mind) এবং সমগ্র জীবন সম্পর্কে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ (Out-look of Life). অতপর সে একটা বিশেষ কর্মপদ্ধতিও যা নির্ধারিত হয় মনোভঙ্গী এবং ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে। এ মনোভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে যে কাঠামো তৈরি হয় সেটাই ইসলাম, সেটাই ইসলামী সভ্যতা এবং ইসলামী তামাদ্দুন। এখানে ধর্ম আর তাহ্যিব-তামাদ্দুন আলাদা আলাদা জিনিস নয় বরং সব মিলে একটা একক সমষ্টি গড়ে তোলে। ঐ একই মনোভঙ্গি ও জীবন দর্শন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে। মানুষের ওপর খোদার কি অধিকার তার আপন সত্তার কি অধিকার, মা-বাপ, স্ত্রী-সন্তানাদি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, লেন-দেন, সম্পর্কিত লোকজন, স্বধর্মী-বিধর্মী, শত্রু-মিত্র, এক কথায় সমগ্র মানবজাতির এবং বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু ও শক্তির কি কি অধিকার রয়েছে—সেসব অধিকার এ জীবনদর্শন নির্ণয় করে এবং তার মধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করে। একজন মানুষের মুসলমান হওয়াটাই এ বিষয়ের যথেষ্ট নিশ্চয়তা যে, সে এসব অধিকার পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে পালন করবে এবং অন্যায় করে একটি অধিকার অন্যটির জন্যে বিনষ্ট করবে না। তারপর এ মনোভঙ্গী ও জীবনদর্শন মানবজীবনের একটি সুমহান নৈতিক লক্ষ্য ও একটি পূতঃপবিত্র আধ্যাত্মিক গন্তব্যস্থল নির্ধারণ করে দেয়। আর জীবনের সকল চেষ্টা-সাধনাকে তা যে কোনো ক্ষেত্রেরই হোক না কেন, এমন পথে পরিচালিত করতে চায় যা সকল দিক থেকে ঐ একই কেন্দ্রের দিকে আবর্তিত হয়।

মূল্যবোধের সিদ্ধান্তকর মানদণ্ড

উল্লিখিত কেন্দ্রটি একটি সিদ্ধান্তকর জিনিস। সবকিছুর মূল্যমান নিরূপিত হয় তার নিরীখেই। সকল জিনিস পরীক্ষা করা হয় এ মাপকাঠিতেই। এ কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে পৌঁছুতে যে জিনিসই সহায়ক হয় তাকেই গ্রহণ এবং যে জিনিসই প্রতিবন্ধক হয় তাকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা হয়। ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্রতম ও নগণ্যতম ব্যাপার থেকে শুরু করে সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের বড় বড় ব্যাপারেও এ মানদণ্ড সমানভাবে কার্যকর। এই মানদণ্ডই ঠিক করে দেয় যে, একজন মানুষকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে, পোশাক পরিধানে, নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কে, লেন-দেনে, কথাবার্তায়, এক কথায় জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে কোন্ কোন্ সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কি কি বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে —যাতে করে সে তার গন্তব্য মুখী রাস্তার ওপর বহাল থেকে এগিয়ে যেতে পারে এবং পথচ্যুত হয়ে বাঁকা রাস্তায় চলতে আরম্ভ না করে। একই মানদণ্ডে এও স্থির করা হয় যে,

সামষ্টিক জীবনে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধন কোন্ নীতিমালা অনুসারে রচনা করা প্রয়োজন—যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন কার্যধারা সেই নির্ধারিত লক্ষ্য পথেই ধাবমান হয় এবং যেসব পথে চললে লক্ষ্যচ্যুত হতে হয় সেসব পথে ধাবমান না হয়। আর আকাশ ও পৃথিবীর যেসব বস্তু মানুষের আয়ত্তে আসবে এবং যেগুলোকে মানুষের বশীভূত করা হবে সেগুলোকে সে কিভাবে ব্যবহার করবে যাতে করে সেগুলো তার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হতে পারে। লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাওয়ার সহায়ক এবং কি কি ও কোন্ কোন্ পন্থা পরিহার করবে যাতে করে সেগুলো তার সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। মানদণ্ডটি আরো বলে দেয়, অনৈসলামী দলগুলোর সাথে মৈত্রীস্থাপনে ও শত্রুতা অবলম্বনে, যুদ্ধ ও সন্ধিতে উদ্দেশ্যের অবিনয়তায় এবং পার্থক্যে বিজয়কালে এবং বিজিত অবস্থায়, জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা অর্জনে, সভ্যতা ও কৃষ্টির আদান-প্রদানে ইসলামী দলকে কোন্ মূলনীতি অনুসরন করতে হবে—যাতে করে বহিঃসম্পর্কের এ বিভিন্ন দিকে তারা যেন নির্ধারিত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয় বরং যতখানি সম্ভব ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অথবা সচেতন বা অবচেতনভাবে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মানব গোষ্ঠীর অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট লোকেরও সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করবে। কারণ প্রাকৃতিক দিক দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যেও তাই যা ইসলামপন্থীদের।

মসজিদ থেকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত

মোদ্দাকথা, ওটা একই দৃষ্টিভঙ্গি না মসজিদ থেকে বাজার ও কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত ইবাদাতের রীতি-পদ্ধতি থেকে রেডিও ও বিমান পরিচালনা পদ্ধতি পর্যন্ত, অযু-গোসল, পবিত্রতা ও পেশাব-পায়খানার খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েল থেকে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি পর্যন্ত, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রকৃতি রাজ্যের নিদর্শনাবলীর চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ এবং প্রাকৃতিক আইন-কানুনের বিরাট তত্ত্বানুসন্ধান পর্যন্ত জীবনের সকল তৎপরতা, চেষ্টা-সাধনা এবং চিন্তা ও কর্মের সকল বিভাগ ও শাখা-প্রশাখাকে এমন এক একক বস্তুতে পরিণত করে যার অংশগুলোর মধ্যে একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা ও সংযোগ-সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। অতপর এ অংশগুলোকে একটা মেশিনের অংশাবলীর মতো পরস্পরকে এমনভাবে সংযুক্ত করে দেয়া হয় যে, মেশিনটি চালু হওয়ার পর তার থেকে একই ধরনের ফল পাওয়া যায়।

বিপ্লবাত্মক মতবাদ

ধর্মীয় জগতে এটি ছিল একটি বিপ্লবাত্মক মতবাদ। কিন্তু জাহেলিয়াতের ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন মন-মস্তিষ্কে এ মতবাদ স্থান লাভ করতে পারেনি। আজকের দুনিয়া খৃষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অনেক বেশী অগ্রসর। তথাপি আজও এতটা অনগ্রসরতা ও অন্ধ কুসংস্কার বিদ্যমান যে, প্রাচীন জাহেলিয়াতের অজ্ঞ লোকেরা এ বিপ্লবাত্মক মতবাদ যেমন গ্রহণ করতে পারেনি, তেমনি ইউরোপের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে উচ্চ শিক্ষিত যুবকরাও এ মতবাদ উপলব্দি করতে পারেনি। ধর্ম সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা হাজার হাজার বছর ধরে বংশানুক্রমে চলে আসছে তার প্রভাব এখনো তাদের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে আছে। যুক্তিভিত্তিক সমালোচনা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের উচ্চাঙ্গ প্রশিক্ষণের পরও তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়নি। খানকা ও মসজিদের অন্ধকারে হুজরাখানায় যারা থাকেন, তারা যদি ধার্মিকতার অর্থ নির্জনে বসে 'আল্লাহ-আল্লাহ' জপ

করা বুঝে থাকেন এবং দ্বীনদারিকে ইবাদাতের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমিত মনে করেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন তো বটেই। অজ্ঞ জনসাধারণ যদি ধর্মকে ঢাক-ঢোল বাজানো মহররমের তাযিয়া এবং গান-বাজনায়, মাসয়ালা জানার মধ্যেই সীমিত মনে করে তাতেও আশ্চর্যের কিছুই নেই। কেননা তারা তো অজ্ঞই। কিন্তু এলমের নূর সংরক্ষণকারী আমাদের এসব বুযর্গদের কি হলো যে, তাদের মন থেকে জরাজীর্ণতার অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে না কেন ? তারাও ইসলাম ধর্মকে ঐ অর্থেই একটি ধর্ম মনে করে যে অর্থে একজন অমুসলিম জাহেলী ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করে।১৩৯

দ্বীনে হক কাকে বলে ?*

কুরআন যে দাবীসহ তার উপস্থাপিত মতাদর্শের দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানায়, তা তার নিজস্ব ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ -(ال عمران : ١٩)

"আল্লাহর নিকটে দ্বীন বলতে শুধু ইসলাম।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)

সচরাচর কুরআনের এ বাক্যটির এরূপ সাদাসিধা ব্যাখা দেয়া হয়ে থাকে যে, আল্লাহর নিকটে সত্য ধর্ম হলো একমাত্র ইসলাম। আর 'ইসলাম' সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণা এই যে, এটা একটা ধর্মের নাম। আজ থেকে তের শ' বছর আগে আরব দেশে এ ধর্মের উদ্ভব হয় এবং নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ভিত্তিস্থাপন করেন। 'ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন' শব্দগুলো আমি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেছি। কারণ শুধু অমুসলিমগণই নয়, বরং বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানও নবী মুহাম্মদ (সা)-কে ইসলামের প্রবর্তক বলে ও লিখে থাকেন। ভাবখানা এই যে, ইসলামের সূচনাই যেন তাঁর থেকেই হয়েছে এবং তিনিই এর প্রতিষ্ঠাতা (Founder)। এ কারণে একজন অমুসলিম যখন কুরআন অধ্যায়ন করতে করতে এ বাক্যটিতে এসে পৌঁছে, তখন সে ভাবে, সকল ধর্মই নিজেকে সত্য এবং অন্যান্য ধর্মকে অসত্য ও বাতিল বলে যেমন ঘোষণা করে থাকে, কুরআনও তেমনি নিজের উপস্থাপিত ধর্মকে সত্য বলে ঘোষণা করছে। এ কথা চিন্তা করে সে আয়াতটি অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হয়। আবার একজন মুসলমান যখন এ আয়াতটি পড়ে তখন সে-ও কোনো চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন বোধ করে না। কারণ এ বাক্যে যে ধর্মকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে, সে নিজেও তাকে তাই বলে মানে। অথবা যদি কিছু চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে তার মনে কোনো আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাহলে তা সাধারণত এ জন্যে যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও অনুরূপ অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনা করে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করতে হয়। কিন্তু আসলে কুরআনের এ বাক্যটি এমন যে, একজন চিন্তাশীল জ্ঞানপিপাসুর উচিত এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। এ যাবত এর ওপরে যতখানি চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে তার চেয়ে অধিক চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

কুরআনের এ দাবীটি যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করার জন্যে সর্বপ্রথম আমাদের 'আদ্বীন' এবং 'আল ইসলাম' শব্দ দু'টোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে।

---

* ১৯৪৩ সালের পহেলা মার্চ দিল্লীর জামেয়া মিল্লিয়াতে প্রদত্ত ভাষণ।

আদ্বীনের তাৎপর্য

আরবী ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর এক অর্থ বিজয়, পরাক্রম, বশীভূত করা ও দখল করা। আর এক অর্থ আনুগত্য ও দাসত্ব। তৃতীয় অর্থ প্রতিফল ও প্রতিদান। চতুর্থ অর্থ নিয়ম-পদ্ধতি ও জীবনবিধান। এখানে এ শব্দটি চতুর্থ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনের অর্থ হলো জীবন যাপনের সেই ব্যবস্থা ও বিধান অথবা চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি যা মেনে চলতে হবে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কুরআন শুধু 'দ্বীন' বলছে না বরং 'আদ্বীন' বলছে। ইংরেজীতে This is a way of life বলার পরিবর্তে This is the way of life বললে অর্থের যে পার্থক্য হয় এখানেও তাই হচ্ছে। অর্থাৎ কুরআনের দাবী এ নয় যে, আল্লাহর নিকটে ইসলাম একটা জীবন ব্যবস্থা। বরং তার দাবী হলো, একমাত্র ইসলামই সত্যিকার এবং সঠিক জীবনপদ্ধতি বা চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি।

তারপর এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, কুরআন এ শব্দকে কোনো সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করেনি বরং ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহার করেছে। জীবন পদ্ধতি বা জীবন ব্যবস্থা অর্থ জীবনের কোনো বিশেষ দিক বা বিভাগের পদ্ধতি নয় বরং গোটা জীবনের পদ্ধতি। আলাদা আলাদা এক ব্যক্তির ব্যক্তি জীবনেরই পদ্ধতি নয় বরং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজেরও পদ্ধতি। একটা বিশেষ দেশ, জাতি বা যুগের জীবন পদ্ধতি নয় বরং সকল যুগের সকল মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনপদ্ধতি। সুতরাং কুরআনের দাবীর মর্ম এ নয় যে, খোদার নিকটে পূজা-অর্চনা, ঊর্ধ-জগৎ সংক্রান্ত আকীদা -বিশ্বাস এবং মরণোত্তর জীবনের ধারণার একটা সঠিক সমষ্টি এমন এক বস্তু যার নাম ইসলাম। এর তাৎপর্য এটাও নয় যে, ব্যক্তিবর্গের ধর্মীয় চিন্তা ও কর্মের (পাশ্চাত্যের পরিভাষায় ধর্ম শব্দটি যে সংকীর্ণ অর্থে গৃহীত হয়েছে, সেই অর্থে) একটা বিশুদ্ধ পদ্ধতির নাম ইসলাম। উপরন্তু কুরআনের দাবীর মর্ম এও নয় যে, আরব দেশের লোকের জন্যে অথবা অমুক শতাব্দী পর্যন্ত সকল মানুষের জন্যে অথবা শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত যারা দুনিয়ায় এসেছে, তাদের জন্যে একটা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থাকেই ইসলাম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে বরং তার সুস্পষ্ট দাবী এই যে, সকল যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্যে দুনিয়ায় জীবন যাপনের একটি মাত্র পন্থা ও পদ্ধতি আল্লাহর দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ও সঠিক এবং তারই নাম 'আল-ইসলাম।'*

আল ইসলাম-এর তাৎপর্য

এবার 'ইসলাম' শব্দের ব্যাখ্যা করা যাক। আরবী ভাষায় এর অর্থ অস্ত্র সমর্পণ করা, নত হওয়া, আনুগত্য স্বীকার করা ও আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু কুরআন শুধু ইসলাম বলেনি

* অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে কুরআনের এক অভিনব তাফসীর করা হয়েছে। যার দৃষ্টিতে দ্বীনের মর্ম বান্দাহ ও খোদার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেই সীমিত এবং তামাদ্দুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ তাফসীর যদি স্বয়ং কুরআন থেকেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে নিসন্দেহে তা মজার জিনিসই হবে। কিন্তু আমি দীর্ঘ আঠারো বছর যাবত কুরআনের গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকে যা বুঝতে পেরেছি তার ভিত্তিতে নির্ভয়ে এ কথা বলতে পারি যে, আধুনিক তাফসীরকারগণ যত মনগড়া ব্যাখ্যাই দিন না কেন, কুরআন 'আদ্বীন' শব্দকে কোনো সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেনি বরং একে সকল কালের সকল মানুষের জন্যে 'সমগ্র জীবনের চিন্তা ও কর্মের বিধান' অর্থেই ব্যবহার করেছে। (একটি তুর্কী সাংবাদিক প্রতিনিধিদল ১৯৪৩ সালে ভারত সফরে এসে উক্ত মন্তব্য করেছিলেন। গ্রন্থকার সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।)

—বলেছে 'আল ইসলাম'। এটা তার বিশেষ পরিভাষা। এ বিশেষ পারিভাষিক শব্দকে সে যে অর্থে ব্যবহার করেছে তা হলো আল্লাহর সামনে নত হওয়া, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর সামনে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়া এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা। অবশ্য এ আত্মসমর্পণের অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মের (Law of nature) সামনে আত্মসমর্পণ করা নয়। কেউ কেউ অবশ্য এ ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এর অর্থ এও নয় যে, মানুষ নিজের কল্পনাশক্তিকে প্রয়োগ করে অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ দ্বারা আল্লাহ কি চান ও কিসে খুশী হন সে সম্পর্কে আপনা থেকেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তার আনুগত্য করবে। অন্য কিছু লোক ভাল করে এটাই বুঝে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাঁর রসূলদের মাধ্যমে চিন্তা ও কর্মের যে পথ ও পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন, তাই মেনে নিতে হবে এবং নিজের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা তথা স্বেচ্ছাচার বিসর্জন দিয়ে ঐ পথ ও পদ্ধতির আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআন 'আল ইসলাম' শব্দ দ্বারা এ কথাই বুঝিয়েছে। এটা কোনো নতুন যুগ ধর্ম নয় এবং এখন থেকে ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদ (সা) আরব দেশে এর ভিত্তিস্থাপন চালু করেননি। বরং যেদিন প্রথম এ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেদিনই আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার জন্যে কেবলমাত্র এ আল ইসলামই সঠিক ও বিশুদ্ধ জীবন ব্যবস্থা। এরপর দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যত নবীই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের পথপ্রদর্শক হয়ে এসেছেন, তাঁদের সকলেই নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ 'আল-ইসলামে'র দিকেই মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। কোথাও এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি। সবশেষে নবী মুহাম্মদ (সা)-ও ঐ একই 'আল ইসলামে'র দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। অবশ্যি এ কথা আলাদা যে, হযরত মূসা (আ)-এর অনুসারীগণ পরবর্তীকালে অন্যান্য বহু বিষয়ের সংমিশ্রণে ইহুদীবাদ নামে ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ 'খৃস্টবাদ' নামে ও ভারতবর্ষ, ইরান, চীন এবং অন্যান্য দেশের নবীদের উম্মতগণও নানা রকমের মিশ্র ও জগাখিচুড়ি মতবাদ তৈরি করেছে। আসলে মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য জানা-অজানা সকল নবী যে দ্বীনের দাওয়াত দিতে এসেছিলেন তা ছিল খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলাম—অন্য কিছু নয়।

কুরআনের দাবী

এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর কুরআনের দাবী আমাদের সামনে একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাহলো এই ঃ "মানবজাতির জন্যে জীবনযাপনের একমাত্র বিশুদ্ধ আল্লাহ মনোনীত পন্থা ও পদ্ধতি হলো আল্লাহর সামনে মাথা নত করা এবং আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে যে চিন্তা ও কর্মের পথ ও পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন তা অনুসরণ করা।" এটাই হচ্ছে কুরআনের দাবী।

এখন আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে যে, এ দাবী মেনে নেয়া উচিত কি না। কুরআন নিজে দাবীর স্বপক্ষে যেসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছে তা তো আমরা পর্যালোচনা করবোই। তবে তার আগে, এ দাবী গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর আছে কি না সে সম্পর্কে নিজেরা একবার তত্ত্বানুসন্ধান করে দেখি না কেন?

জীবনপদ্ধতির আবশ্যকতা

প্রকাশ থাকে যে, মানুষের জীবন যাপনের জন্যে একটা জীবনপদ্ধতি অবলম্বন করা সর্বাবস্থায়ই প্রয়োজন। মানুষ তো আর নদী নয় যে, ভূমির চড়াই-উৎরায়ের ভেতর দিয়ে

তার চলার পথ আপনা থেকেই রচিত হয়ে যাবে। মানুষ গাছগাছালি নয় যে, প্রাকৃতিক আইন তার পথ নির্ণয় করে দেবে। সে একটা নিছক প্রাণীও নয় যে, শুধু তার স্বভাব-প্রকৃতিই তার পথ প্রদর্শনের জন্যে যথেষ্ট হবে। জীবনের একটা বিরাট অংশে মানুষ প্রাকৃতিক আইনের অধীন হলেও, তার জীবনের এমন বহুদিক রয়েছে, সেখানে সে কোনো বাঁধাধরা পথ দেখতে পায় না যে অন্যান্য জীব-জানোয়ারের মত অনিচ্ছাকৃতভাবে সে পথে চলতে থাকবে। বরং তাকে বিচার-বিবেচনা করে একটা পথ বেছে নিতে হয়। তার চিন্তাশীল বিবেকের সামনে বিশ্বজগতের অনেক সমস্যা স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার কোন সমাধান সে খুঁজে পায় না। তাই এসব সমস্যা সমাধানের জন্যে তার চিন্তার একটা পথ আবশ্যক। প্রকৃতি তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার মনে কতকগুলো বিক্ষিপ্ত তত্ত্ব ও তথ্য পৌঁছিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তাকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেয় না। সেসব সাজিয়ে গুছিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্যে তার একটা জ্ঞানের পথ প্রয়োজন। ব্যক্তিগত আচার-আচরণের জন্যে তা কিছু রীতি-পদ্ধতির প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সে তার এমন সব দাবী পূরণ করতে পারে যার জন্যে প্রকৃতি তাকীদ করে বটে, কিন্তু তা পূরণ করার জন্যে কোনো রুচিসম্মত পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয় না। তার দাম্পত্য জীবনের জন্যে, পারিবারিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের জন্যে, অর্থনৈতিক লেন-দেন ও কায়কারবারের জন্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার জন্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের জন্যে এবং জীবনের অন্যান্য বহু দিক ও বিভাগের জন্যে একটা বিধান তার প্রয়োজন। সে বিধান মতে নিছক ব্যক্তি হিসেবে নয় বরং দল, জাতি ও গোষ্ঠী হিসেবে যেন জীবন যাপন করে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, যা স্বভাবতঃই তার বাঞ্ছিত হলেও প্রকৃতি সে লক্ষ্যকে তার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেনি এবং সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কোনো পন্থাও নির্ধারণ করেনি।

মানব জীবন অবিভাজ্য

জীবনের এসব বিভিন্ন দিক ও বিভাগে মানুষের কোনো একটা পথ ও পন্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য। কিন্তু এগুলো কোনো স্থায়ী, পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বনির্ভর বিভাগ নয়। এ জন্যে এসব বিভিন্ন বিভাগে এমন বিভিন্ন পথ অবলম্বন করা সম্ভব নয়—যার লক্ষ্য আলাদা, পাথেয় আলাদা, যে পথে চলার ঢং ও পদ্ধতি আলাদা, চলার দাবী ও চাহিদা আলাদা এবং গন্তব্যস্থলও আলাদা। কেউ যদি মানুষ ও তার জীবন-সমস্যা উপলব্ধি করার জন্যে বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে একটুখানি চেষ্টা করে তাহলেই সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে যে, জীবন সামগ্রিকভাবে একটা গোটা সমষ্টি—যার প্রতিটি অংশ অপর অংশের সাথে এবং প্রতিটি বিভাগ অন্য বিভাগের সাথে ওতপ্রোত জড়িত ও অবিচ্ছেদ্য। এর প্রতিটি অংশ অপর অংশের ওপর প্রভাবশীল ও একে অপর দ্বারা প্রভাবান্বিত। সকল অংশে একই প্রাণশক্তি ছড়িয়ে থাকে এবং এসবের সমন্বয়ে যা তৈরি হয় তাকে বলে মানব জীবন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মানুষের যা প্রয়োজন, তা জীবনের অনেকগুলো লক্ষ্য নয় বরং একটি মাত্র প্রধান লক্ষ্য। যার অধীনে সকল ছোট-বড় লক্ষ্য সামঞ্জস্যশীল থাকবে এবং প্রধান লক্ষ্যটি অর্জিত হলে অন্য সব কয়টি অর্জিত হবে। তার অনেকগুলো পথের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন একটি মাত্র রাজপথের যার ওপর সে তার জীবনের সব কয়টি দিক ও বিভাগসহ পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে আপন জীবন লক্ষ্যের দিকে চলতে পারে। দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা, ধর্ম, নৈতিকতা, সামাজিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও আইন-

আদালত প্রভৃতির জন্যে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা নয় বরং একটি সার্বিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। যার মধ্যে এ সবগুলোই পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে অবস্থান করতে পারে, যার মধ্যে এসবের জন্যে একই মেজাজ-প্রকৃতির যথোপযুক্ত মূলনীতি থাকবে। সেসবের অনুসরণে ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং সার্বিকভাবে গোটা মানবতা সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। সে ছিল জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগ যখন জীবনকে স্থায়ীভাবে আলাদা আলাদা বিভাগে বিভক্ত করা সম্ভব বলে মনে করা হতো। আজকাল যদি কেউ এ রকম ধারণা পোষণ করে অনর্থক কথা বলতে চায় তাহলে বলতে হবে যে, হয় তারা নিষ্ঠা সহকারে পুরোণো ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরে আছে এবং সে জন্যে তারা করুণার পাত্র, আর না হয় তারা আসল ব্যাপারটা ভালো করেই জানে এবং জেনে-বুঝেই এ ধরনের কথাবার্তা শুধু এ জন্যে বলে যে, যে ব্যবস্থা তারা কোনো জনপদে প্রচলিত করতে চায়* তার মূলনীতির সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে এ আশ্বাস দেয়ার প্রয়োজনবোধ করে যে, এ ব্যবস্থার অধীনে তারা তাদের জীবনের অমুক অমুক বিভাগে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে যে, বিভাগগুলো তাদের কাছে অতি প্রিয়। অথচ এ ধরনের নিরাপত্তা যৌক্তিকতা, স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে এটা অসম্ভব। যারা এ কথা বলে থাকে, সম্ভবত তারা নিজেরাও জানে যে, এটা অসম্ভব** প্রত্যেক বিজয়ী দ্বীন জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে তার নিজস্ব প্রাণশক্তি ও মেজাজ প্রকৃতি অনুসারে গঠন না করেই পারে না, যেমন লবণ-খনিতে পতিত জিনিস মাত্রই লবণে পরিণত হতে বাধ্য।

জীবনের ভৌগোলিক ও বংশগত বিভক্তি

মানব জীবনকে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করা যেমন অর্থহীন ও অযৌক্তিক তার চেয়ে অধিকতর অযৌক্তিক ও অর্থহীন ভৌগোলিক সীমারেখা ও বর্ণ-বংশের ভিত্তিতে ভাগ করা। পৃথিবীর বহু স্থানে মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, সন্দেহ নেই এবং নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গল অথবা কৃত্রিম সীমান্তরেখা তাদেরকে বিভক্ত করে রেখেছে। তারপর বিভিন্ন বংশ ও জাতির মানুষও পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ঐতিহাসিক, মনস্তাত্বিক ও অন্যান্য কারণে মানবতার বিকাশ ও উন্নতি বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে।

কিন্তু এ পার্থক্যের ওজুহাত তুলে যে ব্যক্তি বলে, প্রত্যেক বংশ, প্রত্যেক জাতি ও ভৌগোলিক জনপদের জন্যে আলাদা আলাদা 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা রচনা করা দরকার, সে নিছক একটা প্রলাপোক্তি করে। তার সংকীর্ণ দৃষ্টি বাহ্যিক রূপ ও আকার-আকৃতির পার্থক্যের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। এ বাহ্যিক রকমফেরের অভ্যন্তরে বিরাজমান মানবতার একক ও অভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব সে উপলব্ধি করতে পারেনি। তথাপি এ পার্থক্যগুলো যদি বাস্তবিকই এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে যে, এর কারণে আলাদা আলাদা জীবনব্যবস্থা হওয়া দরকার, তবে আমি বলবো, একটি দেশ ও অপর একটি দেশের মধ্যে এবং একটি বংশ ও অপর একটি বংশের মধ্যে যতখানি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা যত অতিরঞ্জিত করে লিখতে চান লিখুন। এরপর যে কোনো দেশের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে, যে কোনো একজন মানুষ ও অপর একজন মানুষের মধ্যে এবং একই পিতা-মাতার

* অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী ব্যবস্থা। খোদা, কিতাব ও রিসালাতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিছক পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর জন্যে একটি জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা।

** এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্যে গ্রন্থাকারের প্রণীত 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ' ১ম ও ২য় খণ্ড এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডের বুনিয়াদী হকুক দ্রষ্টব্য।–(সংকলকদ্বয়)

দুই সন্তানের মধ্যে যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়, তার নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করুন। আমি নিশ্চিত যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রথমোক্ত পার্থক্যের চেয়ে দ্বিতীয় পার্থক্যই অধিকতর প্রকট হয়ে দেখা দেবে। তাহলে প্রত্যেকটি মানুষের জন্যেই আলাদা আলাদা জীবনব্যবস্থার সুপারিশ করেন না কেন ? বস্তুত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, স্ত্রী-পুরুষে এবং পরিবার পরিবারে যে পার্থক্য, তার অভ্যন্তরেও ঐক্যের একটা স্থায়ী উপাদান অবশ্যই লক্ষণীয় এবং তারই ভিত্তিতে একটা জাতি, একটা দেশ ও একটা বংশের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব। আর সে জন্যেই একটা জাতি বা একটা দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্যে একটি মাত্র জীবনব্যবস্থা হওয়া সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। আর সেটা যখন সম্ভব, তখন জাতীয়, দেশীয় ও বংশীয় পার্থক্যের বিপুলতার মধ্যেও একটি মৌলিক ঐক্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না কেন ? আর কেনইবা তার ভিত্তিতে গোটা মানব জাতিকে একটি অখণ্ড একক বলে মনে করা এবং সমগ্র মানব জগতের জন্যে একটি মাত্র দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা রচিত হওয়া সম্ভব হবে না ? এ কথা কি সত্য নয় যে, সমস্ত ভৌগোলিক, জাতিগত ও বংশীয় পার্থক্য সত্ত্বেও প্রকৃতি মৌলিক বিষয়গুলোর বিচারে সকল মানুষ সমান, একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন সকল মানুষের পার্থিব জীবন অতিবাহিত হয়, একই দৈহিক নিয়মে সকল মানুষ গঠিত, মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা একটা জাতির মর্যাদা দিয়েছে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ তাও সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান, জন্মগতভাবে প্রাকৃতিক চাহিদা ও দাবিসমূহের সকল মানুষ সমান অংশীদার, একই রকমের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক, শক্তির সমাবেশে প্রতিটি মানুষের মানবিক সত্তা গঠিত। সর্বোপরি এ কথাও কি ঠিক নয় যে, মানবজীবনে সক্রিয় ও প্রভাবশালী সমস্ত দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকারণগুলো সকল মানুষের বেলায় একই রকম ? এসব ব্যাপারে সকল মানুষ যখন বাস্তবিক পক্ষে সমান, তখন যে মৌলিক নীতি ও আদর্শ সকল মানুষের কল্যাণের জন্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল, তাও বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন হওয়া উচিত। এ মৌলিক নীতি ও আদর্শ এক এক দেশে, এক এক জাতি ও এক এক বংশের জন্যে এক এক রকম হতে পারে না। বিভিন্ন জাতি ও বংশ এ মূলনীতি ও আদর্শের আওতায় নিজেদের আলাদা গুণ-বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি ঘটাতে এবং আংশিকভাবে নিজেদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিভিন্ন পন্থায়ও করতে পারে এবং তা করাও উচিত। তবে মানুষ হিসেবে মানুষের জন্যে যে নির্ভুল 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা প্রয়োজন, তা সর্বাবস্থায়ই এক ও অভিন্ন হতে হবে। যে জিনিস এক জাতির বেলায় সঠিক তা অন্য জাতির বেলায় ভুল হবে, আর যে জিনিস এক জাতির বেলায় ভুল তা অন্য জাতির বেলায় সঠিক হবে—এ কথা বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

জীবনের কালগত বিভক্তি

বাহ্যিক পার্থক্যের ভিত্তিতে জীবনকে বিভক্ত করার স্বপক্ষে কয়েকটি অসার বক্তব্যের পর্যালোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। সে ধরনের আরো একটি অসার বক্তব্য যা খুব নিশ্চয়তা ও পাণ্ডিত্য সহকারে ইদানিং পেশ করা হচ্ছে, অথচ আসলে সেটাই সবচেয়ে অসার ও ভ্রান্ত কথা—তাহলো জীবনের কালগত বিভক্তি। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, একটা জীবনব্যবস্থা এক সময়ে ঠিক থাকে আবার অন্য সময়ে তা ভুল প্রমাণিত হয়। কেননা জীবনের সমস্যাবলী প্রত্যেক যুগে পরিবর্তনশীল। অথচ জীবনব্যবস্থা ভুল কি নির্ভুল তা নির্ভর করে জীবনের

সমস্যাবলীর ওপর। মজার কথা এই যে, মানবজীবন সম্পর্কে এ বক্তব্য উচ্চারণ করা হয়, সেই জীবনকে নিয়েই আবার একই সাথে ক্রমবিকাশের কথাবার্তাও বলা হয়। আর জীবনের ক্রমবিকাশের কথা যখন ওঠে, তখন তাতে প্রভাব বিস্তারকারী, ঐতিহাসিক নিয়ম-কানুনের অনুসন্ধানও চালানো হয়, তার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা হয় বর্তমানের জন্যে শিক্ষা ও ভবিষ্যতের জন্যে পথনির্দেশ। এমনকি 'মানুষের স্বভাব প্রকৃতি' নামে একটা জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে, এটাও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হয়। আমার জিজ্ঞাসা এই যে, যাঁরা জীবনের কালগত বিভক্তিতে বিশ্বাস করেন, তাদের কাছে মানব জাতির এ অব্যাহত ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাঝে যুগ বা কালের সুনির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিত করার মত কোনো পরিমাপ যন্ত্র আছে কি ? আর যদি কোনো সীমানা চিহ্নিত করাও হয় তবে তার কোনো একটি সীমারেখাকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলা সম্ভব হবে কি যে, এ সীমারেখার অপর পারে জীবনের যেসব সমস্যা ছিল এপারে এসে তা একেবারেই বদলে গেছে, আর অপর পারে যে অবস্থা ছিল এপারে তা আর অবশিষ্ট নেই ? যদি সত্যিই মানুষের জীবন এ রকম বিচ্ছিন্ন কালগত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া উচিত যে, অতীত খণ্ডটি তার পরবর্তী খণ্ডের জন্যে একেবারেই নিরর্থক বস্তু। সে খণ্ডটি অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে যুগে মানুষ যা কিছু করেছে তা সব বৃথা হয়ে গেছে। সে যুগে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাতে পরবর্তী যুগের জন্যে কোনোই শিক্ষা নেই। কেননা সে অবস্থাও নেই, সে সমস্যাও আর নেই। তাই সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও সেসব সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত মানুষ যে চেষ্টা-সাধনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তারও কোনো মূল্য নেই। তাহলে তো ক্রমবিকাশ নিয়ে কথাবার্তা বলারও কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। জীবনের ওপর প্রভাবশীল ঐতিহাসিক নিয়ম-কানুনের সন্ধান চালানোরও কোনো স্বার্থকতা থাকে না। আর ইতিহাসের নযীর দেখিয়ে বর্তমান অবস্থার সহযোগী শিক্ষা আহরণেরও কোনো ভিত্তি থাকতে পারে না। ক্রমবিকাশের কথা যখন উচ্চারণ করা হয় তখন অনিবার্যভাবেই স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সেখানে কোনো একটা জিনিস নিশ্চয়ই আছে, যার পরিবর্তন ঘটে এবং সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখে সে ক্রমাগতভাবে বিচরণশীল থাকে। জীবনের নিয়ম-কানুনের কথা যখন আলোচনা করা হয় তখন স্বভাবতঃই এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, এত সব উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া ও আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে একটা শাশ্বত জীবন্ত সত্যও রয়েছে যার একটা নিজস্ব স্বভাব-প্রকৃতি ও স্বতন্ত্র নিয়ম-বিধি বর্তমান। ইতিহাসের নযীর দেখিয়ে যখন কোনো শিক্ষা আহরণ করা হয় তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ রাজপথ পরিভ্রমণ করে যে পথিক ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে এবং একের পর এক মনযিল অতিক্রম করছে, তার নিজস্ব একটা সত্তা ও স্বতন্ত্র একটা চরিত্র রয়েছে। সে সত্তা বিশেষ অবস্থায় বিশেষ পন্থায় কাজ করে এবং এক সময় যা গ্রহণ করে অন্য সময় তা প্রত্যাখ্যান করে ও নতুন জিনিসের দাবী জানায়। এ শাশ্বত সত্য, এ চিরন্তন পরিবর্তনশীল বস্তু এবং ইতিহাসের রাজপথে পরিভ্রমণরত এ পথিককেই সম্ভবতঃ 'মনুষ্যত্ব' বলা হয়। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, রাজপথের বিভিন্ন মনযিল, তার অবস্থা ও সমস্যাবলী নিয়ে যখন আলোচনা শুরু করা হয়, তখন এমন তন্ময় হয়ে আলোচনা করা হয় যে, স্বয়ং পথিকের কথাই আর মনে থাকে না, রাজপথের মনযিল এবং তার অবস্থা ও সমস্যার পরিবর্তন হতে পারে। তাই বলে কি পথিক ও তার স্বকীয়তা পাল্টে যায় ? আমি তো দেখতে পাই, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তার মৌল কাঠামোতে কোনো পরিবর্তনই

হয়নি। যে মৌলিক উপাদানে মানুষ হাজার বছর আগে গঠিত হত আজও সেসব উপাদানেই গঠিত হয়। তার মেযাজ, তার স্বভাব-প্রকৃতির দাবী ও চাহিদা, তার গুণ-বৈশিষ্ট্য, তার আবেগ-অনুভূতি, তার ঝোঁক-প্রবণতা, তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা, তার দুর্বলতা ও সামর্থ, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব বিস্তার ও প্রভাব গ্রহণের ক্ষমতা, তার ওপর কর্তৃত্বশীল শক্তিগুলো এবং তার প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক পরিবেশ—সবই আগে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে এর মধ্যে কোনো একটি ব্যাপারেও সৃষ্টির আদিকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কণা পরিমাণও পার্থক্য ঘটেনি। বস্তুত ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তন চলাকালে অবস্থার হেরফের এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর পরিবর্তনে স্বয়ং মানুষের মনুষ্যত্বও পরিবর্তিত হয়ে যায় কিংবা মনুষ্যত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়গুলোও পরিবর্তিত হয়ে যায়—এমন দাবী করার ধৃষ্টতা কেউ দেখাতে পারে না। আর তা যখন পারে না তখন মানুষের জন্যে কাল যা অমৃততুল্য ছিল আজ তা বিষতুল্য হয়ে গেছে, কাল যা সত্য ছিল আজ তা মিথ্যা হয়ে গেছে এবং কাল যা মূল্যবান ছিল আজ তা মূল্যহীন হয়ে গেছে—এ কথা কিভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে?

মানুষের জন্যে কি ধরনের জীবনব্যবস্থা প্রয়োজন

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনকালে মানব সত্তা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়গুলোকে বুঝতে গিয়ে মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে বিভ্রান্তি ও প্রতারণার শিকার হয়েছে। কোনো সত্যকে অতিরঞ্জিত করে উপলব্ধি করেছে, আবার কোনোটাকে বুঝতে ভুল করেছে, যার ফলে বিভিন্ন সময়ে ভুল জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে বৃহত্তর মানবতা (Humanity at large) পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সে জীবনব্যবস্থায় অসারতা বুঝতে পেরে অনুরূপ আর এক জীবনব্যবস্থার জন্যে তাকে পরিহার করেছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, মানবজাতির জন্যে প্রত্যেক যুগেই একটা আলাদা জীবনব্যবস্থা প্রয়োজন। সে জীবনব্যবস্থা তৈরি হবে কেবল সে যুগেরই অবস্থা ও সমস্যার আলোকে এবং সেসব সমস্যার সমাধানেই তা সচেষ্ট হবে। অথচ এরূপ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে একমাত্র এ সিদ্ধান্ত গ্রহণই যথার্থ হতে পারে যে, এরূপ যুগ ও কালভিত্তিক জীবনব্যরস্থা অথবা অন্য কথায় মৌসুমী ভূঁইফোঁড় ব্যবস্থাকে বার বার পরীক্ষা করা এবং প্রত্যেকটির ব্যর্থতার পর তার স্থলাভিষিক্ত অন্য একটিকে পরীক্ষা করায় মানবজাতির মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোনো ফলোদয় হয় না, এতে করে তার অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং তার উন্নতি ও বিকাশ এবং ইঙ্গিত চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। আসলে সে চরম মুখাপেক্ষী এমন এক জীবন-ব্যবস্থার যা রচিত হবে তার ও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল তত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়ার পর বিশ্বজনীন শাশ্বত ও চিরন্তন নীতিমালার ভিত্তিতে। সে জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করে সে বর্তমান ও অনাগতকালের সকল পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে নিরাপদে এগিয়ে যেতে পারবে এবং উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে জীবনের রাজপথে উঠা-পড়া করে নয়—বরং দ্রুত পদক্ষেপে মনযিলে মকসুদের দিকে ধাবিত হতে সক্ষম হবে।

এরূপ জীবনব্যবস্থা কি মানুষ নিজেই রচনা করতে সক্ষম

এটাই হচ্ছে সে 'দ্বীন' জীবন পদ্ধতি অথবা জীবন বিধান—মানুষ যার মুখাপেক্ষী। এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, মানুষ যদি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নিজেই নিজের

জন্যে এ ধরনের একটা জীবনব্যবস্থা রচনা করতে চায়, তাহলে সে চেষ্টায় তার সফলকাম হওয়া সম্ভব কিনা। আমি এ প্রশ্ন তুলতে চাই না যে, মানুষ আজ পর্যন্ত এরূপ একটা জীবনব্যবস্থা নিজে নিজে তৈরি করতে পেরেছে কিনা। কোনো সে প্রশ্নের জবাব অকাট্যভাবেই 'না' সূচক। এমনকি এ যুগে যারা খুব গালভরা দাবী তুলে নিজ নিজ জীবন-ব্যবস্থা উপস্থাপিত করছে এবং তার জন্যে একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, তারাও এ দাবী করতে পারবে না যে, তাদের মধ্যে কারো উপস্থাপিত জীবন বিধান ঐসব প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে যার জন্যে মানুষ মানুষ হিসেবে একটি 'আদ্বীনের' মুখাপেক্ষী। কেননা কারও জীবনব্যবস্থা বংশ অথবা জাতিভিত্তিক, কারও জীবনব্যবস্থা ভৌগোলিক, কারওটা শ্রেণীভিত্তিক, আবার কারও জীবনব্যবস্থা সবে অতিবাহিত হয়ে যাওয়া যুগ চাহিদা অনুসারে রচিত। অনাগতকালের অবস্থা ও সমস্যাবলীর তা উপযোগী প্রমাণিত হবে কিনা সে সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব নয় কেননা যে যুগ অতিক্রান্ত হচ্ছে তার ঐতিহাসিক দাবী কি, তার পর্যালোচনা এখনো করা হয়নি। এ জন্যে আমার প্রশ্ন এটা নয় যে, মানুষ এ ধরনের একটা জীবনব্যবস্থা তৈরি করতে পেরেছে কিনা। বরং প্রশ্ন এই যে, তৈরি করতে পারে কিনা।

বস্তুতা এটা একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সে জন্যে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সঙ্গত হবে না। মানব জীবনের সিদ্ধান্তকর প্রশ্নগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। তাই ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার যে, সে জিনিসটা কি, যা রচনা করার প্রশ্ন এখানে উঠেছে এবং সে ব্যক্তির যোগ্যতাই বা কতটুকু যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, এটা রচনা করতে পারে কিনা।

'আদ্বীন' বলতে কি বুঝায়

মানুষের জন্যে যে 'আদ্বীন'-এর অপরিহার্যতা এইমাত্র আমি প্রমাণ করলাম তা সর্ব যুগের সকল অবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় ছোটবড় ও খুঁটিনাটি সমস্ত বিধি ব্যবস্থা সম্বলিত একটা বিস্তারিত বিধান নয় যা বিদ্যমান থাকাকালে মানুষ তদনুযায়ীই কাজ করবে। বরং তা আসলে এমন সব সার্বিক, আদি ও শাশ্বত মূলনীতি যা সকল অবস্থায় মানুষকে পথ দেখাতে পারে, তার চিন্তা ও দৃষ্টি, চেষ্টা-সাধনা ও অগ্রযাত্রার সঠিক দিক নির্দেশ করতে পারে এবং ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সময় শক্তি ও শ্রমের অপচয় থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে।

এ উদ্দেশ্যে মানুষের সর্বপ্রথম করণীয় এই যে, তাকে তার নিজের ও বিশ্বজগতের রহস্য কি এবং এ বিশ্বজগতে তার অবস্থান ও মর্যাদা কি সে সম্পর্কে কোনো আন্দাজ অনুমান নয় বরং সুস্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে হবে।

এরপর তাকে এটাও জেনে নিতে হবে যে, এ পার্থিব জীবনই কি তার গোটা জীবন না গোটা জীবনের একটা প্রাথমিক অংশ মাত্র। তার সফর কি কেবল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই না এটা সফরের একটা পর্যায় মাত্র।

এরপর অপরিহার্যভাবে তার জন্যে এমন একটা জীবন লক্ষ্য স্থিরীকৃত হতে হবে যা মানুষের ইচ্ছা নির্ভর লক্ষ্য হবে না বরং আদতেই তা মানব জীবনের লক্ষ্য হবে, সে লক্ষ্যে পৌছার জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে লক্ষ্যের সাথে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এবং সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির যাবতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনো রকম দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ছাড়াই সুসামঞ্জস্য হতে পারবে।

তারপর তার জন্যে নৈতিকতার এমন কতকগুলো অটুট ও সর্বাত্মক মূলনীতি প্রয়োজন যা তার সহজাত গুণ-বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে এবং সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতিতে তা তাত্ত্বিক ও বাস্তব উভয় পর্যায়ে কার্যকর ও কার্যোপযোগী হতে পারবে। সে যাতে নিজের চরিত্র গঠন করতে পারে, জীবন পথ পরিক্রমার প্রতিটি স্তরে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানে দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে আর পরিবর্তনশীল অবস্থা ও সমস্যাবলীর সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে যাতে তার নৈতিক আদর্শ ক্রমাগত ভাঙা-গড়ার শিকার না হতে থাকে এবং সে একজন নীতিহীন ও সুবিধাবাদী লোক হিসেবে গণ্য না হয়, সে জন্যেই তার এসব মূলনীতির একান্ত প্রয়োজন।

তারপর তার জন্যে সমাজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত কতিপয় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ব্যাপকভিত্তিক মূলনীতি প্রয়োজন। মানুষের সমাজবদ্ধতার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এবং তার স্বভাবগত চাহিদা ও দাবীর সম্যক উপলব্ধির ভিত্তিতে গঠিত হওয়া চাই এসব মূলনীতি। এতে না থাকবে চরম ন্যূনতা, না থাকবে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং ভারসাম্যহীনতা। এ সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকারী এবং সর্বযুগের মানবজীবনের সকল দিকের গঠন, বিনির্মাণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের সহায়ক।

তারপর ব্যক্তিচরিত্র, সামষ্টিক আচরণ এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টা-তৎপরতাকে নির্ভুল পথে চালিত করা ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করার জন্যে তার প্রয়োজন কতকগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভুল বিধি-বিধানের যা তার জীবনের রাজপথে পথের দিশারী হিসেবে কাজ করবে এবং প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক চৌরাস্তায় এবং প্রত্যেক বিপজ্জনক পর্যায়ে তাকে সাবধান করে তার সঠিক পথ দেখিয়ে দেবে।

তাছাড়া তার জন্যে আরো কতকগুলো ব্যবহারিক বিধিরও প্রয়োজন—যা চিরদিন সার্বজনীনভাবে পালন করতে হবে। আলোচ্য 'আদ্বীন' বা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থায় মানুষ ও বিশ্বলোকের যে নিগূঢ় তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে, জীবনের যে লক্ষ্য, যে পরিণতি, যে নৈতিক ও সামাজিক মূলনীতি এবং যে আচরণ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, তার সাথে মানুষের সম্পর্ক-বন্ধন অটুট রাখার উদ্দেশ্যেই এসব ব্যবহার-বিধির প্রয়োজন।

এসব মৌলনীতি ও বিধির সমন্বয়েই গঠিত হয় সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সেই জীবন-ব্যবস্থা রচনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এবার ভেবে দেখতে হবে এরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা রচনা করার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ মানুষের আছে কিনা।

মানুষের উপায়-উপকরণের পর্যালোচনা

নিজের 'দ্বীন' বা জীবনব্যবস্থা রচনার জন্যে অনধিক চারটি উপায়-উপকরণ মানুষের হাতে রয়েছে। এর প্রথমটি হলো ইচ্ছা শক্তি, দ্বিতীয়টি বুদ্ধিবৃত্তি, তৃতীয়টি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এবং চতুর্থটি অতীত অভিজ্ঞতার ঐতিহাসিক প্রমাণচিত্র। এ চারটি ছাড়া পঞ্চম কোনো উপকরণের সন্ধান দেয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। এ চারটি উপকরণের প্রত্যেকটি নিয়ে যত বেশী পারেন পর্যালোচনা করে দেখুন তো দেখি। আলোচ্য 'আদ্বীন' রচনায় এগুলো মানুষকে সাহায্য করতে পারে কি ? আমি নিজের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও তত্ত্বানুসন্ধান করে কাটিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এসব উপকরণ ঐ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাটি রচনার কাজে কোনোই

সহায়তা করতে পারে না। তবে তা যদি মানব ব্যতীত ঊর্ধলোকস্থ কোনো পথপ্রদর্শক 'আদ্বীন' উপস্থাপিত করেন তাহলে তা বুঝতে, চিনতে ও তার সত্যাসত্য যাচাই করতে এবং সে অনুসারে জীবনের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিধি রচনা করতেও এগুলো সহায়ক হতে পারে।

এক ঃ ইচ্ছাশক্তি

প্রথমে ইচ্ছাশক্তির কথাই ধরা যাক। এটা কি মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পারে ? ইচ্ছাশক্তি যদিও মানুষের আসল প্রেরণাদায়ক ও কর্মোদ্দীপক শক্তি। কিন্তু এর স্বভাব প্রকৃতিতে যেসব দুর্বলতা বর্তমান, তাতে মানুষকে জীবনের নির্ভুল পথে সন্ধান দেয়ার ক্ষমতা এর কখনোই থাকতে পারে না। পথের সন্ধান দেয়া তো দূরের কথা, এটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানকে বিপথে চালিত করে থাকে। নানা রকমের প্রশিক্ষণ দিয়ে দিয়ে তাকে যতই সংস্কৃতিবান ও মার্জিত করা হোক না কেন, শেষ সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার যখনই তার ওপর ন্যস্ত করা হবে, সে শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে নির্ঘাত ভুল সিদ্ধান্তই নেবে। কেননা তার মধ্যে যেসব চাহিদা দেখা যায়, তা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে কাম্য বস্তু দ্রুত ও সহজলভ্য হয় এমন সিদ্ধান্ত নিতেই বাধ্য করে থাকে। এটা মূলত মানবীয় ইচ্ছাশক্তির স্বভাবগত দুর্বলতা। সুতরাং ইচ্ছা ব্যক্তিগত হোক বা শ্রেণীগত অথবা রুশোবর্ণিত গণইচ্ছা (General will) হোক, মোটকথা কোনো রকমেরই মানবীয় ইচ্ছাশক্তি স্বভাবগতভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা রচনায় সহায়ক হওয়ার যোগ্য নয়। বিশেষত কোনো উচ্চতর বিষয়ে—যথা মানবজীবনের মর্মকথা, তার পরিণতি ও উদ্দেশ্য নির্ণয়ে কোনো প্রকার সহায়তা করার আদৌ কোনো ক্ষমতা তার নেই এবং থাকা সম্ভব নয়।

দুই ঃ বুদ্ধিবৃত্তি

এরপর বুদ্ধিবৃত্তির প্রসঙ্গে আসা যাক। এটা যে, শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মানবীয় শক্তি, মানুষের জীবনে তার গুরুত্ব ও প্রভাব যে অসাধারণ এবং মানুষের জন্যে তা যে একটি বিরাট প্রেরণাদায়ক শক্তি, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু মানুষের জন্যে একটি 'আদ্বীন' রচনা করার দায়িত্ব অর্পণের বিষয়ে বিবেচনা করতে গেলেই প্রশ্ন জাগে যে, এ দায়িত্ব কার বুদ্ধির ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে ? যায়েদের না বকরের ? না সকল মানুষের ? অথবা মানুষের কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ? চলতি যুগের মানুষের না অতীতের, না অনাগতকালের মানুষের ? তথাপি এ প্রশ্ন না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু যে প্রশ্নটি মোটেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না তাহলো এই যে, মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির সীমা ও পরিধি বিবেচনা করার পর কেউ বলতে পারবে কি যে, একটা পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা রচনায় তার ওপর নির্ভর করা চলে কিনা এবং এ কাজ তার ওপর ন্যস্ত করা সঙ্গত কিনা ? এটা তো জানা কথাই যে, তার সকল সিদ্ধান্তই পঞ্চেন্দ্রিয় তথা অনুভূতি শক্তির সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। তার সংগৃহীত তথ্য ভুল হবে বুদ্ধিবৃত্তির সিদ্ধান্তও ভুল হবে। তার তথ্য অসম্পূর্ণ হলে বুদ্ধিবৃত্তির সিদ্ধান্তও হবে অসম্পূর্ণ। আর যে ব্যাপারে পঞ্চেন্দ্রিয় আদৌ কোনো তথ্য এনে দেবে না সে ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তি যদি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকে, তবে কোনো সিদ্ধান্তই নেবে না। আর যদি দাম্ভিক হয় তবে অন্ধকারে নিস্ফল তীর নিক্ষেপ করতে থাকবে। যে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ ও

সংকীর্ণ সে কিভাবে মানবজাতির জন্যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (আদ্বীন) রচনার দায়িত্ব ঘাড়ে নেয়ার যোগ্য হতে পারে ? তাছাড়া 'আদ্বীন' রচনার কাজটি যেসব উচ্চতর ও জটিল সমস্যা সমাধানের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলোর ব্যাপারে পঞ্চেন্দ্রিয় আদৌ কোনো তথ্য সরবরাহ করে না। তবে কি কেবল অলীক কল্পনা, আন্দাজ-অনুমাদন ও আজগুবী ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতেই সেসব সমস্যার সমাধান করতে হবে ? 'আদ্বীন' রচনা করার জন্যে যেসব চিরন্তন নৈতিক মূল্যবোধ অপরিহার্য, সেসব সম্পর্কে পঞ্চেন্দ্রিয় খুবই অসম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এ অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ নৈতিক মূল্যবোধ নির্ণয় করে দেবে, এটা কিভাবে আশা করা যায় ? এভাবে 'আদ্বীনের' অন্যান্য যেসব উপাদানের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তার কোনো একটির জন্যেও পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে কোনো নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় না, যার ভিত্তিতে বুদ্ধিবৃত্তি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বব্যাপী জীবন-ব্যবস্থা রচনায় সক্ষম হতে পারে। অধিকন্তু ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নামক উপাদানটা বুদ্ধিবৃদ্ধির পেছনে স্থায়ীভাবে লেগেই আছে। সে তাকে নিরেট যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেয় না। বুদ্ধিবৃত্তি সোজা পথে চলতে চাইলেও ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাকে কিছুটা বাঁকা পথের দিকেই প্রবৃত্ত না করে ছাড়ে না। সুতরাং যদি ধরেও নেয়া হয় যে, মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস ও সমন্বয় সাধনে এবং তা থেকে প্রমাণ সংগ্রহে ভুল করবে না তথাপি নিজস্ব দুর্বলতার কারণে সে এতটা শক্তি রাখে না যে, তার ওপর এত বড় গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। তার ওপর এ গুরুভার চাপালে তার ওপরও যুলুম করা হয়, আর যে চাপায় তার ওপরও।

তিন ঃ বিজ্ঞান

এখন তৃতীয় উপকরণটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এটি হলো অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞান। একজন বিজ্ঞানের ছাত্র এ জ্ঞানের কদর ও গুরুত্ব যতখানি উপলব্ধি করে আমিও ঠিক ততখানি করি। আমি একে বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা করি না। কিন্তু এ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাকে ব্যাপকতা দান করা যা তার মধ্যে নেই, একেবারেই অবৈজ্ঞানিক কাজ। মানবীয় জ্ঞানের সঠিক তত্ত্ব যার জানা আছে, সে অস্বীকার করতে পারবে না যে, অতীন্দ্রিয় সমস্যার নিগূঢ় রহস্য তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ তার হাতে নেই। সে সরাসরিভাবে তা পর্যবেক্ষণও করতে পারে না আর যেসব জিনিস নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের আওতায় আসে, তার ভিত্তিতে যুক্তি প্রমাণ সহকারে তার সম্পর্কে এমন মতামতও প্রতিষ্ঠা করতে সে সক্ষম নয় যাকে 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা চলে। কাজেই আলোচ্য 'আদ্বীন' রচনায় যে ক'টি মৌল সমস্যার সমাধান একেবারে গোড়াতেই জেনে নেয়া অপরিহার্য, বিজ্ঞানের দৌড় যে সে পর্যন্ত পৌঁছায় না, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, নৈতিক মূল্যবোধ নির্ণয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূলনীতিসমূহ প্রণয়ন এবং বিপথগামিতা রোধকারী সীমারেখা চিহ্নিত করার কাজ বিজ্ঞানের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় কি না ? এ প্রশ্নের জবাব জানতে গিয়ে প্রথমেই কথা ওঠে যে, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোন যুগের বিজ্ঞানের হাতে ঐ দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়। কিন্তু সে কথায় না গিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (আদ্বীন) রচনার কাজ সম্পন্ন করতে কি কি অত্যাবশ্যক শর্ত পালন করা প্রয়োজন, সেটাই আমাদের ভেবে দেখা উচিত। এর জন্যে পয়লা শর্ত এই যে,

যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের অধীন মানুষের পার্থিবজীবন অতিবাহিত হয়, তা মানুষের জানা থাকা চাই। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, স্বয়ং মানুষের আপন জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য তার পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ব হওয়া চাই। তৃতীয় শর্ত এই যে, এ উভয় ধরনের জ্ঞান অর্থাৎ মানবজীবন ও প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জানা সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য একত্র করতে হবে এবং তারপর কোনো এক পূর্ণ পরিপক্ক ও প্রাজ্ঞমস্তিষ্ক কর্তৃক সেগুলোকে নিপুণভাবে বিন্যস্ত করে সেগুলো থেকে নির্ভুল যুক্তি-প্রমাণ আহরণ করে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূলনীতিসমূহ ও ভ্রষ্টতা রোধকারী সীমারেখাসমূহ নির্ণয় করতে হবে। এসব শর্ত আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি, আর আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পরেও তা পূর্ণ হবে এমনটি আশা করা যায় না। হয়তো বা মানবজাতির বিলুপ্তির একদিন আগে তা পূর্ণ হবে। কিন্তু তখন আর তা দিয়ে কোনো কাজই হবে না।

চার ঃ ইতিহাস

সব শেষে ধরা যাক জ্ঞানের সেই উপায়-উপকরণ যাকে আমরা প্রমাণচিত্র অথবা মানবজাতির আমলনামা বলে থাকি। তার গুরুত্ব ও মঙ্গলকারিতা আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমি শুধু বলতে চাই যে, 'আদ্বীন' রচনা করার মত বিরাট কাজ সমাধা করতে এটিও যথেষ্ট নয়। একটু তলিয়ে দেখলে পাঠকমণ্ডলীও আমার সাথে একমত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। এখানে আমি এ প্রশ্ন তুলছি না যে, এ ঐতিহাসিক প্রমাণচিত্র অতীতকাল থেকে বর্তমানকালের মানুষের কাছে সঠিক ও সার্বিকভাবে পৌছেছে কি না। আর এ ঐতিহাসিক প্রমাণচিত্র বা রেকর্ডের সাহায্যে 'আদ্বীন' রচনা করার কাজটি সমগ্র মানব জাতির পক্ষ থেকে কার মস্তিষ্কের ওপর ন্যস্ত করা যাবে ? হেগেলের, না মার্কসের, না আর্নেস্ট হাইকেলের, না অন্য কারও ? আমার জিজ্ঞাস্য শুধু এই যে, অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের সঠিক কোন্ তারিখ পর্যন্ত সময়ের প্রমাণচিত্র একটি 'আদ্বীন' রচনার জন্যে পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ করতে সক্ষম ? তারাই ভাগ্যবান যারা ঐ তারিখের পর জন্মগ্রহণ করবে। আর যারা তার আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবে ? আল্লাহ তায়ালাই তাদের রক্ষক।

হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল

আমি যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম, আমার বিশ্বাস, এতে আমি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অথবা যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে কোনো ভুল করিনি। মানবীয় উপায়-উপকরণের যে সমীক্ষা আমি দিয়েছি তা যদি সঠিক হয় তাহলে আর কোনো বাধা-বিঘ্নের পরোয়া না করে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারি যে, মানুষ নিজের জন্যে অপরিপক্ক, ত্রুটিপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী ও আঞ্চলিক ধাঁচের একটা জীবনব্যবস্থা হয়তো গঠন করতে পারে। কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ ও কালজয়ী জীবনব্যবস্থা (আদ্বীন) রচনা করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এটা অতীতেও অসম্ভব ছিল, আজও অসম্ভব। আর অনাগত ভবিষ্যতেও এর সম্ভাব্যতার কোনোই আশা নেই।

এমতাবস্থায় নাস্তিকদের মতানুসারে যদি মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্যে কোনো "খোদা' না-ই থেকে থাকে, তবে তার আত্মহত্যাই করা উচিত। যে পথিকের পথপ্রদর্শকও নেই, পথের সন্ধান লাভের বিকল্প কোনো উপায়ও নেই, চরম হতাশা ছাড়া তার কপালে আর কিছুই জুটতে পারে না। সে পথের মাঝেই একটা পাথরে সজোরে মাথা ঠুকে নিজের সমস্ত সমস্যা চুকিয়ে ফেলুক—এ উপদেশ ছাড়া তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের তাকে

আর কিছু দেয়ার থাকতে পারে না। আর যদি 'খোদা' থেকে থাকে কিন্তু সে খোদা পথপ্রদর্শক খোদা না হন—যেমন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের একটি গোষ্ঠী এরূপ এক বিশেষ ধাঁচের খোদার অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট রয়েছেন—তাহলে সে তো আরো শোচনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যে খোদা বিশ্বজগতের সকল বস্তু ও প্রাণীর টিকে থাকা ও বিকাশ-বৃদ্ধিলাভের জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছুই দিলেন অথচ তার সবচেয়ে বেশী দরকারী জিনিসটা অর্থাৎ তার জীবনযাপনের বিধান ও পদ্ধতিটা দিলেন না, তার তৈরী করা দুনিয়ায় বাস করাই এক মারাত্মক বিপদ। সত্য বলতে কি, এর চেয়ে বড় বিপদ আর কল্পনাই করা যায় না। কেননা ঐ জীবনপদ্ধতি ছাড়া গোটা মানবজাতির জীবনটাই বৃথা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় গরীব, অনাথ, রোগী, দুঃখী, আহত ও মযলুম মানুষের জন্যে বিলাপ না করে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয়া এ মানব জাতির জন্যেই বিলাপ করা প্রয়োজন। সে বারবার ভুল জীবন দর্শনের ব্যর্থ পরীক্ষা চালায়। চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তারপর উঠে চলতে আরম্ভ করে, অতপর আবার হোঁচট খায়। আর প্রতিবারে যখন হোঁচট খায়, তখন দেশের পর দেশ ও জাতির পর জাতি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। সে এতই দিশেহারা যে, নিজের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, তাও সে জানে না। কিসের জন্যে সে কাজকর্ম করবে, চেষ্টা-তদবীর চালাবে আর কি নিয়ম-পদ্ধতিতে চালাবে, তাও তার অজানা। যে খোদা তাকে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় বসবাস করতে দিয়েছেন তিনি যেন তার এ সমস্ত দুর্গতি নীরবে দেখছেন। যেন কেবল সৃষ্টি করার ভাবনাই তিনি ভাবেন। দুনিয়ায় বেঁচে থাকা ও কাজকর্ম করার নিয়ম জানিয়ে দেয়ার কোনো ধার ধারেন না!

একমাত্র আশার আলো

কুরআন আমাদের সামনে এ চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত অন্য এক অবস্থার চিত্র পেশ করছে। কুরআন বলে, আল্লাহ্ শুধু সৃষ্টিকর্তা নন, তিনি পথপ্রদর্শকও। তিনি বিশ্বচরাচরে বিরাজমান প্রতিটি জিনিসকে তার স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল পথনির্দেশ দিয়েছেন।

الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○ (طه : ٥٠)

"যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার দৈহিক কাঠামো দিয়েছেন অতপর তাকে পথনির্দেশ দিয়েছেন।"—(সূরা তা-হা ঃ ৫০)

এর প্রমাণ দেখতে হলে যে কোনো একটা পিপঁড়ে, মাছি বা মাকড়াশাকে ধরে দেখা যেতে পারে। এসব নগণ্য সৃষ্টিকে যে খোদা জীবনযাপনের পথ দেখিয়েছেন,সেই একই খোদা মানুষকেও পথ দেখিয়েছেন, কাজেই মানুষের জন্যে একমাত্র নির্ভুল ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা হলো সমস্ত দাম্ভিকতা পরিহার করে তার সামনে মাথানত করা এবং নবীদের মাধ্যমে তিনি যে সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বা 'আদ্দীনের' পথনির্দেশ পাঠিয়েছেন, তার অনুসরণ করা।

এখন দেখা যাচ্ছে, আমাদের সামনে দু'টো পথ খোলা রয়েছে। মানুষের শক্তি-সামর্থ ও উপায়-উপকরণ পর্যালোচনার পর একটা পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর কুরআনের ঘোষণার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে আর একটি পথ। আমাদের জন্যে এই দু'টো পথের একটাকে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হয় কুরআনের ঘোষণাকে মেনে নিতে

হবে, নতুবা নিজেদেরকে নৈরাশ্যের সেই ভয়াল অন্ধকারে ঠেলে দিতে হবে, যেখানে আশার কোনো আলোক রশ্মি নেই। বস্তুত জীবনব্যবস্থা রচনার দু'টো উপকরণ রয়েছে এবং সেই দু'টোর একটা বেছে নিলেই হলো—এরূপ অবস্থার মুখোমুখি আমরা নই। আসলে আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন তা হলো এই যে, জীবনব্যবস্থাকে অর্জনের একটামাত্র উপায় রয়েছে। সেই একমাত্র উপায়কে আমরা গ্রহণ করবো, না তার সাহায্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোকেই অগ্রগণ্য মনে করবো, এটাই আমাদের স্থির করতে হবে।

কুরআনের যুক্তি

যে যুক্তিতর্ক আমি এ পর্যন্ত উপস্থাপিত করলাম, তা থেকে আমরা শুধু এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে, মানবজাতির কল্যাণের জন্যে কুরআনের দাবীকে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অন্য কথায় বলা যায়, কাফের হওয়ার তো উপায় নেই, অগত্যা মুসলমানই হও। কিন্তু কুরআন তার দাবীর সমর্থনে এর চেয়ে অনেক উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে। সে মানুষকে দায়ে ঠেকে মুসলমান হতে বলে না। বরং খুশী মনে ও স্বেচ্ছায় মুসলমান হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ব্যাপারে তার বহু যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে চারটি যুক্তি-প্রমাণ সবচেয়ে বলিষ্ঠ। এ চারটিই সে বারংবার পেশ করে থাকে।

এক ঃ মানুষের জন্যে ইসলামই একমাত্র সঠিক জীবনব্যবস্থা। কেননা একমাত্র এটাই প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতিশীল। এ ছাড়া আর যত ধারণা-বিশ্বাস সবই সত্যের পরিপন্থী ও অবাস্তব।

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝ (ال عمران : ٨٣)

"তারা কি আল্লাহর 'দ্বীন' ছাড়া অন্য কোনো 'দ্বীন' চায়? অথচ আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে, সবই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় একমাত্র তারই সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে আছে এবং তার কাছেই তাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।"

দুই ঃ মানুষের জন্যে এটাই একমাত্র বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা । কেননা এটাই হলো একমাত্র সত্য। ন্যায়-নীতির বিচারেও এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা বিশুদ্ধ হতে পারে না। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهٖ ط أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (الاعراف : ٥٤)

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মনিব হলো আল্লাহ—যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে (বা ছয় যুগে) সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি দিনকে রাতের পোশাকে আচ্ছাদিত করেন। অতপর আবার রাতের পেছনে দিন প্রবল গতিতে ছুটে চলে। সূর্য, চাঁদ ও তারা সকলেই তাঁর নির্দেশের অনুগত। শুনে

রাখ! সৃষ্টি তিনিই করেছেন, আর শাসন-বিধানও চলবে একমাত্র তাঁরই। বস্তুত বিশ্বজগতের মনিব আল্লাহ বড়ই কল্যাণময়।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪)

তিন ঃ যেহেতু যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে এবং সে জন্যে নির্ভুল পথনির্দেশ একমাত্র তিনিই দিতে সক্ষম। তাই তাঁর রচিত এ বিধানই মানুষের জন্যে যথার্থ ও নির্ভুল।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝ (ال عمران : ٥)

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই—পৃথিবীতেও না, আকাশেও না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫)

يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

"মানুষের কাছে যা গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাঁর জানা। তাঁর জানা তথ্য থেকে তিনি নিজে যতটুকু মানুষকে জানাতে চান, তাছাড়া আর কিছুই তারা জানতে পারে না।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط (الانعام : ٧١)

"হে নবী! তুমি জানিয়ে দাও যে, একমাত্র আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত ও সঠিক পথনির্দেশ।"–(সূরা আল-আনআম ঃ ৭১)

চার ঃ মানুষের জন্যে এটাই একমাত্র সত্য পথ। কারণ এছাড়া ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। এছাড়া অন্য যে পথেই মানুষ চলবে, সে পথ শেষ পর্যন্ত যুলুম ও অবিচারের দিকেই তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط (الطلاق : ١)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে সে অবশ্যই নিজের ওপর নিজে যুলুম চালাবে।"–(সূরা আত্ তালাক ঃ ১)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ (المائدة : ٤٥)

"আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে যারা বিচার-ফায়সালা করে না তারাই যালিম।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫)

কুরআনের এসব যুক্তি-প্রমাণের আলোকে প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে আল্লাহর সামনে নতি স্বীকার করা ও জীবনের বিধি-ব্যবস্থা তার কাছ থেকেই গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।

খোদায়ী বিধান যাঁচাই করার মাপকাঠি

এবার সামনে অগ্রসর হবার আগে আমি একটা প্রশ্নের জবাব দেয়া দরকার মনে করছি। আলোচনার এ স্তরে এসে প্রত্যেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগে। বিষয়টি নিয়ে যখন চিন্তা-ভাবনা করছিলাম, তখন আমার মনেও ওটা জেগেছিল। প্রশ্নটি হলো, কোন্টি আল্লাহর রচিত বিধান, আর কোন্টি মানব রচিত বিধান, তা আমরা কি উপায়ে নির্ণয়

করতে পারবো ? আল্লাহর বিধান বলে যে কেউ একটা বিধান হাযির করে দিলেই তো তা মেনে নেয়া যেতে পারে না। প্রশ্নটির জবাব দিতে খুবই বিস্তারিত আলোচনার দরকার। তবে আমি সংক্ষেপে জবাব দিতে চেষ্টা করবো। বস্তুত মানবীয় চিন্তা ও খোদায়ী চিন্তার পার্থক্য নির্ণয়ের চারটি প্রধান প্রধান মাপকাঠি রয়েছে। সেগুলো একে একে তুলে ধরছি।

মানুষের চিন্তার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে জ্ঞানের ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতার প্রভাব অনিবার্যভাবেই বিদ্যমান। কিন্তু খোদায়ী চিন্তায় সেটা অসম্ভব। সেখানে অসীম ও নির্ভুল জ্ঞানের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর লক্ষণীয়। আল্লাহর বিধানে কখনো একটি বিশেষ যুগের প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিপন্থী কোনো বিষয় থাকতে পারে না তাতে এমন কোনো বিষয়ও থাকতে পারে না যাতে সত্যের কোনো একটি দিক বিধান রচয়িতার আগোচরে রয়ে গেছে বলে প্রমাণিত হতে পারে। অবশ্য এ মাপকাঠি প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুলে যাওয়া চলবে না যে, জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ধারণা-কল্পনা ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ—এসব এক জিনিস নয়। এক সময়ে মানুষের মন-মগজে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও বৈজ্ঞানিক ধারণা-কল্পনা প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং লোকেরা ভ্রান্তিবশতঃ তাকেই 'জ্ঞান' বলে মনে করে থাকে। অথচ সেগুলোর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যতখানি, সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও ঠিক ততখানি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন ধারণা-কল্পনা ও মতবাদ খুব কমই দেখা গেছে যা শেষ পর্যন্ত যথার্থ 'জ্ঞান' বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

মানবীয় চিন্তার আর একটি বড় দুর্বলতা হলো দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা। পক্ষান্তরে খোদায়ী চিন্তায় দৃষ্টিভঙ্গীর সর্বাধিক পরিমাণ ব্যাপকতা ও বিশালতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। খোদায়ী চিন্তা থেকে উদ্গত কোনো কথা পর্যালোচনা করলে মনে হবে তার প্রবক্তা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবকিছুই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। মনে হবে, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতকে ও তার সমস্ত নিগূঢ় সত্য এক নজরে একই সাথে দেখছেন। তার মোকাবিলায় অতি-উঁচুদরে দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মতামত ও চিন্তাধারাকেও নিতান্ত শিশুসুলভ মনে হবে।

মানবীয় চিন্তার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনার সাথে বিবেক-বুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোথাও না কোথাও লুকোচুরি ও যোগসাজসে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে খোদায়ী ব্যবস্থা অবিমিশ্র বুদ্ধিমত্তা ও নির্ভেজাল জ্ঞানের মহিমায় ভাস্বর। এ বৈশিষ্ট্য এতই উজ্জ্বল ও স্পষ্ট যে, এর বিধি-ব্যবস্থাসমূহের কোথাও ভাবালুতা ও ঝোঁকপ্রবণতার নাম চিহ্নও পরিদৃষ্ট হয় না।

মানবীয় চিন্তার আর একটা দুর্বলতা এই যে, তার রচিত জীবনব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব, মানুষে মানুষে অযৌক্তি বৈষম্য এবং অযৌক্তিক ভিত্তিতেই একের ওপর অন্যের অগ্রাধিকার দানের উপাদান অনিবার্যভাবে বিদ্যমান। কেননা প্রত্যেক মানুষেরই কিছু ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ও অভিরুচি থাকে এবং গোষ্ঠী বিশেষের সাথে তার যোগসূত্র থাকে, আবার গোষ্ঠী বিশেষের সাথে থাকে না। কিন্তু খোদায়ী চিন্তা এ জাতীয় উপাদান থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

নিজেকে খোদায়ী জীবনব্যবস্থা বলে পরিচয়দানকারী প্রত্যেক ব্যবস্থাকে এ মানদণ্ডে যাচাই করে দেখা যেতে পারে। তা যদি মানবীয় চিন্তা ও জ্ঞান-বুদ্ধির ঐসব দুর্বলতা ও

আবীলতা থেকে মুক্ত বলে প্রমাণিত হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যেরূপ ব্যাপক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক, সেরূপ হয়, তাহলে সে জীবনব্যবস্থার ওপর নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় ঈমান আনা যেতে পারে। এ ব্যাপারে ওজর-আপত্তি থাকার কোনোই কারণ নেই।

ঈমানের দাবী

এখন আমি মৌলিক প্রশ্নাবলীর মধ্যে সর্বশেষ প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব। সে প্রশ্নটি হল এই যে, মানুষ যখন কুরআনের এ দাবী মেনে নেয় এবং একটি জীবনব্যবস্থাকে খোদায়ী জীবনব্যবস্থা বলে নিশ্চিন্তভাবে জেনে তার ওপর ঈমান আনে, তখন তার করণীয় কী?

আমি শুরুতেই বলছি যে, ইসলামের অর্থ হল মাথানত করা; বাধ্য ও অনুগত হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা ও আত্মসমর্পণ করা। এ নতি ও বশ্যতা স্বীকার এবং আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের সাথে স্বেচ্ছাচারিতা এবং চিন্তা ও কর্মের অবাধ স্বাধীনতার সহাবস্থান সম্ভব নয়। যে জীবনব্যবস্থার প্রতিই ঈমান আনা হবে নিজের সমগ্র জীবন ও সত্তাকে তার কাছে সপে দিতে হবে। নিজের আয়ত্তাধীন কোনো জিনিসকেই তার আনুগত্যের বাইরে রাখা চলবে না। একাধারে মন ও মস্তিষ্ক, চোখ ও কান, হাত ও পা, পেট ও দেহ, জিহ্বা ও কলম, সময় ও শ্রম, চেষ্টা-তদবীর ও কাজ-কর্ম, ঘৃণা ও ভালবাসা, শত্রুতা ও মিত্রতা—সবকিছুর ওপরই সে জীবনব্যবস্থার নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য মেনে নিতে হবে। নিজ ব্যক্তিসত্তার কোনো অংশ এবং কোনো ক্ষেত্রই তার আওতামুক্ত থাকতে পারবে না। নিজের আয়ত্তাধীন কোনো বস্তুকে যতখানি ঐ জীবনব্যবস্থার আনুগত্য ও আওতার বাইরে রাখা হবে এবং তার যে যে দিক বা ক্ষেত্রকে বাইরে রাখা হবে ঠিক ততখানি এবং সেই অনুপাতে ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। নিজের ঈমান বা বিশ্বাসে যে ব্যক্তি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান থাকতে ইচ্ছুক, নিজের জীবনকে অসত্য থেকে পবিত্র রাখার জন্যে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য।

আমি এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। মানুষের জীবন যে একটি একক ও অবিভাজ্য সত্তা, সে কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এ কারণে মানুষের সমগ্র জীবনের জন্যে একটি মাত্র জীবনব্যবস্থা আবশ্যক। একই সাথে একাধিক জীবন বিধান মেনে চলা কেবল ঈমানের দোদুল্যমানতা এবং সিদ্ধান্তের অস্থিরতা ও অপরিপক্কতারই পরিচায়ক। যখন কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে কারও নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে যে, ওটাই একমাত্র সত্য সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং সে তাকে নিজের ধর্ম বা জীবন বিধানরূপে মেনে নেয় তখন সেটাকে তার জীবনের সকল অংশ ও বিভাগের কার্যকর ধর্ম হিসেবে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তা যদি তার নিজের ব্যক্তিগত ধর্ম হয় তবে অবশ্যই তা হবে তার পরিবারেরও ধর্ম, সন্তান লালন-পালনেরও ধর্ম, শিক্ষা ও শিক্ষায়তনেরও ধর্ম, কায়কারবার ও জীবিকা উপার্জনেরও ধর্ম, পারস্পরিক মেলামেশা, আচার-আচরণ ও জাতীয় কর্মধারারও ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ জীবনেরও ধর্ম এবং সাহিত্য সংস্কৃতিরও ধর্ম। এতে কোনো ব্যতিক্রম হওয়ার কোনোই কারণ নেই। এক একটি মুক্তা আলাদা আলাদা থাকা অবস্থায় মুক্তা থাকবে আর তা দিয়ে মালা গাঁথলেই অমনি মুক্তাগুলো সব কলাই-মুসুরের দানায় পরিণত হবে—এটা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে একটি বিশেষ ধর্ম বা জীবনব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুসারী হবে আর অনেকগুলো মানুষ সংঘবদ্ধ হলেই তাদের

সমষ্টিগত জীবনের কোনো কোনো অংশ সেই ধর্ম বা জীবনব্যবস্থার আনুগত্য থেকে বাদ পড়ে যাবে এটাও সম্ভব নয়। তাছাড়া একজন মানুষ যে ধর্মকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থারূপে মেনে নিয়ে তার প্রতি ঈমান আনে, তার কাছে তার ঈমানের সবচেয়ে বড় দাবী এ দাঁড়ায় যে, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে সেই মহান ধর্মের বরকত লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ দেয় এবং সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাই যাতে সারা দুনিয়ার কর্তৃত্বশীল ও কার্যকর জীবনব্যবস্থায় পরিণত হয়, তার জন্যে সচেষ্ট হয়। বিজয়ী হয়ে বেঁচে থাকাই যেমন সত্যের স্বভাব ধর্ম, তেমনি সত্যাশ্রয়ী হওয়ারও স্বাভাবিক দাবী হল সত্যকে বাতিলের ওপর বিজয়ী করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। কোনো সত্যপন্থী মানুষ এ দায়িত্ব পালন না করে স্বস্তি লাভ করতে পারে না। যে ব্যক্তি দেখতে পায় যে, সারা দুনিয়ায় বাতিল শক্তি দোর্দণ্ড প্রতাপে ও প্রবল পরাক্রমে জেঁকে বসে আছে। অথচ তা দেখেও সে এতটুকুও ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয় না, তার মনে সত্যের প্রতি কিছু অনুরাগ বা আকর্ষণ যদি থেকেও থাকে তবে তা সুপ্ত ও ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। এ ঘুম যাতে তার সর্বনাশা ঘুমে পরিণত না হয় এবং এ নিস্তব্ধতা যাতে মৃত্যুর নিস্তব্ধতায় রূপান্তরিত না হয়, সে জন্যে তার সাবধান হওয়া উচিত।১৪০

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব*

দুনিয়ার মানুষের জীবনযাপনের জন্যে যে জীবন বিধানই রচনা করা হোক না কেন কোনো না কোনো অতিন্দ্রিয় দর্শন থেকেই যে তার উৎপত্তি হবে এটা অবধারিত। জীবনের জন্যে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে প্রথমে মানুষ এবং মানুষের আবাসভূমি এ মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা অর্জন করা অপরিহার্য। তা না হলে উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়। মানুষের চালচলন ও আচার-ব্যবহার কি ধরনের হওয়া উচিত এবং দুনিয়ায় তার কিভাবে কাজকর্ম করা উচিত—এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আগে জানতে হবে মানুষ বস্তুটা কি, এ মহাবিশ্বের অবস্থান ও মর্যাদা কি এবং তার ব্যবস্থাপনা কোন্ ধরনের যার সাথে মানবজীবনের সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। এ শেষোক্ত প্রশ্নগুলোর যে সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে, সে অনুসারেই একটা চারিত্রিক মতাদর্শ গড়ে উঠবে এবং সে চারিত্রিক মতাদর্শটি যে ধরনের হবে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সে অনুসারেই গঠিত হবে। অতপর সে নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সামষ্টিক সম্পর্ক লেনদেন ও আচরণের বিস্তারিত বিধি-বিধান রচিত হবে। এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজ ও সভ্যতার গোটা প্রাসাদ এর ভিত্তিতেই নির্মিত হবে।

বস্তুত পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত মানবজাতির জন্যে যত ধর্ম ও মতাদর্শ তৈরী হয়েছে তার সবটারই গোড়াতে নিজস্ব একটা মৌলিক দর্শন ও মৌলিক চারিত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক করে নিতে হয়েছে। ফলে মূলনীতি থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি নিয়ম-নীতি পর্যন্ত একটি মতাদর্শকে অন্য মতাদর্শ থেকে আলাদা করে রেখেছে এ মৌলিক দর্শন ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। কেননা এটাই হল প্রতিটি জীবনপদ্ধতির মেজাজ বা স্বভাব প্রকৃতির নিয়ামক। জীবনপদ্ধতিকে যদি দেহ মনে করা হয় তবে ওটা তার প্রাণস্বরূপ।

জীবন সম্পর্কে চারটি মতবাদ

একটি জীবনপদ্ধতির খুঁটিনাটি বিষয় ও শাখা-প্রশাখার কথা বাদ দিয়ে কেবল মৌলিক কাঠামো নিয়ে যদি বিচার-বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, মানুষ ও প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে সর্বমোট চারটি অতীন্দ্রিয় মতবাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। দুনিয়ায় যতগুলো জীবন দর্শন রয়েছে তা এ চারটিরই কোনো একটিকে গ্রহণ করেছে। এ চারটি মতবাদের মধ্যে প্রথমটিকে আমরা নির্ভেজাল জাহেলিয়াত নামে আখ্যায়িত করতে পারি।

এক ঃ নির্ভেজাল জাহেলিয়াত

এ মতবাদের মূল কথা এই যে, সমগ্র বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার বাস্তব প্রকাশ। এর পেছনে কোনো প্রজ্ঞা, কোনো নিগূঢ় তত্ত্ব বা কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটি আপনা-আপনি তৈরী হয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলছে, আবার কোনো ফল বা পরিণতি ছাড়াই আপনা-আপনি তা একদিন অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এর কোনো খোদা নেই। আর যদি

---

* সত্য ধর্ম ইসলামের পরিপন্থী যত জীবনাদর্শ রয়েছে বা ছিল তুলনামূলক অর্থে তার সবগুলোকেই 'জাহেলিয়াত' নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামের ভিত্তি হল 'প্রকৃত জ্ঞান' তথা খোদায়ী অহী আর জাহেলী মতাদর্শসমূহের ভিত্তি আন্দাজ-অনুমান ও কল্পনাপ্রসূত অতীন্দ্রিয় ধ্যান-ধারণা অথবা নিছক অজ্ঞতা ও অবিবেচনাপ্রসূত আধ্যাত্মিক চিন্তা-(গ্রন্থকার)।

থেকেও থাকে তবে মানুষের জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ এক ধরনের জীব এবং অন্যান্য জীবের ন্যায় হয়তো ঘটনাক্রমেই তারও উদ্ভব হয়েছে। তাকে কে সৃষ্টি করেছে, কি জন্যে সৃষ্টি করেছে ইত্যাদি নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই। আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, দুনিয়াতে মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে। তার কিছু আশা-আকাঙ্খা আছে, যেসব পূরণ করার জন্যে তার প্রকৃতি ভেতর থেকে প্রবল চাপ দেয়। এসব আশা-আকাঙ্খা পূরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কিছু শক্তি এবং যন্ত্রাদিও তার রয়েছে। সে তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বেশকিছু উপকরণ দেখতে পায়। এগুলোর ওপর নিজের শক্তি ও যন্ত্রগুলো প্রয়োগ করে সে তার আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে। সুতরাং নিজের পার্শ্বপ্রবৃত্তির দাবী পূরণ করা ছাড়া তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এসব চাহিদা পূরণের নিমিত্ত উন্নতমানের উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা ছাড়া তার মানবীয় শক্তি-সামর্থের আর কোনো কার্যকারিতাও নেই। মানুষের উর্ধে জ্ঞান এবং সত্য ও সঠিক পথে চলার পথনির্দেশের কোনো উৎস ও উৎপত্তিস্থল নেই যেখান থেকে সে তার জীবনের বিধান লাভ করতে পারে। সুতরাং তার চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতির ও নিদর্শনাবলী এবং যেসব নিদর্শন ও পরিস্থিতি বিরাজমান আপন ঐতিহাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নিজেই তার একটা জীবন বিধান রচনা করা উচিত। যেহেতু এমন কোনো সরকার বাহ্যত চোখে পড়ে না যার সামনে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই মানুষ স্বাভাবিকভাবেই একটি দায়িত্বহীন সত্তা। যদি তাকে জবাবদিহি করতেই হয় তাহলে তার নিজের কাছেই অথবা এমন এক কর্তৃত্বের কাছে যা মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে—মানুষের ওপরই কর্তৃত্বশীল হয়ে পড়ে।

কর্মফল যা কিছুই হবে তা এ দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ। দুনিয়ার জীবনের বাইরে আর কোনো জীবন নেই। সুতরাং দুনিয়াতে প্রকাশিত কর্মফলের প্রেক্ষিতেই কোনো জিনিস ভুল না নির্ভুল, ক্ষতিকর না লাভজনক, গ্রহণীয় বা বর্জণীয় তা নিরূপিত হবে।

মানুষ যখন নির্ভেজাল জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত থাকে অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উর্ধে কোনো সত্য পর্যন্ত সে পৌছুতে পারে না অথবা প্রবৃত্তির দাসত্বের কারণে পৌছুতে চায় না তখন তার মন-মস্তিষ্কে এ মতবাদই প্রভাবশীল হয়। দুনিয়া পূজারীগণ সকল যুগে এ মতবাদই গ্রহণ করেছে। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া রাজা, বাদশা, আমীর-উমরাহ, শাসকবর্গ, সভাসদগণ, বিত্তশালীগণ এবং বিত্তের পেছনে জীবন উৎসর্গকারীগণ সাধারণভাবে এ মতবাদকেই অগ্রাধিকার দান করেছে। আর ইতিহাসে যেসব জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির বন্দনা-গীত গাওয়া হয়, তাদের সকলের সংস্কৃতির মূলে এ মতবাদ কার্যকর ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলেও এ মতবাদ কার্যকর রয়েছে। যদিও সকল পাশ্চাত্যবাসী খোদা ও আখেরাতে অবিশ্বাসী নয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে তারা সবাই জড়বাদী নৈতিকতারও সমর্থক নয়। কিন্তু যে প্রাণশক্তি তাদের গোটা সভ্যতা ও কৃষ্টির দেহে ক্রিয়াশীল, সেটা খোদা ও আখেরাতের প্রতি এ অবিশ্বাস এবং জড়বাদী নৈতিকতারই প্রাণশক্তি এবং এটা তাদের জীবনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যারা বুদ্ধি-বিবেচনার দিক দিয়ে খোদা ও আখেরাতের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটা অজড়বাদী দৃষ্টিকোণ রাখে তারাও অবচেতনভাবে বাস্তব জীবনে নাস্তিক ও জড়বাদী ছাড়া আর কিছুই নয় কেননা চিন্তার ক্ষেত্রে তারা যে মতবাদের অনুসারী বাস্তব জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের

পূর্ববর্তী সমৃদ্ধিশালী ও খোদাবিস্মৃত লোকদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। বাগদাদ, দামেস্ক, দিল্লী ও গ্রানাডার সমৃদ্ধিশালী লোকেরা মুসলমান ছিল বলে খোদা ও আখেরাতকে অস্বীকার করত না কিন্তু তাদের গোটা জীবনের কর্মসূচী এমনভাবে তৈরী হত যেন খোদা ও আখেরাত বলতে কোনো জিনিসের অস্তিত্বই নেই এবং কারও কাছে জবাবদিহি করার এবং কারও কাছ থেকে হেদায়াত গ্রহণের কোনো প্রশ্নই নেই। আছে শুধু তাদের কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্খা। তাদের এ আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্যে সব ধরনের উপায়, উপকরণ ও পন্থা অবলম্বনে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের মনোভাব হল এই যে, যেহেতু এ জীবনের পর আর কোনো জীবন নেই, অতএব জীবনযাপনের যতটুকু সময় পাওয়া যায়, ভোগ-বিলাসিতার মাধ্যমেই তা সদ্ব্যবহার করতে হবে।

ওপরে বলা হয়েছে যে, এ মতবাদের প্রকৃতিই হল এই যে, এর ভিত্তিতে একটা নির্ভেজাল জড়বাদী নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সে নৈতিক ব্যবস্থা পুঁথি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ হোক অথবা শুধু মন-মানসেই সংকলিত হয়ে থাক তাতে কিছু আসে যায় না। অতপর এ জড়বাদী মানসিকতা থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তাধারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ক্রমান্বয়ে গোটা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নাস্তিকতাও বস্তুবাদের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর ব্যক্তি চরিত্র গড়ে ওঠে একই আদর্শিক ছাঁচে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও লেনদেনের নীতি তৈরী হয় একই পদ্ধতি ও ছাঁচে। আইন-কানুন রচনা এবং তার উৎকর্ষ সাধনও চলে সেই একই ভঙ্গীতে। তারপর এ ধরনের সমাজের নেতৃত্ব লাভ করে তারাই যারা সবচেয়ে বড় প্রতারক, আত্মসাৎকারী, মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ, নিষ্ঠুর এবং নীচ প্রবৃত্তির লোক। গোটা সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব তাদেরই হাতে চলে যায়। তারপর তারা লাগামহীন উটের মতো বেপরোয়াভাবে মানবজাতির ওপর চালায় শোষণ-নিপীড়নের নিষ্ঠুর অভিযান। কোনো হিসাব-নিকাশের অথবা কোনো পক্ষ থেকে পাকড়াও হওয়ার ভয় থাকে না। তাদের সমস্ত বাস্তব কলাকৌশল তৈরী হয় মেকিয়াভেলীর রাজনৈতিক মূলনীতির ভিত্তিতে। তাদের আইন গ্রন্থে শক্তির অপর নাম সত্য আর দুর্বলতার অপর নাম মিথ্যা। বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আর কোনো জিনিস তাদেরকে যুলুম-অবিচার থেকে বিরত রাখতে পারে না। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এ যুলুম-নিষ্পেষণ এমন রূপ ধারণ করে যে, শক্তিশালী আপন জাতির দুর্বল শ্রেণীকে নিষ্পেষিত করতে থাকে। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ* ও জাতি ধ্বংসের রূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

---

* গ্রন্থকার জাহেলী মতবাদের আর একটি দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ হযরত শোয়াইব (আ) যখন স্বজাতির লোকদেরকে এক আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের আহ্বান জানালেন এবং ব্যবসায়িক লেনদেনে দুর্নীতি থেকে বিরত থাকতে বললেন, তখন তারা জবাব দিল ঃ

يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ط

"হে শোয়াইব, তোমার নামায কি এ শিক্ষা দেয়, আমরা আমাদের ঐসব দেব-দেবী পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা-অর্চনা করতো ? অথবা আমাদের ধন-সম্পদ আমরা ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারব না ?"-(সূরা হুদ ঃ ৮৭)

ইসলামের মোকাবিলায় জাহেলী মতাদর্শের এ হলো পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা। ইসলামের কথা হলো, আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া অন্য সব মত ও পথ ভুল এবং অনুসরণের অযোগ্য। কেননা অন্য কোনো মত ও পথের স্বপক্ষে আসমানী কিতাবে কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। আর আল্লাহর দাসত্ব শুধুমাত্র ধর্মীয়গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না বরং সমাজ ও সভ্যতা, অর্থনীতি ও রাজনীতি তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তা হতে হবে। কেননা মানুষের কাছে

দুইঃ শির্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াত

দ্বিতীয় অতি প্রাকৃত মতবাদ শির্কের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা আকস্মিক কোন ঘটনার ফলশ্রুতি নয় এবং এর পেছনে কোনো খোদা নেই তাও নয়। তবে এর খোদা বা প্রভু (Master) একজন নয়, বহু। এ ধারণার স্বপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ নেই। বরং নিছক আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক। এ জন্যে কল্পনা করা যায়, অনুভব করা যায় এবং বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় এমন সব বস্তুকে খোদারূপে গ্রহণ করতে মুশরিকদের মধ্যে কখনো ঐকমত্য হতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না। অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে দিশেহারা লোকদের হাত যে জিনিসের ওপরই পড়েছে, তাকেই তারা খোদা বানিয়ে নিয়েছে। এভাবে উপাস্যের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে। ফেরেশতা, জ্বিন, আত্মা, গ্রহ-নক্ষত্র, জীবিত ও মৃত মানুষ, বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত, জীব-জানোয়ার, নদী-সমুদ্র, পৃথিবী, আগুন, সবই দেবতা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রেম, সৌন্দর্য, কাম প্রবৃত্তি, সৃজনী শক্তি ,রোগ-ব্যাধি, যুদ্ধ, লক্ষ্মী, শক্তি প্রভৃতি বিমূর্ত জিনিসকেও পর্যন্ত উপাস্যে পরিণত করা হয়েছে। এমনকি সিংহ মানব, মৎস্য মানব, পক্ষী মানব, চার-মস্তকধারী, সহস্রভুজ হস্তিমুণ্ডধারী মানুষ প্রভৃতিও কিম্ভুৎকিমাকার মুশরিকদের উপাস্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অতপর এ পন্থার চারপাশে কল্পনা ও পৌরাণিকতার এক অপূর্ব তেলেসমাতি জগত তৈরী হয়েছে। প্রত্যেক অজ্ঞ জাতির উর্বর কল্পনাশক্তিও বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্য এমন মজার মজার নমুনা পেশ করেছে যে, দেখলে অবাক হতে হয়। যেসব জাতির মধ্যে সর্বোচ্চ খোদা তথা আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, সেখানে খোদায়ীর ব্যবস্থাপনা কিছুটা এ ধরনের যেন আল্লাহ তায়ালা বাদশাহ এবং অন্যান্য খোদা তাঁর উজির-নাজির, পারিষদবর্গ, মুসাহেব এবং বিভিন্ন দায়িত্বশীল, কিন্তু মানুষ বাদশাহের কাছে সরাসরি পৌঁছতে পারে না বলে যাবতীয় কাজকর্ম নিম্নপদস্থ খোদাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে। আর আল্লাহ সম্পর্কে যেসব জাতির ধারণা খুবই অস্পষ্ট অথবা যাদের বলতে গেলে কোনো ধারণাই নেই, সেখানে খোদার সকল কর্তৃত্ব বিভিন্ন খোদাদের মধ্যে বন্টিত হয়ে রয়েছে।

নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পর এটাই হলো 'দ্বিতীয় প্রকারের জাহেলিয়াত যার মধ্যে আবহমানকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ নিমজ্জিত হয়ে আছে। সবসময় নিম্নতম পর্যায়ের

শক্তি ও সম্পদ যা কিছু আছে সবই মূলতঃ আল্লাহর এবং কোনো জিনিসই আল্লাহর মর্জির বিপরীত নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকার মানুষের নেই। পক্ষান্তরে জাহেলিয়াতের মতবাদ হলো, বাপ-দাদার আমল থেকে যে রীতি-প্রথা চলে আসছে, তারই অনুসরণ করা উচিত। সেটা যে বাপ-দাদার রীতি, এটাই তার অনুসরণের যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। এ জন্যে আর কোনো যুক্তি প্রমাণের দরকার নেই। ধর্মের সম্পর্ক শুধু পূজা-উপসনার সাথে। আমাদের জীবনের পার্থিব কাজ-কর্মে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত যাতে করে আ-মাদের ইচ্ছামতো তা আমরা সমাধা করতে পারি। এর থেকে এটাও ধারণা করা যেতে পারে যে, জীবনকে ধর্মীয় এবং পার্থিব নামে পৃথক পৃথক ভাগ করার ধারণাটা নতুন কিছু নয়। বরঞ্চ আজ থেকে তিন-চারহাজার বছর পূর্বে হযরত শোয়াইব (আ)-এর জাতিও যেমন এ বিভক্তির কথাটা জোর দিয়ে বলতো, ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য জাতি ও তাদের অন্ধ অনুসারীগণ আজকাল বলে থাকে। আসলে এটা কোনো নতুন 'আলোকরশ্মি' নয় যা মানুষ আজ চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ক্রমবিকাশের ফলে লাভ করেছে। বরঞ্চ এটা সে প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা—যা হাজার হাজার বছর আগে জাহেলিয়াতের মধ্যে এমনিভাবেই বিদ্যমান ছিল। এর সাথে ইসলামের যে দ্বন্দ্ব তাও নতুন নয়, বহু পুরাতন।-(সংকলকবৃন্দ)১৪১

মানসিক অবস্থায় তারা এত দূর নেমে এসেছে। আল্লাহর নবীদের শিক্ষার প্রভাবে যারা এক পরাক্রমশালী আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের মন থেকে অন্যান্য খোদার অস্তিত্ব মুছে গেছে বটে, কিন্তু নবী, শহীদ, পীর, অলী, গাওস, কুতুব, আবদালএবং যিল্লুল্লাহ খেতাবপ্রাপ্ত লোকেরা কোনো না কোনো প্রকারে তাদের আকীদা-বিশ্বাসে স্থান লাভ করেছে। অজ্ঞ লোকেরা মুশরিকদের খোদারূপে গ্রহণ করেছে—যাদের সমগ্র জীবন ছিল মানুষের ওপর থেকে মানুষের খোদায়ী খতম করে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃত। একদিকে মুশরিকদের পূজাপাটের স্থলে ফাতেহা, যিয়ারত, নযর-নিয়ায, ওরস, মাজার পূজা, কবরের ওপর ঝাণ্ডা উড়ানো তাযিয়া এবং এ জাতীয় অন্যান্য ধর্মীয় কার্য-কলাপের এক নতুন শরীয়াত বানিয়ে নেয়া হলো। অপরদিকে কোনো তাত্ত্বিক দলিল প্রমাণাদি ছাড়া এসব বুযর্গানের জন্ম-মৃত্যু, আবির্ভাব ও অন্তর্ধান, কাশফ-কারামত, অস্বাভাবিক ক্ষমতা এবং আল্লাহর সাথে তাদের নৈকট্যের অবস্থা সম্পর্কে এক পরিপূর্ণ পৌরাণিকতা তৈরী করা হয়েছে। যা মুশরিকদের পৌরাণিকবাদের সাথে সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল। তৃতীয়তঃ "অসীলা" 'রূহানীমদদ' 'ফয়েয' প্রভৃতি নামগুলোর মনোমুগ্ধকর আবরণের অন্তরালে আল্লাহ ও বান্দাদের যাবতীয় সম্পর্ক ঐসব বুযর্গানের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। কার্যতঃ অবস্থা ঠিক মুশরিকদের মতো হয়ে পড়েছে। যাদের মতে বিশ্বপ্রভু মানুষের নাগালের বহুদূরে এবং মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় তাঁর নিম্নস্থ কর্ম-কর্তাদের হাতেই ন্যস্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মুশরিকরা নিম্নস্থ কর্মকর্তাদেরকে প্রকাশ্য-ভাবে উপাস্য, দেবতা, অবতার, অথবা আল্লাহর পুত্র নামে আখ্যায়িত করে আর এরা তাদেরকে গাউস, কুতুব, আবদাল, আউলিয়া ও আল্লাহ ওয়ালা ইত্যাদি শব্দের আড়ালে ঢেকে রাখে।

এই দ্বিতীয় ধরনের জাহেলিয়াত ইতিহাসের সকল যুগেই প্রথম ধরনের জাহেলিয়াত অর্থাৎ নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের সাথে সহযোগিতা করে এসেছে। প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, মিশর ,ভারতবর্ষ, ইরান, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের তামাদ্দুন তাহ্যিবে, এ দুই ধরনের জাহেলিয়াতের সহাবস্থান ছিল। অধুনা জাপানের অবস্থাও তদ্রূপ। এ সহযোগিতার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ শির্কমিশ্রিত জাহেলিয়াতে মানুষের সাথে তার উপাস্যদের সম্পর্ক শুধু এতটুকু যে, তাদেরকে কর্তৃত্বশালী এবং লাভ-ক্ষতির মালিক মনে করে এবং বিভিন্ন উপাসনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তাদের কৃপা ও সাহায্য লাভের চেষ্টা করে।*

---

* হযরত সালেহ (আ) তার জাতিকে বলেছিলেন ঃ

فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ-(هود : ٦١)

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তার আনুগত্যের দিকে ফিরে আস। নিশ্চয়ই আমার প্রভু নিকট-বর্তী এবং দোয়া কবুলকারী।"-(সূরা হূদ ঃ ৬১)

এখানে মুশরিকদের একটা বিরাট ভ্রান্ত ধারণা অপনোধন করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত ধারণাটি সাধারণত সকল মুশরিকদের মধ্যে ছিল এবং সকল যুগে মানুষের শির্কে লিপ্ত হওয়ার একটা প্রধান কারণ ছিল। তারা মনে করতো আল্লাহ তাদের রাজা-মহারাজাদের মতই একজন, যিনি প্রজাসাধারণ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত রাজ-প্রাসাদে আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। সেখানে সাধারণ প্রজাগণ পৌছুতে পারতো না। তাই তার কাছে কোনো প্রার্থনা জানাতে হলে তার নৈকট্য লাভকারীদের মধ্য থেকে কারও শরণাপন্ন হতে হয়। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে কারও

এখন কথা হলো এই যে, তাদের নিকট থেকে কোনো নৈতিক নির্দেশ অথবা জীবন যাপনের কোনো আইন-পদ্ধতি পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। কেননা, সেখানে কোনো খোদা থাকলে তো নির্দেশ দান ও আইন-পদ্ধতির প্রশ্ন আছে। আর নেই বলেই মুশরিকরা নিজেরাই অনিবার্যরূপে একটা নৈতিক মতবাদ বানিয়ে নেয় এবং সেই নৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে নিজেরাই একটা শরীয়াত প্রণয়ন করে। এভাবে সেই নির্ভেজাল জাহেলিয়াতই কার্যকর হয়। এ জন্যেই নির্ভেজাল জাহেলিয়াত ও শির্কমিশ্রিত জাহেলিয়াতের ভিত্তিতে যে সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠে, তাতে এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য থাকে না যে, এক জায়গায় জাহেলিয়াতের সাথে সাথে মন্দির, পূজারী ও উপাসনার ধারাবাহিকতা শুরু হয় আর অন্য জায়গায় তা হয় না। নৈতিক চরিত্র ও কার্যধারা উভয় ক্ষেত্রে একই ধরনের হয়ে থাকে; প্রাচীন গ্রীস ও পৌত্তলিক রোম সাম্রাজ্যের নৈতিক মেজাজ-প্রকৃতির সাথে আধুনিক ইউরোপের নৈতিক মেজাজ-প্রকৃতির যে মিল দেখা যায় তার কারণ এটাই।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির জন্যে শির্ক মিশ্রিত মতবাদ আলাদা ও স্থায়ী কোনো ভিত্তি রচনা করে দেয় না। এ ক্ষেত্রেও একজন মুশরিক নির্ভেজাল জাহেলিয়াতেরই পক্ষ অবলম্বন করে এবং মুশরিক সমাজের সমগ্র মানসিক ও চিন্তাগত বিকাশ ঘটে নির্ভেজাল জাহেলিয়াতেরই আদর্শে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মুশরিকদের কল্পনাশক্তি সীমাতিরিক্ত এবং সে জন্যে তাদের চিন্তাধারার কল্পনার প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু নাস্তিকরা কিছুটা বাস্তববাদী হয়ে থাকে। তাই নিছক কাল্পনিক দর্শনের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ-অনুরাগ নেই। অবশ্যই খোদা ছাড়াই তারা যখন বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা যে যুক্তির জাল বোনে, তাও মুশরিকদের পৌরাণিক মতবাদের মতোই অযৌক্তিক হয়। বস্তুতঃ চিন্তার দিক দিয়ে শির্ক এবং নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। এর জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, আজকের ইউরোপ তার মতবাদের দিক দিয়ে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাথে এমন সূত্রে বাঁধা, যেন মনে হয়—ইউরোপ ওদের সন্তান।

তৃতীয়তঃ নির্ভেজাল জাহেলী যেসব সমাজের তামাদ্দুনিক রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করে মুশরিক সমাজও সেগুলো গ্রহণ করার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে যদিও সমাজের গঠন ও বিন্যাসে শির্ক ও নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। শির্কের রাজত্বে বাদশাহদেরকে খোদার আসনে বসানো হয়। আর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতাদের একটা শ্রেণী বিশেষ আভিজাত্য ও অধিকার নিয়ে আবির্ভূত হয়। আর রাজ-পরিবার ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যোগসাজসে একটা চক্র গড়ে ওঠে। এক বংশ-গোত্রের ওপর অন্য বংশগোত্রের এবং একশ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব -প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার একটা স্থায়ী

প্রার্থনা তার কাছে পৌছেও যায় তথাপি খোদায়ীর অহংকারে তিনি নিজে তার জবাব দেয়া পছন্দ করেন না। এ জবাব দেয়ার কাজটা ও নৈকট্য লাভকারী ভক্তদের কারও কাছেই ন্যস্ত করা হয়। এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং ধূর্ত লোকদের প্ররোচনায় পড়ে তারা মনে করে যে, বিশ্বজাহানের মালিকের পবিত্র দরবার সাধারণ মানুষের নাগালের অনেক দূরে। একজন মামলী মানুষ সেখানে পৌছার আশা করতেই পারেনা। তার দরবারে দোয়া পৌছা এবং তার জবাব পাওয়া পবিত্র আত্মাসমূহের অসীলা ব্যতীত এবং দক্ষ ধর্মীয় কর্মকর্তাদের সাহায্যে নযর, নেয়ায ও ফরিয়াদ পৌছানো ছাড়া সম্ভবই নয়। এ ভ্রান্ত ধারণার দরুনই মানুষ ও তার খোদার মাঝে অসংখ্য ছোট-বড় খোদার সমাবেশ ঘটেছে এবং পৌরহিত্য প্রথার উদ্ভব হয়েছে যার মধ্যস্থতা ছাড়া জাহেলী ধর্মমতের অনুসারীরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করতে পারে না।-(গ্রন্থকার)১৪২

মতবাদ গড়ে তোলা হয়। এভাবে অজ্ঞ জনসাধারণকে ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ করে তাদের ওপর নির্যাতনমূলক আধিপত্য বিস্তার করা হয়। অন্যদিকে নির্ভেজাল জাহেলী সমাজে এসব দোষক্রটিগুলো বংশপূজা, জাতিপূজা, জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ, একনায়কত্ব, পুঁজিবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রাণশক্তি ও মৌলিক প্রেরণার দিক দিয়ে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের দ্বারা মানব সমাজকে খণ্ডবিখণ্ড করা এবং এক শ্রেণীর লোকদেরকে অন্য শ্রেণীর লোকদের রক্তপিপাসু বানিয়ে দেয়ার ব্যাপারে উভয়ে একই পর্যায়ভুক্ত।

তিনঃ বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত

তৃতীয় যে অতি প্রাকৃত মতবাদ বৈরাগ্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ এ দুনিয়া এবং দৈহিক অস্তিত্ব মানুষের জন্যে কারাগারের শাস্তিস্বরূপ। মানুষের আত্মা এ দেহের খাঁচার ভেতর সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী হিসেবে অবস্থান করে। দেহের সাথে সম্পর্কের কারণে মানুষ যেসব কামনা-বাসনা ও ভোগের আকর্ষণ অনুভব করে এবং যেসব জৈবিক চাহিদার সম্মুখীন হয় তা প্রকৃতপক্ষে এ কারাগারেরই বেড়ী ও শৃঙ্খল। মানুষ এ দুনিয়া এবং তার বিভিন্ন বস্তুসমূহের সাথে যত বেশী সম্পর্ক রাখবে, সে ততই কলুষিত হবে এবং সে পরিণামে অধিক শাস্তির যোগ্য হবে। তার মুক্তির একমাত্র পথ হলো এ পার্থিব জীবনের ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হওয়া, কামনা-বাসনাকে নির্মূল করা, আনন্দ-সম্ভোগ থেকে দূরে থাকা ও দৈহিক চাহিদা ও প্রবৃত্তির লিপ্সা পূরণ করতে অস্বীকার করা, বন্ধু, প্রেম ও রক্ত-মাংসের সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত স্নেহ, প্রেম-ভালোবাসা মন থেকে মুছে ফেলা এবং আপন শত্রুকে অর্থাৎ দেহ ও প্রবৃত্তিকে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে এত বেশী নিপীড়ন ও নির্যাতন করা যাতে আত্মার ওপর তার আর আধিপত্যই বহাল না থাকে। এতে করে আত্মা ভারমুক্ত, কলুষমুক্ত ও পবিত্র হয়ে যাবে এবং ত্রাণ লাভের উচ্চমার্গে আরোহণ করতে সক্ষম হবে।

এ মতবাদ মূলতঃ একটি অসামাজিক (Anti-Social) মতবাদ। তবে সমাজ ব্যবস্থার ওপর এটি বিভিন্ন উপায়ে প্রভাব বিস্তার করে। এর ভিত্তিতে এক বিশেষ ধরনের দার্শনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বেদান্ত দর্শন, মনুদর্শন, নব্য প্লেটোবাদ (New-Platonism), যোগবাদ, সুফিবাদ, খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদ, বৌদ্ধমত প্রভৃতি এ দর্শনের বিভিন্ন রূপ। এ দর্শন থেকে এমন একটা নৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয় যা খুব কমই ইতিবাচক (Positive) এবং খুব বেশীর ভাগই বরং পুরোপুরি নেতিবাচক (Negative)। এ দু'টিই মিলিতভাবে সাহিত্যে, আকীদা বিশ্বাসে, নৈতিকতায় এবং বাস্তব জীবনে অনুপ্রবেশ করে এবং যেখানে যেখানে তার প্রভাব পৌছে সেখানে তা আফিম ও কোকেনের কাজ করে। প্রথম দু' প্রকারের যাহেলিয়াতের সাথে এ তৃতীয় জাহেলিয়াত সাধারণত তিন উপায়ে সহযোগিতা করে থাকে ঃ

এক ঃ এ বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত সৎ ও ধর্মভীরু লোকদেরকে দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নির্জন কক্ষে বসিয়ে দেয় এবং নিকৃষ্ট ধরনের দুষ্কৃতকারীদের জন্যে কর্মক্ষেত্র খালি করে দেয়। অসৎলোকেরা পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে নির্বিঘ্নে অরাজকতা ছড়ায় আর সৎলোকেরা আপন মুক্তির চিন্তায় তপস্যা চালিয়ে যেতে থাকেন।

দুই ঃ এ জাহেলিয়াতের যেটুকু প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে তা তাদের মধ্যে ভ্রান্ত ধরনের ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং নৈরাশ্যকর দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করে তাদেরকে জালেমদের

সহজ শিকারে পরিণত করে। এ কারণেই রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরা ও ধর্মীয় কর্তৃত্বশালী শ্রেণী এ বৈরাগ্যবাদী দর্শন ও নৈতিকতার প্রচার প্রসারে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতো। তাদের তত্ত্বাবধানে নির্বিঘ্নে এর প্রচার প্রসার চলতো। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও পোপতন্ত্রের সাথে বৈরাগ্যবাদী দর্শন ও নৈতিক আদর্শের কখনো সংঘর্ষ চলেছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

তিন ঃ যখন এ বৈরাগ্যবাদী দর্শন ও নৈতিক আদর্শ মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির কাছে পরাজয় বরণ করে তখন নানা ধরনের কলা-কৌশল উদ্ভাবন করা শুরু হয়। কোথাও কাফ্‌ফারা দানের আকীদা-বিশ্বাস উদ্ভাবন করা হয়—যাতে প্রাণ ভরে পাপ করা যায় এবং বেহেশতও হাতছাড়া না হয়ে যায়। কোথাও বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেহ কেন্দ্রিক প্রেমের বাহানা করা হয়—যাতে করে মনের আগুনও নিভানো যায় এবং পবিত্রতাও অক্ষুণ্ন থাকে। আবার কোথাও দুনিয়া বর্জনের বা বৈরাগ্যের পর্দার আড়ালে রাজা-বাদশাহ ও ধনিক-বণিকদের সাথে যোগসাজসে আধ্যাত্মিকতার জাল বিস্তার করা হয়। রোমের পোপ সম্প্রদায় ও প্রাচ্য জগতের গদিনশীনগণ এর জঘন্যতম দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। জাহেলিয়াত তার স্বগোত্রীয়দের সাথে এমন ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু নবীদের অনুসারীদের মধ্যে এ যাহেলিয়াত যখন অনুপ্রবেশ করে তখন অন্য এক দৃশ্যের অবতারণা হয়। দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র পরীক্ষাক্ষেত্র ও আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র হিসেবে স্বীকার করার পরিবর্তে তাকে নির্যাতন গৃহ ও "মায়াজাল" রূপে পরিচিত করার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের ওপর সে প্রথম আঘাত হানে। দৃষ্টিভঙ্গীর এ পরিবর্তনের ফলে মানুষ এ বাস্তব সত্যকে ভুলে যায় যে, সে এ দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত। সে ভাবতে আরম্ভ করে যে, সে এখানে কাজ করার জন্যে এবং দুনিয়ার নানা রকমের দায়িত্ব পালন করার জন্যে আসেনি বরং তাকে অপবিত্র আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। তাই সে আবর্জনা ও অপবিত্রতা থেকে তার দূরে থাকা উচিত। এখানে অসহযোগী (Non-co-operator) হয়ে থাকা ও দায়িত্ব এড়িয়ে চলাই তার যথার্থ কর্তব্য। এ ধারণার ফলে সে দুনিয়া ও তথাকার কাজ-কর্ম ও দায়-দায়িত্বের প্রতি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকায়। সে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ তো দূরের কথা, সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করতেও ভয় পায়। ফলে ইসলামী শরীয়াতের সমগ্র ব্যবস্থাই তার জন্যে অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইবাদাত ও খোদার আদেশ-নিষেধ পার্থিব জীবনের সংস্কার-সংশোধন ও খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে যে মানুষকে তৈরী করা হয়েছে এ মর্মকথা সে বুঝতে পারে না। বরং সে মনে করতে থাকে যে, ইবাদাত ও কিছু বিশিষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তার পাপ জীবনের কাফ্‌ফারা স্বরূপ। তাই এগুলোকে পূর্ণ মনোযোগের সাথে এবং যথাযথভাবে করে যাওয়া চাই,—যাতে করে পরকালে মুক্তি লাভ করা যায়।

এ মানসিকতা নবীদের উম্মতের একটি অংশকে মোরাকাবা (নিভৃতে ধ্যানমগ্ন থাকা) মোকাশাফা (অজানা রহস্য জানার চেষ্টা), চিল্লা দান, ওজিফা পাঠ, আহযাব ও আমালিয়াত (ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-তুমার প্রভৃতি), আধ্যাত্মিক জগতের স্থানসমূহ ভ্রমণ সায়রে মাকামাত) এবং হকিকতের দার্শনিক* ব্যাখ্যার গোলক ধাঁধায় নিক্ষেপ করেছে। আর নফল ও মুস্তাহাবে

* যথা সর্বেশ্বরবাদ।

ফরজ কাজ থেকে বেশী নিমগ্ন রেখে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে উদাসীন করে রেখেছে। অথচ এ খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যেই নবীদের আগমন হয়েছিল। এদের আর একটি দলের মধ্যে কৃত্রিম দৈন্য আমদানী, দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি, চুলচেরা বিচার ও নিষ্প্রয়োজন তত্ত্বানুসন্ধান, ছোট ছোট জিনিসের সূক্ষ্ম পরিমাণ ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অতিমাত্রায় মাথা ঘামানোর ব্যধি সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর দ্বীন তাদের দৃষ্টিতে এমন এক ভঙ্গুর কাঁচপাত্রে পরিণত হয়েছে যা সামান্য কোনো জিনিসের স্পর্শেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এর ফল এই যে, এ বেচারাদের সমস্ত সময় ব্যয়িত হয় এ কাজে যে কোথাও কিছু উঁচু-নিচু হয়ে যায় কি না বা মাথার ওপরের সেই ভঙ্গুর কাঁচপাত্রটি ভেঙে চুরমার হয়ে না যায়। ধর্মে এত সূক্ষ্মতার পরে অনিবার্যরূপে দৃষ্টির সংকীর্ণতা, উদ্যমহীনতা ও স্থবিরতা জন্ম নেয়। এ ধরনের লোকদের মধ্যে জীবনের বড় বড় সমস্যার ওপর দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করার ও ইসলামের বিশ্বজনীন মূলনীতিগুলো উপলব্ধি করার যোগ্যতা কোথা থেকে আসবে ? আর কি করেইবা তারা দ্বীনের বিশ্বজনীন মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করবে এবং যুগের আবর্তনের ফলে তার নব নব পর্যায়ে দুনিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ ও পথ প্রদর্শনের জন্যে প্রস্তুত হবে ?

চার ঃ ইসলাম

অতি প্রাকৃত মতবাদ আল্লাহর নবীগণ পেশ করেছেন। তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

আমাদের চারপাশে পরিব্যপ্ত এ নিখিল বিশ্বজগত—স্বয়ং আমরা যার একটা অংশ মূলত এক সম্রাটের সাম্রাজ্য। তিনিই এর স্রষ্টা, মালিক এবং একমাত্র শাসক। এখানে তিনি ছাড়া আর কারও হুকুম শাসন চলে না এবং সকলেই তার অনুগত ; সমস্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার পুরোপরিভাবে একমাত্র সেই মালিক ও সর্বাধিনায়কের হাতে নিবদ্ধ। মানুষ এ সাম্রাজ্যের জন্মগত প্রজা। অর্থাৎ প্রজা হওয়া না হওয়া তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। বরং প্রজা হয়েই সে জন্মেছে এবং প্রজা হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার তার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের স্বেচ্ছাচারী দায়িত্বহীন হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। প্রকৃতিগতভাবেও তা হতে পারে না। সে একে তো জন্মগত প্রজা, তদুপরি এ সাম্রাজ্যের একটি অংশ। তাই সাম্রাজ্যের অন্য সকল অংশ যেমন সম্রাটের আদেশের আনুগত্য করে, তেমনি তারও সেই সম্রাটের আনুগত্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। নিজের জীবনযাপন প্রণালী ও দায়িত্ব নিজেই ঠিক করে নেয়ার কোনো অধিকার তার নেই। সাম্রাজ্যের অধিপতি তাকে যে নির্দেশ দেন তাই মেনে চলাই তার একমাত্র কাজ। সে নির্দেশ আসে অহীর মাধ্যমে। আর যেসব মানুষের কাছে অহী আসে তাঁরা সবাই নবী।

কিন্তু মানুষের পরীক্ষার জন্যে মালিক প্রভু এক সূক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি নিজেও প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছেন আর তাঁর সাম্রাজ্যের গোটা আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাও তিনি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। এ রাষ্ট্রব্যবস্থা বাহ্যত এমনভাবে চলছে যে, এর কোনো শাসক দেখা যায় না, কর্মকর্তাও দৃষ্টিগোচর হয় না। মানুষ শুধু একটা কারখানা চলতে দেখে এবং তার ভেতরে নিজেকে উপস্থিত দেখতে পায়। বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা সে অনুভব করতে পারে না যে, সে কারও প্রজা এবং কারও কাছে তার হিসেব দিতে হবে। সে এমন কোনো স্পষ্ট নিদর্শন চাক্ষুস দেখতে পায় না যা থেকে তার ওপর বিশ্ব স্রষ্টার নিরংকুশ কর্তৃত্ব এবং তার

কাছে তার নিজের জবাবদিহি করার ও তার দ্বারা শাসিত হওয়ার ব্যাপারটা সন্দেহাতীত-ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যার ফলে তা মেনে নেয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকে না। নবীও এসেছেন কিন্তু এমনভাবে নয় যে, তার ওপর অহী আসতে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছে এবং এমন কোনো নিদর্শনও তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়নি যা দেখলে তাঁর নবুয়াত মানতে বাধ্য হতে হয়। তাছাড়া মানুষ একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। অমান্য ও বিদ্রোহ করতে চাইলে যে ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়, প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণও তাকে সরবরাহ করা হয় এবং তাকে অত্যন্ত দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয়। এমনকি নাফরমানী ও অবাধ্যতার শেষ সীমায় পৌছা পর্যন্ত সে কোনো বাধার সম্মুখীন হয় না। সাম্রাজ্যের অধিপতি ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য ও দাসত্ব করতে চাইলে তা থেকেও তাকে বলপূর্বক নিবৃত্ত করা হয় না। তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় যে, যার যার দাসত্ব ও আনুগত্য করতে চায় করুক। উভয় অবস্থায় অর্থাৎ অমান্য করলে ও অন্যের দাসত্ব করলেও অব্যাহতভাবে জীবিকা লাভ করতে থাকে, বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কাজ-কর্মের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ এবং যাবতীয় ভোগের সামগ্রী মর্যাদা অনুসারে তাকে প্রচুর পরিমাণে দেয়া হয়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাকে এসব মুক্তহস্তে দেয়া হতে থাকে। কোনো খোদাদ্রোহী বা অন্যের আনুগত্যকারীকে কেবল খোদাদ্রোহী হওয়া বা অন্যের আনুগত্য করার অপরাধে পার্থিব জীবনের উপায়-উপকরণ সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে, এমন কখনো হয়নি। কেননা স্রষ্টা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, ভালো-মন্দ চিনবার ক্ষমতা, কোন্‌টা যুক্তিসঙ্গত ও কোন্‌টা অযৌক্তিক তা বাছ বিচারের যোগ্যতা এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মসম্পাদনের ক্ষমতা দান করেছেন। নিজের অসংখ্য সৃষ্টির ওপর তাকে এক ধরনের আধিপত্য ও শাসকসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ও সামর্থ দিয়েছেন। এসব দিয়ে তিনি তাকে পরীক্ষা করতে চান। এ পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করার জন্যে তিনি তাঁর গোটা সাম্রাজ্যের বাস্তবতাকে ও স্বয়ং নিজের অস্তিত্বকে অদৃশ্যের পর্দায় ঢেকে রেখেছেন, যাতে করে তার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা হয়। তাকে ভাল কিংবা মন্দ পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, যাতে সে সত্য ও ন্যায়কে জানার পর কোনো বলপ্রয়োগ ছাড়া স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তার অনুসরণ করে, না প্রবৃত্তির দাসত্ব গ্রহণ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেটা পরীক্ষা করা যায়। তাকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না দিলে তার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার পরীক্ষা হতে পারে না।

দুনিয়ার এ জীবন পরীক্ষার অবকাশ মাত্র। তাই এখানে তার কাজের হিসেবও নেয়া হবে না, তাকে কর্মফলও দেয়া হবে না। পার্থিব জীবনে তাকে যা কিছু ভোগের সামগ্রী দেয়া হয় সেটা কোনো ভাল কাজের পুরস্কার নয় বরং তাও পরীক্ষার উপকরণ। আর সে যা কিছু দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ মুসিবত ইত্যাদির সম্মুখীন হয় তাও কোনো খারাপ কাজের শাস্তি নয় বরং যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন বিশ্বজগত পরিচালিত হয় তারই অধীন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত ফলাফল।* কাজ-কর্মের আসল ও চূড়ান্ত হিসেব যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পন্ন হবে এ পার্থিবজীবনের অবসানের পর। সেটাই এর নির্দিষ্ট সময় এবং তারই নাম

* অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার জীবনে কর্মফল প্রদানের নিয়ম আদৌ চালু নেই। আমি যে কথা বলতে চাইছি তা হলো এই যে, দুনিয়ার কর্মফল সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট নয় এবং তা স্পষ্টও নয়। দুনিয়ার যে কোনো ব্যাপারে প্রতিদান ও প্রতিফলের চেয়ে পরীক্ষার উপাদানই বেশী। এ জন্যে এখানে যেসব কর্মফল প্রকাশিত হয় তাকে কারও সচ্চরিত্র বা দুশ্চরিত্র হওয়ার মাপকাঠি বলা যায় না! –(গ্রন্থকার)

আখেরাত। সুতরাং দুনিয়ায় যে কর্মফল পাওয়া যায় তা দ্বারা কোনো জীবনপদ্ধতি বা কাজ শুদ্ধ না অশুদ্ধ, ভাল না মন্দ এবং গ্রহণীয় না বর্জনীয়, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আসল মাপকাঠি হলো আখেরাতের প্রকাশিত ফলাফল। আর কোন্ জীবন পদ্ধতি এবং কোন্ কাজের ফল ভাল হবে এবং কিসের ফল খারাপ হবে, সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের ওপর নাযিল হওয়া অহীর মাধ্যমেই শুধু জানা সম্ভব। খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বিধি পরের কথা। আখেরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা যার ওপর নির্ভরশীল সেই মৌলিক ও চূড়ান্ত বিবেচ্য বিষয় হলো, মানুষ তার যুক্তি বিন্যাস ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তির সঠিক ব্যবহার দ্বারা এ কথা বুঝতে পারে কি না যে, আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃত বিধানদাতা ও শাসক এবং তাঁর পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে তা আল্লাহরই রচিত বিধান। আর এ কথা বুঝতে পারার পর স্বাধীন নির্বাচনী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আল্লাহর শাসন ও বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে কিনা।

নবীগণ শুরু থেকেই এ মতাদর্শ পেশ করে এসেছেন। এ মতাদর্শের ভিত্তিতে দুনিয়ার যাবতীয় ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত নিদর্শনের পরিপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব। কোনো নতুন পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতা দ্বারা এ মতাদর্শের খণ্ডন হয় না। এ থেকে স্থায়ী ও আলাদা দর্শন প্রক্রিয়ার জন্ম হয়—যা সকল জাহেলী জীবন দর্শন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ দর্শন বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব সত্ত্বা সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নতুন পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে। এ বিন্যাস পদ্ধতি জাহেলী বিন্যাস পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সাহিত্য ও শিল্পকলার লালন ও বিকাশের জন্যে নবীদের মতাদর্শ জাহেলী সাহিত্য ও শিল্পকলার লালন ও বিকাশের পথের সম্পূর্ণ উল্টো ও ভিন্ন পথ রচনা করে দেয়। জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে তা এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও এক বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সে লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে জাহেলী লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃতিগত ও উপাদানগত কোনো মিল নেই। নৈতিকতারও একটা আলাদা ব্যবস্থার উৎপত্তি হয় এ মতাদর্শ থেকে। জাহেলী নৈতিকতার সাথে তার কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর এ তাত্ত্বিক ও নৈতিক বুনিয়াদের ওপর যে সভ্যতার ইমারত গড়ে ওঠে, তা নির্ভেজাল জাহেলিয়াত থেকে উদ্ভূত সভ্যতাসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সেই সভ্যতা সংরক্ষণের জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন—যার মূলনীতি আগাগোড়া জাহেলী শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী। মোটকথা, এ সভ্যতার ধমনীতে ধমনীতে ও পরতে পরতে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর একক ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব, আখেরাতে বিশ্বাস এবং তার কাছে মানুষের দায়িত্ব সচেতনতা ও আনুগত্য বোধ সক্রিয় প্রেরণা ও প্রাণশক্তি হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু নির্ভেজাল জাহেলী সভ্যতার সমগ্র কর্মকাণ্ড ও বিধি ব্যবস্থা মানুষের বল্গাহীন স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত। তাই নবীদের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা থেকে যে ধাঁচের ও যে মানের মনুষ্যত্ব তৈরি হয়, তার রূপ কাঠামো ও বর্ণজৌলুস জাহেলী সভ্যতার তৈরি মনুষ্যত্ব থেকে সর্বতোভাবে জুড়িহীন।

এরপর এ ভিত্তির ওপর যে বিস্তারিত সামাজিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার কাঠামো দুনিয়ার অন্য সমস্ত কাঠামো থেকে পৃথক। পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য-বস্ত্র, জীবন-যাপন প্রণালী, চাল-চলন, ব্যক্তিগত চরিত্র, জীবিকা উপার্জন, সম্পদ ব্যয়, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক রীতি-পদ্ধতি, বৈঠকাদির পদ্ধতি, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক

সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ, পারস্পরিক লেন-দেন, সম্পদ বন্টন, রাষ্ট্র পরিচালনা, সরকার গঠন, নেতার মর্যাদা, আইন সভা গঠন পদ্ধতি, বেসামরিক প্রশাসনিক সংগঠন আইন রচনার মূলনীতি থেকে খুঁটিনাটি বিধি প্রণয়ন, আদালত, পুলিশ, হিসাব নিরীক্ষণ পদ্ধতি, কর ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, গণপূর্ত কার্যক্রম, শিল্প ও বাণিজ্য, তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ, শিক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য সকল বিভাগের নীতি নির্ধারণ, সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সংগঠন যুদ্ধ ও সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতি—এক কথায় জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার থেকে শুরু করে বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পর্যন্ত এ তামাদ্দুনিক ব্যবস্থার নিয়ম-পদ্ধতি একটি শাশ্বত মহিমায় ভাস্বর। এর প্রতিটি অংশে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা তাকে অন্যান্য তামাদ্দুন থেকে পৃথক করে রাখে। এর প্রতিটি বিষয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, এক বিশেষ উদ্দেশ্য ও নৈতিক আচরণ কার্যকর থাকে, যার সম্পর্ক থাকে খোদার সার্বভৌম কর্তৃত্ব, মানুষের অধীনতা ও জবাবদিহির অনুভূতি এবং আখেরাতের লক্ষ্যের সাথে।

নবীদের আগমনের উদ্দেশ্য

ওপরে বর্ণিত তাহযিব তামাদ্দুন দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই পর্যায়ক্রমে নবীগণ আগমন করেন।

বৈরাগ্যবাদী সভ্যতাকে বাদ দিলে আর যত সভ্যতা আছে—তা জাহেলী সভ্যতা হোক অথবা ইসলামী তা—দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে একটা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্যে একটা সার্বজনীন পদ্ধতি অবলম্বন স্বভাবতঃই করে এবং চায় যে, শাসন ক্ষমতা তার হাতে আসুক যাতে করে নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবন বিধান রচনা করতে পারে। শাসন ক্ষমতা ছাড়া কোনো মতবাদ বা জীবন পদ্ধতি উপস্থাপিত করা বা তাতে বিশ্বাসী হওয়া নিতান্তই অর্থহীন ব্যাপার। বৈরাগ্যবাদীর কথা আলাদা। কারণ দুনিয়ার কার্যকলাপ সে পরিচালনাই করতে চায় না। বরং সে এক বিশেষ ধরনের 'সলুক' বা সাধনা প্রক্রিয়ার দ্বারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তার কাল্পনিক মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার ধ্যানে মগ্ন থাকে। তাই শাসন ক্ষমতার তার প্রয়োজনও নেই, চাহিদাও নেই। কিন্তু যারা দুনিয়ার কার্যক্রম পরিচালনার এক বিশেষ পদ্ধতি নিয়েই ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং সেই বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের ওপরই মানুষের ত্রাণ ও মুক্তি নির্ভরশীল বলে বিশ্বাস করে, তাদের জন্যে শাসন ক্ষমতার চাবিকাঠি হস্তগত করার চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা সে যে জীবন পদ্ধতির নীল নক্শা উপস্থাপিত করে তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত তার নীল নকশা দুনিয়ার বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে না। এমনকি সেই ক্ষমতা অর্জন না করলে তার নীল নক্শা কাগজে এবং মন মগজেও বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না। শাসন ক্ষমতার কর্তৃত্ব যে সভ্যতার হাতে নিবদ্ধ, দুনিয়ার সমস্ত কার্যকলাপ সেই সভ্যতার পরিকল্পনা অনুসারেই চলে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তাধারা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরই নির্দেশ চলে, চারিত্রিক কাঠামো সে-ই তৈরি করে শিক্ষা ও গণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনা তারই হাতে থাকে, তার তৈরি আইন-কানুন অনুসারে তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা কায়েম হয় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারই পলিসি কার্যকর হয়। যে সভ্যতা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নয়, জীবনের কোথাও তার কোনো স্থান নেই। এমনকি একটি কর্তৃত্বশীল সভ্যতা যখন দীর্ঘ কালব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করে রাখে,

তখন দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতা বহির্ভূত সভ্যতার কোনো প্রভাবই থাকে না। সে সভ্যতার প্রতি যারা সহানুভূতিশীল হয় তাদের মনেও এ সন্দেহ জাগে যে, পার্থিব জীবনে এ কার্যকর কিনা। সে সভ্যতার তথাকথিত ধ্বজাবাহী এবং তার নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী বলে দাবীদারগণ শেষ পর্যন্ত বিরোধী সভ্যতার সাথে আপোষ ও ভাগাভাগি করে কাজ-কর্ম চালাতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অথচ শাসন ক্ষমতায় সম্পূর্ণ বিপরীত উৎস থেকে উদ্ভূত দু'টো সভ্যতার মধ্যে ভাগাভাগি ও আপোষ একেবারেই অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার। মানবীয় তামাদ্দুন এ ধরনের অংশীদারিত্ব বরদাশ্‌ত করতে পারে না। এ ধরনের ভাগাভাগিকে বাস্তবে সম্ভব মনে করা জ্ঞানের স্বল্পতারই পরিচায়ক। আর তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া ঈমান ও সাহসিকতার স্বল্পতাই বলতে হবে।

দুনিয়ায় হুকুমতে এলাহীয়া তথা আল্লাহর শাসনব্যবস্থা কায়েম করে আল্লাহ প্রদত্ত সমগ্র জীবন বিধান বাস্তবায়িত করাই নবীদের দুনিয়ায় আগমনের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল।* নবীগণ জাহেলী সভ্যতার ধারক বাহকদেরকে এ অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, তারা ইচ্ছা করলে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের ওপর অটল থাকতে পারে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের প্রভাব যতখানি তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তার মধ্যেই তারা জাহেলী রীতি পদ্ধতি মেনে চলতে পারে। কিন্তু শাসন ক্ষমতার চাবিকাঠি তাদের হাতে থাকুক এবং তারা মানব জীবনের গোটা কর্মকাণ্ডকে বলপ্রয়োগে কুফরী ও জাহেলী আইন-কানুন অনুসারে পরিচালিত করুক—এ অধিকার তাদের দিতে নবীরা প্রস্তুত ছিলেন না এবং স্বাভাবিকভাবেই তা দেয়া সম্ভবও ছিল না। এ জন্যে সকল নবীই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কারও চেষ্টা-সাধনা কেবলমাত্র অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)। কেউবা বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন কিন্তু ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি ইহকাল ত্যাগ করেছেন। যেমন হযরত ঈসা (আ)। আর কোনো কোনো নবী এ আন্দোলনকে সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন হযরত ইউসুফ, হযরত মূসা এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)।[১৪৩]

---

* এ যুগের কোনো কোনো দ্বীনদার বুযর্গকে প্রায়ই বলতে শুনা যায় যে, শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে মুসলমানদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়—এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। যেসব ভদ্রলোকেরা এ কথা বলেন, তাঁদের মনে আসলে শাসন ক্ষমতার নিছক একটা পুরস্কারের ধারণা রয়েছে। ওটা যে একটা গুরুদায়িত্ব, তা তারা ভাবেন না। তারা জানেন না যে, ইসলামকে কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করার জন্যে যে সরকারের প্রয়োজন, তা প্রতিষ্ঠিত করা আল্লাহর বিধানে অপরিহার্য এবং তা মুসলমানের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এরূপ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ করাও ফরয।–(গ্রন্থকার)

কুরআনের দৃষ্টিতে দ্বীন

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ

وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط -(الشورى : ١٣)

"তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করেছেন—যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে নবী) যা এখন আমি অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠালাম এবং যার নির্দেশ ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে ইতিপূর্বে দিয়েছি এ তাকীদের সাথে যে, দ্বীন কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"–(সূরা শূরা ঃ ১৩)

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (সা) কোনো নতুন ধর্মের প্রবর্তক নন। আর আগেকার নবীদের মধ্য থেকে কোনো নবীও কোনো আলাদা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তক ছিলেন না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে একই দ্বীন পেশ করে এসেছেন এবং নবী মুহাম্মদ (সা)-ও তাই পেশ করছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম হযরত নূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা মহাপ্লাবণের পর বর্তমান মানব জাতির তিনিই ছিলেন প্রথম নবী। তারপর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর হযরত ইবরাহীমের নাম নেয়া হয়েছে। আরবরা তাঁকে নিজেদের ধর্মীর নেতা বলে মানতো। সবশেষে হযরত মূসা ও হযরত ঈসার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। খৃষ্টান ও ইহুদীরা তাদেরকে নিজ নিজ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করে থাকে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, এ পাঁচজন নবীকেই এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আসল বক্তব্য এই যে, দুনিয়াতে যতনবী এসেছেন সকলে একই দ্বীন নিয়ে এসেছেন। এখানে কেবল নমুনাস্বরূপ পাঁচজন প্রসিদ্ধ নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা দুনিয়ার সর্বজনবিদিত আসমানী শরীয়াতগুলো তাঁদের মাধ্যমেই পাওয়া গেছে।

এ আয়াতটি থেকে 'দ্বীন' তথা সত্য ধর্ম ইসলাম ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। তাই এ আয়াত নিয়ে গভীর বিচার-বিবেচনা করে তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

আভিধানিক বিশ্লেষণ

আরবী ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যথা ঃ

এক ঃ ক্ষমতা, পরাক্রম ও আধিপত্য, শাসন ও কর্তৃত্ব অন্যকে আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা অন্যের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty) প্রয়োগ করা, তাকে নিজের গোলাম ও অনুগত বানানো। যথা ঃ دان لناس اى قهر هم على الطاعة অর্থাৎ সে মানুষকে আনুগত্য করতে বাধ্য করেছে। دنتهم فدانو اى قهرتهم فاطاعوا অর্থাৎ আমি তাদেরকে পরাভূত করেছি এবং তারা বশ্যতা স্বীকার করেছে। دنت القوم اى اذ للتهم واستعبدتهم অর্থাৎ আমি সেই জাতিকে অনুগত করলাম এবং দাস বানিয়ে নিলাম। دان الرجل اذا عز অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি শক্তিশালী ও সম্মানিত

হলো। دنت الرل، حملته على مايكره অর্থাৎ আমি তাকে এমন কাজ করতে বাধ্য করলাম যা সে করতে রাজী ছিল না। دين فلان، اذا حمل على مكروه অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে একটি অপছন্দনীয় কাজে বাধ্য করা হলো। دنته سسته وملكته অর্থাৎ আমি তার ওপর শাসন ও কর্তৃত্ব চালালাম। دينته القوم وليته سياستهم অর্থাৎ আমি অমুককে জনগণের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করলাম। এ অর্থে হুতিয়্যা নিজের মাকে সম্বোধন করে বলে ঃ

لقد دينت امر بنيك حتى   تركتهم ادق مى الطحين

"তোমাকে স্বীয় সন্তানদের অভিভাবিকা বানানো হয়েছিল। ফলে তুমি তাদেরকে আটার চেয়েও সূক্ষ্ম বানিয়ে ছেড়েছ।"

হাদীসে আছে ঃ

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت

"যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তিকে বশে এনেছে এবং পরকালের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হয়েছে, সে-ই প্রকৃত বুদ্ধিমান।"

এ কারণেই যে ব্যক্তি দেশ জাতি এবং গোত্রের ওপর বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল হয় তাকে ديان (দাইয়ান) বলা হয়। আশা আলহারমাযী রসূলুল্লাহ (সা)-কে يا سيد الناس وديان العرب 'হে জননেতা ও আরব অধিপতি' বলে সম্বোধন করেছিল। এদিক দিয়ে مدين অর্থ দাস এবং مدينة অর্থ দাসী। আর ابن مدينة অর্থ বাঁদীর ছেলে। কবি আখতাল বলেন ঃ ربت وربانى حجرها ابن مدينه 'সে (বাঁদী) আমাকে বাঁদীর ছেলে হিসেবে লালন করেছে।' পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

فَلَوْلاَ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔

অর্থাৎ "তোমরা যদি সত্যিই কারও গোলাম, অনুসারী ও অধীনস্থ না হয়ে থাক তবে মরণোম্মুখ মানুষকে বাঁচাতে পার না কেন ? বেরিয়ে যাওয়া প্রাণ ফিরিয়ে আন না কেন ?"

দুই ঃ আনুগত্য, দাসত্ব, সেবা, কারো বশ্যতা স্বীকার করা, কারও অধীন হওয়া, কারও পরাক্রম ও আধিপত্যের সামনে নতি স্বীকার করা। আরবরা বলে থাকে। دنتهم فدانوا اى قهرتهم فاطاعوا অর্থাৎ আমি তাদেরকে পরাভূত করেছি। ফলে তারা বশ্যতা স্বীকার করেছে। دنت الرجل اى خدمته অর্থাৎ আমি অমুকের সেবা করেছি। হাদীসে আছে, নবী (সা) বলেন, اريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب اى تطيعهم وتخضع لهم "আমি কোরেশদেরকে এমন একটা কলেমার অনুসারী করতে চাই যা তারা মেনে নিলে গোটা আরব জাতি তাদের অনুগত হয়ে যাবে এবং তাদের সামনে মাথা নত করবে।" এ অর্থের আলোকেই আনুগত্যশীল জাতিকে قوم دين বলা হয়। খারেজীদের সম্পর্কে যে হাদীস রয়েছে তাতেও 'দ্বীন' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত

হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 'তারা দ্বীন (আনুগত্য) থেকে বেরিয়ে যাবে তীর যেমন ধনুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় তেমনিভাবে।"*

তিন ঃ শরীয়াত, আইন, রীতিনীতি, আদত, অভ্যাস। সাধারণ কথাবার্তায় এরূপ বলা হয়ে থাকে ঃ مازال ذلك ديني وديدني অর্থাৎ এটা চিরাচরিত রীতি। ويقال دن اذا اعتاد خيرا اوشرا অর্থাৎ কেউ ভালো বা মন্দ যে রীতিই মেনে চলুক, তাকে দ্বীন বলা চলে। হাদীসে আছে ঃ كانت قريش ومن دان بدينهم কোরাইশ এবং তাদের সমমতাবলম্বী।' হাদীসে আরো আছে ঃ انه عليه السلام كان على دين قومه 'রসূলুল্লাহ (সা) নবুয়াতের আগে স্বজাতির অনুসৃত রীতিনীতি মেনে চলতেন।' অর্থাৎ বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক ও দেশাচার সংক্রান্ত যে রীতি প্রথা তার জাতি মেনে চলতো তা তিনিও মেনে চলতেন।

চার ঃ কর্মফল, বদলা, প্রতিদান বা প্রতিশোধ, সিদ্ধান্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ। প্রসিদ্ধ আরবী প্রবচন كما تدين تدان 'যেমন কর্ম তেমন ফল'–এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কুরআনে কাফেরদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে اءنا لمدينون। মৃত্যুর পরে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে নাকি? আমাদের কর্মফল ভোগ করতে হবে নাকি? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ لاتسبوا السلطان فان كان لابد فقولوا اللهم دنهم كما يدينون "তোমরা শাসকদের গালিগালাজ করো না। মন্দ বলা যদি একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে তবে বলো, হে আল্লাহ্, শাসকরা আমাদের সাথে যেমন আচরণ করছে, তুমিও তাদের সাথে তেমনি আচরণ করো" এ অর্থেই ديان 'দাইয়ান' শব্দটি কাজী বা বিচারকের জন্যে ব্যবহৃত হয়। হযরত আলী সম্পর্কে কোনো এক মনীসীর মন্তব্য ঃ كان ديان هذه الامة بعد نبيها "নবীর পর তিনি মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন।"

ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা

আরবরা এ 'দ্বীন' শব্দটিকে উল্লিখিত অর্থগুলোর মধ্যে কখনো একটির এবং কখনো অপরটির জন্যে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতো। কিন্তু এ চারটি বিষয় সম্পর্কে আরবদের ধারণা পুরোপুরি সুস্পষ্টও ছিল না এবং তেমন উচ্চ ধারণাও ছিল না। সে জন্যে এ শব্দটিতে

* এ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, খারেজীরা ধর্মত্যাগী হবে। কেননা হযরত আলীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, "তারা কি কাফের?" তখন তিনি বলেন, من الكفرفروا "তারা তো কুফরীকেই ছেড়ে পালালো।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, افمنافقون هم "তবে কি তারা মুনাফেক?" তিনি বললেন, মুনাফেক আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। অথচ এরা তো দিনরাত আল্লাহকে স্মরণ করে। সুতরাং এ হাদীসে 'দ্বীন' অর্থ আমীরের আনুগত্য—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইবনে আসীর নেহায়া নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

اراد بالدين الطاعة اى انهم يخرجون من طاعة الامام المفترض الطاعة وينسلخون منها

"হযরত আলীর কথার তাৎপর্য এই যে, যে নেতার আনুগত্য করা ফরয তার আনুগত্য থেকে তাঁরা বেরিয়ে যাবে।"–(২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১-৪২)

কিছু অস্পষ্টতা থেকে গিয়েছিল। ফলে এটা যথারীতি কোনো চিন্তাধারার পারিভাষিক শব্দ হতে পারেনি। কুরআন যখন নাযিল হয় তখন সে এ শব্দকে নিজের বক্তব্যের উপযুক্ত বাহন পেয়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থে একে ব্যবহার করে এবং একে তার বিশেষ পরিভাষা রূপে গ্রহণ করে। কুরআনের ভাষায় তাই 'দ্বীন' শব্দটিতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার অভিব্যক্তি ঘটে।

কুরআনের মর্ম অনুসারে মানুষ কারও সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব মেনে নিয়ে এবং তার আনুগত্য গ্রহণ করে যে বিশেষ আচরণ করে ও যে বিশেষ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে তাকেই 'দ্বীন' বলা হয়। আর 'দ্বীন'কে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে তাঁর দাসত্ব করার তাৎপর্য এই যে, মানুষ আল্লাহর দাসত্বের সাথে আর কারও দাসত্ব মিশ্রিত করবে না, বরং কেবলমাত্র তাঁরই বন্দেগী, তাঁরই বিধানের অনুসরণ এবং তাঁরই আদেশ ও নির্দেশের আনুগত্য করবে, তাঁরই ফরমাবরদারীর মাধ্যমে সম্মান, উন্নতি ও পুরস্কারের আশা করবে এবং তাঁর নাফরমানী করলে অপমান লাঞ্ছনা ও শাস্তি পেতে হবে জেনে যেন সাবধান থাকে। সম্ভবত দুনিয়ার কোনো ভাষাতেই কোনো পরিভাষা এত ব্যাপক অর্থবোধক নয়। এ যুগের 'স্টেট' বা 'রাষ্ট্র' শব্দটি অনেকটা তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু এখনো দ্বীনের পরিপূর্ণ অর্থবোধক হতে তার আরও ব্যাপকতা ও প্রশস্ততা অর্জনের দরকার।

একটি ভুল ধারণা

যে 'দ্বীন' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সকল নবীদের নিকট একই ছিল এবং তাঁদের শরীয়াত ছিল বিভিন্ন ধরনের لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا 'তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক উম্মতের জন্যে আমি একটি শরীয়াত ও একটি পথ নির্ধারিত করেছি।' কুরআনের এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ মনে করেছেন যে, 'দ্বীন' শব্দের মধ্যে শরীয়াতের বিধান অন্তর্ভুক্ত নয় বরং শুধুমাত্র তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, কিতাব ও নবুয়াত মেনে নেয়া ও আল্লাহর ইবাদাত করাই 'দ্বীনে'র বক্তব্য। বড়জোর যেসব মৌল নৈতিক বিধান সকল নবীর বেলায় একই রকম ছিল, তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দ্বীনের ঐক্য এবং শরীয়াতের বিভিন্নতার প্রতি স্থুল ও ভাসমান দৃষ্টি দেয়ার ফলেই এরূপ মত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। এটা একটা মারাত্মক অভিমত। এর সংশোধন না হলে পরবর্তীতে দ্বীন ও শরীয়াতের মধ্যে বিভ্রান্তিকর বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস চলতে পারে। এরূপ বিভেদে লিপ্ত হয়েই সেন্ট পল শরীয়াতবিহীন দ্বীনের ধারণা পেশ করে হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মতকে পথভ্রষ্ট করেছেন। শরীয়াতকে যখন দ্বীন থেকে আলাদা জিনিস বলে মনে করা হবে, তখন মুসলমানরাও খৃস্টানদের মত শরীয়াতের বিধানকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করবে এবং তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন লক্ষ্যবহির্ভূত বিধায় তাকে পাশ কাটিয়ে যাবে। কেবল আকীদা-বিশ্বাস ও মৌল নৈতিক শিক্ষাকে পুঁজি করে নিশ্চিন্ত হবে। এ ধরনের আন্দাজ অনুমান দ্বারা দ্বীনের তাৎপর্য নির্ণয় করার পরিবর্তে স্বয়ং কুরআনের কাছ থেকেই জেনে নেয়া ভাল যে, যে দ্বীনকে কায়েম করার নির্দেশ এখানে দেয়া হয়েছে তার অর্থ কি শুধু আকীদা বিশ্বাস ও মৌল নৈতিক শিক্ষা, না শরীয়াতের আইন-বিধানও তার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই, আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষা ছাড়া নিম্নলিখিত জিনিসগুলোও 'দ্বীনে'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঃ

(١) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝ (البينة : ٥)

"একাগ্রচিত্তে দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে তাঁর ইবাদাত করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়া ছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। এটাই হলো সঠিক পথের অনুসারী জাতির দ্বীন।"–(সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৫)

এ থেকে বুঝা গেল যে, নামায ও যাকাত দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ বিভিন্ন শরীয়াতে এ উভয় কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বিধান রয়েছে। অতীতের সকল শরীয়াতে নামাযের রূপ, তার আরকান, আহকাম, রাকায়াত, কেবলা, সময় এবং অন্যান্য বিধান একই রকম ছিল, এ কথা বলা যাবে না। যাকাত সম্পর্কেও একই কথা। কেউ দাবী করতে পারবে না যে, সকল শরীয়াতে যাকাত ফরয হওয়ার নেসাব, তার হার এবং আদায় ও বন্টনের ব্যাপারে একই বিধান চালু ছিল। শরীয়াতের এ বিভিন্নতা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা এ দু'টো জিনিসকে দ্বীনের অংগীভূত বলে ঘোষণা করেছেন।

(٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ط ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ط اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط (المائدة : ٣)

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃতদেহ, রক্ত, শুকরের গোশ্‌ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা জানোয়ার এবং ঐ সব যা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, আঘাত খেয়ে, টক্কর খেয়ে, উঁচু স্থান থেকে পড়ে ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছে। শুধু জীবিত পেয়ে যে জানোয়ারকে তোমরা জবাই করেছ, তা হালাল। উপরন্তু কোনো মন্দিরে জবাই করা জানোয়ারও হারাম। পাশা খেলে ভাগ্য নির্ধারণও তোমাদের জন্যে হারাম। এসবই নাফরমানীর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই মনোনীত করলাম।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩)

এ থেকে বুঝা গেল, শরীয়াতের এসব বিধানও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত।

(٣) قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ ـ (التوبة : ٢٩)

"যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসস্থাপন করে না, আল্লাহ ও রসূল যা হারাম করেছে তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করো।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ২৯)

এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়াও আল্লাহ ও তাঁর রসূল হালাল হারামের যে বিধান দিয়েছেন তা মানা ও পালন করাও দ্বীনের আওতাভুক্ত।

(٤) اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج-(النور : ٢)

"ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ—উভয়কেই একশ' বেত্রাঘাত কর। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করো না—যদি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক।"–(সূরা আন্ নূর ঃ ২)

এ থেকে জানা গেল যে, ফৌজদারী বিধিও দ্বীনের আওতাভুক্ত।

শরীয়াতের বিধানকে স্পষ্টভাষায় দ্বীন বলে অভিহিত করার চারটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো। এ ছাড়া গভীর বিচার-বিবেচনা সহকারে অধ্যয়ন করলে জানা যাবে যে, যেসব গুনাহর কাজ করলে জাহান্নামে যেতে হবে বলে আল্লাহ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যেমন ব্যভিচার, সুদ, মুসলমান হত্যা, এতিমের মাল ভক্ষণ, অন্যায় পন্থায় অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি এবং যেসব অপরাধের দরুন আল্লাহর আযাব অবধারিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন সমমৈথুন ও লেনদেনে দুর্নীতি ইত্যাদি, সেসব থেকে বিরত থাকাও দ্বীনের অঙ্গ। কেননা জাহান্নাম ও খোদায়ী আযাব থেকে রক্ষা করা ছাড়া দ্বীনের আর কি স্বার্থকতা থাকতে পারে ? এমনিভাবে শরীয়াতের যেসব বিধি অমান্য করা চিরতরে দোযখে 'নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ, তাও দ্বীনের অংশরূপে গ্রহণীয়। উদাহরণস্বরূপ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিধির বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○(النساء : ١٤)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করবে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৪)

এমনিভাবে যেসব জিনিস হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন—জুয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য ইত্যাদি—সেসব জিনিসের নিষিদ্ধকরণ যদি দ্বীনের অঙ্গীভূত না করা হয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, আল্লাহ তায়ালা কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় হুকুমত জারী করেছেন যার বাস্তবায়ন তাঁর বাঞ্ছিত নয়। অনুরূপভাবে যেসব কাজকে আল্লাহ ফরয বলে ঘোষণা করেছেন যেমন ঃ রোযা, হজ্জ ইত্যাদি—সেসব কাজ এ অজুহাতে দ্বীনের বর্হিভূত করা যেতে পারে না যে, রমযানের ত্রিশ রোযা আগেকার শরীয়াতে ছিল না এবং কা'বার হজ্জ হযরত ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে কেবল ইসমাঈলের শরীয়াতভুক্ত ছিল।

দেশের আইন এবং দ্বীন

সূরা ইউসুফের مَاكَانَ لِيَاخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ (বাদশাহের আইন অনুসারে ইউসুফ নিজের ভাইকে আটক করতে পারতো না) এ আয়াতে দেশের আইনের (Law of the Land) অর্থে 'দ্বীন' শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের অর্থের ব্যাপকতা সুস্পষ্ট করেছেন। এতে করে তাদের ধারণা অর্থহীন হয়ে যায়—যারা নবীগণের দাওয়াতকে শুধু সাধারণ ধর্মীয় অর্থে এক আল্লাহর পূজা-অর্চনা এবং কতিপয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার মধ্যে সীমিত মনে করেন এবং মনে করেন মানবীয় তামাদ্দুন, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, আদালত ও অন্যান্য দুনিয়াবী ব্যাপারের সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি থেকেও থাকে তাহলে সেসব ব্যাপারে দ্বীনের নির্দেশসমূহ নিছক ঐচ্ছিক সুপারিশ মাত্র। সে অনুসারে কাজ করতে পারলে ভালো, নচেৎ মানুষের স্বরচিত আইন ও বিধান মেনে চলায় কোনো দোষ নেই। এ সরাসরি এক বিভ্রান্তিকর ধারণা। দীর্ঘদিন ধরে এ ধারণা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে এবং মুসলমানরা যে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থেকে উদাসীন রয়েছে, তার জন্যে এ ধারণা বহুলাংশে দায়ী। এর কারণে মুসলমানরা কুফরী ও জাহেলী জীবনব্যবস্থাকে শুধু যে মেনে নিয়েছে তাই নয় বরং এটাকে নবীর একটা সুন্নাত মনে করে, সেই জীবনব্যবস্থার অংশীদার ও পরিচালক হতেও রাজি হয়ে গেছে। ফৌজদারী আইনকে দ্বীন বলে আখ্যায়িত করে এ আয়াত তাদের সে ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। এখানে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, নামায, রোযা ও হজ্জ যেমন দ্বীন, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার আইনও দ্বীন। সুতরাং اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন) এবং وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করছে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না) ইত্যাদি আয়াতে যে দ্বীনের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে, তার অর্থ শুধু নামায-রোযা করাই নয় বরং ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থাও। এটাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যবস্থা মেনে চললে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আসল ব্যাপার হল, সূরা মায়েদার لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا (আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একটি শরীয়াত ও একটি পথ নির্ধারণ করেছি) এ আয়াতের বিপরীত মর্ম গ্রহণ করে এ অর্থ করা হয়েছে যে, শরীয়াত যেহেতু প্রত্যেক উম্মতের জন্যে আলাদা ছিল, আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যা সকল নবীর একই ছিল। তাই শরীয়াত কায়েম করা দ্বীন কায়েম করার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ আসলে এ আয়াতের তাৎপর্য ঠিক এর বিপরীত। সূরা মায়েদার যে স্থানে এ আয়াত রয়েছে তার পূর্বাপর ৪১ থেকে ৫০ আয়াত পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়লে জানা যাবে যে, এ আয়াতের সঠিক মর্ম হল এই যে, যে নবীর উম্মতকে যে শরীয়াতই আল্লাহ দিয়েছিলেন, সেই উম্মতের জন্যে সেটাই ছিল দ্বীন। সেই নবীর আমলে সেই দ্বীন ও শরীয়াতকেই কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এখন যেহেতু মুহাম্মদ (সা)-এর নবী যুগ, সে জন্যে উম্মতে মুহাম্মদীকে যে শরীয়াত দেয়া হয়েছে, এ যুগের জন্যে সেটাই দ্বীন এবং তা কায়েম করার অর্থই দ্বীন কায়েম করা। এখন এই যে শরীয়তগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা তার অর্থ এ নয় যে, খোদার প্রেরিত শরীয়াতগুলো পরস্পর বিরোধী ছিল। বরং তার অর্থ এই যে,

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ নামায-রোযার কথাই ধরুন। নামায সকল শরীয়াতেই ফরয ছিল। কিন্তু সকল শরীয়াতের একই কেবলা ছিল না। নামাযের সময়, রাকায়াত ও আরকান-আহকামও পার্থক্য ছিল। রোযাও সকল শরীয়াতে ফরয ছিল। কিন্তু রমযান মাসের ত্রিশ রোযা সব শরীয়াতে ছিল না। তাই বলে এ কথা বলা ঠিক নয় যে, সাধারণভাবে নামায-রোযা করা দ্বীন কায়েমের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট নিয়মে নামায পড়া ও নির্দিষ্ট সময়ে রোযা রাখা দ্বীন কায়েমের বহির্ভূত। এ থেকে নির্ভুলভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা এই যে, প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যে সে সময়কার শরীয়াতে নামায ও রোযার যে নিয়ম নির্ধারিত ছিল সেই অনুসারে সেই যুগে নামায পড়া ও রোযা রাখাই ছিল দ্বীন কায়েম করা। আর আজকের যুগে দ্বীন কায়েম করার অর্থ এই যে, এসব ইবাদতগুলোর জন্যে শরীয়াতে মুহাম্মদীতে যে নিয়ম-বিধি রয়েছে, সে অনুসারে তা সম্পন্ন করা। এ দু'টি উদাহরণ থেকে শরীয়াতের অন্যান্য সকল নির্দেশ অনুমান করা যেতে পারে।

দ্বীন স্বীয় শাসনক্ষমতা দাবী করে

পবিত্র কুরআন মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, এ মহাগ্রন্থ তার অনুসারীদেরকে কুফরী ব্যবস্থা ও কাফেরদের প্রজা ধরে নিয়ে পরাজিত ও অনুগত নাগরিকের মত ধর্মীয় জীবনযাপনের কর্মসূচী পেশ করছে না। বরং সে প্রকাশ্যে নিজের শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। চিন্তা, নৈতিকতা, সভ্যতা, আইন-কানুন ও রাজনীতির দিক দিয়ে সত্য দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ—প্রাণ বিসর্জন করার জন্যে সে তার অনুসারীদেরকে আহ্বান জানায়। এ মহাগ্রন্থ তাদেরকে মানব জীবনের সংশোধনের জন্যে এমন কর্মসূচী দেয়, যার একটি বিরাট অংশের বাস্তবায়ন কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদের হাতে শাসনক্ষমতা থাকলেই সম্ভব। এ মহাগ্রন্থ তার নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণনা করছে ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ -(النساء : ١٠٥)

"(হে নবী!) আমি এ মহাগ্রন্থকে সত্য সহকারে তোমার কাছে নাযিল করেছি যেন আল্লাহ তোমাকে যে আলোক দেখিয়েছেন সেই আলোকে তুমি লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পার।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১০৫)

এ কিতাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের বিধান দেয়া হয়েছে। সে বিধানের পেছনে স্পষ্টত এমন একটি সরকারের ধারণা বিদ্যমান যা যাকাত আদায় করে উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বিলিবণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০-১৩০)। এ কিতাবে সুদ বন্ধ করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যারা সুদ খাওয়া অব্যাহত রাখে তাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে (বাকারা ঃ ২৫৭), তা কার্যকর হতে পারে, যদি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে ঈমানদার লোকদের হাতে আসে। এ কিতাবে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড, (বাকারা ঃ ১৭৮), চোরের হস্ত কর্তন (মায়েদা ঃ ৩৮), ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদের জন্যে শাস্তি দেয়ার যে হুকুম জারী করা হয়েছে, তা এটা মনে করে দেয়া হয়নি যে, এসব নির্দেশ পালনকারী কাফেরদের আদালতও পুলিশের অধীনে থাকবে। এতে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (বাকারা ঃ ১৯০-২১৬)

একথা মনে করে নয় যে, এ দ্বীনের অনুসারীগণ কাফের সরকারের অধীন সৈনিক হিসাবে ভর্তি হয়ে এ নির্দেশ কার্যকর করবে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায়ের নির্দেশও এতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা কাফেরদের প্রজা হয়ে তাদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করবে ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে, তা হতে পারে না। এ কথা শুধু হিজরতের পরে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, হিজরতের আগেকার সূরাগুলো পড়লেও একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি প্রকাশ্যে দেখতে পায় যে, কুরআনের শুরু থেকেই মুমিনদেরকে বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল করার পরিকল্পনা ছিল, কাফের সরকারের অধীন ইসলাম ও মসুলমানরা জিম্মী হয়ে থাকবে—এ পরিকল্পনা কখনো ছিল না।

নবী (সা)-এর বাস্তব ক্রিয়াকর্মের সাক্ষ্য

সর্বোপরি নবী মুহাম্মদ (সা)-এর তেইশ বছরব্যাপী রিসালাত যুগের বাস্তব কর্মকাণ্ডের সাথেই উল্লিখিত ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সংঘর্ষশীল। তিনি তাবলীগ ও তলোয়ার এ উভয়ের সাহায্যে সমগ্র আরব জাহানকে পদানত করে সেখানে তিনি বিস্তারিত শরীয়াতসহ একটা পরিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেন—এ কথা কে না জানে ? সে রাষ্ট্র আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্র, সভ্যতা ও কৃষ্টি, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি ও আইন-আদালত এবং যুদ্ধ ও সন্ধি পর্যন্ত—জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আপন প্রভাবাধীন করে রেখেছিল। বর্ণিত আয়াতে সমস্ত নবীসহ নবী মুহাম্মদ (সা)-কে দ্বীন কায়েম করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তাঁর সকল কার্যকলাপ সে নির্দেশেরই বাস্তব ব্যাখ্যা ছিল, এ কথা যদি স্বীকার করা না হয়, তাহলে এর দু'টো অর্থ দাঁড়ায়। হয় রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর (মায়াযাল্লাহ) এ অভিযোগ আরোপ করতে হয় যে, তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছিল শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতার প্রধান প্রধান মৌলিক বিষয়গুলো প্রচার করার, আর তিনি সে সীমালংঘন করে আপন উদ্যোগে একটা সরকার কায়েম করে বসেছিলেন এবং একটা বিস্তারিত বিধান রচনা করে নিয়েছিলেন যা সকল নবীর শরীয়াতের সম্মিলিত বিধান থেকে আলাদা ধরনের এবং অতিরিক্ত। অথবা স্বয়ং আল্লাহর ওপর এ দোষারোপ করতে হয় যে, তিনি সূরা শূরায় উল্লিখিত ঘোষণা করার পর নিজেই তার বিপরীত কাজ করেছেন এবং আপন নবীকে দিয়ে ঐ সূরায় ঘোষিত দ্বীন কায়েম করার কাজের চেয়ে অনেক বেশি ও পৃথক ধরনের কাজ করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার তিনি তাঁর প্রথম ঘোষণার পরিপন্থি দ্বিতীয় ঘোষণাও করেন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম)–মায়াযাল্লাহ।

দ্বীন একটা সার্বিক ও ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা

পবিত্র কুরআন দ্বীন শব্দটিকে এক ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। তার অর্থ এমন একটি জীবনবিধান যার অধীনে মানুষ কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করবে, তার নির্ধারিত সীমারেখা, রীতিনীতি ও আইন-কানুনের অধীন জীবন যাপন করবে, তার আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্মান, উন্নতি ও পুরস্কারের আশা পোষণ করবে এবং তার নাফরমানী করার ফলে অপমান, লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করতে হবে—এ ভয় তার মনে থাকতে হবে। দুনিয়ার কোনো ভাষাতেই বোধ হয় এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ আর নেই। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে দ্বীন এ পরিভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

"আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান)-এর মধ্যে যারা আল্লাহকেও মানে না (অর্থাৎ তাঁকে একমাত্র সার্বভৌমত্বের মালিক বলে স্বীকার করে না) আখেরাতকেও (অর্থাৎ হিসেব ও প্রতিফলের দিনকেও) মানে না আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব বস্তু হারাম করেছেন, তাকে হারাম বলে স্বীকার করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বহস্তে জিজিয়া দেয় এবং বশ্যতা স্বীকার করে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ২৯)

এ আয়াতে দ্বীনে হক (সত্য ধর্ম) একটা পারিভাষিক শব্দ। এর দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চান তা তিনি আয়াতের প্রথম তিনটি কথায় নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। এ তিনের সমষ্টিকেই দ্বীনে হক বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ○ (المؤمن : ٢٦)

"ফেরাউন বলল, দাঁড়াও আমি মূসাকে মেরেই ফেলছি এবং এখন তার রবকে ডাকুক। আমার ভয় হয় যে, সে তোমাদের দ্বীনটাই পাল্টে না দেয়, অথবা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি না করে।"–(সূরা মু'মিন ঃ ২৬)

কুরআনে ফেরাউন ও মূসার যত বিবরণ পাওয়া যায় তার প্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করলে নিসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এখানে দ্বীন নিছক কোনো ধর্মের অর্থে ব্যবহার হয়নি। বরং রাষ্ট্র ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, মূসা (আ)-এর উদ্দেশ্য যদি সফল হয়, তাহলে রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টে যাবে। ফেরাউনের সার্বভৌমত্ব ও প্রচলিত আইন-কানুন ও রীতিনীতির ভিত্তিতে যে জীবনব্যবস্থা চালু রয়েছে, তা মূলোৎপাটিত হবে এবং তার জায়গায় হয় কোনো নতুন ব্যবস্থা নতুন বুনিয়াদের ওপর গড়ে ওঠবে অথবা কোনো ব্যবস্থাই গড়ে ওঠবে না বরং দেশ জুড়ে একটা অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۔(ال عمران : ١٩)

"আল্লাহ মনোনীত একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۔(ال عمران : ٨٥)

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীনের সন্ধান করবে, তার সেই দ্বীন মোটেই গ্রহণ করা হবে না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫)

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○(التوبة : ٣٣)

"তিনিই একমাত্র আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে সঠিক পথনির্দেশনা ও দ্বীনে হকসহ পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি অন্য সমস্ত দ্বীনের ওপর তাকে বিজয়ী করতে পারেন, মুশরিকদের কাছে তা যতই অপসন্ধনীয় হোক না কেন।"–(সূরা তওবা ঃ ৩৬)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ج (الانفال : ٣٩)

"যতক্ষণ দুনিয়া থেকে সমস্ত কুফরী ব্যবস্থার অবসান না ঘটে এবং দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট না হয়ে যায়, ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।"
–(সূরা আল আনফাল ঃ ৩৯)

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ (النصر)

"আল্লাহর সাহায্য যখন এসে গেছে এবং বিজয় সূচিত হয়েছে, আর তুমি যখন দেখেছ যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন এবার তুমি নিজ প্রভুর গুণগান ও প্রশংসা কর, তাঁর তসবিহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"–(সূরা নসর)

এ আয়াতগুলোতে দ্বীন বলতে আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাধারা, নৈতিকতা ও বাস্তব ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে বুঝানো হয়েছে।

প্রথম দু'টো আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের (ইসলাম) ভিত্তিতে যে জীবনব্যবস্থা তৈরি হয়, একমাত্র সেটাই আল্লাহর মনোনীত বিশুদ্ধ জীবন-ব্যবস্থা। এ ছাড়া অন্য কোনো ভূয়া সার্বভৌম সত্তার আনুগত্যের ভিত্তিতে যে জীবনব্যবস্থা তৈরি হয়, বিশ্ব-প্রভুর নিকট তা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রকৃতিগতভাবে তা হতেও পারে না। কেননা মানুষ যার সৃষ্টি, যার দাস, যার প্রতিপালিত এবং যার রাজ্যে প্রজা হিসেবে বসবাস করে, সে কখনো এ কথা মেনে নিতে পারে না, মানুষ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো শক্তির আনুগত্য ও দাসত্বে জীবনযাপনের এবং অন্য কারো নির্দেশ অনুসারে চলবার অধিকার রাখে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে এ বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও সত্য জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলাম দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য এই যে, তিনি এ জীবনব্যবস্থাকে অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করেই ছাড়বেন।

চতুর্থ আয়াতে ইসলামী জীবনব্যবস্থার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যতোদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে খোদাদ্রোহিতার ভিত্তিতে গঠিত সকল জীবনব্যবস্থার উচ্ছেদ না হয়েছে এবং বন্দেগী ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট না হয়েছে ততোক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াবাসীর সাথে লড়াই করে যেতে হবে।

পঞ্চম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে এমন এক সময় সম্বোধন করা হয়েছে যখন তেইশ বছরের অক্লান্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টায় আরবে বিপ্লব পূর্ণ হয়েছে। ইসলাম পরিপূর্ণ আকারে একটা আকীদাগত, চিন্তাগত, নৈতিক, শিক্ষাগত, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবে কায়েম হয়ে গেছে এবং আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক দলে দলে এসে এ ব্যবস্থার আওতায় প্রবেশ করছে। এভাবেই নবী মুহাম্মদ (সা)-এর অর্জিত কাজ সম্পন্ন হলো। তাঁকে বলা হচ্ছে যে, এ বিরাট সাফল্যকে নিজের সাফল্য মনে করে তিনি যেন গর্বিত না হন।

সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, অক্ষমতা ও সম্পূর্ণতার উর্ধে যে সত্তা, তাহলো নবী মুহাম্মদ (সা)-এর রবের সত্তা। অতএব, এ বিরাট কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্যে তাঁকে বলা হচ্ছে তাঁর রবের তাসবীহ ও গুণগান করতে এবং দীর্ঘ তেইশ বছরের সংগ্রাম-সাধনায় যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্যে তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।[১৪৪]

অধ্যায় ঃ ৯

মোজেযাসমূহ

মোজেযা সম্পর্কে আলোচনা

নবীগণ যখনই নিজেদেরকে বিশ্বপ্রভুর প্রেরিত বাণীবাহক হিসেবে পেশ করেছেন তখন লোকেরা তাঁদের কাছে দাবী করেছে, তোমরা যদি সত্যি-সত্যি বিশ্বপ্রভুর প্রতিনিধি হয়ে থাক তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রচলিত ধারার উর্ধে উঠে এমন কিছু অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা তোমাদের ঘটানো উচিত যা দেখে স্পষ্টতই মনে হবে যে, বিশ্বপ্রভু তোমাদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এ ঘটনাটা নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত করেছেন। এ দাবীর জবাবে নবীগণ কতগুলো নিদর্শন দেখিয়েছেন। কুরআনের পরিভাষায় তাকে আয়াত বা নিদর্শন এবং আকীদা বিশারদগণের পরিভাষায় তাকে মোজেযা বলা হয়।

মোজেযা অস্বীকারকারীদের বিভ্রান্তি

এ ধরনের নির্দশন বা মোজেযাসমূহকে কিছু লোক প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন সংঘটিত সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে। তারা আসলে কুরআনকে মানা না মানার মধ্যবর্তী একটা অযৌক্তিক ও দুর্বোধ্য ভূমিকা অবলম্বন করে। কেননা কুরআন যেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করে, সেখানে তাকে পূর্বাপর বর্ণনাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা মামুলী ঘটনা সাব্যস্ত করার চেষ্টা অত্যন্ত উদ্ভট ধরনের বাকচাতুর্য ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরনের বাকচাতুর্যের প্রয়োজন পড়ে কেবল সেই সব লোকের যারা অস্বাভাবিক ঘটনাবলী বর্ণনাকারী গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপনও করতে চায় না, আবার জন্মগতভাবে পৈতৃক ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে সে গ্রন্থ অস্বীকারও করতে পারে না—যাতে বাস্তবিক পক্ষে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আসল প্রশ্ন

মোজেযার ব্যাপারে আসল সিদ্ধান্তকর প্রশ্ন এই যে, আল্লাহ তায়ালা কি প্রাকৃতিক জগতকে একটা বিশেষ নিয়মে চালিত করে দেয়ার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন এবং এ চালু প্রক্রিয়ার কোথাও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন ? অথবা তিনি কি আপন রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব আপন হাতে রেখেছেন এবং প্রতিমুহূর্তে তাঁর নির্দেশ এ রাজ্যে কার্যকর হয় এবং বিভিন্ন জিনিসের আকৃতি ও ঘটনাবলীর চলতি ধারায় যখন যেমন ইচ্ছা আংশিক বা সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতাও রাখেন ?

দু'টো দৃষ্টিভঙ্গী

যারা এ প্রশ্নের জবাবে প্রথম বক্তব্যের সমর্থক তাদের পক্ষে মোজেযা স্বীকার করা অসম্ভব। কেননা খোদা ও বিশ্বজগত সম্পর্কে তাদের যা ধারণা, তার সাথে মোজেযা খাপ খায় না। তবে এ ধরনের লোকদের কুরআনের তফসীর ও ব্যাখ্যার কাজে মশগুল না হয়ে কুরআনকে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করে দেয়া উচিত। কেননা খোদা সম্পর্কে প্রথমোক্ত ধারণা কুরআন জোর দিয়েই খণ্ডন করেছে এবং দ্বিতীয় ধারণা জোর দিয়ে সমর্থন করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআনের যুক্তি-প্রমাণে সন্তুষ্ট হয়ে প্রথমোক্ত ধারণাকে গ্রহণ করে তার পক্ষে মোজেযা বুঝা ও বিশ্বাস করা মোটেই কঠিন হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক,

কোনো ব্যক্তি এরূপ আকীদা-বিশ্বাস অবলম্বন করে যে, সাপ যেভাবে জন্মে থাকে কেবলমাত্র সেভাবেই জন্মাতে পারে। অন্য কোনো পদ্ধতিতে সাপ সৃষ্টি করা আল্লাহর ক্ষমতারও বাইরে। এ ব্যক্তিকে যদি কেউ জানায় যে, অমুকের লাঠি সাপে পরিণত হয়েছে, অতপর সেই সাপ আবার লাঠির রূপ ধারণ করেছে, তাহলে জানা কথা যে, সে এ খবর নিশ্চিত-ভাবেই অবিশ্বাস করবে। পক্ষান্তরে আর এক ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাস এরূপ যে, আল্লাহ প্রাণহীন জড়বস্তু দিয়ে সজীব প্রাণী সৃষ্টি করেন। তিনি যে কোনো জড়বস্তুকে যেভাবে খুশী জীবন দান করতে পারেন। এ ব্যক্তির পক্ষে ডিমের ভেতর রক্ষিত কতিপয় জড়বস্তুর সাপ হয়ে যাওয়া যেমন আশ্চার্যজনক নয়, লাঠি থেকে সাপ হওয়াও তেমনি বিস্ময়কর মনে হয় না। পার্থক্য শুধু এই যে, একটা ঘটনা সবসময় ঘটে থাকে, আর একটা ঘটনা মাত্র তিনবার ঘটেছে। কিন্তু এটুকু পার্থক্য একটাকে বিস্ময়কর আর অন্যটাকে অবিস্ময়কর করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়।[১৪৫]

মোজেযার সত্যতার প্রমাণ

قُلْ رَّبِّىْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّايَعْلَمُهُمْ اِلاَّ قَلِيْلٌ ۖ فَلاَ تُمَارِ فِيْهِمْ اِلاَّ مِرَاۤءً ظَاهِرًا ۖ وَّلاَ تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ۝ (الكهف : ٢٢)

"তুমি বল আমার প্রভুই ভাল করে জানেন তাদের (আসহাবে কাহাফের) সংখ্যা কত ছিল। খুব কম লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। কাজেই তুমি স্থুল কথাবার্তা ছাড়া কারো সাথে তাদের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করো না। তাদের সম্পর্কে কারও কাছে কিছু জিজ্ঞাসাও কর না।"–(সূরা আল কাহাফ ঃ ২২)

সূরা কাহাফের এ আয়াতটির মর্ম এই যে, তাদের সংখ্যাটাই আসল কথা নয়, বরং এ ঘটনা থেকে যে শিক্ষা বা উপদেশ পাওয়া যায়, সেটাই আসল বস্তু। এ ঘটনার শিক্ষা এই যে, একজন খাঁটি ঈমানদার লোকের কোনো অবস্থাতেই সত্যকে উপেক্ষা এবং বাতিলের সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়। আরও শিক্ষণীয় এই যে, মু'মিনের ভরসা পার্থিব উপায়-উপকরণের ওপর নয়—আল্লাহর ওপর হওয়া উচিত। আর সত্যের স্বপক্ষে কাজ করার জন্যে বাহ্যত অনুকূল পরিবেশের লক্ষণ দেখা না গেলেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে সত্যের পথে পা বাড়ানো উচিত।

প্রাকৃতিক নিয়ম ও আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতা

এ ঘটনার আর একটি শিক্ষা এই যে, লোকেরা যে চলতি স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহকে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলে জানে এবং ভাবে যে, এ নিয়মের বিরুদ্ধে দুনিয়ায় কিছু ঘটতে পারে না, আসলে আল্লাহর ওপর সে ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি যখন যেখানে চান এ চলতি নিয়মের বিপরীত যে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাতে পারেন। একজন লোক দু'শো বছর ঘুমিয়ে থেকে হঠাৎ এমনভাবে উঠে বসবে যেন সে কয়েক ঘন্টা মাত্র ঘুমিয়েছে এবং এ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কোনো প্রভাব তার আয়ুতে, চেহারা সূরতে, লেবাস-পোশাকে ও স্বাস্থ্যে পড়বে না, এমন ঘটনা ঘটানো তাঁর পক্ষে কোনো বিরাট ব্যাপার নয়। এ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আসমানী কিতাবসমূহ ও নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে

মানবজাতির সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যত বংশধরকে এক সাথে পুনর্জীবিত করা আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে নয়। এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, অজ্ঞ ও অর্বাচীন মানুষ প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর নিদর্শনগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে তা থেকে আরো বেশি করে পথভ্রষ্ট হওয়ার উপকরণ সংগ্রহ করেছে, যেমন আসহাবে কাহাফের বেলায় তা করেছে।*১৪৬

বিশ্ব প্রকৃতিতে অসংখ্য বিস্ময়কর বস্তুর অস্তিত্ব

আল্লাহর এ সৃষ্টিজগতে অসংখ্য বিস্ময়কর বস্তু বিরাজমান। যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, তার শক্তির অপার মহিমা অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর আকারে নজরে পড়ে। কিছু ঘটনা ও অবস্থা সাধারণত এক বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। তবে তা এ কথার প্রমাণ হতে পারে না যে, এ প্রচলিত নিয়ম লংঘন করে অন্য কোনো অস্বাভাবিক উপায়ে তা দেখা দিতে পারে না। এ ধারণা খণ্ডন করার জন্যে বিশ্বজগতের সর্বত্র এবং সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে অস্বাভাবিক অবস্থা ও ঘটনার এক সুদীর্ঘ তালিকা রয়েছে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সর্বশক্তিমান হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে সে কখনো এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, একজন মানুষকে এক হাজার বছর বা তার কম বেশী আয়ু দান করা জীবন ও মৃত্যুর মালিকের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ নিজের ইচ্ছায় অবশ্যি এক মুহূর্তেও বাঁচতে পারে না সত্য। কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা করলে যতক্ষণ খুশী বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।১৪৭

---

* আসহাবে কাহাফের অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ এ উদ্দেশ্যে ঘটিয়েছিলেন যে, লোকেরা তা থেকে আখেরাতের বিশ্বাস অর্জন করবে। অথচ এ নির্দেশ থেকেই তারা উল্টো বুঝেছে যে, আল্লাহ তাদের পূজা করার জন্যে আরো কয়েকজন দেবতা জোগাড় করে দিলেন।–(গ্রন্থকার)

পূর্বতন নবীগণের মোজেযা পর্যালোচনা

হযরত সালেহ (আ)-এর উষ্ট্রীর মোজেযা

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا م قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْ جَاءَ تْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -(الاعراف : ٧٣)

"সামুদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে তাদেরকে বললো, হে আমার স্বজাতীয় ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো খোদা নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত। আল্লাহর এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শনস্বরূপ। ওকে ছেড়ে দাও আল্লাহর যমীনে বিচরণ করতে থাক। কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ কর না। নইলে তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কবলে পড়বে।"-(সূরা আ'রাফ ঃ ৭৩)

বাহ্যিক বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আয়াতের প্রথম অংশে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দ্বিতীয়াংশে নিদর্শন শব্দদ্বয় দ্বারা এ উষ্ট্রীকেই বুঝানো হয়েছে। সূরা শূয়ারার অষ্টম রুকু'তে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, সামুদ জাতি স্বয়ং হযরত সালেহের কাছে নিদর্শন চেয়েছিল, যাতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহর নবী। সেই দাবীর জবাবেই হযরত সালেহ উষ্ট্রী হাযির করেছিলেন। সুতরাং উষ্ট্রী যে মোজেযাস্বরূপই এসেছিল, তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। অন্যান্য বহু নবী অবিশ্বাসীদের দাবীর জবাবে আপন নবুয়াতের প্রমাণ হিসেবে যেসব মোজেযা দেখাতেন, এটা সে ধরনেরই একটি মোজেযা। হযরত সালেহ অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, উষ্ট্রীর বেঁচে থাকার ওপর তোমাদের জীবন নির্ভরশীল। এ হুঁশিয়ারী থেকে প্রমাণিত হয় যে, উষ্ট্রীর জন্মই হয়েছিল মোজেযার আকারে। তিনি আরো বলেছিলেন যে, উষ্ট্রী তোমাদের ক্ষেতে অবাধে চরে বেড়াবে। একদিন সে একাকী পানি খাবে। অপর দিন অন্য সকলের জন্তু-জানোয়ার পানি খাবে। তোমরা যদি তার কোনো ক্ষতি কর তাহলে সহসা তোমাদের ওপর খোদার আযাব নেমে আসবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জিনিসের অলৌকিকত্ব লোকেরা স্বচক্ষে দেখতে পায়, তাকেই শুধু এমন মর্যাদার সাথে উপস্থাপিত করা যায়। উষ্ট্রীটি যেখানে খুশী চরে বেড়াত এবং একদিন সে একা আর অপর দিন সকলের জানোয়ার পানি খেত। এ অবস্থা অনেক দিন চলেছে এবং তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা বরদাশ্‌ত করেছে। অবশেষে অনেক সলা-পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করে তাকে মেরে ফেলা হলো। অথচ হযরত সালেহের এমন কোনো শক্তি ছিল না যার জন্যে তাঁকে ভয় করার কিছু ছিল। এ উষ্ট্রীর অলৌকিকত্বের আরও প্রমাণ এই যে, তারা এর জন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল এবং জানত যে, তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো শক্তি আছে যার বলে সে তাদের মধ্যে অমন স্পর্ধার সাথে ঘুরাফেরা করে। উষ্ট্রীটি কি ধরনের ছিল এবং কিভাবে তার আবির্ভাব ঘটলো, সে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোনো স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। সে জন্যে তাফসীরকারগণ এর জন্ম সম্পর্কে

যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তা গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কুরআন থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, উষ্ট্রীটি কোনো না কোনো দিক দিয়ে মোজেযা হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল।১৪৮

মৃতের পুনর্জীবন সংক্রান্ত মোজেযা

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ قف وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ لا قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (البقرة : ٢٥٩)

"অথবা উদাহরণস্বরূপ সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ কর যে একটি বিধ্বস্ত জনপথ অতিক্রম করার সময় বললো, এ মৃত জনপদকে আল্লাহ কি করে পুনরুজ্জীবিত করবেন ? আল্লাহ তায়ালা তখন তার প্রাণ সংহার করলেন এবং সে একশ' বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। অতপর আল্লাহ তাকে দ্বিতীয় বার জীবন দান করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা বলত, তুমি কত দিন মৃত অবস্থায় পড়েছিলে ? সে বলল, একদিন অথবা কয়েক ঘন্টা। আল্লাহ বললেন, তোমার এ অবস্থার ওপরে একশ' বছর অতীত হয়েছে। তুমি এখন একটু নিজের খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকিয়ে দেখ তা মোটেই বিকৃত হয়নি। অন্যদিকে তোমার গাধার দিকেও তাকাও (তার কংকাল পর্যন্ত পচে যাচ্ছে)। তোমাকে লোকদের জন্যে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরার জন্যেই আমি এসব ঘটিয়েছি। তারপর দেখ আমি কিভাবে এ কংকাল দাঁড় করিয়ে তার মধ্যে রক্ত-মাংস সংযোজন করছি। এভাবে তার কাছে যখন সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠল তখন সে বলল, আমি জানি যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৯)

এ ব্যক্তি কে ছিলেন এবং সেটা কোন্ বস্তি ছিল, তা আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে যে জন্যে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে তা এতটুকু বলার জন্যে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তাকে তিনি এভাবেই হেদায়াতের আলো প্রদান করেন। ব্যক্তি এবং স্থান নির্ণয়ের কোনো উপায়ও আমাদের হাতে নেই এবং তাতে কোনো লাভও নেই। তবে পরবর্তী বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই কোনো নবী ছিলেন।

উপরোক্ত প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সে বুযর্গ ব্যক্তি পরকাল অবিশ্বাস করতেন অথবা সে সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল। বরং আসলে তিনি নিগূঢ় তত্ত্বের চাক্ষুস অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়েছিলেন। নবীদেরকে এ সুযোগ দেয়া হত। দুনিয়ার মানুষ যাকে একশ' বছর আগে মারা গেছে বলে জানে, সে ব্যক্তির জীবিত হয়ে ফিরে আসা সমসাময়িক লোকদের মধ্যে তাকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যথেষ্ট।১৪৯

হযরত আইয়ূবের রোগ নিরাময়কারী ঝর্ণা

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝ (ص : ٤١-٤٢)

"আমার বান্দা আইয়ূবের কথা স্মরণ কর। সে তার প্রভুকে সম্বোধন করে বলল, শয়তান আমাকে যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট ও আযাবে ফেলে দিয়েছে। (আমি তাকে নির্দেশ দিলাম) মাটিতে পা দিয়ে আঘাত কর। এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল ও পান করার জন্যে।"–(সূরা সোয়াদ ঃ ৪১-৪২)

আল্লাহর হুকুমে মাটিতে পদাঘাত করতেই একটা ঝর্ণা বেরিয়ে এল। সেই ঝর্ণার পানি পান ও তা দিয়ে গোসল করাই ছিল হযরত আইয়ূবের রোগের চিকিৎসা। মনে হয়, স্বম্ভবতঃ হযরত আইয়ূব কোনো মারাত্মক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাইবেলেও বলা হয়েছে যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর সারা শরীর ফোঁড়ায় জর্জরিত ছিল।[১৫০]

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মোজেযা

চারটি পাখী জীবিত করার ঘটনা

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (البقرة : ٢٦٠)

"সেই ঘটনাটিও স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলেছিল, খোদা! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত কর, তা আমাকে দেখাও। আল্লাহ বলেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? ইবরাহীম বলেন, বিশ্বাস তো করি। কিন্তু মনের সন্তুষ্টি প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন, তাহলে চারটি পাখি নিয়ে তাদেরকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের খণ্ডিত এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রাখ। তারপর তাদেরকে ডাক দাও। তারা তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে। জেনে রেখ যে, আল্লাহ অতিশয় পরাক্রমশালী ও নিপুণ কুশলী।"–(সূরা বাকারা ঃ ২৬০)

বার্ধক্যে হযরত ইবরাহীমের সন্তান লাভ

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۝ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ (هود : ٧١-٧٣)

"অতপর আমি তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলল, হায়! আমার বদ নসীব! আমার সন্তান হবে নাকি ? আমি তো থুত্থুড়ে বুড়ী

হয়ে গেছি। আর আমার এ স্বামীও বুড়ো হয়ে গেছেন। এতো বড়ো আজব কথা। ফেরেশতারা বলল, আল্লাহর সিদ্ধান্তে আপনি অবাক হচ্ছেন ? হে ইবরাহীমের পরিবারবর্গ! আপনাদের ওপর আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও বিরাট মর্যাদাশালী।"-(সূরা হূদ ঃ ৭১-৭৩)

আগুন থেকে হযরত ইবরাহীমের নিষ্কৃতি

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝

"তারা পরস্পর বলল, তার জন্যে একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর এবং জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডলীতে তাকে ফেলে দাও। তারা তার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত এটেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকেই হেয় করে দিয়েছি।"-(সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ৯৭-৯৮)

হযরত মূসা (আ)-এর মোজেযাসমূহ

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ ۙ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ -

"অতপর আমি মূসা ও তার ভাই হারুনকে আমার নিদর্শনসমূহ ও অকট্য প্রমাণসহ ফেরাউন ও তাঁর দলবলের কাছে পাঠালাম।"-(সূরা আল-মুমিনূন ঃ ৪৫-৪৬)

'নিদর্শনসমূহের' পর 'অকাট্য প্রমাণ' এর উল্লেখের তাৎপর্য এ হতে পারে যে, এসব নিদর্শন তাঁদের সাথে থাকাই তাঁদের দু'জনের নবুয়াতের অকাট্য প্রমাণ ছিল। আবার এও হতে পারে যে, মিসরে তিনি লাঠি ছাড়া আর যেসব মোজেযা দেখিয়েছেন সেগুলো হল নিদর্শন আর অকাট্য প্রমাণ অর্থ তার লাঠি। কেননা লাঠির মাধ্যমে যেসব মোজেযা প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁদের উভয়ের রসূল হওয়া সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে দেয়নি।[১৫১]

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ

مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ (الاعراف : ١١٦-١١٧)

"তারা যখন নিজেদের যাদুর উপকরণ নিক্ষেপ করল তখন তারা দর্শকদের চোখে যাদু করল এবং মনে ত্রাসের সঞ্চার করল। এভাবে এক সাংঘাতিক রকমের যাদু দেখাল। আমি মূসাকে ইংগিত করলাম, তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা তাদের মিথ্যা যাদুর মায়াজালকে গ্রাস করতে লাগলো ?"(সূরা আরাফ ঃ ১১৬-১১৭)

হযরত মূসার লাঠি

এরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, হযরত মূসার লাঠি যাদুকরদের সেই লাঠি ও দড়িগুলোকে গিলে খেয়ে ফেলেছিল যা অজগর সাপের মত দেখাচ্ছিল। কুরআনের বক্তব্য শুধু এই যে, মূসার লাঠি সাপ হয়ে যাদুকরদের ধোঁকাপূর্ণ মায়া মরীচিকা গ্রাস করে ফেলল। আয়াতের মর্ম স্পষ্টতঃ এ রকম মনে হয় যে, মূসার সাপ যেদিকে যেদিকে গেছে, সেখান থেকে যাদুর প্রভাব নষ্ট হয়ে গেছে। যাদুর প্রভাবে যাদুকরদের লাঠি ও দড়ি সাপের

মত ফণা তুলছিল বলে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মূসার সাপ এক চক্কর ঘুরে আসতেই সকল লাঠি লাঠির রূপ এবং সকল দড়ি দড়ির রূপ ধারণ করল।[১৫২]

ফেরাউন গোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন সতর্কতামূলক আযাব

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ قف فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○ (الاعراف : ١٣٠-١٣٣)

"আমি ফেরাউনের লোকজনকে কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানিতে আক্রান্ত করেছিলাম যাতে করে তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে। কিন্তু তাদের এমন দশা হয়েছিল যে, ভাল অবস্থা হলে বলত, আমরা এর যোগ্য। আর খারাপ কিছু ঘটলে মূসা ও তার সাথীদেরকে তাদের জন্যে দুর্ভাগ্যজনক মনে করত। আসলে তাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহর কাছেই ছিল। তবে তাদের অধিকাংশেরই তা জানা ছিল না। তারা মূসাকে বলল, তুমি আমাদেরকে যাদু প্রভাবিত করার জন্যে যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা তোমার কথা শুনব না। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের ওপর ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত করলাম, পঙ্গপাল ছড়িয়ে দিলাম, উই পোকা ও ব্যাঙ পাঠিয়ে দিলাম এবং রক্তবৃষ্টি বর্ষণ করলাম। এসব নিদর্শন আলাদা আলাদাভাবে দেখালাম। কিন্তু তারা দাম্ভিকতার পথে এগিয়েই যেতে লাগল। আসলে তারা ছিল ভীষণ অপরাধী জাতি।"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৩০-১৩৩)

যে জিনিস কিছুতেই যাদুর ফল হতে পারে না বলে ফেরাউনের সভাসদগণের নিশ্চিতরূপে জানা ছিল, তাকেও যাদু বলে আখ্যায়িত করে তারা হঠকারিতা ও বাকচাতুরি প্রদর্শন করেছে। সারা দেশে দুর্ভিক্ষ ও ক্রমাগত ফসলহানি ঘটানো যে কোনো যাদুকরের কৃতিত্ব হতে পারে, তা বোধ হয় কোনো নির্বোধও বিশ্বাস করবে না। এ কারণেই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ؕ (النمل : ١٣-١٤)

"আমার নিদর্শনগুলো যখন তারা দেখতে পেল তখন বলল, এটা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট যাদু। অথচ ভেতর থেকে তাদের মন বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিছক দাম্ভিকতা ও অহংকার বশেই তারা অস্বীকার করলো।"–(সূরা আন নামল ঃ ১৩-১৪)[১৫৩]

পূর্বোক্ত আয়াতে যে ঝড়-তুফানের কথা বলা হয়েছে, তা সম্ভবত শিলাবৃষ্টিসহ প্রবল বারিবর্ষণ ছিল। তুফান অন্য ধরনেরও হতে পারে। তবে বাইবেলে তুষারপাতজনিত তুফানের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আমি এ অর্থই ব্যবহার করেছি।[১৫৪]

ঐ আয়াতে যে 'কুম্মাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার কয়েকটি অর্থ রয়েছে, যথা ঃ উকুন, ক্ষুদে মাছি, ক্ষুদে পংগপাল, মশা, উইপোকা ইত্যাদি। এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগের কারণ সম্ভবত এই যে, মশা ও উকুন মানুষের ওপর এবং উই পোকা খাদ্য-গুদামে হামলা চালিয়েছিল।–(বাইবেলের যাত্রাপুস্তক, ৭ম থেকে ১২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)১৫৫

নয়টি নিদর্শন

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اِذْ جَاۤءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ○ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَاۤءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَاۤئِرَ ج وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ○ (بنى اسرائيل : ١٠١-١٠٢)

"আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। এখন তুমি নিজেই বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর যে, মূসা যখন তাদের সামনে এসেছিল তখন ফেরাউন তাঁকে কি বলেছিল যে, হে মূসা, আমি মনে করি তোমাকে অবশ্যই যাদু করা হয়েছে। মূসা তার জবাবে বলল, এসব মনোজ্ঞ নিদর্শন আসমান-যমীনের প্রভু ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি। হে ফেরাউন! আমার ধারণা যে তুমি নিশ্চয়ই হতভাগ্য।"

–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০১-১০২)

সূরা আল আ'রাফে এ নয়টি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হল ঃ ১. লাঠি —যা সাপে রূপান্তরিত হত ২. উজ্জ্বল হস্ত—যা বগল থেকে বের করে আনলেই সূর্যের মত আলো-ঝলমল করত ৩. যাদুকরদের যাদুকে জনসাধারণ্যে পরাজিত করা ৪. একটি ঘোষণা অনুসারে সারাদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়া ৫. ক্রমাগত তুফান ৬. পঙ্গপাল ৭. উইপোকা ৮. ব্যাঙ ও ৯. রক্ত প্রভৃতি বিপদসমূহ অবতীর্ণ হওয়া।১৫৬

হযরত মূসা ফেরাউনের কথার যে জবাব দেন, তার মর্ম ছিল এই যে, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ব্যাঙের উৎপাত, সমস্ত খাদ্যগুদামে উই পোকার আক্রমণ এবং এ ধরনের অন্যান্য জাতীয় সংকট কোনো যাদুকরের যাদু অথবা কোনো মানবীয় শক্তির দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রত্যেক বিপদ আসার আগে হযরত মূসা ফেরাউনকে সাবধান করে দিয়ে বলতেন, তুমি যদি নিজের হঠকারিতা ত্যাগ না কর, তাহলে এই এই বিপদ তোমার রাজ্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তার কথামত ঠিক সেই বিপদ যথাসময়ে এসে পড়তো। এমতাবস্থায় এসব বিপদাপদ আসমান-যমীনের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কারও দ্বারা সংঘঠিত হয়েছে—এ কথা বলা একমাত্র কোনো পাগল বা হঠকারী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।১৫৭

লাঠি দ্বারা সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করা

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ـ (طه : ٧٧)

"আমি মূসাকে অহী দ্বারা বললাম, এখন তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে পড় এবং তাদের জন্যে সমুদ্রের ভেতর শুকনো রাস্তা বানিয়ে দাও। তোমাদের

পেছনে কেউ ধাওয়া করছে সে ভয় কর না। আর (সমুদ্রের ভেতর দিয়ে চলতে গিয়ে) ঘাবড়ে যেও না।”–(সূরা ত্বাহা ঃ ৭৭)

এ ঘটনার বিবরণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা শেষ পর্যন্ত একটা রাত নির্দিষ্ট করে দিলেন যে রাতে সকল ইসরাঈলী ও অইসরাঈলী মুসলমানদেরকে (যার জন্যে “আমার বান্দাগণ” এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) সকল অঞ্চল থেকে হিজরত করে বেরিয়ে পড়ার কথা। আগে থেকে নির্ধারিত একটা জায়গায় তাঁরা সবাই একত্র হয়ে একটা কাফেলার আকারে বেরিয়ে পড়লেন। সে কালে সুয়েজ খাল ছিল না। লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত সমগ্র এলাকা ছিল মুক্ত এলাকা। কিন্তু সে এলাকার সমস্ত পথে সামরিক ঘাটি ছিল। এ জন্যে ঐ রাস্তা অতিক্রম করা নিরাপদ ছিল না। এ জন্যে হযরত মূসা লোহিত সাগর অভিমুখী পথ অবলম্বন করেন। সম্ভবত সমুদ্রের তীর ধরে সিনাই উপদ্বীপের দিকে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কাফেলা সমুদ্রতীরে থাকতেই ওদিকে পেছন থেকে ফেরাউনের বিরাট বাহিনী এসে পৌঁছে গেল। সূরা শূয়ারাতে বর্ণিত হয়েছে যে, মোহাজেরদের কাফেলা সমুদ্র ও ফেরাউনের বাহিনীর মধ্যস্থলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসাকে নির্দেশ দেন اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ‘তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রের ওপর আঘাত কর।’ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ‘তৎক্ষণাৎ সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হল এবং তার দু’ ভাগ দু’দিকে মস্তবড় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে দাঁড়ালো।’ কাফেলা পার হয়ে যাওয়ার জন্যে মাঝখানে শুধু রাস্তা হয়ে গেল তাই নয় বরং মধ্যবর্তী এ অংশটি একটা শুষ্ক সড়কে পরিণত হল। এ হল একটা সুস্পষ্ট মোজেযারই বর্ণনা। যারা বলেন, ঝড় কিংবা জোয়ার-ভাটার কারণে সমুদ্রের পানি সরে গিয়েছিল, তাদের কথা এ বর্ণনা থেকে অসার প্রমাণিত হয়। কেননা সে কারণে পানি সরলে তা দু’পাশে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে দাঁড়ায় না এবং মাঝের অংশ শুকনো সড়কে পরিণত হয় না।[১৫৮]

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ٥ (الشعراء : ٦٣)

“আমি মূসাকে অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলাম, তুমি সমুদ্রের ওপর লাঠি দিয়ে আঘাত কর। তৎক্ষণাৎ সমুদ্র দু’ভাগ হয়ে গেল এবং দু’ভাগ দু’দিকে মস্তবড় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে দাঁড়াল।”–(সূরা শূয়ারা ঃ ৬৩)

আরবী ভাষায় طود মানে পাহাড়। লিছানুল আরব নামক অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে الطود الجبل العظيم মানে বিরাটকায় পাহাড়। এর ওপর আবার عظيم তথা ‘বিরাট’ বিশেষণ প্রয়োগ করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পানি উভয় দিকে অত্যন্ত উঁচু পাহাড়ের আকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের ভেতর এই যে রাস্তার ব্যবস্থা, এটা একদিকে বনী ইসরাঈলের কাফেলার পার হওয়ার সুযোগ করে দেয়া এবং অপরদিকে ফেরাউনের বাহিনীকে ডুবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পানি এত বড় উঁচু পাহাড়ের আকারে এত দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়েছিল যে, লক্ষ লক্ষ ইসরাঈলী মোহাজেরদের কাফেলা তার ওপর দিয়ে পারও হয়ে গেল, আবার তাদের পর ফেরাউনের বাহিনী তার মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছেও গেল। এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, সাধারণ

প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন যেসব ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়, তা যত প্রচণ্ডই হোক না কেন, তার দরুন সমুদ্রের পানি এত বড় পাহাড়ের মত হয়ে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকে না। আরও লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, সূরা ত্বাহায় বলা হয়েছে فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا। 'তাদের জন্যে সমুদ্রের মধ্যে শুকনো রাস্তা বানিয়ে দাও।' অর্থাৎ সমুদ্রের ওপর লাঠি দিয়ে আঘাত করায় শুধু যে পানি সরে গিয়ে দু'দিকে পাহাড়ের মত দাঁড়াল তা নয়, বরং ভেতরে যে রাস্তা হলো তা শুষ্কও হয়ে গেল। বিন্দুমাত্রও কাঁদা পানি রইল না যে, চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। এটা একটা সুস্পষ্ট মোজেযার বর্ণনা। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন এ ঘটনা ঘটেছিল বলে যারা এর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন, তাদের ধারণা যে ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৫৯]

'মান্না' ও 'সালওয়া'

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ○ (طه : ٨٠)

"আমি তোমাদের ওপর মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছি।"–(সূরা ত্বাহা ঃ ৮০)

বাইবেলের বিবরণ এই যে, মিসর থেকে বেরিয়ে আসার পর যখন বনী ইসরাঈল সীন মরুভূমিতে এলিম ও সিনাই এর মাঝখানে পথ অতিক্রম করছিল এবং খাদ্য ভাণ্ডার নিঃশ্বেষ হয়ে যাওয়ায় তাদের অনাহারে কাটানোর উপক্রম হয়েছিল, তখন মান্না ও সালওয়া নাযিল হওয়া শুরু হয় এবং ফিলিস্তিনের লোকালয়ে পৌঁছা পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। (যাত্রাপুস্তক অধ্যায়-১৬, গণনাপুস্তক অধ্যায়–১১ স্তোত্র ৭-৯, যিহোশয়ের পুস্তক, অধ্যায়-৫, স্তোত্র ১২) যাত্রাপুস্তকে মান্না ও সালওয়ার বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী উড়িয়া আসিয়া শিবিরস্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতঃকালে শিবিরের চারিদিকে শিশির পড়িল। পরে পতিত শিশির উর্দ্ধগত হইলে, দেখ, ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তুবিশেষ প্রান্তরের উপরে পড়িয়া রহিল। আর তাহা দেখিয়া ইস্রায়েল সন্তানগণ পরস্পর কহিল, উহা কি ? কেননা তাহা কি, তাহারা জানিল না। তখন মোশি কহিলেন, উহা সেই অন্ন, যাহা সদাপ্রভু তোমাদিগকে আহারার্থে দিয়োছেন।–(অধ্যায় ১৬, স্তোত্র ঃ ১৩-১৫)

আর ইস্রায়েল-কুল ঐ খাদ্যের নাম মান্না রাখিল ; তাহা ধনিয়া বীজের মত, শুক্ল-বর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।–(স্তোত্র ঃ ৩১)

গণনাপুস্তকে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে ঃ

লোকেরা ভ্রমণ করিয়া তাহা কুড়াইত, এবং যাঁতায় পিষিয়া কিম্বা উখ্‌লিতে চূর্ণ করিয়া বহুগুণাতে সিদ্ধ করিত, ও তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিত ; তৈলপক পিষ্টকের ন্যায় তাহার আস্বাদ ছিল। রাত্রিতে শিবিরের উপরে শিশির পড়িলে ঐ মান্না তাহার উপরে পড়িয়া থাকিত।–(অধ্যায় -১১, স্তোত্র ঃ ৮-৯)

এটাও একটা মোজেযা ছিল। কেননা চল্লিশ বছর পর যখন বনী ইসরাঈল স্বাভাবিক খাদ্য পাওয়া শুরু করল, তখন এ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। আজকাল সেখানে বটের নামক পাখীরও আধিক্য দেখা যায় না, আর মান্নাও কোথাও পাওয়া যায় না। সন্ধানী লোকেরা বনী ইসরাঈলের চল্লিশ বছর ব্যাপী মরুচারী জীবন যাপনের ঐ এলাকাটায় তন্নতন্ন করে

খুঁজে দেখেছে, মান্না তারা কোথায়ও পায়নি। অবশ্য ব্যবসায়ী লোকেরা মানুষকে বোকা বানাবার জন্যে 'মান্না' এর হালুয়া বিক্রি করে বেড়ায়।[১৬০]

হযরত সুলায়মান (আ)-এর মোজেযা

পাখির ভাষার জ্ঞান

وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ـ(النمل : ١٦)

"এবং তিনি বললেন, হে জনগণ! আমাকে পাখির ভাষা শিখানো হয়েছে।"
–(সূরা আন্ নামল ঃ ১৬)

হযরত সুলায়মান পশুপাখির ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন এ বিষয়ে বাইবেল নীরব। তবে ইসরাঈলী কিংবদন্তিতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।
–(জিউয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১শ' খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৯)[১৬১]

জ্বিনেরা তাঁর অনুগত ছিল

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○(النمل : ١٧)

"সুলায়মানের জন্যে জ্বিন, মানুষ ও পাখির সুনিয়ন্ত্রিত বাহিনীর সমাবেশ করা হয়েছিল।"–(সূরা আন নামল ঃ ১৭)

সাবার রাণীর সিংহাসন এক নিমিষে হাযির করা হয়েছিল

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ○ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۛ (النمل : ٣٨ـ٤٠)

"সুলায়মান বললেন, হে সভাসদবৃন্দ ঃ আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে চলে আসার আগে রাণীর সিংহাসন আমার কাছে কে এনে দিতে পারে ? এক দানব বলল, আপনি যেখানে বসে আছেন ওখান থেকে উঠবার আগেই আমি তা এনে দেব, আমি এ ব্যাপারে ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত। কিতাব সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী একজন বলল, আমি চোখের পলকেই তা এনে দেব। অতপর যখন সুলায়মান সে সিংহাসন নিজের কাছে দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ।"

অন্যান্য নবীর মোজেযা

ইউনুস (আ)–এর ঘটনার অলৌকিক দিক

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ○ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ○ فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ○ لَلَبِثَ

فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاۗءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ○ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ○ (الصفت : ١٣٩-١٤٦)

"নিশ্চয়ই ইউনুসও একজন রসূল ছিলেন। সেই সময়টা স্মরণ কর, যখন তিনি একটা যাত্রী বোঝাই জাহাজের দিকে ছুটে পালালেন। লটারীতে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হলেন। অবশেষে তাকে মাছে গিলে ফেলল। তিনি ছিলেন অনুতপ্ত। তিনি যদি আল্লাহর তসবীহ পাঠকারী না হতেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত তাকে সেই মাছের পেটেই থাকতে হত। অবশেষে তাকে আমি খুবই রুগ্ন অবস্থায় একটা গাছপালাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং তার ওপর একটা লাউ গাছ জন্মিয়ে দিলাম।"
–(সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ১৩৯-১৪৬)

বৃদ্ধা স্ত্রীর গর্ভ থেকে হযরত যাকারিয়ার সন্তান লাভ

فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ○ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ○ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ○ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ○ (مريم : ٥-١٠)

"তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দাও। যেন সে আমারও উত্তরাধিকারী হয় এবং ইয়াকুবের বংশধরেরও উত্তরাধিকার লাভ করে। আর হে আমার রব! তাকে একজন মনোনীত মানুষ হিসেবে তৈরি কর। হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি যার নাম হবে ইয়াহইয়া। আমি ইতিপূর্বে এ নামে আর কোনো মানুষ সৃষ্টি করিনি। তিনি বললেন, হে আমার রব! আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা। আর আমিও চরম বার্ধক্যে উপনীত। কি করে আমার সন্তান হবে ? জবাব এল ঃ এটাই হবে। তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্যে একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার। এর আগে তোমাকেও আমি সৃষ্টি করেছি। তখন তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। যাকারিয়া বললেন, হে প্রতিপালক ! আমার জন্যে একটা নিদর্শন ঠিক করে দিন। আল্লাহ বললেন, তোমার জন্যে নিদর্শন এই যে, পর পর তিন দিন তুমি লোকদের সাথে কথা বলতে পারবে না।"–(সূরা মরিয়ম ঃ ৫-১০)

হযরত ঈসা (আ)-এর মোজেযা

হযরত ঈসার বিনা বাপে জন্ম লাভ

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ○ (المؤمنون : ٥٠)

"মরিয়মকে ও তার ছেলেকে আমি একটা নিদর্শন বানালাম এবং উভয়কে একটা উঁচু জায়গায় রাখলাম যেখানে তারা স্বস্তি লাভ করেছিল এবং যেখানে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত ছিল।"–(সূরা আল মুমিনূন ঃ ৫০)

এখানে এ কথা বলা হয়নি যে, মরিয়ম একটা নিদর্শন ছিল এবং মরিয়মের ছেলে আর একটা নিদর্শন ছিল। এ কথাও বলা হয়নি যে, মরিয়ম ও তার ছেলেকে দু'টো নিদর্শনে পরিণত করেছি। বরং উভয়ের সমন্বয়ে একটা নিদর্শন বানান হয়েছে—এ কথাই বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, বাপ ছাড়া ঈসা (আ)-এর জন্ম হওয়া এবং পুরুষের সংসর্গ ছাড়া মরিয়মের গর্ভবতী হওয়াটাই মা ও ছেলের একত্রে একটি নিদর্শনে পরিণত হওয়ার কারণ।[১৬২]

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○ قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ○ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ○ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ○ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ○ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○ (مريم : ١٦-٢٣)

"(আর হে মুহাম্মদ!) তুমি এ গ্রন্থে মরিয়ামের সেই ঘটনা বর্ণনা কর, যখন সে আপনজন থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে নির্জনবাস গ্রহণ করেছিল। সে পর্দায় আচ্ছাদিত হয়ে তাদের থেকে লুকিয়েছিল। সে অবস্থায় আমি তার কাছে আপন আত্মা (ফেরেশতা)-কে পাঠালাম। সে তার কাছে পূর্ণ মানবীয় রূপে দেখা দিল। মরিয়ম হঠাৎ বলে উঠল ঃ তুমি যদি কোনো খোদাভীরু লোক হয়ে থাক তবে আমি তোমার থেকে দয়াময় খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি। সে বলল, আমি তোমার রবের দূত মাত্র। তোমাকে একটা পবিত্র সন্তান দান করবো, এ উদ্দেশ্যে এসেছি। মরিয়ম বলল, আমার ছেলে হবে কেমন করে ? আমাকে তো কোনো মানুষ স্পর্শও করেনি, আর আমি কোনো চরিত্রহীন মেয়েলোকও নই। ফেরেশতা বলল, এমনিই হবে। তোমার রব বলেছেন ঃ এ কাজ আমার পক্ষে খুবই সহজ। আমি এ ছেলেটিকে মানবমণ্ডলীর জন্যে একটা নিদর্শন এবং নিজের পক্ষ থেকে এক অনুগ্রহে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই এ কাজ করব। আর এটা আল্লাহর সিদ্ধান্তকৃত বিষয়, এটা হবেই। মরিয়ম সেই সন্তানটিকে গর্ভে ধারণ করল এবং এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। অতপর প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নীচে যেতে বাধ্য করল। সে বলতে লাগল ঃ হায় এর আগে যদি আমার মরণ হত এবং আমার নাম-নিশানা না থাকত।"–(সূরা মরিয়ম ঃ ১৬-২৩)

এখানে দূরবর্তী স্থান অর্থে বেথলেহেমকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মরিয়মের ই'তেকাফ থেকে বেরিয়ে সেখানে যাওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। মরিয়ম একেতো ছিলেন বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে ধার্মিক গোষ্ঠী বনী হারুনের বংশধর, তার ওপর আবার আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে নিবেদিতা হয়ে বায়তুল মাক্দাসে অবস্থান করছিলেন। এমন মেয়ে হঠাৎ

গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় তিনি যদি ই'তেকাফের জায়গায় বসে থাকতেন এবং তাঁর গর্ভের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেত তাহলে পরিবারের লোকেরা তো বটেই, তাঁর স্বজাতির অন্যান্য লোকেরাও তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলত। বেচারী এ কঠিন মুসিবতে পড়ে নিশব্দে ই'তেকাফের কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন যাতে করে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তটা পর্যন্ত অন্ততঃ স্বজাতির ধিক্কার-তিরস্কার ও ব্যাপক দুর্নাম থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। এ বেরিয়ে পড়ার ঘটনাটি হযরত ঈসার বিনা বাপে পয়দা হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ। মরিয়ম যদি বিবাহিত হতেন এবং স্বামী থেকেই তাঁর গর্ভধারণ হত তাহলে পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় ছেড়ে সন্তান প্রসবের জন্যে একটা দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার কোনো কারণই ছিল না।[১৬৩]

'হায়, যদি আমার মরণ হত এবং আমার নাম-নিশানা না থাকতো'—মরিয়মের এ উক্তি থেকেই বুঝা যায়, তিনি তখন কতখানি উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তা ছিলেন। অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করলে সে কথা কারোই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কেবল প্রসব বেদনার দরুন তাঁর মুখ দিয়ে এ কথা বের হয়নি বরং আল্লাহ যে ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষায় তাঁকে ফেলেছেন তাতে কি করে তিনি ভালভাবে উত্তীর্ণ হবেন, এ চিন্তাই তাঁকে অস্থির করে রেখেছিল। গর্ভে সন্তান থাকার ব্যাপারটা না হয় এ যাবত কোনো না কোনো উপায়ে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এখন এ সন্তানকে নিয়ে যাবেন কোথায় ? মরিয়ম যে এ কথাগুলো বলেছিলেন তা পরবর্তী এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বিবাহিতা মেয়ের প্রসবকাল উপস্থিত হলে কষ্টের দরুন সে যতোই ছটফটই করুক না কেন, সে কখনো চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয় না।[১৬৪]

দোলনায় সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর কথা বলা

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۚ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝ يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ مَاكَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝ (مريم : ٢٨-٢٧)

"সে যখন বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নিজের লোকজনের কাছে এলো তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে মরিয়ম ! তুমি এ কোত্থেকে নিয়ে এলে ? হে হারুনের বোন ! না তোমার বাপ খারাপ লোক ছিল, আর না তোমার মা চরিত্রহীনা ছিল।"
—(সূরা মরিয়ম ঃ ২৭-২৮)

যারা হযরত ঈসার অলৌকিক জন্ম অস্বীকার করে তাদের কাছে এর কি ব্যাখ্যা আছে যে, হযরত মরিয়ম যখন বাচ্চা কোলে নিয়ে এলেন তখন তাঁর জাতির লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে নানারূপ তিরস্কার-ভর্ৎসনা করতে লাগল কেন ?[১৬৫]

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۚ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ (مريم : ٢٩)

"মরিয়ম তার বাচ্চার দিকে ইঙ্গিত করলে লোকেরা বললো, দোলনায় শায়িত শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো।"—(সূরা মরিয়ম ঃ ২৯)

কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যাকারীগণ আয়াতটির অর্থ এরূপ করেছেন—"যে কালকের শিশু তার সাথে আমরা কি কথা বলবো ?" অর্থাৎ তাদের মতে এসব কথাবার্তা হযরত

ঈসার যৌবনকালে হয়েছে। বনী ইসরাঈলের বয়স্ক ও বুড়ো লোকেরা বলেছিল, 'যে ছেলেকে সেদিন আমরা দোলনায় পড়ে থাকতে দেখলাম তার সাথে আবার কি কথা বলব ?' কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি এবং পূর্বাপর বর্ণনা ধারা লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, মোজেযাকে এড়িয়ে চলার জন্যে এটা নিছক একটা অর্থহীন অপব্যাখ্যা মাত্র। এ অপব্যাখ্যাকারীরা আর কিছু না হোক শুধু কথাটাও ভেবে দেখলে পারতো যে, লোকরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আপত্তি জানাতে এসেছিল সেটা তার যৌবনকালে ঘটেনি, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়েই ঘটেছিল। তাছাড়া সূরা আলে ইমরানের ৪৬তম আয়াতে এবং সূরা মায়েদার ১০ম আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে ও অকাট্যভাবে বলা হয়েছে যে, এসব কথাবার্তা হযরত ঈসা যৌবনকালে বলেননি, বরং তিনি যখন সদ্য প্রসূত এবং দোলনায় শায়িত তখনই বলেছেন। প্রথম আয়াতটিতে ফেরেশতা হযরত মরিয়মকে ছেলে হওয়ার পূর্বাভাস দেয়ার সময় বলেন যে, সে ছেলে মানুষের সাথে দোলনায় থাকতেও কথা বলবে, যৌবনকালেও কথা বলবে। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ স্বয়ং হযরত ঈসাকে বলেন, তুমি দোলনায় থাকতেও মানুষের সাথে কথা বলবে, আর যৌবনকালেও বলবে।১৬৬

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ قف اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا ۝ وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ص

وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَیًّا ۝ وَّبَرًّا بِوَالِدَتِیْ ز وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ۝

"শিশু বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দাহ। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, নবী বানিয়েছেন এবং কল্যাণময় বানিয়েছেন—তা আমি যেখানেই থাকি না কেন, আর আমাকে আজীবন নামায ও যাকাত পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাকে তিনি মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন, অত্যাচারী ও হতভাগ্য বানাননি।"
–(সূরা মরিয়ম ঃ ৩০-৩২)

এখানে পিতা-মাতার হক আদায়কারী বলা হয়নি, শুধু মায়ের হক আদায়কারী বলা হয়েছে। এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসার বাপ ছিল না। কুরআনের সর্বত্র তাঁকে মরিয়মের ছেলে ঈসা বলে উল্লেখ করাও এর আর একটি অকাট্য প্রমাণ।১৬৭

وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝ (مریم : ۳۳)

"আমি যেদিন জন্মেছি, যেদিন মরবো এবং যেদিন আবার জীবিত হব, সবসময়ে আমার ওপর শান্তি।"–(সূরা মরিয়ম ঃ ৩৩)

এ হল সেই 'নিদর্শন' যা হযরত ঈসা (আ)-এর সত্তার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের সামনে পেশ করা হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে তাদের অবিরাম দুষ্কর্মের জন্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার আগে তাদের সংশোধনের সর্বশেষ সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন। সে জন্যে তিনি এ কৌশল অবলম্বন করলেন যে, বনী হারুনের যে ধার্মিকা মেয়েটি বায়তুল মাক্দাসে ই'তেকাফরত ছিল এবং হযরত যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছিল তাকে হঠাৎ কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী করে দিলেন। তারপর সে যখন বাচ্চা কোলে নিয়ে হাযির হবে তখন গোটা জাতির মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সবার দৃষ্টি তার ওপরে পড়বে। এ কৌশলের ফলে হযরত মরিয়মকে ঘিরে মানুষের ভিড় জমে উঠল তখন তিনি সেই সদ্যপ্রসূত শিশুকে দিয়ে কথা বলালেন—যাতে করে সেই শিশু বড় হয়ে

যখন নবুয়াত লাভ করবে তখন যেন জাতির হাজার হাজার লোক এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে বিদ্যমান থাকে যে, তারা ঐ শিশুর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার এক বিস্ময়কর মোজেযা দেখতে পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও যখন জাতি তার নবুয়াত অস্বীকার করবে এবং তাকে অনুসরণের পরিবর্তে অপরাধী সাজিয়ে শূলে চড়ানোর চেষ্টা করবে, তখন তাদেরকে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে যা দুনিয়ার অন্য জাতিকে দেয়া হয়নি।[১৬৮]

কুরআনে উল্লেখিত অন্যান্য মোজেযা

وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ج وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ج وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○(ال عمران : ٤٩)

"আর যখন সে রসূল হিসেবে বনী ইসরাঈলের কাছে এল, তখন বলল, আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সামনে মাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতি বানাই। অতপর তাতে আমি ফুঁক দিতেই আল্লাহর ইচ্ছায় পাখী হয়ে যায়। আমি আল্লাহর ইচ্ছায় জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করি এবং মৃতকে জীবিত করি। তোমরা কি খাও আর কি সঞ্চিত করে রাখ তাও আমি বলতে পারি। তোমরা যদি ঈমান আনতে চাও তাহলে এসবের মধ্যে তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৯)

নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর মোজেযাসমূহ

কুরআনকেই নবুয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ط قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ج هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○(الاعراف : ٢٠٣)

"হে নবী ! তুমি তাদের সামনে কোনো নিদর্শন (মোজেযা) পেশ না করলে তারা বলেঃ তুমি নিজের জন্যে একটা নিদর্শন বেছে নিলে না কেন ? তুমি তাদেরকে বল ঃ আমি তো শুধু সেই অহীর অনুসরণ করি যা আমার রব আমার কাছে পাঠান। এ হলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রজ্ঞার আলো, হেদায়াত ও রহমত তাদের জন্যে যারা একে গ্রহণ করে।"—(সূরা আল আরাফ ঃ ২০৩)

কাফেরদের এ প্রশ্ন ছিল স্পষ্টত বিদ্রূপাত্মক। অর্থাৎ তাদের কথার অর্থ ছিল এই ঃ 'তুমি বাপু যেমন নবী হয়ে পড়েছ তেমনি নিজের জন্যে একখানা মোজেযাও বাছাই করে নিয়ে এলে পারতে।' কিন্তু এ বিদ্রূপের কেমন মনোজ্ঞ জবাব দেয়া হয়েছে, তা লক্ষণীয়।

এ জবাবের মর্ম হলো ঃ তোমরা দাবী করলেই বা আমি নিজে প্রয়োজান বোধ করলেই একটা কিছু আবিষ্কার করে অথবা বানিয়ে দেব এমন ক্ষমতা আমার নেই। আমি

একজন রসূল মাত্র। আমার দায়িত্ব শুধু এই যে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর নির্দেশ মত কাজ করব। আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে মোজেযার পরিবর্তে কুরআন দিয়েছেন। এ দূরদৃষ্টিকারী আলোকে পরিপূর্ণ। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, একে যারা মেনে নেয় তারা জীবনের সঠিক সরল পথের সন্ধান পায় এবং তাদের সুন্দর চরিত্রে আল্লাহর রহমতের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়।[১৬৯]

নবী মুহাম্মদ (সা) আপন উদ্যোগে মোজেযা দেখাতে সক্ষম ছিলেন না

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ط -(الانعام : ٣٥)

"তথাপি (হে নবী) যদি তাদের উপেক্ষা তুমি সহ্য করতে না পার তাহলে ক্ষমতা থাকলে মাটির তলায় কোন সূড়ঙ্গ খুঁজে বের কর অথবা আকাশে একটা সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের জন্যে একটা নিদর্শন নিয়ে আসার চেষ্টা কর।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ৩৫)

নবী (সা) যখন দেখলেন যে, জাতিকে বুঝাতে বুঝাতে দীর্ঘ দিন কেটে গেল, তবু তারা পথে এলো না, তখন সময় সময় তার মনে এ আকাঙ্খা জাগত ঃ "আহা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশ পেত যার দ্বারা তাদের কুফরী ঘুচে যেতো এবং তারা আমার নবুয়াতের সত্যতা মেনে নিত।" এ আয়াতে নবীর এ আকাঙ্খারই জবাব দেয়া হয়েছে। তার মর্ম এই ঃ অধৈর্য হয়ো না। যে নিয়মে এবং যে ধারা প্রক্রিয়ায় আমি এ কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ধৈর্যের সাথে তার অনুসরণ কর। মোজেযা দিয়েই যদি কাজ নিতে হতো তাহলে তা কি আমি নিজে নিতে পারতাম না? কিন্তু আমি জানি যে, মানসিক ও নৈতিক বিপ্লব এবং যে নিষ্কলুষ তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে, সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছাবার সঠিক পথ এটা নয়। তথাপি মানুষের বর্তমান স্থবিরতা এবং তাদের কঠোর অস্বীকার-অবিশ্বাস যদি তোমার সহ্য না হয়, আর তুমি যদি মনে কর যে, এ স্থবিরতা দূর করার জন্যে কোনো স্থূল ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নিদর্শন দেখানোই দরকার তাহলে নিজেই উদ্যোগ নাও এবং ক্ষমতা থাকলে যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে অথবা আকাশে উঠে এমন কোনো মোজেযা নিয়ে আসার চেষ্টা কর যা অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে পরিণত করার জন্যে তুমি যথেষ্ট মনে কর। তবে তুমি এ আশা কর না যে, আমি তোমার এ আকাঙ্খা পূরণ করব। কেননা আমার পরিকল্পনায় এ ধরনের কোনো চেষ্টা-তদবিরের স্থান নেই।[১৭০]

নবী মুহাম্মদ (সা)–এর সবচেয়ে বড় মোজেযা কুরআন

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَافِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى○(طه : ١٣٣)

"তারা বলে যে, মুহাম্মদ তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে একটু নিদর্শন (মোজেযা) নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্বতন গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি।"–(সূরা ত্বাহা ঃ ১৩৩)

অর্থাৎ এটা কি একটা ছোট-খাট মোজেযা যে, তাদেরই একজন নিরক্ষর লোক এমন একখানা কিতাব পেশ করেছেন যাতে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার নির্যাস সন্নিবেশিত রয়েছে ? মানুষকে সৎপথে চালিত করার জন্যে ওসব কিতাবে যা কিছু ছিল তা যে এ কিতাবে শুধু সন্নিবেশিত হয়েছে, তা-ই নয়, বরং তা এত সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে যে, একজন মরুচারী বেদুঈনও তা বুঝতে পারে ও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে।[১৭১]

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝ وَقَالُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ (العنكبوت : ٤٨-٥١)

"(হে নবী!) তুমি ইতিপূর্বে না কোনো বই পড়তে আর না আপন হাত দিয়ে লিখতে। পড়তে লিখতে পারলে বাতিলপন্থী লোক সন্দেহে পড়তো। আসলে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের মনে এ উজ্জ্বল নিদর্শনগুলো রয়েছে। যালেমরা ছাড়া আর কেউ আমার নিদর্শন অবিশ্বাস করে না। তারা বলে ঃ এ লোকটার ওপর তার প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শনসমূহ (মোজেযা) অবতীর্ণ করা হয়নি কেন ? তুমি বল ! নিদর্শনসমূহ আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি শুধু পরিষ্কার ভাষায় সাবধানকারী। তাদের জন্যে এ নিদর্শন কি যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি যা পড়ে পড়ে তাদেরকে শোনানো হচ্ছে ? বস্তুত আসলে এতে রয়েছে করুণা ও উপদেশ তাদের জন্যে যারা ঈমান আনে।"–(সূরা আল আনকাবূত ঃ ৪৮-৫১)

এ আয়াতগুলোতে যে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তার মূল কথা এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন নিরক্ষর। তাঁর প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রীয় লোকজন তাঁকে জন্ম থেকে যৌবন পর্যন্ত দেখেছে এবং তারা এ কথা ভাল করেই জানত যে, তিনি সারা জীবনে না কোনো বই পড়েছেন আর না কখনো কলম হাতে নিয়েছেন। এ বাস্তব অবস্থার উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, এ নিরক্ষর মানুষটির মুখ দিয়ে পূর্বতন আসমানী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা, পূর্বতন নবীদের জীবন বৃত্তান্ত, সাবেক ধর্মসমূহের আকীদা ও বিশ্বাস, আদিম জাতিসমূহের ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও চারিত্রিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ওপর যে ব্যাপক ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অভিব্যক্তি ঘটছে তা তিনি অহী ছাড়া আর কোনো পন্থায় অর্জন করতে পারেন না। তিনি যদি লেখাপড়া জানতেন এবং লোকেরা তাঁকে বই পুস্তক পড়তে ও জ্ঞান-গবেষণা করতে দেখতো তাহলে হয়তো অবিশ্বাসীদের সন্দেহের কিছুটা অবকাশ থাকত। তাঁরা ভাবতে পারতো যে, তাঁর এ জ্ঞানসম্ভার অহীর পরিবর্তে নিজস্ব চেষ্টা-সাধনা দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর নিরক্ষরতা লেশমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ রাখেনি। এরপর নিরেট হঠকারিতা ছাড়া নবুয়াতকে অস্বীকার করার পেছনে আর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।[১৭২]

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের মত গ্রন্থ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর নাযিল হওয়াটাই এত বড় মোজেযা যে, তাঁর রসূল হওয়ার ওপর বিশ্বাসস্থাপন করার জন্যে তা যথেষ্ট। এরপর আর কোনো মোজেযার প্রয়োজনই থাকে না। অন্যান্য মোজেযাও কেবল তাদেরই জন্যে মোজেযা যারা তা দেখেছিল। কিন্তু কুরআন এমন কালজয়ী ও চিরন্তন মোজেযা, যা সবসময় মানুষের সামনে রয়েছে, তাদের কাছে পড়ে শুনানো হয় এবং সবসময় তারা তা দেখতেও পারে।[১৭৩]

নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বস্তুগত মোজেযার পরিবর্তে জ্ঞানগত মোজেযা দেয়ার কারণ

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ط

"এমন কোনো কুরআন যদি নাযিল করা হতো যার জোরে পাহাড় চলতে আরম্ভ করে দিত, পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যেত অথবা মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বেরিয়ে কথা বলা শুরু করে দিত, তাহলেই বা কি লাভ হত ?"–(সূরা আর রা'আদ ঃ ৩১)

এ আয়াত বুঝবার জন্যে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এতে কাফেরদের সাথে নয় মুসলমানদের সাথে কথা বলা হয়েছে। মুসলমানরা কাফেরদের পক্ষ থেকে বারংবার মোজেযার দাবী শুনে অস্থির হয়ে উঠতেন এবং মনে মনে বলতেন, ওদের বিশ্বাস জন্মানোর মতো কিছু মোজেযা দেখিয়ে দেয়া হলে কতই না ভাল হতো। এ ধরনের কোনো নিদর্শন না আসার কারণে কাফেরগণ সাধারণ মানুষের মনে নবীর নবুয়াত সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে এটা যখন তাঁরা অনুভব করতেন তখন তাঁদের অস্থিরতা ও উদ্বেগ আরো বেড়ে যেত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে যে, কুরআনের কোনো সূরার সাথে সাথে হঠাৎ করে এ জাতীয় কোনো নিদর্শনও যদি দেখান হতো, তাহলে কি সত্যিই তারা ঈমান আনত বলে তোমরা মনে কর ? তোমরা কি তাদের সম্পর্কে এতই আশাবাদী যে, তারা সত্যদ্বীন গ্রহণ করার জন্যে একেবারে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে, শুধু একটা প্রকাশই বাকী রয়েছে ? কুরআনের শিক্ষায়, বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনাবলীতে নবীর নিষ্কলুষ জীবনে এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনের বিপ্লবী পরিবর্তনে যারা সত্যের আলোর দর্শন পেল না, তোমরা কি ভেবেছ যে তারা পাহাড় চালিত হওয়া, পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়া এবং মৃত ব্যক্তিদের কবর থেকে বেরিয়ে আসার মধ্যে কোনো আলোক রশ্মির সন্ধান পাবে।"*[১৭৪]

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ○(الشعراء : ٤)

"আমি ইচ্ছা করলে আসমান থেকে এমন নিদর্শন নামিয়ে দিতে পারি যার সামনে তাদের মাথা নুয়ে পড়বে।"–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ৪)

অর্থাৎ সকল কাফেরকে ঈমান আনতে ও আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য করে এমন কোনো নিদর্শন নাযিল করে দেয়া আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ নয়। তিনি যে

* এ আলোচনার অর্থ এ নয় যে, নবী মুহাম্মদ (স)-এর পক্ষ থেকে কোনো মোজেযা প্রকাশ পায়নি। সময়ে সময়ে অনেক মোজেযাই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এগুলো বিরোধীদের ঈমান আনার জন্যে নবুয়াতের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি।–(সংকলকবৃন্দ)

এমন করছেন না তার কারণ এ নয় যে, এ কাজ তাঁর ক্ষমতার বহির্ভূত। আসলে লোকদের এ ধরনের বাধ্যতামূলক ঈমান তাঁর বাঞ্ছিত নয়। তিনি চান লোকেরা নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে আল্লাহর কিতাবে, বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র এবং স্বয়ং তাদের মধ্যে যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তার সাহায্যে সত্যকে উপলব্ধি করুক। তারপর যখন তাদের মন সাক্ষ্য দেবে যে, নবীগণ যা বলেছেন আসলে সেটাই সত্য আর তার বিপরীত যতসব আকীদা-বিশ্বাস ও রীতি-পদ্ধতি চালু রয়েছে তা সবই বাতিল ও অসত্য, তখন তারা জেনে-বুঝে বাতিলকে ত্যাগ করে সত্যকে অবলম্বন করবে। এভাবে স্বেচ্ছায় ঈমান আনা, বাতিলকে বর্জন করা এবং সত্যের অনুসরণ করাই এমন কাজ যা আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে দাবী করেন। এ কারণেই তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দান করেছেন। এ কারণেই তিনি মানুষকে এ স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, সে ইচ্ছা করলে সঠিক অথবা ভ্রান্ত যে কোনো একটা পথ গ্রহণ করতে পারে। এ কারণেই তিনি মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ এ উভয় প্রবণতাই দান করেছেন। পাপ ও পুণ্য উভয়ের পথই তার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। শয়তানকে ধোঁকা দেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সঠিক পথ-প্রদর্শনের জন্যে নবুয়াত, অহী এবং মঙ্গলের দিকে দাওয়াতের ধারাবাহিকতা কায়েম করেছেন। মানুষকে মত ও পথ বেছে নেয়ার যাবতীয় সময়োপযোগী যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়েছেন এটা দেখার জন্যে যে, সে কুফরী ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে, না ঈমান ও আনুগত্যের পথ। মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যে বাধ্য করে এমন কোনো ব্যবস্থা যদি আল্লাহ গ্রহণ করতেন তাহলে এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। ঈমান আনতে মানুষকে বাধ্য করাই যদি তাঁর ইচ্ছা হত তাহলে মোজেযা দেখিয়ে বাধ্য করার কি দরকার ছিল ? আল্লাহ মানুষকে এমন স্বভাব-প্রকৃতি ও এমন গঠন দিয়ে সৃষ্টি করতে পারতেন যে, কুফরী, নাফরমানী ও পাপাচারের কোনো ক্ষমতাই তার থাকত না। ফেরেশতাদের মত মানুষও ফরমাবরদার ও অনুগত হয়েই জন্ম নিত। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ সত্যটাই তুলে ধরেছেন। যেমন ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ط اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ۝ (يونس : ٩٩)

"তোমার প্রভু যদি চাইতেন তাহলে দুনিয়ার সমস্ত অধিবাসী মুমিন হয়ে যেত। তুমি কি এখন মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে চাও ?"–(সূরা ইউনুস ঃ ৯৯)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط (هود : ١١٨-١١٩)

"তোমার প্রভু যদি চাইতেন তাহলে সকল মানুষকে একই উম্মতভুক্ত করে দিতে পারতেন। তারা তো বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে। (বিভ্রান্তি থেকে) বেঁচে যাবে শুধু তারাই যাদের ওপর তোমার প্রভুর অনুগ্রহ রয়েছে। তাদেরকে তিনি এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন।"[১৭৫]

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ۝ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (الشعراء : ٨٧)

"তারা কি কখনও পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেনি যে, কত বেশী পরিমাণে সব রকমের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদসেখানে পয়দা করেছি ? নিশ্চয়ই এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। তবুও অধিকাংশ লোক ঈমান আনবে না।"–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ৭-৮)

অর্থাৎ সত্যকে খুঁজে পেতে কারো যদি নিদর্শনের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে বেশী দূরে যেতে হবে না। এ দুনিয়ার রূপ-বৈচিত্র্যকে একটু চোখ মেলে দেখে নিলেই সে বুঝতে পারবে বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে তত্ত্ব (আল্লাহর একত্ব) নবীগণ পেশ করেছেন সেটাই সত্য, না সত্য সেসব মতবাদ যা মুশরিক ও নাস্তিকরা প্রচার করছে। পৃথিবীতে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজির এত অধিক ও বিচিত্র সমাবেশ, এগুলোর গুণাগুণে ও অসংখ্য সৃষ্টির অসংখ্য চাহিদায় যে সুস্পষ্ট মিল ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান তা দেখে একজন নির্বোধই এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, কোনো নিপুণ কুশলীর তীক্ষ্ণ কর্মকুশলতা, কোনো মহাজ্ঞানীর প্রজ্ঞা, কোনো মহাশক্তিধরের অজেয় শক্তি এবং কোনো দক্ষ স্রষ্টার সুচিন্তিত সৃষ্টি পরিকল্পনা ছাড়াই এসব আপনা আপনিই হচ্ছে। অথবা এ সমস্ত পরিকল্পনা রচনা ও বাস্তবায়নকারী কোনো এক খোদা নয় বরং বহুসংখ্যক খোদার ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বাতাস ও পানির মধ্যে এমন সুষ্ঠু সমন্বয় স্থাপিত হতে পেরেছে এবং এসব উপকরণে তৈরী উদ্ভিদরাজি ও সীমা সংখ্যাহীন রকমারি জীব-জানোয়ারের চাহিদা ও প্রয়োজনের মধ্যে এমন সামঞ্জস্য গড়ে তুলেছে। একজন বিবেকবান মানুষ হঠকারিতা ও আগে থেকে কোনো বদ্ধমূল ধারণায় যদি লিপ্ত না হয়, তাহলে এ দৃশ্য অবলম্বন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে যে, এগুলো নিশ্চয়ই খোদার অস্তিত্ব এবং একই খোদার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। এসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আর কোনো মোজেযার প্রয়োজন থাকতে পারে কি, যা না দেখলে তাওহীদের সত্যতার প্রতি মানুষ বিশ্বাসী হতে পারে না ?[১৭৬]

একটা বড় রকমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোজেযা

[গ্রন্থের 'এ' অংশটি আমাদের কাঠামো মাফিক মোজেযার দর্শন তত্ত্ব নীতিগত আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট, এতে ঘটনাবলীর দিক দিয়ে নবী করীম (সা)-এর মোজেযাসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়নি, বরং তা গ্রন্থের ঘটনাবলীর আলোচনায় স্ব-স্ব স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে শুধু চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার বিরাট মোজেযাটিকে উদাহরণস্বরূপ আলোচনায় শামিল করা হয়েছে।

এ আলোচনায় পূর্বতন নবীদের মোজেযাসমূহ কতক বিষয় প্রমাণের জন্যে উল্লেখিত হয়েছে অথবা তা উল্লেখ করে তা থেকে নীতিগত তত্ত্ব নেয়া হয়েছে।–(সংকলকদ্বয়)]

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○
وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○ (القمر : ١-٣)

"কেয়ামতের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। তাদের স্বভাব এমনই যে, যে নিদর্শনই তারা দেখুক না কেন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটা চিরাচরিত জাদু। তারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে আর প্রত্যেক ব্যাপারকে শেষ পর্যন্ত একটি পরিণতিতে অবশ্যই পৌছতে হবে।"
–(সূরা আল কামার ঃ ১-৩)

চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাবলী

চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা কুরআনের অকাট্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত। হাদীসের বর্ণনা-সমূহের ওপর এটা নির্ভরশীল নয়। তবে হাদীসের বর্ণনা থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় এবং এটা কবে ও কিভাবে ঘটেছিল তার সন্ধান মেলে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমদ, আবু উয়ানা, আবু দাউদ তায়ালেসী, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নঈম ইসফাহানী বিভিন্ন সুত্রের বরাত দিয়ে হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত হোযায়ফা, হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত যুবাইর ইবনে মোতয়েম থেকে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে তিনজন মনীষী অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হোযায়ফা ও হযরত জোবায়ের ইবনে মোতয়েম জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁরা এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী। অন্য দু'জন মনীষী এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী হতে পারেননি। কেননা তাঁদের একজনের (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) জন্মের আগে এ ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয়জন (হযরত আনাস ইবনে মালেক) এ ঘটনার সময় শিশু ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা উভয়ে সাহাবী, তাই এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী বয়স্ক সাহাবীদের নিকট থেকে শুনেই যে তাঁরা বর্ণনা করে থাকবেন সেটা নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া যায়।

বর্ণনাসমূহের সারসংক্ষেপ

এ বর্ণনাগুলোর সবক'টি একত্র করলে যে মর্ম অনুধাবন করা যায় তা নিম্নরূপ ঃ হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর আগের ঘটনা। চান্দ্রমাসের চতুর্দশীর রাত। চাঁদ সবেমাত্র উঠেছে, হঠাৎ চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গেল। তার এক টুকরো সামনের পর্বতের একপাশে এবং

অপর টুকরো অপর পার্শ্বে দেখা গেল। এক মুহূর্ত এ অবস্থায় থাকার পর আবার উভয় টুকরো একত্র হলো। নবী মুহাম্মদ (সা) তখন মিনায় অবস্থান করছিলেন। তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন, ব্যাপারটা তোমরা দেখে নাও এবং সাক্ষী থাক। কাফেররা বলল, মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে জাদু করেছে। সে জন্যে আমাদের দৃষ্টি প্রতারিত হয়েছে। অন্যান্যরা বলল, মুহাম্মদ (সা) আমাদের ওপর না হয় জাদু করেছেন, সকলের ওপর তো যাদু করতে পারেন না। বাইরের লোকেরা আসুক। তাদেরকে জিজ্ঞেস করব ঘটনাটা তারাও দেখেছে কিনা। বাইরে থেকে যখন কিছু লোক এলো তখন তারাও জানাল যে তারাও এ দৃশ্য দেখেছে।

হযরত আনাসের কোনো কোনো বর্ণনা থেকে এ ভ্রান্ত ধারণা জন্মে যে, চাঁদ দু' টুকরো হওয়ার ঘটনা দু'বার ঘটেছিল। কিন্তু প্রথমতঃ অন্য কোনো সাহাবী এ কথা বলেননি, দ্বিতীয়তঃ খোদ হযরত আনাসেরই কোনো কোনো বর্ণনায় 'মাররাতাইন' (দু'বার) এবং কোন কোনো বর্ণনায় 'ফিরকাতাইন' ও 'শিককাতাইন' শব্দ দু'টি রয়েছে। এর অর্থ হল দু' টুকরো। তৃতীয়তঃ পবিত্র কুরআনে শুধু একবার চাঁদ দু' টুকরো হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। কাজেই ঘটনাটা একবার ঘটেছে এ কথাই ঠিক। অবশ্য রসূলুল্লাহ (সা) চাঁদকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা মাত্র দু' টুকরো হওয়া এবং চাঁদের এক টুকরো তাঁর জামার ভেতর ঢুকে আস্তিন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত কিংবদন্তীগুলা একেবারেই ভিত্তিহীন।

ঘটনাটির আসল ধরন

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, এ ঘটনাটা আসলে কি ধরনের ছিল। কি কাফেরদের দাবীর প্রেক্ষিতে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়্যাতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে একটা মোজেযা ছিল? না এটা আল্লাহর ইচ্ছায় চাঁদের বুকে সংঘটিত নিছক একটা দুর্ঘটনা মাত্র? আর নবী মুহাম্মদ (সা) কি একে কেয়ামতের সম্ভাব্যতা ও আসন্নতার নিদর্শন মনে করে লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন? মুসলিম মনীষীগণের একটি দল একে নবীর একটি অন্যতম মোজেযা বলে গণ্য করেন। তাঁদের ধারণা, কাফেরদের দাবীর জবাবেই এ মোজেযা দেখান হয়েছিল। কিন্তু এ অভিমতের ভিত্তি হল হযরত আনাস থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস। তিনি ছাড়া আর কোনো সাহাবী এ বক্তব্য পেশ করেননি। ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার বলেন, "চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা যতগুলো সূত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র হযরত আনাসের হাদীস ছাড়া আর কোন হাদীসে আমি এ কথা পাইনি যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটা মুশরিকদের দাবী অনুসারে ঘটেছে।" (চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অবশ্য আবু নঈম ইসফাহানী 'দালাইলুন্নবুয়াত' নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক হাদীসে ঠিক এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছন। তবে তার সূত্র খুবই দুর্বল। বিশ্বস্ত সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে যতগুলো বর্ণনা হাদীস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে তার কোনোটাতেই এ বক্তব্য আসেনি। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস উভয়েই এ ঘটনার সময় অনুপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে যেসব সাহাবী উপস্থিত ছিলেন যথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হুযায়ফা, হযরত যোবাইর ইবনে মোতয়েম, হযরত আলী এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এদের কেউই বলেননি যে, মক্কার মুশরিকরা নবী মুহাম্মদের নবুয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে একটা কিছু নিদর্শন দেখানোর আবদার ধরেছিল এবং সে জন্যেই

তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মোজেযা দেখান হয়েছিল সবচয়ে বড় কথা এই যে, পবিত্র কুরআন নিজেও এ ঘটনাকে রেসালতে মুহাম্মদীর নিদর্শন নয়, বরং কেয়ামত আসন্ন হওয়ার নিদর্শন বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য নবী (সা) কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এ ঘটনা তার সত্যতা প্রমাণ করেছিল সে হিসেবে এ ঘটনা যে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতের সত্যতারও একটা জ্বলন্ত নিদর্শন তাতে সন্দেহ নেই।

কিছু প্রতিবাদ ও তার জবাব

এ মোজেযা নিয়ে দু' ধরনের প্রতিবাদ করা হয়েছে। প্রথমত চাঁদের মত অত বড় একটা উপগ্রহের বিদীর্ণ হয়ে দু' টুকরো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং একটি অপরটি থেকে শত শত মাইল দূরে চলে যাওয়ার পর পুনরায় একত্র হওয়া তাদের মতে কিছুতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ঃ এমন ঘটনা যদি ঘটে থাকত তাহলে এ ঘটনা সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করত, ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে তার উল্লেখ থাকত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই পুস্তকে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকত। কিন্তু এ দু'টো প্রতিবাদই মূলত ভিত্তিহীন। এর সম্ভাব্যতা নিয়ে যে বিতর্ক সেটা প্রাচীন যুগে চলতে পারত কিন্তু এ যুগে গ্রহ-উপগ্রহের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষ যেসব তথ্য জানতে পেরেছে তার ভিত্তিতে এটা সম্ভব যে একটি গ্রহের ভেতরে যে আগ্নেয়গিরি রয়েছে তার আগুন উদগীরণের ফলে সেটা ফেটে যাওয়া এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তার এক এক টুকরো এক এক দিকে ছিটকে বহুদূর পর্যন্ত চলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তারপর কেন্দ্রেরচুম্বক শক্তির দরুন টুকরোগুলো আবার পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়াও অসম্ভব নয়। এরপর দ্বিতীয় আপত্তিটার কথা ধরা যাক। এটাও এ জন্যে গুরুত্বহীন যে, এ ঘটনা আকস্মিকভাবে এক মুহূর্তের জন্যে ঘটেছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটায় সারা দুনিয়ার মানুষ চাঁদের দিকেই চেয়ে থাকবে এমন কোনো কথা ছিল না। ঘটনাটার সাথে কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি যে লোকের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হবে। আগে থেকে কোনো বিজ্ঞপ্তিও ছিল না যে, লোক তার প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় তা দেখাও সম্ভবপর ছিল না। শুধুমাত্র আরব ও তার পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতেই তখন চাঁদ উঠেছিল। আর ইতিহাস লেখার আগ্রহ ও কলাকৌশল তখনও এতটা উৎকর্ষ লাভ করেনি যে, প্রাচ্য দেশে যারা সে ঘটনা দেখেছে তারা তা লিপিবদ্ধ করে ফেলবে এবং এসব সাক্ষ্য প্রমাণ কোনো ঐতিহাসিকের হস্তগত হলে সে তা ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করবে। তথাপি মালাবারের ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সেই রাতে সেখানকার এক রাজা এ দৃশ্য দেখেছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের বইতে এবং পঞ্জিকায় এর উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন, সে প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, এর প্রযোজন শুধু তখনই হত যদি চাঁদের গতিতে তার কক্ষপথে এবং উদয়াস্তের সময়ে যদি কোনো তারতম্য দেখা দিত। সেটা হয়নি বলেই প্রাচীন যুগের জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি। সে যুগে মহাশূন্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলোও এতটা উন্নতি লাভ করেনি যে মহাশূন্যে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার প্রতি তারা লক্ষ্য রাখবে এবং সেগুলোকে প্রমাণচিত্রে সংরক্ষিত করবে।১৭৭

অধ্যায় ঃ ১০

মাসালায়ে শাফায়াত

মাসালায়ে শাফায়াতের বিভিন্ন দিক

[নবুয়াতের মর্মকথার সাথে শাফায়াতের বিষয়টি দু'কারণে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। প্রথম কারণ এই যে, নবী করীম (সা) এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা শাফায়াতের আকীদা-বিশ্বাসকে মুক্তির ঢাল মনে করত এবং বলত যে, এ কতো তারা নবী ও বুযুর্গানের আওলাদ এবং অপরদিকে দেব-দেবীদেরকে পূজা-আর্চনার দ্বারা সন্তুষ্ট করত। এসব দেবদেবী আল্লাহর দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশকারী এবং সে জন্যে তারা আল্লাহর অতি প্রিয়পাত্র। অতএব পাপের জন্যে খোদার শাস্তির ভয় অর্থহীন। কুরআন শাফায়াতের এ ধারণা খণ্ডন করেছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, কেয়ামতের দিনে আম্বিয়ে কেরাম (কিছুসংখ্যক নেক-বান্দাগণও) তাঁদের এমন কিছু অনুসারীর শাফায়াত করবেন যারা সামগ্রিকভাবে খোদার মর্জি মোতাবেক জীবনযাপন করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি করে ফেলেছেন অথবা তাদের দ্বারা গোনাহের কাজও হচ্ছিল এবং তারা বারবার অনুতপ্ত হয়ে সংশোধনের চেষ্টাও করছিল।

এ দু'টি কারণের জন্যে আমরা মনে করলাম যে, শাফায়াত প্রসঙ্গ শীর্ষক একটি অধ্যায় মৌলিক আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে মাওলানার কলম থেকে মূল্যবান কথা বেরিয়েছে।—(সংকলকবৃন্দ)।]

শাফায়াতের প্রসঙ্গটি কুরআনের একাধিক জায়গায় সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ শাফায়াত (সুপারিশ) কে করতে পারে এবং কে করতে পারে না, কোন্ অবস্থায় করা চলে, কোন্ অবস্থায় চলে না, কার জন্যে করা চলে, কার জন্যে করা চলে না, কার পক্ষে ফলদায়ক আর কার পক্ষে নয়—এসব জানা কারও পক্ষে কঠিন নয়। শাফায়াত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। এ জন্যে কুরআন এ বিষয়টি এত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, এতে কোনো রকম সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই থাকতে দেয়নি। যেমন সূরা বাকারার ২৫৫নং আয়াতে (আয়াতুল কুরসীতে) বলা হয়েছে ঃ

لَهُ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط مَنْ ذَالَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط

"আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছু কেবল তাঁরই। আল্লাহর সামনে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে এমন কে আছে?"

يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج

"মানুষের কাছে যা দৃশ্যমান এবং যা অদৃশ্য সবই তিনি জানেন। আর আল্লাহর জানা বিষয়সমূহের কোনোটাই তাদের জ্ঞানের আওতায় আসতে পারে না। তবে তিনি স্বয়ং কাউকে কিছু জানাতে চান তো সে আলাদা কথা।"

আল্লাহর ওপর কারও প্রভাব খাটে না

মুসলিম মনীষী, ফেরেশতা এবং অন্যান্য সত্তা সম্পর্কে মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর দরবারে তারা খুব প্রভাবশালী। যে বিষয় নিয়ে তাঁরা বেঁকে বসেন তা না করিয়ে ছাড়েন না এবং আল্লাহর কাছ থেকে যা খুশী তাই আদায় করতে পারেন। উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশে তাদের এ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, প্রভাব

খাটানো তো দূরের কথা, বড় বড় নবী এবং ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাও বিশ্বজগতের সেই বাদশাহের সামনে বিনা অনুমতিতে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস রাখেন না।[১৭৮]

দ্বিতীয়াংশে যে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে তা দ্বারা শিরকের ভিত্তির ওপর আরো একটা আঘাত হানা হয়েছে। প্রথমাংশে আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ ও সীমাহীন কর্তৃত্ব-প্রভুত্বের এবং সর্বময় এখতিয়ারের ধারণা পেশ করে বলা হয়েছিল যে, তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে কেউ যেমন প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার নয়, তেমনি সুপারিশের মাধ্যমে তাঁর সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করার শক্তিও কারোর নেই। এখন আর একদিক দিয়ে বলা হচ্ছে যে, অন্য কেউ তার কাজে হস্তক্ষেপ করবেই বা কেমন করে ? কারণ তাদের তো বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা ও তাঁর গূঢ় রহস্য সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টি সকলেরই জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কারো দৃষ্টি বিশ্বজগতের সকল তত্ত্বের ওপর পরিব্যাপ্ত নয়। তারপর যদি কোনো ছোটখাট ব্যাপারে কোনো লোকের স্বাধীন হস্তক্ষেপ বা অটল সুপারিশ চলতে দেয়া হয় তাহলে জগতের সমস্ত শৃঙ্খলাই বিনষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার কথা দূরে থাক, বান্দা নিজের ভাল-মন্দই বুঝবার যেগ্যতা রাখে না। তার ভাল-মন্দও বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পরিচালকই পুরোপুরি জানেন। তখন তাঁর দেয়া বিধান ও নির্দেশের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই।[১৭৯]

শাস্তিযোগ্য লোকদের জন্যে কোনো সুপারিশ নেই

সূরা আনআমে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰؤُا ط لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّاكُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ○ (الانعام : ٩٤)

"এবং এখন আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সেসব সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে তাদেরও কিছু ভূমিকা আছে ? তোমাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যাদের ধারণা করেছিলে তারা তোমাদের থেকে সরে পড়েছে।"

এ সূরার অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْذِرْبِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ○ (الانعام : ٥١)

"(হে মুহাম্মদ!) তুমি এই (অহী ভিত্তিক জ্ঞান) দ্বারা সেইসব লোককে উপদেশ দাও যারা আল্লাহর কাছে হাযির হওয়ার ভয়ে ভীত থাকে সেখানে এমন অবস্থায় হাযির হতে হবে যখন সেখানে তিনি ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না। এতে করে হয়ত বা তারা (সাবধান হয়ে) খোদা ভীরুতার পথ অবলম্বন করবে।"
–(সূরা আল আনআম ঃ ৫১)

এর মর্ম এই যে, যারা দুনিয়ার ভোগবাদী জীবনে এমনভাবে মত্ত রয়েছে যে, তাদের মৃত্যুর ভাবনাও নেই এবং একদিন খোদাকে মুখ দেখাতে হবে তাও তাদের মনে নেই তাদের তো এ উপদেশে কখনও কোনো কাজ হবে না। অনুরূপভাবে যারা ভাবে যে, দুনিয়ায় আমরা যা ইচ্ছে করতে পারি, আখরাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, কেননা অমুক আমাদের সুপারিশ করবে, অমুক আমাদের সাহায্য করবে বা অমুক আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দিয়ে গেছে, তাদেরও এ উপদেশে কোনো লাভ হবে না।[১৮০]

সূরা আল আরাফে বলা হয়েছে ঃ

فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط

"(আখেরাতে তারা বলবে) এখন কি আমরা কোনো সুপারিশকারী পাব যারা আমাদের স্বপক্ষে সুপারিশ করবে ? তা না হলে আমাদের আবার ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমরা আগে যেসব কাজ করতাম তার বদলে অন্য রকম কাজ করে দেখাব।" –(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৩)

সূরা ইউনুসে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ ○

"তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করার অধিকারী কেউ নেই। ইনিই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতএব তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদাত কর। এখনও কি তোমরা সাবধান হবে না ?"–(আয়াত ঃ ৩)

একই সূরায় আরো বলা হয়েছে ঃ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ط قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لاَيَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِى الْاَرْضِ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○(يونس : ١٨)

"তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সব সত্তার পূজা-অর্চনা করে যারা তাদের লাভ-ক্ষতি কিছুই করতে পারে না এবং বলে যে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশ করবে। হে মুহাম্মদ! তুমি তাদেরকে বল, আসমান ও জমীনের কোথাও যে জিনিসের অস্তিত্ব আল্লাহর জানা নেই সেই জিনিসের কথাই কি তোমরা তাঁকে জানাতে চাও ? তারা যে শিরক করছে আল্লাহ তার থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধে।"–(সূরা ইউনুস ঃ ১৮)

কোনো জিনিস আল্লাহর অজানা থাকার অর্থ হল সে জিনিসের আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। কেননা যত জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে তার সবই আল্লাহর জানা। কাজেই এখানে খুবই সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গীতে সুপারিশকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, আকাশে বা পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে সুপারিশ করার কেউ আছে বলে আল্লাহ তায়ালার তো জানাই নেই। অতপর তোমরা তাঁকে কোন্ সুপারিশকারীদের কথা জানাচ্ছ ?[১৮১]

সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ط (المؤمن : ١٨)

"অন্যায় আচরণকারীদের জন্যে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকবে না এবং থাকবে না কোনো সুপারিশকারী যার কথা শোনা হবে।"–(সূরা মু'মিন ঃ ১৮)

শাফায়াত বা সুপারিশ সম্পর্কে কাফেরদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্যে এ কথা বলা হয়েছে। আসলে তো অপরাধী লোকদের জন্যে সেখানে কোনো শাফায়াতকারী থাকবেই না। কেননা শাফায়াত করার অনুমতি যদি আদৌ পাওয়া যায় তবে তা আল্লাহর প্রিয় ও নেককার বান্দাগণই পাবেন। আর আল্লাহর এসব নেককার বান্দাহ ফাসেক-বদকার লোকদের বন্ধু হতে পারেন না এবং তাদেরকে বাঁচাবার জন্যে সুপারিশ করার কথা তাঁরা চিন্তাও করবেন না। তথাপি কাফের, মুশরিক ও পথভ্রষ্ট লোকেরা যেহেতু সাধারণভাবে বিশ্বাস করে থাকে যে, তারা যেসব সাধু-সজ্জনকে ভক্তি করে ও মানে তারা কোনো মতেই তাদেরকে দোযখে যেতে দেবে না। তারা পথ আগলে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে মাফ করিয়েই ছাড়বে। তাই বলা হচ্ছে যে, সেখানে এমন কোনো সুপারিশকারীই থাকবে না যার সুপারিশ আল্লাহকে মানতে হবে।[১৮২]

সুপারিশের জন্যে অনুমতির প্রয়োজন

সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ○ (مريم : ٨٧)

"সে সময় কেউ সুপারিশ করতে সমর্থ হবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি করুণাময়ের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছে তার কথা আলাদা।"–(সূরা মরিয়ম ঃ ৮৭)।

এর এক অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি অনুমতি পাবে কেবল তার জন্যেই সুপারিশ করা চলবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি অনুমতি লাভ করবে কেবলমাত্র সে-ই সুপারিশ করতে পারবে, অন্য কেউ নয়। আয়াতটির বাচনভঙ্গী এমন যে, উভয় অর্থেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

যে ব্যক্তি করুণাময়ের কাছ থেকে অনুমতি পাবে কেবল তার জন্যেই সুপারিশ করা চলবে—এ কথার তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি ঈমান এনে ও আল্লাহর সাথে কিছুটা সম্পর্ক বজায় রেখে নিজেকে ক্ষমার যোগ্য করে নিয়েছে, কেবলমাত্র তারই সুপারিশ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।* আর যে ব্যক্তি অনুমতি লাভ করবে, কেবলমাত্র সে-ই

* অর্থাৎ শাফায়াত আল্লাহ তায়ালার প্রতিদান আইন ও ক্ষমাবিধির আওতাভুক্ত। শাফায়াত লাভের পূর্বশর্ত এই যে, বান্দাকে আল্লাহর সামনে নিজেকে ক্ষমার যোগ্য প্রমাণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তাওবা সংক্রান্ত মূল নীতিতে ক্ষমাবিধির একটা বিধি বর্ণিত হয়েছে। সেটা হলো এই যে, যারা সারাজীবন একাধারে পাপের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে এবং তার জন্যে কোনো রকম অনুতাপ বা উৎকণ্ঠা বোধ করে না তাদের তাওবা কবুল হবে না। যারা গুনাহর কাজ করার অব্যবহিত পরেই অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং গুনাহ ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধির চেষ্টায় লিপ্ত হয় কেবল তাদেরই তাওবা কবুল হয়। তাওবার এ শর্ত যারা পূরণ করে কেবল তারাই যে শাফায়াত লাভের অধিকারী হয় সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুরূপভাবে ক্ষমাযোগ্য লোকদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ যারা বড় বড় গুনাহর কাজ ও সর্বজনবিদিত খারাপ কাজগুলো থেকে বিরত থাকে এবং কেবলমাত্র ভুলক্রমে বা অজ্ঞাতসারে যাদের ছোট ছোট পদস্খলন ঘটে। এ থেকে একজন সাধারণ মানুষও অনুমান করতে পারে যে, সে ক্ষমা ও শাফায়াতের অধিকারী হতে পারবে কিনা। তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) কতকগুলো খারাপ কাজের উল্লেখ করে নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা এসব কাজ করবে আমি তাদের জন্যে সুপারিশ করবো না।–(সংকলকদ্বয়)

সুপারিশ করতে পারবে—এ কথার অর্থ এই যে, লোকেরা যাদেরকে শাফায়াতকারী বা সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে, তারা সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। বরং আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন কেবলমাত্র সে-ই সুপারিশ করার জন্যে মুখ খুলতে পারবে।[১৮৩]

সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَئِذٍ لَّاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ○ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ○ (طه : ١٠٩-١١٠)

"করুণাময় যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং যার কথা শোনা পছন্দ করবেন, সে ছাড়া অন্য কারো শাফায়াত ফলবতী হবে না। তিনি মানুষের আগের ও পেছনের সব অবস্থা জানেন। অন্যরা সেটা পুরোপুরি জানে না।"–(সূরা ত্বা-হা ঃ ১০৯-১১০)

প্রথম আয়াতটির দু' অর্থ হতে পারে ঃ প্রথমত, অনুবাদে যে অর্থ ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, "করুণাময় আল্লাহ যার জন্যে শাফায়াতের অনুমতি দেবেন এবং যার সম্বন্ধে কথা শোনা পছন্দ করবেন সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কারও জন্যে শাফায়াত ফলবতী হবে না" আয়াতের শব্দবিন্যাস এমন যে উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। আসল ব্যাপার এই যে, কেয়ামতের দিন নিজের খেয়াল-খুশী মত কথা বলা দূরের কথা, কেউ টুঁ শব্দটিও করার সাহস পাবে না। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই সুপারিশ করতে পারবে যাকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষেই সুপারিশ করতে পারবে যার পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ দু'টো কথাই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط (البقرة : ٢٥٥)

"তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে এমন কে আছে ?"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫) এবং

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا ق لَّايَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

"সেই দিন যখন রূহ এবং ফেরেশতারা সকলে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে এবং কেউ কথা বলবে না, তখন কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি কথা বলতে পারবে, করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং সে যা করবে তা ঠিক ঠিক বলবে।"–(সূরা আন নাবা ঃ ৩৮)

অপরদিকে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ لا اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ○ (الانبياء : ٢٨)

"তারা কারও সুপারিশ করতে পারে না। কেবলমাত্র সেই সব লোকের জন্যে সুপারিশ করতে পারে যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে (আল্লাহ) রাজী হন এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত থাকে।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৮)

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَاتُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى ○ (النجم : ٢٦)

"আকাশে কত ফেরেশতা এমন রয়েছে যাদের সুপারিশে কোনো কাজ হয় না। অবশ্য আল্লাহর অনুমতি নিয়ে সুপারিশ করলে এবং যার জন্যে তিনি সুপারিশ শুনতে চান ও পছন্দ করেন তার জন্যে সুপারিশ করলে সে কথা স্বতন্ত্র।"-(সূরা আন নাজম ঃ ২৬)

শাফায়াতের ওপর বিধি নিষেধ আরোপের কারণ

শাফায়াতের ওপর এই বিধি নিষেধ আরোপের কারণ সূরা ত্বা-হায় বর্ণিত হয়েছে। ফেরেশতাই হোন, নবীই হোন অলীই হোন আর যিনিই হোন কারো জানা নেই এবং জানা থাকতেও পারে না যে, কার আমলনামা কি ধরনের, দুনিয়ার জীবনে কে কি করত এবং আল্লাহর আদালতে কে কি ধরনের আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে এসেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ সকলের অতীত ক্রিয়াকলাপের সার্বিক জ্ঞান রাখেন এবং এখন তার কি অবস্থা, নেককার হয়ে থাকলে কতখানি নেককার হয়েছে, পাপী হয়ে থাকলে কোন্ পর্যায়ের পাপী, ক্ষমার যোগ্য কিনা, চরম শাস্তি পাওয়ার যোগ্য না তার শাস্তি লাঘব করা যেতে পারে, না কিছু অনুকম্পা দেখানও যেতে পারে, সেসব একমাত্র আল্লাহরই সঠিকভাবে জানা রয়েছে।* এমতাবস্থায় ফেরেশতা, নবী ও নেককার লোকদেরকে সুপারিশের অবাধ স্বাধীনতা কি করে দেয়া যায় যে, প্রত্যেকে যার জন্যে যে ধরনের সুপারিশ করতে চাইবে তা করতে পারবে? একজন সাধারণ কর্মকর্তা তার ক্ষুদ্র বিভাগটিতে যদি প্রত্যেক আত্মীয় ও বন্ধুর সুপারিশ শুনতে আরম্ভ করে তাহলে দু'চার দিনেই গোটা বিভাগটার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। তাই যদি হয় তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর যিনি সর্বময় প্রভু তাঁর কাছ থেকে কিভাবে আশা করা যেতে পারে যে, তাঁর দরবারে সুপারিশের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে এবং প্রত্যেক বুযুর্গ আল্লাহর দরবারে গিয়ে যাকে খুশী ক্ষমা করিয়ে নেবে? অথচ কোনো বুযুর্গেরই জানা নেই যে, যাদের সুপারিশ তাঁরা করছেন তাদের আমলনামা কেমন। দুনিয়ায় যে অফিসারেরই কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ রয়েছে তাঁর নীতি এমন হয় যে, তাঁর কোনো বন্ধু যদি তাঁর কোনো অধীনস্থ অপরাধী কর্মচারী সম্পর্কে সুপারিশ করেন, তাহলে তিনি বলেন, "এ লোক কাজকর্মে যে কত বড় ফাঁকিবাজ, দায়িত্বহীন, ঘুষখোর এবং জনসাধারণকে সে যে কত বেশী হয়রান করে তা আপনি জানেন না। আমি তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তাই দয়া করে আপনি এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে সুপারিশ করবেন না।**

---

* অন্য কথায় বলা যায় যে, শাফায়াত মূলত এক ধরনের সাক্ষ্যদান। যে ব্যক্তির আমলনামা পেশ করা হচ্ছে, সে মোটামুটিভাবে কি ধরনের লোক ছিল, শাস্তির যোগ্য না ক্ষমার যোগ্য, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার কাজই এ দ্বারা সম্পন্ন হয়।-(সংকলকদ্বয়)

** নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর সমসাময়িক মুসলমানদেরকে এই বলে বার বার সাবধান করেছেন, "আমার পরে যারা আমার নীতি-পদ্ধতি বদলাবে তাদেরকে সেই হাউজে কাওসার থেকে হটিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে তার ধারে ঘেঁষতে দেয়া হবে না। আমি বলবো, এরা আমার অনুসারী। তখন আমাকে বলা হবে, আপনার তিরোধানের পর ওরা কি করেছে তা আপনি জানেন না। এরপর আমিও তাদের তাড়িয়ে দেবো এবং বলবো, দূর হয়ে যাও।" বহুসংখ্যক হাদীসে এ বিবরণ পাওয়া যায়।-(গ্রন্থকার) বুখারী কিতাবুর রিকাক, কিতাবুল ফিতান, মুসলিম-কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ ইবনে মাসউদ ও আবু হুরাইরার বর্ণনা, ইবনে মাজাহ কিতাবুল মানাসিক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।[১৮৫]

এ ছোট উদাহরণটা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ আয়াতে শাফায়াত সম্পর্কে যে নীতি বর্ণিত হয়েছে তা কত বিশুদ্ধ, যুক্তিসঙ্গত ও ইনসাফপূর্ণ। আল্লাহর কাছে শাফায়াতের দরজা বন্ধ হবে না। যেসব নেক বান্দা দুনিয়ায় মানুষের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদেরকে আখেরাতেও সহানুভূতি দেখানোর সুযোগ দেয়া হবে কিন্তু তাঁদেরকে সুপারিশ করার আগে অনুমতি নিতে হবে এবং যে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তাঁদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন কেবল তার জন্যেই সুপারিশ করতে পারবেন। তাছাড়া সুপারিশের জন্যেও শর্ত থাকবে যে, তা যেন সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত হয়। وقال صوابا (এবং যা বলবে তা ঠিক বলবে) আল্লাহর এই উক্তি সুস্পষ্ট করে সে কথাই বলছে। এমন অসঙ্গত সুপারিশ সেখানে করা চলবে না যে, এক ব্যক্তি দুনিয়ায় হাজার হাজার মানুষের হক মেরে এসেছে, আর একজন বুযুর্গ দাঁড়িয়ে এই বলে সুপারিশ করবেন, "হুজর! তাকে পুরস্কৃত করে ধন্য করুন।"*১৮৪

সূরা নাবায় ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّايَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

"যেদিন রূহ এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন সেদিন আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে যা বলবে তা ঠিক বলবে।"–(সূরা আন নাবা ঃ ৩৮)

এখানে কথা বলার অর্থ সুপারিশ করা। বলা হচ্ছে যে, তা করা হবে দু'টি শর্তে। প্রথমত, যে ব্যক্তিকে যে অপরাধীর জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া হবে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি তার জন্যে সুপারিশ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, সুপারিশকারী যেন সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলে। কোনো অসঙ্গত সুপারিশ যেন না করে। আর যার জন্যে সুপারিশ করবে সে যেন দুনিয়ায় অন্তত কালেমায়ে হকের স্বীকৃতিদানকারী হয়ে থাকে। অর্থাৎ শুধু সে গুনাহগার ছিল কাফির ছিল না এমন হয়।১৮৬

মুশরিকদের কল্পিত সুপারিশকারী

সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۝ (الانبياء : ٢٨)

"যা কিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, যা কিছু তাদের জ্ঞানের অগোচরে তাও তিনি জানেন। যাদের স্বপক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ রাজি তাদের ব্যতীত আর কারও সুপারিশ তারা করবে না এবং তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।"

---

* বরঞ্চ নবীগণ নিজ নিজ উম্মতের অপরাধী ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে শাস্তি দেয়ার সুপারিশই করবেন। যেমন একটি দল সম্পর্কে নবীর নিম্নরূপ উক্তি কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে।

يَارَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمِىْ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ـ

"হে আমার প্রভু ! আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল।"

মুশরিকরা দু'টো কারণে ফেরেশতাদেরকে উপাস্য মনে করত। প্রথমত, তারা তাদেরকে আল্লাহর সন্তান-সন্ততি মনে করত। দ্বিতীয়ত তাদের পূজা করে তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী বানাতে চাইতো। وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ (তারা বলত, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী ঃ সূরা ইউনুস ঃ ১৮) এবং مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এ জন্যে যে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে আমাদের সাহায্য করবে।-(সূরা জুমার ঃ ৩) এ দু' আয়াতে এ উভয় কারণ খণ্ডন করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআন শাফায়াতের মুশরিকী ধারণা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করতে গিয়ে প্রায়ই গুরুত্ব দিয়ে এ কথা বলে থাকে, "তোমরা যাদেরকে সুপারিশকারী বলে মনে কর তারা গায়েবের (অদৃশ্যের) কোনো খবর রাখে না আর আল্লাহ তাদের জানা-অজানা সব ব্যাপারই জানেন।" এ কথা দ্বারা আল্লাহ মানুষকে যে বিষয়টি বুঝাতে চান তাহলো ঃ প্রত্যেক মানুষের অতীত-ভবিষ্যত এবং গোপন-প্রকাশ্য সব ব্যাপার যখন তারা জানে না তখন সুপারিশ করার শর্তহীন ও নিরংকুশ ক্ষমতা তারা কিভাবে পেতে পারে ? এ জন্যে ফেরেশতা, নবী বা অন্য কোনো বুযুর্গ প্রত্যেকেরই সুপারিশ করার ক্ষমতা শর্তাধীন। শর্ত হল, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কারও জন্যে সুপারিশ করতে অনুমতি দেয়া। যে কোনো ব্যক্তির জন্যে আপন ইচ্ছানুসারে সুপারিশ করার অধিকার কারও থাকবে না। আর সুপারিশ শোনা বা না শোনা এবং তা কবুল করা বা না করা যখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তখন এ ধরনের ক্ষমতাহীন সুপারিশকারীদের কি অধিকার থাকতে পারে কারো পূজা-উপাসনা লাভ করার এবং প্রার্থনা ও আকুতি শোনার ?[১৮৭]

সূরা সাবায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ط -(سبا : ٢٣)

"আল্লাহ যার জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন কেবলমাত্র তার জন্যে ছাড়া আর কারও জন্যে সুপারিশ ফলদায়ক হবে না।"-(সূরা আস সাবা ঃ ২৩)

অর্থাৎ কারও স্বয়ং মালিক হওয়া, মালিকানায় অংশীদার হওয়া অথবা খোদার সহযোগী বা সহকর্মী হওয়া তো দূরের কথা, সমগ্র বিশ্বচরাচরে এমন একটি সত্তাও নেই যে, আল্লাহর দরবারে ইচ্ছা মত কারও জন্যে একটু সুপারিশ পর্যন্ত করতে পারে। তোমরা অনর্থক এ ভুল ধারণায় মত্ত হয়ে রয়েছ যে, আল্লাহর কিছু প্রিয় বা প্রভাবশালী বান্দা রয়েছে যারা একটা আবদার করে জিদ ধরলে আল্লাহ তা না মেনে পারেন না। অথচ আসলে সেখানে বিনা অনুমতিতে টু-শব্দটি করার দৃষ্টতা কেউ দেখাতে পারে না। যে অনুমতি পাবে সে-ই কিছু মিনতি জানাতে পারবে এবং যার জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি পাওয়া যাবে, সুপারিশ শুধু তার জন্যেই করা যাবে।[১৮৮]

একই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝(سبا : ٢٣)

"শেষ পর্যন্ত লোকদের মন থেকে উৎকণ্ঠা দূর হলে তারা সুপারিশকারীদেরকে জিজ্ঞেস করবে ; তোমাদের প্রভু কি জবাব দিলেন। তারা বলবে, ঠিক জবাবই দিয়েছেন। বস্তুত তিনি পরাক্রান্ত ও মহান।"–(সূরা আস সাবা ঃ ২৩)

কেয়ামতের দিন যখন কোনো সুপরিশকারী কারও জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি প্রার্থনা করবে তখন কি অবস্থাটা দাঁড়াবে, এখানে তারই একটা দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এমন একটি অবস্থা আমরা দেখতে পাই যে, অনুমতি চেয়ে আবেদন পেশ করার পর সুপারিশকারী এবং সুপারিশ প্রার্থী উভয়ে চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় অত্যন্ত ব্যাকুল ও অধীরভাবে জবাবের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। অবশেষে যখন অনুমতি এসে যায় এবং সুপারিশকারীর মুখের ভাব দেখে সুপারিশ প্রার্থী বুঝতে পারে যে, অবস্থা কিছুটা আশাব্যঞ্জক, তখন তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে আসে। সে এগিয়ে গিয়ে সুপারিশকারীকে জিজ্ঞেস করে যে, কি জবাব পাওয়া গেল ? সুপারিশকারী জবাব দেয় যে, ঠিক আছে। অনুমতি পাওয়া গেছে।*

এ বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ বুঝাতে চান যে, ওরে বেকুফের দল! যে দরবারের অবস্থা এমন তার সম্পর্কে তোমরা কেমন করে এ ধারণা পোষণ কর যে, সেখানে কেউ গিয়ে আপন ক্ষমতার জোরে তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেবে বা আল্লাহর কাছে জিদ ধরে বসবে এবং এ কথা বলার দৃষ্টতা দেখাবে যে, এরা আমার ভক্ত। এদেরকে মাফ করতেই হবে।[১৮৯]

সূরা আদ দুখানে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ (الدخان : ٤١-٤٢)

"সেদিন কোনো আত্মীয়-স্বজন অন্য আত্মীয়-স্বজনের কোনোই কাজে আসবে না। কোথা থেকে কোনো সাহায্য আসবে না। অবশ্য স্বয়ং আল্লাহ যার ওপর অনুগ্রহ করবেন তার কথা আলাদা। তিনি পরাক্রমশালী ও করুণাময়।"–(সূরা আদ দুখান ঃ ৪১-৪২)

এখানে বিচার দিনে যে আদালত বসবে তার চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। কারো সাহায্য বা সমর্থন কোনো অপরাধীর মুক্তি নিশ্চিত করতে বা তার শাস্তি লাঘব করাতে পারবে না। সেই আসল সার্বভৌমত্ব প্রভুর হাতেই থাকবে সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি যাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া কেউ ঠেকাতে সক্ষম নয় এবং যাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সাধ্যও কারও নেই। অনুকম্পা দেখিয়ে কারও শাস্তি লাঘব করা বা রহিত করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর

* কেয়ামতের দিন নবীগণ কি রকম বিনয়ের সাথে সুপারিশ করবেন তার একটা দৃশ্য সূরা মায়েদার শেষ রুকূ'তে দেখানো হয়েছে। সেখানে হযরত ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদের জন্যে কিভাবে সুপারিশ করবেন তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষ্য দেবেন। তারপর বলবেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

"তুমি যদি তাদের শাস্তি দিতে চাও, তবে তারা তো তোমার বান্দা। (শাস্তি মাথা পেতে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই) আর যদি ক্ষমা করো, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী এবং কুশলী।"–(আয়াত ঃ ১১৮) এই তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যের প্রথমাংশে শাফায়াতের মিনতির সুর রয়েছে—দাবী বা আবদার নেই।–(সংকলকদ্বয়)

ইচ্ছাধীন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্দয় হয়ে ন্যায় বিচার করেন না, বরং সদয় হয়েই ন্যায় বিচার করে থাকেন। কিন্তু কোনো বিচারে তিনি যে ফায়সালা করবেন তা অবশ্যই হুবহু কার্যকর হবে। খোদায়ী আদালতের এ চিত্র ব্যাখ্যা করার পর পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে এ আদালতে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তাদের পরিণতি কি হবে এবং যাদের সম্পর্কে প্রামণিত হবে যে, তারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে নাফরমানী থেকে বিরত থেকেছে, তাদেরকে কিভাবে পুরস্কৃত করা হবে।[১৯০]

পুত্রের জন্যে হযরত নূহ (আ)-এর দোয়া করার দৃষ্টান্ত

সূরা হুদে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে (আয়াত ৬৯ থেকে ৭৬ দ্রষ্টব্য) সেটা কুরাইশদের লক্ষ্য করেই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর হওয়ার কারণে তারা সমগ্র আরবের পীরজাদা, কা'বা শরীফের পূজারী পুরোহিত এবং ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক নেতৃত্বের মালিক হয়ে পড়েছিল। এ জন্যে তারা বেশ গর্ব-অহংকারের সাথে বলত যে, তারা যখন আল্লাহর স্নেই প্রিয় বান্দাহর বংশধর এবং তিনি যখন তাদের সুপারিশ করার জন্যে আল্লাহর দরবারে রয়েছেনই তখন তাদের ওপর আল্লাহর গযব কি করে নাযিল হতে পারে। এ মিথ্যে দর্প চূর্ণ করার জন্যে প্রথমে একটা দৃশ্য দেখান হল যে, হযরত নূহের মত একজন মহান নবী চোখের সামনে আপন কলিজার টুকরাকে ডুবতে দেখেছেন এবং অস্থির হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন যে, তাঁর ছেলেকে রক্ষা করা হোক কিন্তু এ সুপারিশে ছেলের কোনো লাভ তো হলই না, উপন্তু বাপকে পাল্টা ধমক খেতে হল। এরপর স্বয়ং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দৃশ্য দেখান হল। একদিকে তাঁর ওপর আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ এবং অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ভাষায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে আল্লাহর সেই বন্ধু (খলিল) ইবরাহীমই যখন ন্যায়বিচারে হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাঁর প্রবল কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও আল্লাহ হযরত লূতের দুষ্কৃতিকারী জাতির ব্যাপারে তাঁর সুপরিশ প্রত্যাখ্যান করেন।[১৯১]

অতপর এ সূরা হুদেই পরবর্তী এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يَاتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ج (هود : ١٠٥)

"যখন সেই (কিয়ামতের) দিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও টু-শব্দটি করার ক্ষমতা থাকবে না।"–(সূরা হুদ ঃ ১০৫)

অর্থাৎ এ আহম্মকের দল অনর্থক মিথ্যে ভরসায় জীবন কাটাচ্ছে যে, অমুক হযরত আমাদের সুপারিশ করে আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন, অমুক বুযুর্গ জিদ ধরে বসবেন এবং তার প্রতিটা ভক্তকে ক্ষমা না করিয়ে ছাড়বেন না, অমুক সাহেব আল্লাহর প্রিয়পাত্র। বেহেশেতের পথের ওপর অনড় বসে থাকবেন এবং ভক্তদের ক্ষমার পরোয়ানা না নিয়ে তিনি নড়বেন না। অথচ জিদ ধরা আর বেঁকে বসে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। যত বড় মর্যাদাশালী মানুষ বা ফেরেশতাই হোক না কেন সেখানে একটা কথা বলারও সাহস কারও হবে না। স্বয়ং সে আদালতের প্রধান বিচারপতি আল্লাহ নিজেই যদি কাউকে কিছু বলার অনুমতি দেন তাহলেই কেবল কথা বলা যাবে।*[১৯২]

* বিভিন্ন মাযার ও আস্তানায় যারা এ ভেবে নযর-নিয়ায দিয়ে থাকে যে, উক্ত মাযারে শায়িত ব্যক্তিগণ আল্লাহর দরবারে খুবই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। তাদের সুপারিশ পাওয়ার আশায় তারা নিজেদের আমলনামাকে কলুষিত করে চলেছে। কেয়ামতের দিন তাদের চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।[১৯৩]

পার্থিব জীবনে আল্লাহর কাছে সুপারিশের মুশরিকী ধারণা

সূরা নাহলে বলা হয়েছে ঃ

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ -(النحل : ٧٢)

"তবুও (এত সব দেখা ও জানা সত্ত্বেও) তারা কি বাতিলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে ?"-(সূরা আন নাহল ঃ ৭২)

মক্কার মুশরিকরা অস্বীকার করত না যে, দুনিয়ার এত সব ভোগের সামগ্রী আল্লাহরই দান। আল্লাহর এ দানের পেছনে আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল এটাও তারা অস্বীকার করত না। কিন্তু যে ভুলটা তারা করত তাহলো এই যে, এসব সম্পদের জন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে তারা এমন অনেক সত্তার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করত যাদেরকে তারা মনে করত যে, এসব সম্পদ লাভের ব্যাপারে তাদেরও হাত ছিল, অথচ এ সম্পর্কে তাদের কাছে কোনো যুক্তি-প্রমাণ ছিল না। এ আচরণকেই কুরআনের ভাষায় 'আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। দান করলেন একজনে আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হল অন্য একজনের—এটা কুরআনের দৃষ্টিতে অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। কুরআন নীতিগতভাবে এ কথাও বলছে যে, দাতা সম্পর্কে কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ চাড়াই এরূপ ধারণা করা যে, তিনি দয়াপরবশ হয়ে দান করেননি বরং অমুকের মধ্যস্থতায়, অমুকের খাতিরে, অমুকের সুপারিশে কিংবা অমুকের হস্তক্ষেপের ফলে করেছেন, তাহলে সেটাও মূলত তাঁর দান অস্বীকার করারই শামিল।

কুরআনের এ দু'টো মৌলিক শিক্ষাই সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত ও সাধারণ বিবেকসম্মত। যে কোনো ব্যক্তি সামান্য একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারে। মনে করুন, আপনি একজন বিপন্ন মানুষের ওপর দয়াপরবশ হয়ে তাকে সাহায্য করলেন, আর সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে আপনার মুখের ওপর অন্য একজনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল যার এ সাহায্যের ব্যাপারে কোনো হাতই ছিল না। হতে পারে আপনি উদারতাবশতঃ তার এ অন্যায় আচরণকে উপেক্ষা করবেন এবং ভবিষ্যতেও তাকে সাহায্য করতে থাকবেন কিন্তু মনে মনে আপনি নিশ্চয়ই বুঝে নেবেন যে, সে একজন চরম অভদ্র ও অকৃতজ্ঞ মানুষ। মনে করুন, এরপর তাকে আপনি ঐ আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, তার ধারণায় আপনি নিজের সদয়তা ও দানশীলতার কারণে তার সাহায্য করেননি, বরং সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির খাতিরে করেছেন। অথচ আসলে সে কথা সত্য নয়। এ ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয় নিজেকে অপমানিত বোধ করবেন। তার এ ধারণার এ সুস্পষ্ট অর্থ আপনার কাছে এ হবে যে, সে আপনার সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ মনোভাব পোষণ করে। আপনার সম্পর্কে তার ধারণা এই যে, আপনি কোনো দয়ালু ও দরদী মানুষ নন। বরং বন্ধু-বান্ধবদের খাতির-তোয়াজ করাই আপনার কাজ। ধরাবাঁধা কয়েকজন বন্ধুর মাধ্যমে যদি কেউ আসে, আপনি তার সাহায্য সেই বন্ধুদের মন রক্ষার খাতিরেই করেন। তা না হলে আপনি এমন লোকই নন যে, আপনার দ্বারা কারও কোনো উপকার হতে পারে।[১৯৪]

সূরা আন নাহলের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ ○ (النحل : ٨٣)

"তারা আল্লাহর দানকে জানতে পেরেও তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশ লোকই এমন যারা সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৮৩)

এখানে অস্বীকার করা দ্বারা আগে যে আচরণের উল্লেখ আমরা করেছি তাই বুঝান হচ্ছে। পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস যে আল্লাহরই দান, তা মক্কার কাফেররা অস্বীকার করত না কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ এসব জিনিস তাদের দেবতাদের খাতিরেই দিয়েছেন। এ কারণে তারা এসব দানের জন্যে আল্লাহর সাথে সাথে ঐসব মধ্যস্থ সত্তারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। এমনকি আল্লাহর চেয়েও তাদের কৃতজ্ঞতা একটু বেশী করেই জানাত। এ আচরণকেই-আল্লাহ নাশোকরী, অকৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর দানকে অস্বীকার করা প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করেছেন।[১৯৫]

সূরা আল হজ্বে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝(الحج : ٧٥-٧٦)

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ (তাঁর নির্দেশাবলী প্রেরণের জন্যে) ফেরেশতা ও মানুষ উভয়ের মধ্য থেকে দূত নির্বাচন করে থাকেন। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। তিনি মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন সবই জানেন। আর যাবতীয় বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৫-৭৬)

এর মর্ম হচ্ছে এই যে, মুশরিকগণ সৃষ্টিজগতের যেসব সত্তাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হল নবী অথবা ফেরেশতা। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তারা আল্লাহর নির্বাচিত দূত মাত্র। তাদের মর্যাদা এরচেয়ে বেশী কিছু নয়। শুধু এ মর্যাদার জন্যে তাঁরা খোদা বা খোদার অংশীদার হতে পারেন না।

'মানুষের যা গোপন এবং যা প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন' এ কথাটা কুরআন শরীফে সাধারণত শাফায়াতের মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে বলা হয়ে থাকে। এখানে এ কথা বলার মর্ম এই যে, তোমরা যদি ফেরেশতা, নবী ও পুণ্যবান মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের যাবতীয় চাহিদা পূরণকারী ও সংকট উদ্ধারকারী মনে না-ও কর, শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী ভেবেও যদি তাদের পূজা কর, তবুও ভুল। কেননা সবকিছু দর্শন ও শ্রবণ ক্ষমতার মালিক শুধু আল্লাহ। প্রত্যেকের গোপন ও প্রাকশ্য সবকিছু শুধু তিনিই জানেন। দুনিয়ার গোপন ও প্রকাশ্য কল্যাণ-অকল্যাণ কেবল তাঁরই জানা। ফেরেশতা ও নবীসহ কারও জানা নেই কখন কোন্ কাজ করা সঙ্গত এবং কখন সঙ্গত নয়। এ জন্যে আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম ও ঘনিষ্ঠতম সৃষ্টিকেও তাঁর অনুমতি ছাড়া ইচ্ছামত সুপারিশ করার অধিকার দেননি এবং তেমন কোনো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য বলেও গণ্য করেননি।[১৯৬]

সূরা যুমারে আল্লাহ বলেন ঃ

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ ط قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَايَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ۝ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

"তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী ঠিক করে নিয়েছে ? তুমি তাদেরকে বল, তাদের ক্ষমায় কিছু না থাকলেও এবং তারা কোন কিছুই বুঝতে না পারলেও কি সুপারিশ করতে পারবে ? তুমি ঘোষণা করে দাও যে, সমস্ত সুপারিশ কেবল আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব প্রভূত্বের মালিক। আবার তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"-(সূরা আয যুমার ঃ ৪৩-৪৪)

অর্থাৎ এরা নিজেরা স্বয়ং এ ধারণা করে বসে আছে যে, আল্লাহর দরবারে এমন কিছু প্রভাবশালী সত্তা থাকবে, যাদের সুপারিশ কিছুতেই অমান্য করা হবে না। অথচ কারো এ শক্তি নেই যে, আল্লাহর দরবারে কেউ স্বয়ং সুপরিশকারী হয়ে দাঁড়াবে। সুপারিশ মঞ্জুর করে নেয়া তো দূরের কথা, আর তাদের সুপারিশকারী হওয়ার কোনো দলিল-প্রমাণও নেই। আল্লাহ তায়ালাও কখনও এ কথা বলেননি যে, তাঁর কাছে তাদের এমন কোনো মর্যাদা রয়েছে। আর সে সকল সত্তাও কখনও এ দাবী করেনি যে, তাদের পূজারীদের কার্যসিদ্ধি তারা করে দেবে। অধিকন্তু তাদের বোকামি এই যে, সকল ক্ষমতার আসল মালিককে বাদ দিয়ে তারা এসব মনগড়া সুপারিশকারীকেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে নিয়েছে এবং তাদের সকল ভক্তি শ্রদ্ধা তাদের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে।[১৯৭]

সূরা আন নজমে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَاتُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْضٰى ○(النجم : ٢٦)

"আকাশে কতই না ফেরেশতা রয়েছে। তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা এমন কোন ব্যক্তির স্বপক্ষে সুপারিশের অনুমতি দিয়েছেন যার জন্যে তিনি কোন আবেদন শুনতে চান এবং পছন্দ করেন।"

-(সূরা আন নাজম ঃ ২৬)

অর্থাৎ সকল ফেরেশতা একত্র হয়ে কারো জন্যে সুপারিশ করলেও তাতে যখন ফায়দা হয় না, তখন তোমাদের এসব মনগড়া খোদার সুপারিশে ফায়দা হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহই হচ্ছেন সর্বময় ক্ষমতার মালিক। ফেরেশতারাও যতক্ষণ আল্লাহর তরফ থেকে অনুমতি না পান কোনো ব্যক্তির পক্ষে তাদের সুপারিশ শুনতে রাজি না হন ততক্ষণ সুপারিশ করার সাহস করেন না।[১৯৮]

আল্লাহর ফায়সালা কেউ রুখতে পারে না

সূরা আর-রাআদে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○(الراعد : ١١)

"এবং আল্লাহ যখন কোনো জাতির বিপর্যয় আনয়নের সিদ্ধান্ত করেন তখন তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো থাকে না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় এ জাতির কোনো সহযোগী-সাহায্যকারীও থাকে না।"-(সূরা আর রাআদ ঃ ১১)

অর্থাৎ বলা হচ্ছে, এমন ভুল ধারণায় কখনও পড়ে থেকো না যে, তোমরা যত কিছুই কর না কেন তোমাদের উপঢৌকনাদির ঘুষ খেয়ে কোনো পীর, ফকীর বা অতীত-

ভবিষ্যতের কোনো বুযুর্গ অথবা কোনো জ্বিন বা ফেরেশতা এমন শক্তির অধিকারী হবে যে, তোমাদের খারাপ কাজের পরিণাম থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে।"[১৯৯]

কোন্ ক্ষেত্রে সুপারিশের দরজা বন্ধ হয়

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (التوبة : ٨٠)

"হে নবী! তুমি এসব লোকের (মুনাফেকদের) জন্যে ক্ষমা চাও বা না চাও—তুমি যদি তাদের জন্যে সত্তর বারও ক্ষমা চাও—তথাপি আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে মুক্তির পথ দেখান না।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৮০)

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○(المنافقون : ٦)

"হে নবী! তুমি এদের (মুনাফেকদের) জন্যে ক্ষমা চাও বা না চাও, তাদের জন্যে সবই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে কখনও সঠিক পথ দেখান না।"–(সূরা আল মুনাফেকুন ঃ ৬)

এ কথাটা প্রথমে সূরা মুনাফেকুনে নাযিল হয়। এর তিন বছর পর সূরা তাওবায় একই কথা আরো জোর দিয়ে বলা হয়।

"এতে আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে মুনাফেকদের সম্পর্কে বলছেন, 'তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা চাও বা না চাও এমনকি তুমি যদি তাদের জন্যে সত্তর বারও ক্ষমা চাও, তবুও আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন না। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের সাথে কুফরি করেছে। আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন না।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৮০)

একই সূরায় কিছু দূর গিয়ে আবার আল্লাহ বলেন, "ওদের কেউ মারা গেলে তার জানাযার নামায কখনও পড় না। এমনকি তার কবরের ওপরও দাঁড়িও না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরি করেছে এবং নাফরমান থাকা অবস্থাতেই মরেছে।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৮৪)*[২০০]

এ আয়াতে দু'টো বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছে। প্রথমত, গুনাহ মাফ করার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা হলে তা কেবল হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের বেলায়ই ফলদায়ক হতে পারে। যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ থেকে সরে যায় এবং ফাসেকী ও নাফরমানীর পথ

* কুরআনের এসব আয়াত এবং আরও কিছু আয়াত থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলো এই যে, নবী পাক (সা)-এর ভাষায় এ কথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিনে কোন্ ধরনের লোকের জন্যে এবং কোন্ কোন্ কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্যে কোনো সুপারিশই ফলপ্রসু হবে না। বিভিন্ন হাদীস এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। এ সত্যের আলোকে শাফায়াতের ঐসব প্রচলিত ধারণার কোনোই মূল্য থাকে না—যার প্রভাবে মানুষ উদাসীন হয়ে ইবাদাত পরিত্যাগ করে, দ্বীনের নির্দেশণাবলী থেকে বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং মনের ইচ্ছামতো পাপে লিপ্ত হয়।–(সংকলকদ্বয়)

অবলম্বন করে তার জন্যে কোনো সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা স্বয়ং আল্লাহর রসূলও যদি ক্ষমা চান তবুও ক্ষমা করা হবে না। দ্বিতীয়ত, যারা সত্য ও সঠিক পথে চলতে চায় না, আল্লাহ সে পথ তাদের জন্যে সুগম করেন না। কোনো বান্দা নিজেই যদি সঠিক পথ থেকে সরে যায়, এমনকি তাকে সে পথের সন্ধান দিলেও এবং সেদিকে ডাকা হলেও সে যদি অহংকারের সাথে মাথা উঁচু করে সে ডাক প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আল্লাহর কি দারকার পড়েছে যে, তার পেছনে পেছনে হেদায়াত নিয়ে ঘুরবেন এবং তাকে সৎ পথে আসার জন্যে খোশামোদ করবেন ?[২০১]

হাশরের দিন শাফায়াতকারী হিসেবে নবী মুহাম্মদ (সা)

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে শাফায়াতের ইসলাম সম্মত বিধান এই যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি সুপারিশ করতে পারবেন যাঁকে সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার আল্লাহ স্বয়ং দেবেন আর যার স্বপক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি আল্লাহ দেবেন, কেবলমাত্র তার সপক্ষেই সুপারিশ করা চলবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো লক্ষণীয় ঃ

يَوْمَئِذٍ لَّاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلاً (طه : ١٠٩) لاَتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ ـ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ـ(البقرة : ٢٥٥)

এ বিধান অনুযায়ী নবী মুহাম্মদ (সা) আখেরাতে অবশ্যই শাফায়াত বা সুপারিশ করবেন। তবে এ শাফায়াত তিনি করবেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং সেইসব খোদাভীরু ঈমানদার লোকের জন্যে যাঁরা যথাসাধ্য নেক কাজ করতে সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে বদ কাজ ও অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার কাজে লিপ্ত লোকেরা এবং যারা কখনও আল্লাহকে ভয় করে না তারা নবীর শাফায়াতের যোগ্য নয়। হাদীসে নবী পাকের একটি দীর্ঘ ভাষণ বর্ণিত হয়েছে। অন্যের অর্পিত সম্পদ আত্মসাৎ করা যে কত বড় ভয়ংকর অপরাধ তা তিনি উক্ত হাদীসে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন পরের সম্পদ আত্মসাৎকারীরা সে সম্পদের বোঝা ঘাড়ে করে হাজির হবে এবং আমাকে ডেকে বলবে, يارسول الله اغثنى "হে আল্লাহর রসূল (সা)! আমাকে উদ্ধার করুন।" কিন্তু আমি তার জবাবে বলব, لااملك لك شيئًا قد ابلغتك "আমি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারব না। আমি তোমার কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম ?"–(মিশকাত বাবে কিসমাতুল গানায়েম আল-গলুলোফীহা)[২০২]

অধ্যায় ঃ ১১

ভবিষ্যদ্বাণী

নবী পাকের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)-এর পক্ষ থেকে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যা সত্যে পরিণত হয়। অবশ্যি অনেক সময় তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হতে বেশ বিলম্ব হয় এবং বাহ্যত যেসব অবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তা দেখে অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, এসব প্রতিফলিত হবে।

সত্য ভবিষ্যদ্বাণী নবুওয়াতের নিদর্শনের শামিল এবং একদিক দিয়ে তার মধ্যে অলৌকিকত্বের রং দেখতে পাওয়া যায়। গণক ও হস্তরেখাবিদগণ যাকিছু বলেন তার কিছুটা কোনো কোনো সময়ে কোনো আকারে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু নবীগণের পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী খোদার দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে করা হয় বলে তা পরিপূর্ণরূপে সত্যে পরিণত হয়।

নবী পাক (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এমন যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসে সংরক্ষিত আছে। তার মধ্যে যতগুলো আমরা গ্রন্থকারের প্রবন্ধাদি থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা-ই এখানে সংযোজিত করা হয়েছে।–(সংকলকবৃন্দ)

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

উজ্জ্বল ভবিষ্যত

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰىؕ (الضحى : ٤)

"আগের থেকে পরের সময়কালটা তোমার জন্যে অবশ্যই ভাল হবে।"

–(সূরা আদ দোহা ঃ ৪)

আল্লাহ তায়ালা নবী (সা)-কে এ সুসংবাদ এমন সময়ে দিয়েছিলেন—যখন মুষ্টিমেয় লোক তাঁর সাথে ছিলেন। গোটা জাতি ছিল তাঁর বিরোধী। বাহ্যত সাফল্যের কোনো দূরতম লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না। ইসলামের প্রদীপ মক্কাতেই টিম্ টিম্ করে জ্বলছিল। তা নিভিয়ে দেয়ার জন্যে চারদিকে ঝড় বইছিল। সে সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেন, এ প্রাথমিক অবস্থায় যে বাধা-বিপত্তি আসছে তাতে দমে যাবে না। পরবর্তী সময়কালটা এখন থেকে ভাল প্রমাণিত হবে। তোমার মান-সম্মান ও মর্যাদা সর্বদা বাড়তেই থাকবে এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করতে থাকবে। আর এ ওয়াদা শুধু দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে এ ওয়াদাও করা হচ্ছে যে, আখেরাতে যে মর্যাদা তোমার হবে তা দুনিয়ার মর্যাদা থেকে অনেক গুণে বেশী।

তাবারানী "আওসাতে' এবং বায়হাকী 'দালায়েলে' ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত নকল করেছেন, নবী (সা) বলেন ঃ আমার পরে আমার উম্মত যেসব সাফল্যের অধিকারী হবে তা সবই আমার সামনে পেশ করা হয়। তাতে আমি সন্তুষ্ট হই। অতপর আল্লাহ তায়ালা এ এরশাদ করেন, আখেরাত তোমার জন্যে দুনিয়া থেকে ভাল হবে।[২০৩]

দ্বীন বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىؕ (الضحى : ٥)

"শীগ্‌গীর তোমার প্রভু তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে।"

অর্থাৎ দিতে যদিও কিছুটা বিলম্ব হবে—কিন্তু সে সময় বেশী দূরে নয় যখন তোমার প্রভু তোমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন এবং তুমি তাতে পরিতৃপ্তি লাভ করবে। এ প্রতিশ্রুতি নবীর জীবনেই এভাবে পালিত হয় যে, আরবের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের শাম সীমান্ত ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। আরব ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এ ভূখণ্ডটি আইন-শৃঙ্খলার অধীন হয়ে পড়ে। যে শক্তিই এর সংঘর্ষে এসেছে সে-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। যে দেশে মুশরিক ও আহলে কিতাবগণ তাদের মিথ্যা বাণী সমুন্নত রাখার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তার সর্বত্র কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' গুঞ্জরিত হলো। মানুষের মস্তকই শুধু অবনত হলো না, তাদের হৃদয় মনও বশীভূত হলো। তাদের আকীদা-বিশ্বাসে, কাজে-কর্মে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হলো। জাহেলিয়াতের আঁধারে আচ্ছন্ন একটি জাতি মাত্র তেইশ বছরে এমনভাবে বদলে গেল যে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। তারপর নবী পাক (সা)-এর

প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন এতটা শক্তি অর্জন করলো যে, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে তা ছড়িয়ে পড়লো। অতপর দুনিয়ার প্রতিটি কোণে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করলো। এসব কিছু তো আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে দুনিয়ার বুকেই দিলেন। আর আখেরাতে যা দিবেন তা ধারণার অতীত।[২০৪]

এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ যে, একটা অজ্ঞ-অসভ্য জাতির মধ্যে তিনি এমন এক মহান নবী পয়দা করলেন যাঁর শিক্ষা ও পথনির্দেশ এতটা বিপ্লবাত্মক এবং বিশ্বজনীন আদর্শের ধারক-বাহক যে, সমগ্র মানব জাতি মিলে একটি মাত্র উম্মত বা দল হতে পারে। তারপর হর-হামেশা সেই আদর্শ থেকে পথনির্দেশ পেতে পারে। কোনো ভুয়া বা কপট ব্যক্তি যতোই চেষ্টা করুক না কেন, এ মর্যাদা কিছুতেই লাভ করতে পারে না। আরবের মতো অনুন্নত দেশ তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোনো বিরাট জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিরও এমন সাধ্য ছিল না যে, একটা জাতির আকৃতি-প্রকৃতি এভাবে একেবারে পাল্টে দিতে পারতো এবং তারপর এমন এক সার্বিক আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতো যার ভিত্তিতে গোটা মানব গোষ্ঠী একটি মাত্র উম্মতে রূপান্তরিত হয়ে একটি জীবন বিধান (দ্বীন) ও একটি সভ্যতার বিশ্বজনীন ব্যবস্থা চিরদিনের জন্যে পরিচালনা করতে সক্ষম হতো। এ একটি মোজেযা যা আল্লাহর কুদরতে সংঘটিত হয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাঁর সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী জ্ঞানের ভিত্তিতে যে ব্যক্তি, দেশ বা জাতিকে তিনি চান এ কাজের জন্যে মনোনীত করেন। এর জন্যে যদি কেউ মনে পীড়া বোধ করে তা করুক তাতে কিছু যায় আসে না।[২০৫]

উৎকৃষ্ট যুগের নিশ্চয়তা দান

সূরায়ে আদ্দোহার বিষয়বস্তু হচ্ছে নবীকে সান্ত্বনা দেয়া এবং অহীর ধারাবাহিকতা রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে নবী যে মনোকষ্ট ভোগ করছিলেন তা দূর করা, প্রথমেই উজ্জ্বল দিবস এবং শান্ত রাতের কসম করে নবীকে নিশ্চয়তা দেয়া হলো যে, তাঁর প্রভু তাঁকে কিছুতেই ত্যাগ করেননি এবং তাঁর ওপর অসন্তুষ্টও হননি। তারপর নবীকে সুসংবাদ দেয়া হল যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন তিনি হয়েছেন তা সাময়িক মাত্র। প্রত্যেক আগতকালটা পূর্ববর্তীকাল থেকে ভাল হতে থাকবে এবং অবিলম্বেই আল্লাহ তাঁর ওপরে এমন অনুগ্রহ-অনুকম্পা বর্ষণ করবেন যে, তিনি খুশী হবেন। এ হচ্ছে এমন সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। অথচ যে সময়ে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তখন এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি যে, মক্কার যে অসহায় লোকটি জাতির জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় সংগ্রাম মুখর তার এমন বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হবে।

তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, কি কারণে তোমার মনে এ আশঙ্কা জন্মালো যে, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি এবং তোমার প্রতি আমি নারাজ হয়েছি? আমি তো তোমার জন্মলগ্ন থেকেই তোমার প্রতি ক্রমাগত অনুগ্রহই করে আসছি। তুমি এতীম হয়ে জন্মগ্রহণ করলে এবং আমি তোমার প্রতিপালন ও দেখাশুনার সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে দিলাম। তোমার সঠিক পথ জানা ছিল না। আমি তোমাকে পথ দেখালাম। তুমি ছিলে বিত্তহীন তোমাকে বিত্তশালী বানালাম। এসব কিছু এটাই প্রমাণ

করে যে, প্রথম থেকেই তোমার প্রতি আমার নজর ছিল এবং স্থায়ীভাবে তুমি আমার অনুগ্রহ-অনুকম্পার মধ্যেই ছিলে।২০৬

বোঝা অপসারণের অর্থ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ

"(হে নবী !) আমি কি তোমার জন্যে তোমার বক্ষ প্রসারিত করে দেইনি ? এবং আমি তোমার ওপর থেকে যে ভারি বোঝা নামিয়ে দিয়েছি যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।"–(সূরা আলাম নাশরাহ ঃ ১-৩)

তফসীরকারকদের কেউ কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে নবী করীম (সা) এমন কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি করে ফেলেছিলেন যার জন্যে তিনি খুবই চিন্তা ভারাক্রান্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, তিনি তাঁর সে ক্রটি মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে এ অর্থ করা নেহাত ভুল প্রথমতঃ শব্দটির অবশ্যম্ভাবী অর্থ গুনাহ্-ক্রটি-বিচ্যুতি নয়। বরং এ শব্দের অর্থ ভারি বোঝাও। অতএব এ শব্দটির অযথা কদর্য অর্থ গ্রহণের কোনো কারণ থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ নবী পাকের নবুয়াতপূর্ব জীবন এমন পূত-পবিত্র ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীদের কাছে তা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। বস্তুত কাফেরদেরকে সম্বোধন করে নবীকে দিয়ে এ কথা বলিয়ে দেয়া হলো ঃ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ط (يونس : ١٦)

"আমি এ কুরআন পেশ করার আগে তোমাদের মধ্যে একটা জীবন অতিবাহিত করেছি।"–(সূরা ইউনুস ঃ ১৬)

নবী পাক (সা)-এ ধরনের কোনো লোকই ছিলেন না যে, গোপনে তিনি কোনো গুনাহ করে ফেলেছেন-(মায়াযাল্লাহ)। এমনটি হয়ে থাকলে তা আল্লাহ তায়ালার অজানা থাকতো না এবং কেউ গোপন কলঙ্ক বহন করে থাকলে তা তিনি জাতির সামনে বিনা দ্বিধায় এ কথা বলে দিতে পারতেন যেমন সূরায়ে ইউনূসের ওপরে বর্ণিত আয়াতে তিনি বলে দিয়েছেন। অতএব এ আয়াতে শব্দটির সঠিক অর্থ হচ্ছে বোঝা। অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট, চিন্তা-ভাবনার বোঝা। আপন জাতির অজ্ঞতা-মূর্খতা দেখে তাঁর অনুভূতিশীল স্বভাব-প্রকৃতির ওপরে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার বোঝা বেড়ে চলছিল। নবীর চোখের সামনে মূর্তি পূজা চলছিল, মুশরিকী রীতিনীতি পদ্ধতি জোরেশোরে চলছিল। চারিত্রিক কলুষতা ও নগ্নত্য চারদিকে বিরাজ করছিল। সমাজে যুলুম এবং ক্রিয়াকলাপে দ্বন্দ্ব-ফাসাদ সাধারণ বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ক্ষমতাসীনের বাড়াবাড়িতে ক্ষমতাহীন নিষ্পেষিত হচ্ছিল। শিশু-বালিকাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হচ্ছিল। একটি গোত্র অপর গোত্রের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করে বসতো। কখনো কখনো এ গোত্রীয় কলহ শত শত বছর ধরে চলতো। জান-মাল-ইজ্জত-আব্রু কারও নিরাপদ ছিল না যতোক্ষণ না তার পেছনে কোনো শক্তিশালী দল ছিল। এসব অবস্থা দেখে নবী পাক (সা) মর্মপীড়া ভোগ করছিলেন। কিন্তু এ অধঃপতন দূর করার কোনো পথ তিনি খুজে পাচ্ছিলেন না। এ মর্মপিড়ার বিরাট বোঝা তার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হেদায়াতের পথ দেখিয়ে এ বোঝা তাঁর ওপর থেকে সরিয়ে দেন। অতপর

নবুয়াতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে—তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের ওপর ঈমানই মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান। এর দ্বারাই জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সংস্কার সংশোধনের পথ সুগম করা যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালার এ পথনির্দেশ নবী পাক (সা)-এর সকল বোঝা লাঘব করে দেয় এবং তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েন যে, এ পথেই শুধু আরবের নয় গোটা দুনিয়ার অধঃপতন ও বিপর্যয় রোধ করা যেতে পারে।২০৭

রফয়ে যিক্‌র

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -(الم نشرح : ٤)

"এবং তোমার জন্যে তোমার যিকিরের আওয়াজ বুলন্দ করে দিয়েছি।"

এ কথা এমন এক সময়ে বলা হয়েছিল যখন কেউ এ কথা চিন্তাই করতে পারতো না যে, যে ব্যক্তির সাথে মাত্র গুটি কয়েক লোক রয়েছে এবং মক্কা শহরেই যারা সীমাবদ্ধ, সে ব্যক্তির আওয়াজ কিভাবে সমগ্র দুনিয়ায় বুলন্দ হতে পারে এবং কেমন এক অসাধারণ সুখ্যাতি তাঁর ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এ অবস্থাতেই তার নবীকে এ সুসংবাদ দিলেন এবং আশ্চর্যজনক পন্থায় তা কার্যে পরিণত করলেন। নবীর স্মরণ বা আওয়াজ ঘরে ঘরে পৌছাবার কাজ তিনি (আল্লাহ) স্বয়ং নবীর দুশমনদের দ্বারাই শুরু করলেন। মক্কার কাফেরগণ নবীকে বিপদে ফেলার জন্যে যে পন্থা অবলম্বন করেছিল তার মধ্যে একটা এই ছিল যে, হজ্জের সময় যখন গোটা আরবের লোক দলে দলে মক্কায় পৌঁছত, তখন কাফেরদের এক একটি প্রতিনিধিদল হাজীদের শিবিরে শিবিরে হাযির হতো এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলতো, "মুহাম্মদ নামে একটি মারাত্মক লোক মানুষের ওপর এমন এমন যাদু করছে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। অতএব তার থেকে সাবধান হয়ে থাকবে।' এ ধরনের প্রচারণা তারা ঐসব লোকের কাছেও করত যারা হজ্জ ছাড়া অন্যান্য দিনে শুধু জিয়ারতের জন্যে অথবা কোনো ব্যবসা উপলক্ষে মক্কা আসতো। এভাবে যদিও তারা নবী পাক (সা)-এর কুৎসা রটনা করতো কিন্তু তার ফল এই হতো যে, আরবের গ্রামে-গঞ্জে তাঁর নাম পৌঁছে যায়। এভাবে দুশমনেরা মক্কার নিভৃত স্থান থেকে নবীর নাম সারা দেশের সকল গোত্রের কাছে পরিচিত করে দেয়। তারপর স্বাভাবিকভাবেই লোক জানতে চাইল, সে লোকটি কে, কি বলে, কেমন লোক সে, কারা তার যাদুর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং যাদুর কোন্ ধরনের ক্রিয়াই বা তাদের ওপর হচ্ছে। মক্কার কাফেরদের প্রচারণা যতোই বাড়তে থাকলো, মানুষের মনে এসব জিজ্ঞাসাও বেড়ে চললো। এ জিজ্ঞাসা ও উৎসুক্যের ফলে নবীর চরিত্র ও আচার আচরণ লোকে জানতে পারলো। তারা কুরআন শুনে বুঝতে পারলো কোন্ ধরনের শিক্ষা নবী মানুষকে দিচ্ছিলেন। তারা দেখলো যে, যে জিনিসকে যাদু বলা হচ্ছে তার দ্বারা প্রভাবিত লোকের জীবন ধারায় সাধারণ আরববাসীদের থেকে কোন্ ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এর ফলে নবীর কুৎসা তাঁর সুনাম-সুখ্যাতিতে পরিণত হতে লাগলো। অতপর হিজরতের সময় আসতে আসতে এমন অবস্থা হলো যে, দূর ও নিকটের আরব গোত্রগুলোর মধ্যে এমন একটাও সম্ভবত ছিল না যার মধ্যে কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যাদের মধ্যে কিছু লোক নবী ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েনি। এ হচ্ছে হুজুর পাকের চর্চা বুলন্দ হওয়ার প্রথম পর্যায়। অতপর হিজরতের পর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এ সময়ে

একদিকে মুনাফিক দল, ইহুদী এবং সমগ্র আরবের মুশরিকগণ নবী (সা)-এর কুৎসা রটনায় উঠে-পড়ে লেগেছিল অপরদিকে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র খোদাপুরস্তি ও খোদাভীতি, চারিত্রিক পবিত্রতা, সুন্দর সমাজব্যবস্থা, ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য, ধনিকদের উদারহস্তে দান, গরীবদের তত্ত্বাবধান, চুক্তির সংরক্ষণ, লেন-দেন ও কায়কারবারে সততা প্রভৃতির এমন এক দৃষ্টান্ত পেশ করছিল যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলেছিল। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দুশমনরা নবীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে আহ্লে ঈমানদের যে জামায়াত তৈরী হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের নিয়ম-শৃঙ্খলা, বীরত্ব মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, যুদ্ধের মধ্যেও চারিত্রিক সীমারেখা পালনের দ্বারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রমাণিত করেন যে, সমগ্র আরব তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করে। দশ বছরের মধ্যে হুজুর পাকের চর্চা ও মহিমা এতটা বুলন্দও সমুন্নত হয়ে পড়লো যে, বিরোধীরা যে দেশে তাকে বদনাম করার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল সে দেশের সর্বত্র 'আশ্ হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'-এর বাণী গুঞ্জরিত হলো।

অতপর তৃতীয় পর্যায় শুরু হলো খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে, যখন নবী পাক (সা)-এর পবিত্র নাম সারা দুনিয়ায় বুলন্দ হতে লাগলো। এর ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত বেড়েই চলেছে এবং ইন্‌শাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত বেড়েই চলবে। আজ দুনিয়ায় এমন কোনো স্থান নেই যেখানে মুসলমানদের কোনো বস্তি নেই এবং পাঁচবার আযানের মাধ্যমে উচ্চস্বরে মুহাম্মদ (সা)-এর রেসালাতের ঘোষণা করা হয় না, নামাযের মধ্যে নবীর প্রতি দরূদ পড়া হয় না এবং জুমআর খুৎবার মধ্যে তাঁর মঙ্গল কামনা করে নাম স্মরণ করা হয় না। বছরের বার মাসের মধ্যে কোনো দিন এবং দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এমন কোনো সময় নেই—যখন দুনিয়ার কোথাও না কোথাও নবী পাক (সা)-এর মুবারক যিকির করা হয় না। এ কুরআনের সত্যতার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, যখন নবুয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন ورفعنا لك ذكرك তখন কেউই এ ধারণা করতে পারেনি যে, তাঁর এই رفع ذكر (তাঁর নাম ও যিকির বুলন্দ হওয়া) এমন মর্যাদার সাথে এবং ব্যাপকভাবে হতে থাকবে। আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে—নবী (সা) বলেছেন, জিবরাঈল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার এবং আপনার রব জিজ্ঞেস করেন কিভাবে তিনি আপনার নাম ও যিকির বুলন্দ করেন। নবী (সা) বলেন, আল্লাহ পাকই তা ভালো জানেন। জিবরাইল বলেন, আল্লাহ এরশাদ করেন, যখন আমার যিকির করা হয় তখন আমার সাথে তোমারও (নবীর) যিকির করা হবে—(ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতিম, মুসনাদে আবু ইয়ালা, ইবনুল মুন্‌যের ইবনে হাব্বান, ইবনে মারদুইয়া, আবু নঈম)। পরবর্তীকালের গোটা ইতিহাস সাক্ষ দিচ্ছে যে, এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।[২০৮]

শরহে সদর

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

"(হে নবী!) আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি ?"-(সূরা আলাম নাশরাহ্ ঃ ১)

এ প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু এবং পরের কথা থেকে প্রকাশ হচ্ছে যে, ইসলামী দাওয়াত শুরু করার সাথে সাথে যেসব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন রসূলুল্লাহ (সা) হয়েছিলেন, তার জন্যে

সে সময়ে তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে নবী! আমি কি তোমার ওপর এই এই অনুগ্রহ করিনি? তারপরও এসব বাধাবিপত্তির জন্যে তুমি উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন? বক্ষ উন্মুক্ত করা শব্দটি কুরআন মজীদে যে যে স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে তা লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, তার দু'টি অর্থ।

এক ঃ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ج (الانعام : ١٢٦) ঃ

"অতএব যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দানের ইচ্ছা করেন, ইসলামের জন্যে তার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১২৫)

দুই ঃ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط(الزمر : ٢٢) ঃ

"যার বক্ষ আল্লাহ, ইসলামের জন্যে খুলে দিয়েছেন, সে তার রবের পক্ষ থেকে একটি আলোকের ওপর চলছে।"–(সূরা আয যুমার ঃ ২২)

এ দু'টি স্থানে শরহে সদরের মর্ম হলো সকল প্রকার মানসিক অস্থিরতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যে, ইসলামের পথই অকাট্য সত্য এবং ঐসব আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক মূলনীতি, তাহ্যিব ও তামাদ্দুন, আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশ একেবারে অভ্রান্ত যা ইসলাম পেশ করেছে। সূরা শূয়ারার ১২-১৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ)-কে নবুয়াতের মহান দায়িত্বে নিয়োজিত করার পর ফেরাউন ও তার রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম-সংঘর্ষ করার নির্দেশ যখন দেয়া হয়, তখন মূসা (আ) আরজ করেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ ۝ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ -(الشعراء : ١٢-١٣)

"হে আমার রব! আমার ভয় হচ্ছে লোকে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আমার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে।"–(সূরা শুয়ারা ঃ ১২-১৩)

সূরা ত্বাহার ২৫-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে, সে সময়ে হযরত মূসা (আ) আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করলেন ঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ۝ وَيَسِّرْلِىْٓ اَمْرِىْ -(طه : ٢٥-٢٦)

"আমার রব! আমার বক্ষ আমার জন্যে খুলে দিন এবং আমার কাজ আমার জন্যে সহজ করে দিন।"

এখানে বক্ষের সংকীর্ণতার অর্থ এই যে, নবুয়াতের মতো বিরাট গুরুভার বহন করার জন্যে এবং একাকী দুর্দান্ত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে সাহস সৃষ্টি হচ্ছিল না। আর শরহে সদরের অর্থ মানুষের মনোবল বেড়ে যাওয়া। কোনো বিরাট অভিযান পরিচালনা এবং বড়ো কঠিন কাজ সমাধা করতে পশ্চাদপদ না হওয়া এবং নবুয়াতের মতো বিরাট দায়িত্ব পালনে সাহস সৃষ্টি হওয়া।

চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্ষ খুলে দেয়ার মধ্যে এ দু'টি অর্থই নিহিত রয়েছে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে এর তাৎপর্য এই যে, নবুয়াতের আগে রসূলুল্লাহ (সা) আরবের পৌত্তলিক, নাসারা ইহুদী ও অগ্নিপূজকদের ধর্মগুলোকে ভ্রান্ত

মনে করতেন এবং আরবের কিছু তাওহীদ পন্থীদের মধ্যে যে একমুখিতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল তার প্রতিও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ এ একটা অস্পষ্ট আকীদা ছিল যার মধ্যে সত্য-সঠিক পথের কোনো বিশদ বিবরণ ছিল না। কিন্তু সঠিক পথ কোন্‌টা এ যখন তাঁর জানা ছিল না সে জন্যে তিনি এক মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। অতপর নবুয়াত দান করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করলেন এবং সেই সরল-সঠিক পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম) তাঁর সামনে খুলে দিলেন—যার ফলে তাঁর মনে এক প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা ফিরে এলো।

দ্বিতীয় অর্থের তাৎপর্য এই যে, নবুয়াত দানের সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা নবীকে সে সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনা, দৃঢ় সংকল্প ও মনের প্রসারতা দান করেন যা এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন ছিল। তিনি এমন এক ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হলেন যা তিনি ছাড়া অন্য কোনো মানুষের হৃদয়ে স্থান হতে পারে না। তিনি এমন দূরদর্শী জ্ঞান লাভ করলেন—যা ব্যাপক অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সক্ষম। ফলে তিনি এতোটা যোগ্যতা অর্জন করলেন যে, জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি চরম উচ্ছৃংখল সমাজে কোনো উপায়-উপাদান ও দৃশ্যত কোনো সহায়ক শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইসলামের ধ্বজাবাহীরূপে বিরোধিতা ও শত্রুতার ঝড়-ঝঞ্ঝার মোকাবিলা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এ পথে যতোই দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ এসেছে তা তিনি ধৈর্যের সাথে মাথা পেতে নিয়েছেন। কোনো শক্তি তাঁকে তাঁর লক্ষ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। শরহে সদরের এ অমূল্য সম্পদ যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দান করেছেন, তখন কাজের সূচনালগ্নে এসব বাধা-বিপত্তি দেখে তিনি হিম্মত হারাবেন কেন?

কোনো কোনো তাফসীরকার শরহে সদরকে বক্ষ বিদীর্ণকরণ অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এ আয়াতকে বক্ষবিদীর্ণের অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন—যা হাদীসের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ হাদীসের বর্ণনাগুলোর ওপরই নির্ভরশীল। কুরআন থেকে এ প্রমাণ করার চেষ্টা ঠিক হবে না। আরবী ভাষার দিক দিয়ে শরহে সদরকে শক্কে-সদর বা বক্ষবিদীর্ণ করার অর্থে কিছুতেই গ্রহণ করা যেতে পারে না। আল্লামা আলুসী তাঁর রুহুল মায়ানীতে বলেন ঃ

حمل الشرح فى الاية على شق الصدر ضعيف عند المحققين -

"বিশেষজ্ঞদের নিকটে এ আয়াতে—'শরহ্'কে 'শক্কে'র অর্থে গ্রহণ করা একটি দুর্বল সিদ্ধান্ত।"২০৯

কাওসারের সুসংবাদ

নবুয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (সা) যখন চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন, গোটা জাতি শত্রুতায় উঠেপড়ে লাগে, পথে প্রতিবন্ধকতার পাহাড় দাঁড়িয়ে যায়, চারদিকে বিরোধিতার তুফান চলতে থাকে এবং নবী ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাফল্যের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, সে সময়ে নবীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এবং সাহস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আয়াত নাযিল করেন। সূরা দোহাতে এরশাদ হয় ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ○ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ○

"অবশ্য অবশ্যই পরবর্তী সময়কাল (প্রত্যেক পরবর্তী সময়কাল) পূর্ব থেকে ভালো হবে এবং তোমার প্রভু তোমাকে ঐসব কিছু দেবেন—যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

আলাম নাশরাহ্তে আল্লাহ বলেন ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "বরং আমি তোমার নামের স্মরণ বুলন্দ করে দিয়েছি।" অর্থাৎ দুশমন সারা দেশে তোমার বদনাম করে বেড়াচ্ছে—কিন্তু আমি তোমার নাম উজ্জল করার ও তোমার প্রসিদ্ধিলাভের ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছি।

অতপর বলা হয়েছে ঃ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○ (الم نشراح : ٥-٦)

"বস্তুত সংকীর্ণতার সাথে প্রশান্তিও আছে, অবশ্যই সংকীর্ণতার সাথে প্রশান্ততা আছে।' —অর্থাৎ এ সময়ে অবস্থা খুব কঠিন বলে অধীর হয়ো না। অবিলম্বেই বিপদ-মসিবতের সময় শেষ হয়ে যাবে এবং সাফল্য এসে পড়বে।"

এ অবস্থাতেই সূরা কাওসার নাযিল করে আল্লাহ তায়ালা নবী পাক (সা)-কে সান্ত্বনা দেন। তার সাথে বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংসেরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কুরাইশ কাফেরগণ বলতো যে, মুহাম্মদ (সা) গোটা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর অবস্থা এখন একজন সহায়-সম্বল ও বন্ধুহীন মানুষের মতো। একরামার রেওয়ায়াতে আছে, যখন হুজুর পাককে নবী বানানো হয়, এবং যখন তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন তারা বলতে লাগলো, بتر محمد منا (ইবনে জারীর)। অর্থাৎ মুহাম্মদ তাঁর জাতি থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন যেন একটি গাছ তার মূল থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আশা করা যায় যে, কিছুদিন পরে সে শুকিয়ে মাটিতে লয় হয়ে যাবে। মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, মক্কার সর্দার আস বিন ওয়ায়েল সাহ্মীর কাছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর কথা বললে সে বলতো, "আরে, ছেড়ে দাও তার কথা। সে তো ছিন্নমূল (আবতার)। তাঁর তো ছেলে পুলেও নেই। মরে গেলে তো নাম নেবার কেউ থাকবে না।"

শামির বিন আতিয়া বলে যে, উকবা বিন আবি মুয়াইতও নবী সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করতো।-(ইবনে জারীর)

ইবনে আব্বাস বলেন, একবার মদীনার ইহুদী সর্দার কা'ব বিন আশরাফ মক্কায় এলে কুরাইশ সর্দারগণ তাকে বলে ঃ

اَلَا تَرٰى اِلٰى هٰذَا الصَّبِىِّ الْمُنْبَتِرِ مِنْ قَوْمِهٖ يَزْعَمُ اَنَّهٗ خَيْرٌ مِّنَّا وَنَحْنُ اَهْلُ الْحَجِيْجِ وَاَهْلُ السَّدَانَةِ وَاَهْلُ السِّقَايَةِ ـ

"একবার এ ছেলেটির দিকে দেখ না, সে তো সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন অথচ বলে যে, সে নাকি আমাদের চেয়ে ভালো, অথচ আমরা হজ্জ করি, কা'বা ঘরের খেদমত করি এবং হাজীদের পানিও পান করিয়ে থাকি।"-(বায্যার) এ ঘটনা সম্পর্কে একরামার রেওয়ায়াত হচ্ছে ঃ কুরাইশরা হুজুর পাক (সা)-এর الصُّنْبُوْرُ الْمُنْبَتِرُ مِنْ قَوْمِهٖ শব্দগুলো ব্যবহার করতো। তার অর্থ ঃ দুর্বল সহায়-সম্বল ও বন্ধুহীন এবং যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে (ইবনে জারীর)। ইবনে সা'দ এবং ইবনে আসাকের রেওয়ায়াত ঃ হযরত

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর বড়ো সাহেবজাদা ছিলেন কাসেম (রা)। তাঁর ছোটো হযরত যয়নব (রা) তাঁর ছোটো হযরত আবদুল্লাহ (রা)। অতপর পর পর তিন মেয়ে হযরত উম্মে কুলসুম (রা), হযরত ফাতেমা (রা) এবং হযরত রুকাইয়া (রা)। এদের মধ্যে প্রথমে হযরত কাসেম (রা) এন্তেকাল করেন এবং তারপর হযরত আবদুল্লাহ (রা) এন্তেকাল করেন। এ কথা শুনে আস বিন ওয়ায়েল বলে, তাঁর বংশ খতম হয়ে গেল। এখন তিনি আবতার অর্থাৎ তাঁর মূল ছিন্ন হয়ে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আস-এর এ অতিরিক্ত উক্তি আছে ঃ

اِنَّ مُحَمَّدَ اَبْتَرَ لَاابْنَ لَهُ يَقُوْمُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ - فَاِذَا مَاتَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ -

অর্থাৎ মুহাম্মদ আবতার (ছিন্নমূল)। তাঁর কোনো পুত্র-সন্তান নেই যে, তার স্থলাভিষিক্ত হবে। মৃত্যুর পর তার নাম দুনিয়া থেকে মুছে যাবে। তখন তোমরা তাঁর থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। আবদ বিন হুমাইদ ইবনে আব্বাস (রা) যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন তার থেকে জানা যায় যে, হুজুরের সাহেবজাদা আবদুল্লাহর এন্তেকালের পর আবু জেহেলও এ ধরনের মন্তব্য করে। শামের বিন আতিয়া থেকে ইবনে আবু হাতেম রেওয়ায়াত করেন ঃ হুজুর (সা)-এর পুত্রশোকের সময় ওকবা বিন আবু মুয়াইতও এ ধরনের নীচ মানসিকাতার পরিচয় দেয়। আতা বলেন, হুজুর (সা)-এর দ্বিতীয় পুত্র এন্তেকাল হওয়ার পর হুজুরের অতি নিকট প্রতিবেশী ও চাচা আবু লাহাব দৌড়ে গিয়ে মুশরিকদেরকে এ সুসংবাদ দেয় ঃ بتر محمد الليلة আজ রাতে মুহাম্মদ একেবারে পুত্রহীন হয়ে পড়লো।

এ ছিল সেই হৃদয় বিদারক অবস্থা—যখন সূরা কাওসার নাযিল হয়। কুরাইশ কাফেরগণ নবীর ওপর এ জন্যে ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করতেন এবং তাদের শির্কের প্রকাশ্যে খণ্ডন করতেন। এ কারণেই নবী হওয়ার পূর্বে গোটা জাতির মধ্যে তাঁর যে মর্যাদা ছিল তার থেকে তারা তাঁকে বঞ্চিত করলো। তাকে যেন আপন গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাইরে নিক্ষেপ করলো। তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গী-সাথীও ছিলেন সহায়-সম্বল ও বন্ধুহীন। তাঁরাও নির্যাতিত হচ্ছিলেন। এমন অবস্থায় পর পর পুত্র শোকের পাহাড় নবী পাকের ওপর ভেঙ্গে পড়ে। এহেন বিপদের সময় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গোত্র ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোক ও প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে সহানুভূতি তো দূরের কথা তারা বরং আনন্দউল্লাসে ফেটে পড়ে। তারা এমন এমন মন্তব্য করতে থাকে—যা ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। অথচ তিনি আপন-পর সকলের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষুদ্রতম সূরাটিতে এমন এক সুসংবাদ দিয়েছেন যা দুনিয়ার কোনো মানুষকে কখনো দেয়া হয়নি। এই সাথে এ সিদ্ধান্তও শুনিয়ে দেয়া হলো যে, তাঁর বিরোধিতাকারীগণই ছিন্নমূল হয়ে পড়বে।[২১০]

'আবতার' শব্দটি 'বাতার থেকে উদ্ভূত যার অর্থ কর্তন করা। কিন্তু পরিভাষায় এ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নামাযে যে রাকায়াতের সাথে অন্য কোনো রাকায়াত পড়া হয় না হাদীসে তাকে 'রুতায়রা' বলা হয়েছে। আর একটি হাদীসে আছে ঃ كل امر ذى بال لايبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রশংসা ব্যতিরেকে শুরু করা হলে তা হবে 'আবতার'। অর্থাৎ তার মূল ছিন্ন হবে। সে কাজ সুদৃঢ় হবে না এবং তার

পরিণাম ভাল হবে না। যে ব্যক্তি ব্যর্থকাম হয় তাকেও 'আবতার' বলে। উপায়-উপাদান থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে 'আবতার' বলা হয়। যার মঙ্গলের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং যার সাফল্যের সকল আশাই নির্মূল হয়েছে, সেও 'আবতার'। যে তার আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে একাকী হয়ে পড়েছে সেও 'আবতার'। যার কোনো সন্তান-সন্ততি নেই অথবা হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেছে—তার জন্যে 'আবতার' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কারণ তারপরে তার নাম নেবার আর কেউ থাকে না এবং তার নাম-নিশানা মুছে যায়। প্রায় এসব অর্থেই কুরাইশ কাফেরগণ নবী করীম (সা)-কে আবতার বলতো। এ জন্যে আল্লাহ বলেন, তুমি আবতার নও, বরং তোমার এ দুশমনরাই আবতার। এটা ছিল না তাদের কথার জবাবে কোনো কথা। বরং প্রকৃতপক্ষে এ ছিল কুরআনের বড়ো গুরুত্বপূর্ণ ভবিষদ্বাণী —যা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়। যে সময়ের এ ভবিষ্যদ্বাণী, তখন তো লোকে নবীকেই 'আবতার' মনে করতো। এবং ধারণাই করা যেতো না যে, কিভাবে কুরাইশদের বড়ো বড়ো সর্দারগণ আবতার হয়ে পড়বে। কারণ শুধু মক্কাতেই নয়—সারা আরবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তারা ছিল, ছিল সফলকাম। ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি নিয়ামতের অধিকারী তারা ছিল। সারা দেশে তাদের প্রতিনিধি ছিল, তাদের সাহায্যকারী বন্ধু-বান্ধব ছিল। তারা ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারী। হজ্জের ব্যবস্থাপনা তাদের হাতে ছিল বলে সকল আরব গোত্রের সাথে তাদের ব্যাপক সম্বন্ধ-সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর অতীত হতে না হতেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। এমন এক সময় ছিল যখন খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশগণ বহু আরব ও ইহুদী গোত্রগুলো নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে এবং নবী পাক (সা)-কে শহরের পাশে খন্দক নির্মাণ করে প্রতিরোধ করতে হয়। আবার মাত্র তিন বছর পর এমন সময় এলো যখন নবী মক্কা আক্রমণ করেন। তখন কুরাইশদের কোনো সমর্থক সাহায্যকারী কেউ ছিল না এবং তাদেরকে অসহায় অবস্থায় অস্ত্র সম্বরণ করতে হয়। তারপর এক বছরের মধ্যে গোটা আরব নবীর মুষ্ঠির মধ্যে এসে যায়। দেশের দূর-দূরান্তর ও প্রত্যন্ত এলাকা থেকে দলে দলে লোক এসে নবীর হাতে বায়আত করতে থাকে। তাঁর দুশমন একেবারে বন্ধুহীন হয়ে পড়ে। তারপর তাদের নাম ও নিশানা এমনভাবে মুছে যায় যে, তাদের সন্তান-সন্ততি দুনিয়ায় বেঁচে থাকলেও তাদের মধ্যে কেউ এ কথা জানে না যে, তারা আবু জেহেল, আবু লাহাব, আস বিন ওয়ায়েল অথবা ওকবা বিন আবি মুয়াইত প্রভৃতি ইসলাম দুশমনদের সন্তান। আর জানলেও তারা স্বীকার করতে রাজী নয় যে, তাদের পূর্বপুরুষ এসব লোক ছিল। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্তানদের প্রতি আজ সমগ্র দুনিয়া থেকে দরূদও সালাম পাঠ করা হয়। কোটি কোটি মুসলমান নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জন্যে গর্ববোধ করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর সাথেই নয় বরং তাঁর বংশ ও তাঁর সাহাবীদের বংশের সাথে সম্পর্কের জন্যে গৌরব ও সম্মানবোধ করে। কেউ সাইয়েদ, কেউ উলুবী, কেউ আব্বসী, হাশেমী, সিদ্দিকী, ফারুকী, ওসমানী, যুবায়রী অথবা আনসারী। কিন্তু আবু জেহেলী অথবা লাহাবী কোনো নাম শুনতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস এ কথা প্রমাণিত করেছে যে, 'আবতার' নবী পাক (সা) ছিলেন না, বরং তাঁর দুশমন ছিল 'আবতার' এবং এখনো আছে।*[২১১]

---

*ان شانئك هو الا بتر এখানে شانى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার উৎপত্তি شنئن থেকে। যার অর্থ হিংসা ও শত্রুতা যার কারণে অন্যের প্রতি অসদাচরণ করা। কুরআনের অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে ঃولا يجرمنكم شنان قوم على الاتعدلوا এবং (হে মুসলমানগণ) কোনো দলের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এতটা বাড়াবাড়ি করতে না দেয় যে, তোমরা অন্যায় করে বস। অতএব شانئك -এর অর্থ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে রসূলুল্লাহ (সা)-এর শত্রুতায় এতটা অন্ধ হয়ে পড়েছে যে, তাঁর বদনাম করে, তাঁর বিরুদ্ধে কটূক্তি করে, তাঁকে লাঞ্ছিত করে এবং নানা ধরনের গালি দিয়ে মনের ঝাল মিটাবে।[২১২]

কাওসার সুসংবাদের পারলৌকিক দিক

হাউযে কাওসার সম্পর্কে নবী (সা) যা বলেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ কেয়ামতের প্রচণ্ড দিনে প্রত্যেকে যখন তৃষ্ণায় ছট্‌ফট করতে থাকবে, তখন হাউযে কাওসার নবী করীম (সা)-কে দান করা হবে। নবীর উম্মত হাউযের নিকটে নবীর সাথে মিলিত হয়ে হাউয থেকে পানি পান করে পরিতৃপ্ত হবে। সকলের আগে নবী পাক সেখানে উপস্থিত হয়ে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবেন। নবী বলেন هُوَ حَوضٌ تَرِدُ عَلَيهِ اُمَّتِيْ يوم القيمة 'এ এমন এক হাউয বা চৌবাচ্চা যেখানে কেয়ামতের দিনে আমার উম্মত গিয়ে পৌঁছবে' (মুসলিম, আবু দাউদ)। انا فرطكم على الحوض 'আমি তোমাদের সকলের আগে হাউযের কাছে পৌঁছে যাব।'–(বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

انى فرط لكم وانا شهيد عليكم وانى والله لانظر الى حوض الان

"আমি তোমাদের আগে সেখানে পৌঁছব এবং তোমাদের জন্যে সাক্ষ্য দেব। খোদার কসম—আমি আমার হাউয এখন দেখতে পাচ্ছি।"–(বুখারী)

একবার নবী আনসারদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

انكم ستلقون بعدى اثمرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض-

"আমার পরে তোমরা স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতির সম্মুখীন হবে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। অতপর আমার সাথে হাউযে কাওসারে এসে মিলিত হবে।"–(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

انا يوم القيمة عند عقر الحوض 'কেয়ামতের দিনে আমি হাউযের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করব' (মুসলিম)। হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি হাউয সম্পর্কে নবী (সা)-এর কাছে কিছু শুনেছেন কি ? তিনি বলেন, একবার দু'বার তিনবার, চারবার নয়—বহুবার শুনেছি। যে এটাকে মিথ্যা মনে করবে, আল্লাহ তাকে তার পানি থেকে বঞ্চিত করবেন।– (আবু দাউদ)

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হাউয সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোকে মিথ্যা মনে করতো। এমনকি সে আবু বারযা আসলামী (রা), বারা বিন আযেব (রা) এবং আয়েয বিন আমর (রা)-এর সকল বর্ণনা মিথ্যা বলেছে। অবশেষে আবু সাবরা একটি বিবরণ বের করে আনেন যা তিনি আমর বিন আসের নিকটে শূন্যে লিপিবদ্ধ করেন। তার মধ্যে নবী পাক (সা)-এর এ কথা লিখিত ছিল ঃ الا ان موعد كم حوضى 'মনে রেখো, আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাতের স্থান হচ্ছে হাউযে কাওসার।'–(মুসনাদে আহমদ)

দুই ঃ এ হাউযের প্রশস্থতা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ রেওয়ায়াতে এ কথা আছে যে, এর দৈর্ঘ্য আয়লা (ইসরাঈলের বর্তমান পোতাশ্রয় আয়লাত) থেকে ইয়ামেনের সানআ পর্যন্ত অথবা আয়ালা থেকে আদন পর্যন্ত অথবা আম্মান থেকে আদন পর্যন্ত। তার প্রস্থ আয়লা থেকে হুজফা (জেদ্দা এবং রাবেগের মধ্যবর্তী স্থান) পর্যন্ত (বুখারী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)।

এর থেকে অনুমান করা যায় যে, বর্তমান লোহিত সাগরকেই হয়ত হাউযে কাওসারে পরিণত করা হবে। আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তিন ঃ এ হাউয সম্পর্কে নবী বলেন, বেহেশতের কাওসার নামক নদী থেকে পানি এনে এ হাউযে ঢালা হবে। يشخب فيه ميزابان من الجنة অন্যত্র بغت فيه مزابان يمدانه من الجنة। অর্থাৎ বেহেশত থেকে দু'টি নালা এর সাথে সংযুক্ত করা হবে পানি সরবরাহ করার জন্যে (মুসলিম)

আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে يفتح نهر من الكوثر الى الحوض 'বেহেশতের নাহরে কাওসার থেকে একটি নালা এ হাউযের দিকে খুলে দেয়া হবে।'–(মুসনাদে আহমদ)

চার ঃ নবী করীম (সা) এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এর পানি দুধ অথবা চান্দি থেকে সাদা, বরফ থেকে অধিক ঠাণ্ডা এবং মধু থেকে অধিকতর মিষ্টি। তার তলদেশের মাটি মিশ্‌ক থেকে অধিকতর সুগন্ধ। তার ওপরে আকাশের তারার ন্যায় অসংখ্যা কুঁজো রক্ষিত থাকবে। যে ব্যক্তি একবার এ পানি পান করবে তার কোনো দিন আর পিপাসা লাগবে না। এর থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত থাকবে সে কোনো দিন পরিতৃপ্ত হবে না। সামান্য শাব্দিক গরমিলসহ এ কথা বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)।

পাঁচ ঃ এ সম্পর্কে নবী করীম (সা) বার বার লোকদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা আমার রীতিনীতি পরিবর্তন করবে, তাদেরকে এ হাউয থেকে দূরে রাখা হবে এবং তাদেরকে এখানে আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো যে, এরা আমার সঙ্গী-সাথী। তখন বলা হবে, আপনার জানা নেই যে, তারা আপনার পরে কি করেছিল। তারপর আমিও তাদের প্রতিরোধ করব এবং বলব—তোমরা দূরে সরে যাও। একথা বহু রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)।

ইবনে মাজাহ এ বিষয়ে যে হাদীস বর্ণনা করেছে তার ভাষা বড় মর্মান্তিক।

الا وانى فرطكم على الحوض واكاثر بكم الامم فلا تسودوا وجهى الا وانى مستنقذ انا
ساومستنقذ اناس منى فاقول يارب اصيحابى فيقول انك لاتدرى ما احدثوا بعدك

"মনে রেখ, তোমাদের পূর্বেই আমি হাউযে পৌঁছে যাব। অন্যান্য উম্মত থেকে তোমাদেরকে নিয়ে আমার উম্মত অধিকসংখ্যক হবে বলি আমি গর্ববোধ করব। সাবধান থেকো, কিছু লোককে আমি ছাড়িয়ে আনব এবং কিছু লোক আমার থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, পরওয়ারদেগার! এরা তো আমার সাহাবী। তিনি বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে তারা কি ধরনের কাজ করেছে।"–ইবনে মাজাহ বলেন, এ কথাগুলো নবী আরাফাতের খুৎবার মধ্যে বলেছিলেন।

ছয় ঃ এমনিভাবে হুযুর (সা) তাঁর আপন সময়কাল থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, যারাই আমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে চলবে এবং আমার রীতিনীতি পরিবর্তন করবে, তাদেরকে হাউয থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। আমি বলব, হে আমার রব ! এরা তো আমার। এরা আমার উম্মতের লোক। তার জবাবে বলা

হবে, আপনার জানা নেই যে, আপনার পর তারা কি কি পরিবর্তন করেছে এবং উল্টো পথে তারা চলছে। নবী বলেন, তারপর আমি তাদের প্রতিরোধ করব এবং হাউযের কাছে আসতে দিব না।

এ বিষয়ের ওপর বহু প্রার্থনা হাদীসে পাওয়া যায়।-(বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ দ্রষ্টব্য)

এ হাউযের বর্ণনা পঞ্চাশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। পূর্ববর্তী ইসলামী মনীষীগণ এ হাউযকে হাউযে কাওসারই মনে করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবুর রেকাকের শেষ অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন ঃ بَاب فِى الْحَوض وقول اللّه اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ

হযরত আনাস (রা)-এর একটি রেওয়ায়াতে এ বিশ্লেষণ রয়েছে যে, নবী পাক (সা) কাওসার সম্পর্কে বলেন ঃ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِى এ হলো সেই হাউয যেখানে আমার উম্মত সমবেত হবে।

বেহেশতে কাওসার নামক যে স্রোতস্বিনী রসূলুল্লাহ (সা)-কে দান করা হবে তার বিবরণও বহু হাদীসে রয়েছে। হযরত আনাস (রা) থেকেও বহু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—যাতে তিনি বলেন, মেরাজের রাতে নবীকে বেহেশতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল। এ সময়ে তিনি একটি নদী দেখতে পান—যার তীরে হীরকখচিত কোব্বা নির্মিত ছিল। তার তলার মাটি মিশকের মতো সুগন্ধ। হুযুর (সা) জিবরাইল অথবা সঙ্গের ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেন—ওটা কি। জবাবে বলা হয়, এ হচ্ছে নহরে কাওসার—যা আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে দান করেছেন।-(মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি প্রভৃতি)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবীকে জিজ্ঞেস করলো কাওসার কি ? তদুত্তরে নবী বলেন, এ একটি নহর যা আল্লাহ আমাকে বেহেশতে দান করেছেন। তার মাটি মিশকের মতো সুবাসিত, পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধু থেকে মিষ্টি (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী)। ইবনে জারীর মুসনাদে আহমদের আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, হুযুর (সা) নহরে কাওসারের গুণ বর্ণনা করে বলেন, তার তলায় পাথরের পরিবর্তে মণি-মাণিক্য সজ্জিত রাখা আছে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, নবী পাক (সা) বলেছেন, কাওসার বেহেশতের একটি নহর বা নদী। তার তীর স্বর্ণনির্মিত। এ মণি-মাণিক্যের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। অর্থাৎ প্রস্তুরখণ্ডের স্থানে সেখানে হীরা ও মণি-মাণিক্য পড়ে রয়েছে। তার মাটি মিশক থেকে বেশী সুগন্ধি। তার পানি দুধ থেকে বেশি সাদা, বরফ থেকে বেশি ঠাণ্ডা এবং মধু থেকে বেশি মিষ্টি। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবি হাতিম, দারেমী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনযের, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে আবি শায়বাহ)। উসামা বিন যায়েদ (রা) বলেন, একবার নবী (সা) হযরত হামযা (রা)-এর গৃহে তশরিফ নিয়ে যান। তিনি ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী হুযুরের মেহমানদারি করেন। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে বলেছেন যে, বেহেশতে আপনাকে একটি নহর দান করা হয়েছে যার নাম কাওসার। তদুত্তরে নবী বলেন, হাঁ ঠিক তার মাটি ইয়াকুত ও বিভিন্ন মণি-মাণিক্যের তৈরি। এসব বর্ণনা ছাড়াও সাহাবা এবং তাবেঈনের বহু সংখ্যক উক্তি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে—যাতে কাওসার বলতে বেহেশতের এ নদী বা নহরকে মনে করা হয়েছে এবং

তার ঐসব গুণাবলীই বলা হয়েছে যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), হযরত আনাস বিন মালেক (রা), হযরত আয়েশা (রা), মুজাহিদ এবং আবুল আলীয়ার উক্তি মুসনাদে আহমদ, বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর, ইবনে আবি শায়বাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২১৩]

আবু লাহাবের ভয়াবহ পরিণাম

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞ (اللهب : ١)

"আবু লাহাবের হাত ভেঙে গেছে এবং সে বিফল মনোরথ হয়েছে।"

কোনো কোনো তফসীরকার تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَتَبَّ -এর অর্থ করেছেন 'ভেঙে যাক আবু লাহাবের হাত' এবং وتب -এর অর্থ করেছেন, 'সে ধ্বংস হয়ে যাক' অথবা 'সে ধ্বংস হয়েছে।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কোনো বদদোয়া বা অভিসম্পাত নয় যা তাকে দেয়া হয়েছিল। বরং এ ছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণী যার জন্যে ভবিষ্যতে সংঘঠিত হবে এমন কিছুকে অতীত ক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়েছে। তার হওয়াটা এত নিশ্চিত যে, যেন তা হয়েই গেছে। প্রকৃতপক্ষে তা হয়েছিলও যা ক'বছর আগে এ সূরায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। হাত ভেঙে যাওয়ার অর্থ শরীরের অংশ হাত ভেঙে যাওয়া নয়। বরং কোনো লোকের ঐসব কাজে বিফল মনোরথ হওয়া—যার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আবু লাহাব রসূলুল্লাহ (সা)-এর ইসলামী দাওয়াত নস্যাৎ করে দেয়ার জন্যে সকল শক্তি নিয়োজিত করে। কিন্তু এ সূরা নাযিল হওয়ার সাত-আট বছর যেতে না যেতেই বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ নিহত হয় যারা নবীর শত্রুতা সাধনে আবু লাহাবের সহযোগী ছিল। তাদের এ পরাজয়ের সংবাদ যখন মক্কায় পৌছলো তখন আবু লাহাব এতটা মর্মাহত হলো যে, সাত দিনের বেশী বেঁচে থাকতে পারলো না। তার মৃত্যুটাও ছিল বিরাট শিক্ষণীয়। সে Malignant Pastule রোগে আক্রান্ত হয় যার জন্যে তার পরিবারের লোকজন তাকে ফেলে রেখে সরে পড়েছিল। কারণ তারা এ সাংঘাতিক ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে আতঙ্কিত ছিল। মৃত্যুর পর তিন দিন পর্যন্ত তার কাছে কেউ গেল না। তার লাশ পচে দুর্গন্ধময় হয়ে গেল। এ নিয়ে লোকে তার ছেলেদেরকে তিরস্কার করতে লাগলো, তখন তারা কয়েকজন হাবশীকে দিয়ে তার লাশ উঠিয়ে তাদের দ্বারা দাফন করে। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, একটা গর্ত খনন করে কাঠের সাহায্যে লাশ গর্তে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার ওপর মাটি পাথর চাপা দেয়া হয়। তার অতিরিক্ত ও পরিপূর্ণ পরাজয় আর একদিক দিয়ে হয় এবং তা এই যে, যে দ্বীনের পথ রুদ্ধ করার জন্যে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল, তার সন্তানগণ সে দ্বীন গ্রহণ করে। সর্বপ্রথম তার কন্যা দুররাহ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌছে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। অতপর মক্কা বিজয়ের সময়ে তার উভয় পুত্র ওতবা এবং মুয়াত্তাব হযরত আব্বাস (রা)-এর মধ্যস্থতায় নবী (সা)-এর সামনে হাযির হয় এবং ঈমান আনার পর নবী (সা)-এর হাতে বায়আত করে।[২১৪]

নবীকে বহিষ্কার করার জন্যে মক্কাবাসীদের শাস্তি

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۞

“এ ভূখণ্ড থেকে তোমাকে উৎখাত করে এখান থেকে বহিষ্কার করার জন্যে তারা পদ্ধপরিকর হয়েছিল। কিন্তু যদি তারা এরূপ করে তাহলে তোমার পরে স্বয়ং তারা এখানে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না।”–(বনী ইসরাঈল ঃ ৭৬)

এ সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যদিও সে সময় একটা হুমকি মনে করা হচ্ছিল কিন্তু দশ এগারো বছরের মধ্যে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। এ সূরা নাযিল হওয়ার এক বছর পরে নবী (সা)-কে তারা মক্কা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে। তারপর আট বছরের বেশিকাল অতিবাহিত না হতেই তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কা প্রবেশ করেন। তারপর দু' বছরের মধ্যেই সমস্ত আরব ভূখণ্ডে মুশরিকদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। যারাই তখন আরবে অবস্থান করছিল মুসলমান হিসেবেই করছিল। মুশরিকদের কোনো স্থানই সেখানে ছিল না।[২১৫]

কুরাইশ দলের পরাজয়

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝ (القمر : ٤٥)

“অতি শীগ্‌গির এ দল পরাজয়বরণ করবে এবং তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করতে দেখা যাবে।”–(সূরা আল কামার ঃ ৪৫)

হিজরতের পাঁচ বছর আগে এ সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, যে কুরাইশ দল নিজের শক্তির গর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করতো তারা শীগ্‌গির মুসলমানদের নিকটে পরাজয়বরণ করবে। কেউ তখন এ ধারণাই করতে পারতো না যে, অদূর ভবিষ্যতে কিভাবে এ বিপ্লব সাধিত হবে। মুসলমানদের দুরবস্থা এমন ছিল যে, তাদের একদল দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে এবং অবিশিষ্ট ঈমানদারগণ শেয়াবে-আবি তালেবের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। কুরাইশগণ তাঁদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পর্বত গুহায় তাঁদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল বলে তাঁরা অনাহারে মরছিলেন। এ অবস্থায় কে এ ধারণা করতে পারতো যে, সাত বছরের মধ্যে পট পরিবর্তন হয়ে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর শাগরিদ একরামার বর্ণানায় দেখা যায় যে, হযরত ওমর (রা) বলেন, যখন সূরা কামারের এ আয়াত নাযিল হয় তখন আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে, এ আবার কোন্ দল যে, পরাজিত হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে যখন কাফেরগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখলাম যে, আল্লাহর রসূল (সা) যুদ্ধের পোশাক পরিহিত অবস্থায় সামনের দিকে এগুচ্ছিলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এ কথাগুলো বেরিয়ে আসছিল ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ -

“তখন আমি বুঝলাম যে, এটাই হচ্ছে সেই পরাজয় যার সংবাদ আগে দেয়া হয়েছিল।”–(ইবনে জারীর ইবনে আবি হাতিম)[২১৬]

মক্কা বিজিত হবে

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُونَ ۝ (الصفت : ١٧٣)

“আমাদের সেনাগণ অবশ্যই বিজয়ী হবে।”–(সূরা আস্ সাফ্‌ফাত ঃ ১৭৩)

অর্থাৎ কুরাইশ কাফেরগণ অল্পকাল মধ্যেই নিজেদের পরাজয় এবং তোমাদের বিজয় সচক্ষে দেখতে পাবে। যেমনভাবে বলা হয়েছিল তেমনিই ঘটলো। এ আয়াতগুলো নাযিল

হওয়ার চৌদ্দ-পনেরো বছর পরেই মক্কার কাফেরগণ নবী (সা)-কে বিজয়ের বেশে মক্কা প্রবেশ করতে নিজ চোখে দেখতে পেলো। অতপর কয়েক বছর পর তারা এটাও দেখলো যে, ইসলাম শুধু মক্কার ওপরেই নয়—রোম ও ইরান সাম্রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলো।[২১৭]

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ○ (ص : ١١)

"এতো দলগুলোর মধ্যে একটা ছোট্ট দল যা এ স্থানেই একদিন পরাজিত হবে।"

এ স্থান বলতে মক্কার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে স্থানে এসব লোক (কুরাইশ কাফেরগণ) বড় বড় কথা বলছে, সেখানেই তারা একদিন পরাজয়বরণ করবে। এখানেই তাদের জন্যে সে সময় আসবে যখন তারা নতশিরে নবীর সামনে দাঁড়াবে যাঁকে আজ তারা হেয় মনে করে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।[২১৮]

কুরআনের দাওয়াত চারদিকে অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط

"অতি শীগ্গিরে আমি তাদেরকে উর্ধ্বজগতে ও তাদের আপন সত্তার মধ্যে আমার নিদর্শন দেখাবো। অতপর তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন প্রকৃতপক্ষে এক মহাসত্য।"–(সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৫৩)

অর্থাৎ অবিলম্বে তারা আপন চোখে দেখতে পাবে যে, এ কুরআনের দাওয়াত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এরা স্বয়ং তার সামনে নতশির। সে সময়ে তারা বুঝতে পারবে যে, আজ যা কিছু তাদেরকে বলা হচ্ছে এবং যা তারা মানতে অস্বীকার করছে তা একেবারে সত্য।

কিছু লোক প্রশ্ন তুলছে যে, কোনো দাওয়াতের বিজয়ী হওয়া এবং বিরাট বিরাট এলাকা জয় করে নেয়া তার সত্য হওয়ার প্রমাণ নয়। বাতিল দাওয়াতও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার অনুসারীগণও দেশের পর দেশ জয় করে চলে।

আসলে বিষয়টির সামগ্রিক দিকের ওপর গভীর মনোনিবেশ না করে তার বাহ্যিক দিকের ওপর এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামের যে আশ্চার্য ধরনের বিজয় লাভ হয়েছিল তা নিছক এ অর্থে আল্লাহর নিদর্শন ছিল না যে, মুসলমানগণ দেশের পর দেশ জয় করেছিল। বরং এ অর্থে যে, এ বিজয় অন্যান্য বিজয়ের মতো ছিল না। অন্যান্য বিজয়ের অবস্থা এই যে, কোনো ব্যক্তি, পরিবার অথবা জাতি বিজয় লাভের পর বিজিতদের জীবন ও ধন-সম্পদের মালিক হয়ে বসে এবং খোদার যমীন যুলুম অত্যাচারে ভরে যায়। পক্ষান্তরে ইসলামের বিজয় তার সাথে বয়ে এনেছিল এক বিরাট ধর্মীয়, নৈতিক, মানসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং তাহ্যিব-তামাদ্দুন সম্পর্কিত বিপ্লব। এ বিপ্লবের প্রভাব যেখানেই পৌছেছে, মানুষের সর্বোত্তম গুণাবলীর বিকাশ ঘটছে এবং অসৎ গুণাবলী দমিত হয়েছে। দুনিয়া যেসব গুণাবলী সংসার ত্যাগী দরবেশ এবং নীরবে আল্লাহ আল্লাহ যিকিরকারীদের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল এবং কখনো এ চিন্তা করতে পারেনি যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপানা পরিচালনাকারীদের মধ্যেও এসব গুণাবলী পাওয়া যেতে পারে। সেসব চারিত্রিক গুণাবলী এ বিপ্লবের বদৌলতে দেখতে

পাওয়া গেল শাসকের রাজনীতিতে, আদালতের সুবিচারে, সেনানায়কদের যুদ্ধ ও বিজয় লাভে, কর আদায়কারীদের মধ্যে, বিরাট বিরাট ব্যবসার মালিকদের মধ্যে। এ বিপ্লব তার প্রতিষ্ঠিত সমাজে সাধারণ মানুষকে চরিত্র, কর্মকুশলতা ও পবিত্রতার দিক দিয়ে এতো উন্নীত করে যে, অন্যান্য সমাজের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণও নিম্নস্তরের মনে হয়েছে। ইসলাম মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের শৃঙ্খলামুক্ত করে বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনা ও কাজের রাজপথে এনে দিয়েছে। অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থা যেসব সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের কোনো চিন্তা-ভাবনাই করে না, ইসলাম তার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেছে। অথবা তারা চিকিৎসার চিন্তা করলেও এ ব্যাপারে সফলকাম হতে পারেনি। যেমন ধরুন, বর্ণ, বংশ, মাতৃভূমি, ভাষা প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ, একই সমাজে শ্রেণী বিভাগ এবং তাদের মধ্যে উঁচু-নীচের পার্থক্য, ছুঁৎমার্গ, আইনগত অধিকার এবং ব্যবহারিক সামাজিকতায়, সাম্যের অভাব, নারীর লাঞ্ছনাময় জীবন এবং মৌলিক অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিতকরণ, অপরাধের আধিক্য, মদ এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্যাদির সাধারণ প্রচলন, সরকারের সমালোচনার ঊর্ধে থাকা, মৌলিক অধিকার থেকে জনগণকেও বঞ্চিত রাখা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চুক্তির অবমাননা, যুদ্ধে পৈশাচিক আচরণ এবং এ ধরনের বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধি, স্বয়ং আরব ভূ-খণ্ডে এ বিপ্লব দেখতে দেখতে অরাজকতার স্থানে আইন-শৃঙ্খলা, হত্যাকাণ্ড ও নিরাপত্তাহীনতার স্থলে শান্তি শৃংঙ্খলা, পাপাচারের স্থানে খোদাভীতি ও পবিত্রতা, অন্যায়-অবিচারের স্থানে সুবিচার, অপবিত্রতা ও অসভ্যতার স্থলে পবিত্রতা ও সভ্যতা, অজ্ঞতার স্থলে জ্ঞান লাভ, বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্ব কলহের পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম ভালবাসা সৃষ্টি করল। উপরন্তু যে জাতির লোক আপন গোত্রীয় নেতৃত্বের বেশি কিছু চিন্তাও করতে পারতো না, তাদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হলো। এসব ছিল সেসব নিদর্শন—যা ঐ বংশধরগণ তাদের আপন চোখে দেখতে পেয়েছিল যাদেরকে সম্বোধন করে নবী (সা) প্রথমে এ আয়াত পড়ে শুনিয়েছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এ নিদর্শনাবলী ক্রমাগত দেখিয়ে চলেছেন। মুসলমানগণ তাদের পতন যুগেও চরিত্রের যে মহত্ব প্রদর্শন করেছে তার ধারে কাছেও তারা পৌঁছতে পারেনি—যারা সভ্যতা ও ভদ্রতার ধারক-বাহক বলে গর্ব করে বেড়াচ্ছে। ইউরোপীয় জাতিসমূহ আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া এবং স্বয়ং ইউরোপের বিজিত জাতিসমূহের সাথে যে উৎপীড়নমূলক আচরণ করেছে, মুসলমানদের ইতিহাসের কোনো কালেও তার নজীর পেশ করা যাবে না। এ শুধুমাত্র কুরআন পাকেরই বরকত যা মুসলমানদের মধ্যে এতোটা মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি করেছিল যে, তারা বিজয়ী হওয়ার পরও ততটা অত্যাচারী হতে পারেনি—যতটা অমুসলিমদের ইতিহাসের সকল যুগেই তাদেরকে অত্যাচারী হিসেবে দেখা গেছে এবং এখনো দেখা যাচ্ছে। কারো চোখ থাকলে সে দেখুক যে, স্পেনে মুসলমানগণ কয়েকশ' বছর শাসন করেছে কিন্তু সে সময়ে খৃষ্টানদের সাথে তারা কোন্ ধরনের আচরণ করেছে। তারপর খৃষ্টানরা যখন সেখানে ক্ষমতা লাভ করলো তখন তারা মুসলমানদের সাথে কি ব্যবহার করেছে। ভারতে আটশ' বছরের অধিককাল রাজত্ব করেও মুসলমানগণ হিন্দুদের সাথে কোন্ ধরনের আচরণ করেছে। আর এখন হিন্দু সেখানে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুসলমানদের সাথে কি ব্যবহার করছে। ইহুদীদের সাথে বিগত তেরশ' বছর মুসলমানদের আচরণ কি ছিল। আর এখন ফিলিস্তিনে তারা মুসলমানদের সাথে কোন্ ধরনের আচরণ করছে।[২১৯]

নবী পাকের জন্যে উচ্চ মর্যাদা

إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ إِلٰى مَعَادٍ ط

"(হে নবী!) নিশ্চিত জেনে রাখ যে, যিনি এ কুরআন তোমার ওপরে ফরয করেছেন তিনি তোমাকে এক সর্বোৎকৃষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবেন।"-(সূরা কাসাস ঃ ৮৫)

আসল শব্দগুলো হচ্ছে لرادك الى معاد তোমাকে একটি 'মায়াদের' দিকে ফিরিয়ে দিবেন। মায়াদ (معاد)-এর আভিধানিক অর্থ এমন স্থান যেদিকে সর্বশেষে মানুষকে প্রর্তাবর্তন করতে হয়। এ পদটি Indefinite (অনির্দিষ্ট) হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় স্বভাবতঃই তার মর্ম এই হয় যে, স্থানটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। কোনো কোনো তফসীরকার তার অর্থ করেছেন বেহেশত। কিন্তু একে বেহেশতের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন— তাই হতে দেয়া উচিত যাতে করে এ স্থানের প্রতিশ্রুতি দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে। আলোচ্য বিষয়ের পূর্ব প্রসঙ্গও এটাই দাবী করে যে, শুধু আখেরাতেই নয় বরং দুনিয়াতেও নবী মুস্তফা (সা)-কে শেষ পর্যন্ত বিরাট মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি হিসেবে এটাকে মনে করতে হবে। মক্কার কাফেরদের যে কথার ওপরে ৫৭ আয়াত থেকে এ পর্যন্ত ক্রমাগত যে আলোচনা চলে আসছে তাতে তারা বলেছিল, 'হে মুহাম্মদ (সা) তুমি তোমার সাথে আমাদেরকেও নিয়ে ডুবতে চাচ্ছ। যদি আমরা তোমাকে সমর্থন করি এবং তোমার দ্বীন গ্রহণ করি তাহলে আরব ভূ-খণ্ডে আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।' তার জবাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেন, 'হে নবী ! যে খোদা এ কুরআনের পতাকাবাহী হওয়ার দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করেছেন, তিনি তোমাকে ধ্বংস করবেন না। বরং তোমাকে এমন মর্যাদায় ভূষিত করবেন যার ধারণাও এ লোকেরা করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কয়েক বছর পরই এ দুনিয়ার বুকেই তাদের চোখের সামনে নবী (সা)-কে সমগ্র আরব ভূখণ্ডের একচ্ছত্র আধিপত্য দান করে দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁকে প্রতিরোধ করার কোনো শক্তিই টিকে থাকতে পারল না এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দ্বীনেরও কোনো স্থান সেখানে রইলো না। সমগ্র আরব ভূখণ্ডে এমন এক ব্যক্তির একচ্ছত্র বাদশাহী কায়েম হয়েছে যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বি কেউ ছিল না এবং মানুষ শুধু তার রাজনৈতিক আধিপত্যই মেনে নেয়নি বরং সে ব্যক্তি সকল দ্বীনের অবসান ঘটিয়ে গোটা জাতিকে তার দ্বীনের অনুসারী বানিয়েছে আরবের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এমন কোনো নজীর ছিল না।[২২০]

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যে মাকামে মাহমুদ

عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (بنى اسرائيل : ٧٩)

"অতি শীগ্‌গির তোমার প্রভু তোমাকে 'মাকামে মাহমুদে' অধিষ্ঠিত করবেন।"

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাকে এমন মর্যাদায় ভূষিত করবেন যেখানে তুমি হবে সমগ্র সৃষ্টির প্রশংসিত। চারদিক থেকে তোমার প্রতি প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে

এবং তোমার সত্তা একটি প্রশংসনীয় সত্তায় পরিণত হবে। আজ তোমার বিরুদ্ধবাদীরা তোমায় অভ্যর্থনা করে গালি ও ভর্ৎসনা দ্বারা এবং সারা দেশে তোমার দুর্নাম করার জন্যে মিথ্যা অভিযোগের ঝড় সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু সে সময় বেশী দূরে নয়, যখন দুনিয়ায় তোমার প্রশংসার গুঞ্জরণ শুনা যাবে এবং আখেরাতেও তুমি সকল সৃষ্টির দ্বারা প্রশংসিত হবে। কেয়ামতের দিনে শাফায়াতকারী হিসেবে নবী মুস্তফা (সা)-এর মর্যাদা লাভ তাঁর মাহমুদিয়াতের (প্রশংসিত হওয়ার) একটা অংশ।২২১

পরাজিত রোম সাম্রাজ্যের জন্যে জয়লাভের সুসংবাদ

সূরা রুমের প্রাথমিক আয়াতগুলোতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার এবং মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) আল্লাহর সত্য নবী হওয়ার সুস্পষ্ট সাক্ষ্যগুলোর অন্যতম। এ কথা বুঝতে হলে সে সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি নজর দেয়া বিশেষ প্রয়োজন যা এ সূরার আয়াতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

নবী মুস্তফা (সা)-এর নবুয়াতের আট বছর পূর্বের ঘটনা এই যে, রোম সম্রাট মরিসের (Maurice) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং ফোকাস (Phocas) নামে জনৈক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহন করে। সে ব্যক্তি সম্রাটের চোখের সামনে তাঁর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করে। অতপর পিতাকে হত্যা করে পিতা-পুত্রের ছিন্ন মস্তকগুলো কন্স্ট্যান্টিনোপলে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখে। তার ক'দিন পর তার স্ত্রী এবং তিন কন্যাকেও হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর ইরান সম্রাট খসরু পারভেজ রোম সাম্রাজ্যে আক্রমণ করার নৈতিক অজুহাত পেয়ে গেলেন। মরিস তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং তাঁর সাহায্য সহযোগিতায় পারভেজ ইরানের সিংহাসন লাভ করেন। পারভেজ তাঁকে পিতার মতো মনে করতেন। এ জন্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, হানাদার ফোকাস তাঁর পিতৃতুল্য মরিস ও তাঁর পরিবারের প্রতি যে পৈশাচিক আচরণ করেছে তিনি তাঁর প্রতিশোধ নেবেন। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ফোকাসের সেনাবাহিনীকে ক্রমাগত পরাজিত করতে থাকেন এবং এভাবে এশিয়া মাইনরের এডিসা (বর্তমান উর্ফা) পর্যন্ত এবং অন্যদিকে সিরিয়ার হালব ও এন্তাকিয়া পর্যন্ত পৌঁছেন। রোমীয় শাসকগণ যখন দেখলো যে, ফোকাস দেশ রক্ষা করতে পারছে না তখন তারা আফ্রিকার গভর্নরের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হলো। সে তার পুত্র হেরাক্লিয়াসকে (Heraclius) একটা শক্তিশালী বাহিনী-সহ কন্স্ট্যান্টিনোপলে পাঠিয়ে দিল। সে পৌঁছামাত্র ফোকাসকে সিংহাসনচ্যুত করলো। তার স্থলে হেরাক্লিয়াসকেই রোমের কায়সার বা শাসক বানানো হলো। ক্ষমতালাভের পর সে ফোকাসের সাথে ঠিক ঐরূপ আচরণ করলো—যেমন ফোকাস মরিসের প্রতি করেছিল। এ হলো ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা এবং ঠিক এ বছরই নবী মুহাম্মদ (সা)-কে নবুয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছিল।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ফোকাসের সিংহাসন-চ্যুতি ও হত্যার পর তা শেষ হয়ে গেল। তাঁর যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি ফোকাসের অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিশোধ নেয়াই হতো, তাহলে তার নিহত হওয়ার পর নব নিযুক্ত কায়সারের (হেরাক্লিয়াস) সাথে তাঁর সন্ধি করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখলেন। এখন তিনি এ যুদ্ধকে ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে মজুসীদের ধর্মীয় যুদ্ধের রূপদান করলেন। ঈসায়ীদের যে সম্প্রদায়গুলোকে (নাস্তুরী, ইয়াকুবী প্রভৃতি) সরকারী গীর্জা নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করে তাদের ওপর বছরের পর বছর ধরে উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল তারা মজুসী

আক্রমণকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লো এবং ইহুদীরাও মজুসীদের সাথে হাত মিলালো। এমনকি খসরু পারভেজের সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী ইহুদীদের সংখ্যা ছাব্বিশ হাজারে পৌঁছলো।

হেরাক্লিয়াস এ প্লাবণ রুখতে পারলো না। সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্র তার কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, এন্তেকাফিয়া ইরানীদের হস্তগত হয়েছে। তারপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইরানীগণ দামেস্ক জয় করে। পর বছর বায়তুল মাকদেস জয় করে ইরানীগণ খৃস্টানদের ওপর ধ্বংসলীলা শুরু করে। এ শহরে নব্বই হাজার খৃষ্টানকে হত্যা করা হয়। তাদের সবচেয়ে পবিত্র গীর্জা কানিসাতুল কেয়ামাহ্ সমাধিস্তম্ভ (Holy Sepulchre) ধ্বংস করা হয়। প্রকৃত ক্রস বা দণ্ডকাষ্ঠ, যে সম্পর্কে খৃষ্টানদের এ বিশ্বাস ছিল যে, এর ওপরেই যীশু খৃস্ট জীবন দিয়েছিলেন। ইরানী মজুসীগণ তা ছিনিয়ে নিয়ে মাদায়েনে পাঠিয়ে দেয়। ক্ষমতাসীন পাদরী যাকারিয়া অপহৃত হন এবং শহরের সকল বড় বড় গীর্জাগুলো ধ্বংস করা হয়। এ বিজয় খসরু পারভেজকে কতখানি মদমত্ত করেছিল তার স্বাক্ষর বহন করে একখানি পত্র যা তিনি বায়তুল মাকদেস থেকে হেরাক্লিয়াসের কাছে পাঠান। তাতে তিনি বলেন ঃ

"সকল খোদার বড় খোদা, সমগ্র জাহানের মালিক খসরুর পক্ষ থেকে ঐ হীন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বান্দা হেরাক্লিয়াসের প্রতি তুই বলিস যে, তোর খোদার ওপর তোর ভরসা আছে। তাহলে কেন তোর খোদা আমার হাত থেকে জেরুজালেম রক্ষা করলো না ?

এ বিজয়ের পর এক বছরের মধ্যেই ইরানী সেনাবাহিনী জর্দান, ফিলিস্তিন এবং সিনাই উপত্যকার গোটা অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে মিসর সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এ ছিল এমন এক সময় যখন মক্কায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর একটি সংগ্রাম চলছিল। এখানে তাওহীদের ধ্বজাধারীগণ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে এবং মুশরিকগণ কুরাইশ সর্দারদের অধীন একে অপরের সাথে সংগ্রামরত ছিল। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলো যে, ৬১৫ খৃস্টাব্দে মুসলমানদের একটি বিরাট দল নিজ নিজ ঘর-বাড়ী ছেড়ে আবিসিনিয়ার একটি খৃস্টান রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। আবিসিনিয়া ছিল রোমের বন্ধুরাষ্ট্র। সে সময়ে রোমের ওপর ইরানীদের বিজয়ের চর্চা সকলের মুখেই শুনা যেতো। মক্কায় মুশরিকগণ আনন্দে নাচতো এবং মুসলমানদেরকে বলতো, দেখ, ইরানের অগ্নি উপাসকগণ বিজয় লাভ করছে এবং অহী ও রেসালাতে বিশ্বাসীগণ পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করছে। এমনি আমরা আরবের প্রতিমা-পূজকগণ তোমাদের দ্বীনকে নির্মূল করে দিব।"

এরূপ পরিস্থিতিতে কুরআন পাকের এ সূরা নাযিল হয়। তাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হচ্ছে যে, নিকটস্থ ভূখণ্ডে রোমীয়গণ পরাজিত হয়েছে। কিন্তু তাদের পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে। সেটা এমন একদিন হবে যে, আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিজয়ে মুসলমানগণ খুশী হবে।

এ কথার মধ্যে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এক ঃ রোমীয়গণ বিজয় লাভ করবে। দুই ঃ মুসলমানদেরও সে সময়ে বিজয়সূচিত হবে। দৃশ্যতঃ সুদূর ভবিষ্যতেও এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না যে, এ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কোনো একটিও কয়েক বছরের মধ্যে সফল হবে। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় মুসলমান যারা মক্কায় নিষ্পেষিত-নির্যাতিত হচ্ছিল এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর আট বছর পর্যন্ত তাদের বিজয় লাভ করার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল

না। অন্যদিকে রোমীয়দের পরাজয় দিন দিন বেড়ে চলছিল। ৬১৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গোটা মিসর ইরানীদের হস্তগত হয় এবং মজুসী সেনাগণ তারাবেলিস (ত্রিপলী) সীমান্ত পর্যন্ত তাদের পতাকা উড্ডীন করে। এশিয়া, মাইনর পর্যন্ত ইরানী সেনাগণ রোমীয়দের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের অবশিষ্ট বাহিনী বস্ফোরাসের তীরভূমিতে উপনীত হয়। ৬১৭ খৃস্টাব্দে তারা কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের সম্মুখস্থ খালেকদুন (Chaleedon) বর্তমানে কাজীকুই দখল করে বসে। রোমের কায়সার ইরানের খসরুর নিকটে তার দূত প্রেরণ করে সবিনয়ে নিবেদন জানায় যে, সে যে কোনো মূল্যে সন্ধি করতে রাজী আছে। কিন্তু জবাবে খসরু বলেন, আমি কায়সারকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিব না যতোক্ষণ না সে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আমার সামনে হাযির হয় এবং ক্রুশবিদ্ধ খোদাকে পরিত্যাগ করে অগ্নি খোদার বন্দেগী কবুল করে। অবশেষে খসরু এতটা পরাজয়মনা হয়ে পড়ে যে, কন্‌স্ট্যান্টিনোপল ছেড়ে কার্থেজ (বর্তমান তিউনিস) চলে যেতে মনস্থ করে। ঐতিহাসিক গীবনের ভাষায়, কুরআন মজীদের এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর সাত আট বছর পর্যন্ত এমন অবস্থা বিরাজ করছিল যে, কেউ এ ধারণাই করতে পারতো না যে, রোমীয়গণ ইরানের ওপর বিজয়ী হবে। বিজয়ী হওয়া তো দূরের কথা, সে সময় পর্যন্ত কেউ এ আশা পোষণ করতে পারেনি যে, এ রাজ্যটি জীবিত থাকবে।*

কুরআনের এ আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন মক্কার কাফেরগণ এ নিয়ে খুব বিদ্রূপ-উপহাস করতে থাকে। উবাই বিন খালফ হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে বাজি রেখে বলল, "যদি তিন বছরের মধ্যে রোমীয়গণ বিজয়ী হয় তো আমি দশ উট দিব, অন্যথায় দশ উট তোমাকে দিতে হবে। এ বাজি রাখার খবর নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, কুরআনে فى بضع سنين শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে এবং আরবী ভাষায় এর মেয়াদ দশের মধ্যে হয়। এ জন্যে দশ বছরের মধ্যে সময়কালের শর্ত কর এবং উটের সংখ্যা বাড়িয়ে একশ' কর।

অতপর হযরত আবু বকর উবায়ের সাথে পুনরায় দেখা করেন এবং নতুন করে এ শর্ত স্থিরীকৃত হল যে, দশ বছরের মধ্যে যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে তাকে একশ' উট দিতে হবে।

৬২২ খৃস্টাব্দে নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনা গমন করেন। ওদিকে কায়সার হেরাক্লিয়াস চুপে চুপে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে কৃষ্ণসাগরের পথে তারাবজুনের দিকে যাত্রা করে এবং পেছন দিক থেকে ইরানীদের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতির জন্যে কায়সার গীর্জার নিকট অর্থ সাহায্য চাইলো এবং খৃস্টীয় গীর্জার সর্বপ্রধান ধর্মাধ্যক্ষ সার্জিয়াস (Serjius) খৃস্টবাদকে মজুসীবাদ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গীর্জায় উপঢৌকনস্বরূপ সঞ্চিত ধন-সম্পদ সুদে ঋণ দান করেন। হেরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃস্টাব্দে আরমেনিয়া থেকে তার আক্রমণ শুরু করে এবং পর বছর ৬২৪ খৃস্টাব্দে আযারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুস্ত্রের জন্মস্থান উরমিয়া ধ্বংস করে দেয় এবং ইরানীদের অগ্নিউপাসনা মন্দির ধূলিসাৎ করে। খোদার কুদরতের লীলা এই যে, একই বছরে বদর প্রান্তরে প্রথমবার মুসলমানগণ কাফেরদের ওপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন। এভাবে সূরায়ে রোমে বর্ণিত উভয় ভবিষ্যদ্বাণী দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে একই সাথে কার্যকর হয়।

---

* Gilbon-Decline & Fall of the Roman Empire, Vol. II, p. 788, Modern Library, New York.

অতপর রোমীয় সৈন্যগণ ইরানীদেরকে ক্রমাগত পরাভূত করতে থাকে। নিনওয়ার চূড়ান্ত যুদ্ধে (৬২৭ খৃঃ) তারা ইরানী সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। তারপর ইরানী বাদশাহদের বাসস্থান দাস্তগির্দ (দাস্তেরাতুল মিলক) ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং রোমীয়গণ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে টেসিফুনের (Ctesiphon) সম্মুখে উপনীত হয় যা সেকালে ইরানের রাজধানী ছিল। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে খসরু পরভেজের বিরুদ্ধে পারিবারিক বিদ্রোহ শুরু হয় এবং তাঁকে বন্দী করা হয়। তাঁর চোখের সামনে তাঁর আঠার জন সন্তানকে হত্যা করা হয়। কিছুদিন পর কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। এ বছরেই হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়—যাকে কুরআন 'বিরাট বিজয়' বলে অভিহিত করে। এ বছরেই খসরু পরভেজের পুত্র দ্বিতীয় কোব্বাদ অধিকৃত যাবতীয় রোমীয় অঞ্চল ইরানের দখলমুক্ত করে এবং আদিক্রুশ প্রত্যার্পণ করে রোমীয়দের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। ৬২৯ খৃষ্টাব্দে 'পবিত্র ক্রুশ' সস্থানে রাখার উদ্দেশ্যে স্বয়ং কায়সার বায়তুল মাকদেস গমন করে। এ বছরেই নবীপাক (সা) কাযা ওমরাহ আদায় করার জন্যে হিজরতের পর প্রথম মক্কা প্রবেশ করেন।

এরপর কারো মনে সন্দেহের কণামাত্র রইল না যে, কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। আরবের বহুসংখ্যক মুশরিক এর ওপর ঈমান আনে। ওবাই বিন খালফের ওয়ারিশগণকে বাজিতে হারার পর তার শর্ত পালনের জন্যে হযরত আবু বকর (রা)-এর হাতে একশ' উট অর্পণ করতে হয়। এসব উট নিয়ে আবু বকর নবীর কাছে হাযির হন। নবী এসব উট সদকা করে দিতে বলেন। শর্ত এমন সময় হয়েছিল যখন শরীয়াতে জুয়া হারাম করা হয়নি। এখন হারাম হওয়ার নির্দেশ এসেছিল। এ জন্যে হরবী (যুদ্ধরত) কাফেরদের সম্পদ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হলেও নির্দেশ দেয়া হল যে, তা নিজে ব্যবহার না করে সদকা করে দেয়া হোক।২২২

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ ط (الروم : ٤-٥)

"এবং সেদিন এমন একদিন হবে যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ের জন্যে মুসলমানগণ আনন্দে উল্লষিত হবে।"–(সূরা আর রোম ঃ ৪)

ইবনে আব্বাস (রা), আবু সাঈদ খুদরী (রা), সুফিয়ান সাওরী, সুদ্দী প্রমুখ মনীষীগণ বলেছেন যে, ইরানীদের ওপর রোমীয়দের বিজয় এবং বদরে মুশরিকদের ওপরে মুসলমানদের বিজয় একই বছরে হয়েছিল। এ জন্যে মুসলমানদের দ্বিগুণ আনন্দ হয়েছিল। এ কথা ইরান এবং রোমের ইতিহাস দ্বারাও প্রমাণিত। ৬২৪ খৃষ্টাব্দে বদর যুদ্ধ হয়েছিল, এ বছরেই রোমের কায়সার জরথুস্ত্রের জন্মস্থান ধ্বংস করেছিল এবং ইরানের সর্ববৃহৎ অগ্নি-উপাসনা মন্দির ধূলিসাৎ করে।২২৩

ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণ*

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ط

* এ কুরআনের বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী যা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নুবয়াত এবং কুরআনের সত্যতার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। যে সময়ে কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী শ্রুতিগোচর হয়, তখন পর্যন্ত মিসরের ফেরাউনদের কবর ও লাশগুলোর অবস্থা জানা যায়নি। মমি ঘরগুলোতে প্রবেশ এবং ফেরাউনদের কবর ও তাবুত উন্মুক্ত করার কাজ সাম্প্রতিকালে হয়েছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কারও এ কথা জানা ছিল না যে, হযরত মূসার সমসাময়িক ফেরাউন ডুবে মরার পর তার লাশ রক্ষিত আছে কি নেই। তিন হাজার বছরের অধিককালের প্রাচীন ঘটনা সম্পর্কে সম্প্রতি যে তথ্য উদঘাটিত হয়েছে তাতে কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রমাণ কুরআন অবিশ্বাসকারীদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

"এখন তো আমরা শুধু তোমার লাশ রক্ষা করব যাতে করে পরবর্তী বংশধরদের জন্যে তা একটা শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে রয়ে যায়।"-(সূরা ইউনুস ঃ ৯২)।

সিনাই উপত্যকার পশ্চিম তীরে এখনও সে স্থান বিদ্যমান আছে যেখানে ফেরাউনের লাশ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এ স্থানকে এখন জাবালে ফেরাউন বলা হয়। তার নিকটে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে ফেরাউনের হাম্মাম বলে। এর অবস্থান আবু যায়নামার কয়েক মাইল উত্তরে ওপর দিকে। ফেরাউনের লাশ এখানে পড়েছিল বলে স্থানীয় অধিবাসীগণ স্থানটিকে চিহ্নিত করে রেখেছে।

জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণকারী ফেরাউন যদি সে ব্যক্তিই হয় যাকে সম্প্রতিকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের ফলে হযরত মূসা (আ)-এর সমসাময়িক বলা হয়েছে, তাহলে তার লাশ এখন কায়রোর যাদুঘরে দেখতে পাওয়া যাবে। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে স্যার গ্রাফটন এলিট স্মিত যখন তার মমি থেকে আবরণ উন্মোচন করেন, তখন তার লাশের ওপর জমাট বাঁধা লবণ দেখতে পাওয়া যায় এবং এটা তার সাগরের লবণাক্ত পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ অর্থাৎ "আমরা তো শিক্ষণীয় নিদর্শনাদি দেখাতেই থাকব যদিও অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এই যে, বড় বড় শিক্ষণীয় নিদর্শন দেখেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না।"[২২৪]

ইয়াজুজ মাজুজের বিশ্বব্যাপী হামলা

ইয়াজুজ বলতে রুশ এবং উত্তর চীনের ঐসব উপজাতীয়দেরকে বুঝায় যারা তাতারি, মঙ্গোলি, হুন, সিথিয়ান প্রভৃতি নামে অভিহিত। প্রাচীনকাল থেকে তারা সভ্যতামণ্ডিত দেশগুলোতে হামলা চালাত। উপরন্তু জানা যায় যে, তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কাফকাযের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ এবং দারিয়ালের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। কারণ তাঁদের আক্রমণের গতি যখন তখন এশিয়া এবং ইউরোপের উভয় দিকে প্রবাহিত হত। বাইবেলে (জন্মবৃত্তান্ত, অধ্যায় ১০) তাদেরকে হযরত নূহের পুত্র ইয়াফেসের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও তাই বলেছেন। হাযাকিয়েলের গ্রন্থে (অধ্যায় ৩৮, ৩৯) তাদেরকে রুশ, তোবল (বর্তমান তোবালিস্ক) এবং মিসক (বর্তমান মস্কো) অঞ্চলের অধিবাসী বলা হয়েছে। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসিফোস তাদেরকে সিথিয়ান জাতির বলেছেন, যাদের আবাস্থল কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। জেরুমের বর্ণনা মতে, মাজুজ ককেশিয়ার উত্তরে খাজার সাগরের নিকটে বসতি স্থাপন করে।[২২৫]

তাদেরকে উন্মুক্ত করে দেয়ার অর্থ এই যে, তারা পৃথিবীবাসীদের ওপর এমনভাবে হামলা শুরু করবে যেন কোনো হিংস্র পশুকে হঠাৎ কোনো বদ্ধ খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। 'সত্য প্রতিশ্রুতি পূরণ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়েছে' কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এদিকে করা হচ্ছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের এ বিশ্বব্যাপী আক্রমণ-উপদ্রব আখেরী যামানায় হবে এবং তারপর অতি সত্বরই কেয়ামত হবে। নবী (সা)-এর নিম্ন ভবিষ্যদ্বাণীও এ অর্থকে আরও জোরদার করে যা ইমাম মুসলিম হুযায়ফা বিন আসিদ আল গিফারির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা হল এই যে, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা তার

আগে দশটি আলামত দেখতে পাবে। যেমন, ধূমরাশি, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, ঈসা বিন মরিয়মের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের হামলা-উপদ্রব, তিনটি বড় বড় ভূমি ধস (Land slides -একটি প্রাচ্যে, দ্বিতীয়টি পাশ্চাত্যে এবং তৃতীয়টি আরবে) এবং সর্বশেষে ইয়েমেন থেকে একটি ভয়ানক অগ্নি উত্থিত হয়ে মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে (অর্থাৎ কেয়ামত সংগঠিত হবে)। অন্য একটি হাদীসে ইয়াজুজ-মাজুজের হামলা প্রসঙ্গে নবী (সা) বলেন, পূর্ণ গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব যেমন অত্যাসন্ন হয় এবং তার জানা থাকে না কোন্ মুহূর্তে দিনে না রাতে তার প্রসব হবে ঠিক তেমনি সে সময় কেয়ামত ততটা অতি আসন্ন হয়ে পড়বে।

(كالحامل المتم لايدرى اهلها متى تفجؤهم بولدها ليلا او نهارا)

কিন্তু ইয়াজুজ ও মাজুজ উভয়ে একত্র হয়ে দুনিয়ায় তাদের আক্রমণ-উপদ্রব শুরু করবে কিনা একথা কুরআন এবং হাদীস থেকে সুস্পষ্ট করে বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে, কেয়ামতের নিকটবর্তীকালে তারা একে অপরের ওপরে আক্রমণ করতে থাকবে এবং তাদের যুদ্ধ একটা বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের রূপ ধারণ করবে।[২২৬]

ইহুদীদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই যে, তা হতে থাকবে কেয়ামতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। এতে করে ফিলিস্তিনে ইসরাঈলীদের বর্তমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কিছু যায় আসে না। প্রথমত ইহুদী জাতি সম্পর্কে সামষ্টিকভাবে এ আয়াতটি প্রযোজ্য। তাদের এক এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের ওপর এ আয়াতের মর্ম প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গোটা জাতি হিসেবে তারা যে অবস্থায় জীবনযাপন করবে এ হলো তারই এক বর্ণনা। এর অর্থ এই নয় যে, এ সুদীর্ঘকালের মধ্যে দুনিয়ার কোথাও অল্পকালের জন্যেও তারা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে না। আসলে এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে হলে ইহুদী জাতির সেই ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে যা হযরত ঈসা (আ)-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। সেই ইতিহাস এবং সমষ্টিগতভাবে দুনিয়ায় তাদের যে বর্তমান অবস্থা তা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কুরআন পাকের নিম্নোক্ত বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয় ঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ط

“এবং যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি কয়ামত পর্যন্ত তাদের ওপর কোনো না কোনো ব্যক্তিকে শাসক বানিয়ে দেবেন যে, তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবে।”-(সূরা আল আরাফ ঃ ১৬৭)।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَاثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ-

“তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে (সেখানেই তারা এ লাঞ্ছনার বোঝা বহন করবে)। অবশ্যি কোথাও যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং মানুষের পক্ষ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা তারা পায়, সে অন্য কথা।”-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১২)।

তাদের গোটা ইতিহাস এ কথাই বলে যে, কখনও কখনও দুনিয়ার কোথাও এমন এক শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যে, ইহুদীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং বহিষ্কৃত করেছে। আর কোথাও যদি তারা নিরাপদে থেকে থাকে, তো সেটা তাদের ক্ষমতাবলে নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে কোনো মানব গোষ্ঠীর সাহায্য-সহানুভূতিতেই তা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র ব্রিটিশ এবং আমেরিকার কৃপা ও সহযোগিতায় স্থাপিত হয়েছে এবং বিদ্যমান আছে। এ সহেযাগিতা যেদিন বন্ধ হবে সেদিন ইসরাঈলের কি দশা হয় তা দুনিয়া দেখতে পাবে। আমার ধারণা, আল্লাহ তায়ালা এ জাতিকে নির্মূল করতে চান না, বরং একটা শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে চান। এ জাতির ওপর ক্রমাগত যদি নির্যাতন-নিষ্পেষণ চলতে থাকত, তাহলে তারা দুনিয়ার বুক থেকে বহু পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। আল্লাহ তায়ালা তার আপন হিকমতের দ্বারা এ জাতিকে টিকিয়ে রাখার এ ব্যবস্থা করেছেন যে, কোথাও তাদেরকে পিটানো হচ্ছে, তো কোথাও আশ্রয় মিলে যাচ্ছে। এভাবে তারা বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে না জীবিত না মৃত لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰى এ অবস্থায় দুনিয়ার বুকে টিকে আছে।[২২৭]

হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী

পরিপূর্ণ নিরাপত্তার যুগ

হযরত খাব্বাব (রা) বলেন, একদিন নবী পাক (সা) কা'বা ঘরের ছায়ায় বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে বললাম হে আল্লাহর রসূল ! যুলুম-অত্যাচারের আর অন্ত নেই। আপনি কি আল্লাহর দরবারে দোয়া করছেন না ?

এ কথা শুনে তাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হল এবং তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যাঁরা ঈমানদার ছিলেন তাঁদের ওপর এর চেয়ে ঢের বেশী যুলুম হয়েছে। লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের মাংস ছিন্নভিন্ন করা হত, তাঁদের মাথার ওপর করাত রেখে চিরে ফেলা হত, তথাপি তাঁরা সত্যদ্বীন থেকে সরে পড়েনি। নিশ্চতরূপে জেনে রাখ যে, আল্লাহ এ কাজ সম্পন্ন করেই ছাড়বেন। অবশেষে এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি সানআ' থেকে হাজারা মাউত পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তার ভয় করার থাকবে না কিন্তু তোমরা বড্ডো তাড়াহুড়ো করছ।-(বুখারী)[২২৮]

আরব ও অনারবের ওপর জয়লাভের শর্ত

আবু তালেব নবী মুহাম্মদ (সা)-কে ডেকে বললেন, ভাইপো! এই দেখ, তোমার জাতির লোকেরা আমার কাছে এসেছে। তাদের ইচ্ছা, তুমি একটি ইনসাফপূর্ণ কথায় তাদের সাথে একমত হও। এতে করে তোমার ও তাদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয়ে যাবে। তারপর আবু তালেব কুরাইশ সর্দারদের প্রস্তাব নবীর কাছে রাখলেন। জবাবে নবী (সা) বললেন, চাচা ! আমি তো তাদের সামনে এমন এক বাণী পেশ করছি তা মেনে নিলে সমগ্র আরব তাদের অধীন হবে এবং অন্যান্য দেশ কর দিতে থাকবে।

নবীর এ কথা বিভিন্ন রাবী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

اريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدى اليهم بها العجم الجزية۔

অন্য একটি বর্ণনায় ঃ

ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم۔

অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায়, নবী (সা) আবু তালেবের পরিবর্তে কুরাইশদেরকে সম্বোধন ধরে করে বলেন ঃ

كلمة واحدة تعطو نيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم۔

অন্যত্র ঃ

ارايتم ان اعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم۔

এসব শাব্দিক পার্থক্য সত্ত্বেও সকল বর্ণনার মর্ম একই। অর্থাৎ নবী পাক (সা) তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের সামনে এমন এক বাণী পেশ করছি যা গ্রহণ করলে তোমরা আরব ও আজমের মালিক হয়ে পড়বে। এখন বল দেখি, তোমরা যাকে ইনসাফপূর্ণ

কথা বলছ, সেটা ভাল না, না আমারটা অধিকতর ভাল ? তোমাদের মঙ্গল কি এ কালেমা গ্রহণের মধ্যে আছে না এমনটির মধ্যে যে তোমরা যে অবস্থায় আছ আমি তোমাদেরকে সে অবস্থায় থাকতে দিব এবং নিজে আপন খোদার বন্দেগী করতে থাকব ?[২২৯]

কুরাইশদের রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা

নবী (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যতদিন কুরাইশগণ তাদের চরিত্র উন্নত রাখবে এবং সামষ্টিকভাবে দ্বীনের ধ্বজা বহন করতে থাকবে, আর তাদের মধ্যে দু'জনও যদি সত্যের জন্যে সংগ্রামশীল পাওয়া যায়, তাহলে শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে।

নবী (সা)-এর এ ধারণা এতটা সত্য ছিল যে, তার পরে কয়েক শতক পর্যন্ত ইতিহাস তাঁর সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে থাকে। কুরাইশ গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এমন ছিল যে, খেলাফতে রাশেদার যুগে চারজন খলীফা এ গোত্রই সরবরাহ করে এবং জানা কথা যে, তাঁদের বিকল্প কোনো ব্যক্তিত্ব তখন সমগ্র আরব ভূমিতে ছিল না। অতপর এ গোত্রই প্রসিদ্ধ উমাইয়া শাসন কায়েম করে। এ গোত্রই আব্বাসীয়া শাসনের পত্তন করে। স্পেনে বিরাট শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং মিসরে ফাতেমীয় শাসন এ গোত্রেরই অবদান।[২৩০]

জিহাদ অব্যাহত থাকবে

আমার উম্মতের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। কোনো ন্যায় বিচারকের ন্যায় বিচার অথবা অত্যাচারীর অত্যাচার তা বন্ধ করতে পারবে না। এ প্রাণশক্তিই হর-হামেশা ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করে এসেছে। এ প্রাণশক্তিই পরিবেশের ভয়াবহ চিত্রের সামনে নতি স্বীকার করা থেকে সৎকর্মশীলদেরকে (সালেহীন) বিরত রেখেছে।[২৩১]

মুসলমানের অধঃপতন ইহুদী ও খৃস্টানদের মতোই হবে

নবীপাক (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি এই যে, মুসলমানগণ অবশেষে ইহুদী ও খৃস্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকবে। তারা যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, মুসলমানরাও তা-ই করবে। এমনকি তারা যদি কেউ আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে মুসলমানদের মধ্যেও এমন লোকের আবির্ভাব হবে যাদের দ্বারা এ অপরাধ সংঘটিত হবে।*[২৩২]

মিল্লাতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের রূপরেখা

যদিও এসব ভবিষ্যদ্বাণী মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাক প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়, ইমাম শাতবী মুওয়াফেকাতে এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র) মনসবে ইমামতে যেসব বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তার উদ্ধৃতি এখানে নিরর্থক হবে না ঃ

---

* গ্রন্থকার নবী পাক (সা)-এর এরশাদ অন্য এক সূত্রে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ নবী (সা) বলেন, তোমরাও পূর্ববর্তী উম্মতদের আচার-আচরণ অবলম্বন করবে। এমনকি তারা যদি গোসাপের গর্তে প্রবেশ করে, তোমরাও তা-ই করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইহুদী-নাসারাদের কথা বলছেন। নবী জবাবে বলেন, হ্যাঁ, নবীর এ শুধু সতর্কবাণী নয়, বরং নবীদের উম্মতের মধ্যে অধঃপতন কোনে্ কোন্ পথে এসেছে এবং কিভাবে তার প্রকাশ ঘটেছে, খোদা প্রদত্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নবী পাক তা জানতেন।[২৩৩]

ان اول دينكم نبوة ورحمة وتكون فيكم ماشاء اللّه ان تكون ثم يدفعها اللّه جل جلاله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ماشاء اللّه ان تكون ثم يدفعها اللّه جل جلاله ثم تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء اللّه ان يكون ثم يدفعه اللّه جل جلاله ثم تكون ملكا جبرية فتكون ماشاء اللّه ان تكون ثم يدفعها اللّه جل جلاله ـ

"তোমাদের দ্বীনের সূচনা নবুয়াত এবং রহমত থেকে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন এটাকে অক্ষুণ্ন রাখবেন। অতপর তিনি তার অবসান ঘটাবেন এবং নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত* চলবে যতদিন তিনি চাইবেন। তারপর নিকৃষ্ট ধরনের বাদশাহী চলতে থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এটারও অবসান হবে। তারপর অত্যাচারী শাসকদের শাসন কায়েম হবে। যতদিন আল্লাহ চাইবেন ততদিন তা চলতে থাকবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা তার পরিসমাপ্তি ঘটাবেন।"

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل فى الناس بسنة النبى ويلقى الاسلام بجر انه فى الارض يرضى عنها ساكن السماء وساكن الارض لاتدع السماء من قطر الاصبته مدرار ولا تدع الارض من نباتها وبركاتها شيئا الا اخرجته ـ

"অতপর নবুয়াতের পদ্ধতির সেই খেলাফত হবে—যা মানুষের মধ্যে নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে এবং ইসলাম যমীনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ শাসনব্যবস্থায় আসমানবাসীও খুশী হবে এবং দুনিয়াবাসীও। আসমান প্রাণ খুলে তার বরকতসমূহ বর্ষণ করতে থাকবে এবং যমীন তার গর্ভস্থ সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে।"

আমি বলতে পারি না, সনদের দিক দিয়ে এ রেওয়ায়াতগুলোর কি মর্যাদা। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ ধরনের আর যত বর্ণনা আছে তার সাথে এগুলো সামঞ্জস্যশীল। এতে ইতিহাসের পাঁচটি পর্যায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনটি অতীত হয়েছে এবং চতুর্থটি চলছে। অবশেষে যে পঞ্চম পর্যায়টির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সব রকম লক্ষণ তো এই দেখা যাচ্ছে যে, মানব ইতিহাস দ্রুত সেদিকেই ছুটছে। মানুষের তৈরী সকল প্রকার 'ইজম' পরীক্ষিত হয়েছে। এগুলো নৈরাশ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই যে, তারা মরিয়া হয়ে ইসলামের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।২৩৫

আমীর, ওমরা ও শাসকদের নৈতিক অধঃপতন

انه ستكون بعدى امراء من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه

"আমার পরে কিছু লোক শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে। তাদের মিথ্যাচারীতায় যারা সহযোগিতা করবে এবং অত্যাচারে যারা সাহায্য করবে তারা আমার নয় এবং আমি তাদের নই।–(নাসায়ী)।

* নবী (সা) এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমার পরে খেলাফত ৩০ বছর চলবে এবং তারপর বাদশাহী কায়েম হবে। খেলাফতের মুদ্দৎ ৪১ হিজরীর রবিউল আউয়ালে শেষ হয় যখন হযরত হাসান (রা) মাবিয়া (রা)-এর সপক্ষে খেলাফত থেকে সরে পড়েন।–(গ্রন্থকার)২৩৪

سيكون عليكم ائمة يملكون ازراقكم يحدثونكم فيكذبونكم ويعملون فيسيئون العمل لايرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم فاعطوهم الحق مارضوا به فاذا تجاوزوا فمن قتل على ذالك فهو شهيد ـ(كنز العمال ـ ج ٦ ص ٣٤٧)

"অতি সত্বর তোমাদের ওপর এমন লোক শাসক হবে যাদের হাতে তোমাদের জীবিকার চাবিকাঠি থাকবে। তারা তোমাদের সাথে কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে এবং কাজ করলে মন্দ কাজ করবে। তাদের মন্দকাজের প্রশংসা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ঘোষণা না করলে তারা তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ তারা বরদাশত করে তাদের সামনে সত্যকে তুলে ধর। তারা যদি সীমা অতিক্রম করে এবং কাউকে কতল করা হয়, তাহলে সে হবে শহীদ।"–(কানযুল ওম্মাল)[২৩৬]

দ্বীন পুনর্জাগরণের ধারাবাহিকতা

مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا (যারা তাদের জন্যে তাদের দ্বীনকে সজীব করবে)-এ হাদীসের ব্যাখ্যা।

এ এমন এক বিষয় যার সুসংবাদ দিয়েছেন সত্য সংবাদদাতা নবীপাক (সা) এবং তা আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে।

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِاَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا ـ

"আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শতকের মাথায় এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন যারা তাদের জন্যে তাদের দ্বীনকে সজীব করবে।"

কিন্তু এ হাদীস থেকে কিছু লোক 'তাজদীদ' এবং 'মুজাদ্দিদের' একেবারে এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছেন। তাঁরা على رأس كل ماة -এর অর্থ নিয়েছেন শতাব্দীর শুরু অথবা শেষ। এবং من يجد دلها -এর এ মর্ম নিয়েছেন যে, ইনি অবশ্যই কোনো এক ব্যক্তি হবেন। এর ভিত্তিতে তাঁরা তালাশ করা শুরু করলেন যে, বিগত শতাব্দীগুলোর মধ্যে এমন কে কে ছিলেন যাঁরা শতাব্দীর শুরুতে অথবা শেষে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁরা তাজদীদে দ্বীনের কাজও করেছেন। অথচ رأس মাথাকে বুঝান হয়নি এবং من শব্দটি শুধু এক বচনেই সীমাবদ্ধ নয় راس -এর শাব্দিক অর্থ মাথা এবং শতাব্দীর মাথায় কোনো ব্যক্তির উত্থানের সুস্পষ্ট মর্ম এই যে, তিনি তাঁর যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তাধারা এবং কর্মকাণ্ডের গতিধারার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবেন। من শব্দটি আরবী ভাষায় এক ও বহু উভয় বচনেই ব্যবহৃত হয়। অতএব من থেকে এক ব্যক্তি এবং বহু ব্যক্তি উভয় অর্থই করা যেতে পারে। এর অর্থ গোটা প্রতিষ্ঠান এবং দলও হতে পারে। নবীপাক (সা) যে সুসংবাদ দিয়েছেন তার সুস্পষ্ট মর্ম এই যে, ইনশাআল্লাহ ইসলামী ইতিহাসের কোনো শতাব্দীতেই এমন সব লোকের অভাব হবে না যাঁরা জাহেলিয়াতের ঝড়-তুফানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন এবং ইসলামকে তাঁর সত্যিকাররূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করতে থাকবেন। এটা জরুরী নয় যে, এক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ একই ব্যক্তি হবেন। একই শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন লোক এবং দল এ খেদমত করতে পারেন। এটাও কোনো কথা নয় যে, সমগ্র দুনিয়ার জন্যে একজন মাত্র মুজাদ্দিদ হবেন। একই সময়ে বহু দেশে বহু লোক

তাজদীদে দ্বীনের কাজ করতে পারেন। এটাও জরুরী নয় যে, এ ব্যাপারে যিনিই যতটুকু খেদমত করবেন, তাঁকেই মুজাদ্দিদের মর্যাদায় ভূষিত করা হবে। মুজাদ্দিদের মর্যাদা ও উপাধি একমাত্র ঐসব ব্যক্তিকে দেয়া যায় যাঁরা তাজদীদে দ্বীন বা দ্বীনের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে বিরাট ও মহান অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।[২৩৭]

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের প্রকাশ

একটি হাদীসে আছে—"অতি শীগগির আমার উম্মত বাহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তার মধ্যে একটি মাত্র আখেরাতে নাযাত লাভ করবে। তারা ঐসব লোক হবে যারা আমার সাহাবীদের অনুসরণ করবে।"

হাদীসগুলোতে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসব ফেতনা থেকে দূরে থাকার জন্যে সতর্ক করে দেয়াই এসবের লক্ষ্য।[২৩৮]

মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, হাদীস যাঁচাইকারীগণ এ ব্যাপারে এমন কড়াকড়ি করেছেন যে, তাঁদের একটি দল এ কথা স্বীকারই করেন না যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। আসমাউর-রেজালের (হাদীস বর্ণনাকারী-পরম্পরা) যাঁচাই পর্যালোচনায় জানতে পারা যায় যে, এসব হাদীসের অধিকাংশ রাবী (বর্ণনাকারী) শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ইতিহাস পাঠ করলেও জানা যায় যে, প্রত্যেক দল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থে এসব হাদীস ব্যবহার করেছে এবং নিজেদের কোনো ব্যক্তির ওপর মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত আলামতগুলো আরোপ করার চেষ্টা করেছে।

বর্ণনাগুলোর মধ্যে সত্য ও মনগড়া উপাদান

উপরোক্ত কারণে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো সত্য। কিন্তু বিশদ বর্ণনায় যেসব কথা বলা হয়েছে তার বেশীর ভাগ সম্ভবত মনগড়া। স্বার্থান্বেষীগণ নবীর প্রকৃত এরশাদের সাথে অতিরিক্ত এসব বিষয়-সংযোজন করেছে। বিভিন্ন সময়ে যেসব লোক প্রতিশ্রুত* মাহদীর মিথ্যা দাবী করেছে তাদের সাহিত্যাবলীতে দেখা যায় যে, তাদের সৃষ্ট অরাজকতার পেছনে এসব বর্ণনা উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

---

* হাদীসে যে 'মাহদী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রতিই লক্ষ্য করা যাক। নবী মাহদী শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ 'হেদায়াতপ্রাপ্ত'। 'হাদী' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। মাহদী প্রত্যেক সর্দার, নেতা ও আমীর হতে পারেন যিনি সত্য পথের ওপর অবিচল থাকেন। 'আল মাহদী' বড় জোর অধিকতর বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে—যার উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে আগমনকারী কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার প্রকাশ হওয়া। সে বিশেষ মর্যাদা এভাবে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবীর পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত বিনষ্ট হওয়ার পর অত্যাচার-অবিচারে দুনিয়া জর্জরিত হবে এবং তারপর আগমনকারী ব্যক্তি নতুন করে নবীর পদ্ধতিতে খেলাফত কায়েম করবেন এবং দুনিয়া সুবিচারে পূর্ণ হবে। এ হল আসল কথা যার জন্যে সে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করার লক্ষ্যে 'মাহদী' শব্দের পূর্বে ال যোগ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, মাহদী নামের দ্বারা দ্বীনের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট পদ সৃষ্টি করা হয়েছে যার ঈমান আনা নবীদের ওপর ঈমান আনার অনুরূপ এবং তাঁর আনুগত্য করা নাযাত, ইসলাম এবং ঈমানের শর্ত হয়ে পড়বে। মাহীদ কোনো নিষ্পাপ সত্তা হবে এ ধারণার সপক্ষে হাদীসে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না। আসলে নবী ব্যতীত অন্য কোনো লোকের নিষ্পাপ হওয়ার ধারণাটা শিয়া সম্প্রদায়ের। কুরআন এবং সুন্নাতে এর কোনো দলিল প্রমাণ নেই।[২৪০]

নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশভঙ্গি

আমি নবীপাক (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রতি যতদূর চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, তাতে মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে হাদীসগুলোতে যে ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়, নবীর বর্ণনাভঙ্গী তেমন ছিল না। তিনি অবশ্যি প্রধান প্রধান আলামতগুলো বর্ণনা করতেন কিন্তু খুঁটিনাটি বর্ণনা করা তাঁর পদ্ধতি ছিল না।২৩৯

সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াতগুলোর গরমিল

যখন এসব বর্ণনাগুলোকে একত্র করে একটি অপরটির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়, তখন তাদের মধ্যে বেশীরভাগই গরমিল দেখা যায়। উপরন্তু বনী ফাতেমা, বনী আব্বাস এবং বনী উমাইয়ার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পূর্ণ ইতিহাস যাঁদের সামনে রয়েছে এবং তাঁরা যখন সুস্পষ্ট দেখতে পাননি এ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত দলগুলোর প্রত্যেকের স্বপক্ষে বিভিন্ন রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে এবং রাবীদের (বর্ণনাকারী) মধ্যেও অধিকাংশ এমন যে, তাঁরা কোনো না কোনো একটি দলের সাথে সংশ্লিষ্ট, তখন হাদীসে বর্ণিত সকল খুঁটিনাটি বর্ণনা মেনে নেয়া তাদের জন্যে মুশকিল হয়ে পড়ে। যেমন ওসবের মধ্যে কোনো কোনোটায় কাল পতাকা رايات السود উল্লেখ আছে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, কাল পতাকা বনী আব্বাসের প্রতীক ছিল। উপরন্তু ইতিহাস থেকে এটাও জানতে পারা যায় যে, এ ধরনের হাদীস পেশ করে করে আব্বাসীয় খলিফা মাহদীকে প্রতিশ্রুত মাহদী প্রমাণ করার চেষ্টা চলতে থাকে।২৪১

কামেল মুজাদ্দিদের মর্যাদা

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে, আজ পর্যন্ত কোনো কামেল-মুজাদ্দিদ জন্মগ্রহণ করেননি। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয এ মর্যাদার অধিকারী হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তাঁর পরে যত মুজাদ্দিদ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকে কোনো বিশেষ বিভাগের অথবা কয়েকটি বিভাগে কাজ করেছেন। কামেল মুজাদ্দিদের স্থান এখনও শূন্য আছে কিন্তু বিবেক চায়, প্রকৃতি দাবী করে এবং দুনিয়ার গতিধারাও সে দাবী পেশ করছে যে, এমন একজন 'লীডার' জন্মগ্রহণ করুন। তিনি এ যুগেই জন্মগ্রহণ করুন অথবা কালের বহু আবর্তন-বিবর্তনের পরে করুন, তাঁরই নাম হবে 'আল ইমামুল মাহদী' যার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী নবীপাক (সা)-এর পবিত্র মুখে করা হয়েছে।

আজকাল মানুষ অজ্ঞতাবশত এ নামটি শুনে নাক সিঁটকায়। তাদের অভিযোগ, কোনো আগমনকারী মানুষের প্রতীক্ষায় অজ্ঞ লোকেরা কর্মপ্রবণতা হারিয়ে ফেলেছে। এ জন্যে তাদের অভিমত এই যে, তথ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণ পোষণ করে অজ্ঞ লোক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তা কোনো তথ্যই আদতে নয়। উপরন্তু তারা বলে, সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গায়েবী মহাপুরুষ আগমনের ধারণা পাওয়া যায়। অতএব এসব কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আমি মনে করি, খাতামুন্নাবিয়্যীনের মতো পূর্ববর্তী নবীগণও যদি তাঁদের জাতিকে এ সুসংবাদ দিয়ে থাকেন যে, মানবজাতির পার্থিব জীবন শেষ হবার পূর্বে ইসলাম একবার সমগ্র দুনিয়ার দ্বীন হবে এবং তা যদি কুসংস্কার না হয়, তাহলে মানব রচিত যাবতীয় 'ইজম' ব্যর্থ হওয়ার পর ধ্বংসোন্মুখ মানুষ আল্লাহ-রচিত মতবাদের স্মরণাপন্ন

হতে বাধ্য হবে এবং এ নিয়ামত মানুষ লাভ করবে এমন এক মহান নেতার বদৌলতে যিনি নবীগণের পন্থায় কাজ করে ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করবেন —তাহলে এ কথা বললে তা কুসংস্কার হবে কেন? খুব সম্ভব, নবীগণের মুখ থেকে কথাটা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং অজ্ঞ লোকেরা এর প্রকৃত মর্ম বিকৃত করে তাকে কুসংস্কারের রূপ দিয়েছে।

মাহদী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

কতিপয় নতুনত্বপন্থী আছে যারা ইমাম মাহদীর আবির্ভাব স্বীকারই করে না। মুসলমানদের মধ্যে আবার যাঁরা ইমাম মাহদীর আবির্ভাব স্বীকার করেন, তাঁরাও ভ্রান্ত ধারণার দিক দিয়ে প্রথমোক্ত দলের পেছনে নন। তারা মনে করেন, ইমাম মাহদী লেবাস-পোশাকে সেকেলে ধরনের মৌলভী ও সুফীদের মত হবেন। হঠাৎ একদিন তসবিহ হাতে মাদ্রাসা অথবা খানকার হুজরা থেকে আবির্ভূত হবেন। সঙ্গে সঙ্গে 'আমি মাহদী' বলে ঘোষণা করবেন। আলেম-পীর-দরবেশগণ কেতাব-পত্র নিয়ে হাযির হবেন এবং কেতাবে বর্ণিত আলামত ও হুলিয়া মুতাবেক তাকে যাঁচাই করে চিনে ফেলবেন। অতপর বায়আত হবে এবং জিহাদের ঘোষণা হবে। চিল্লায়রত দরবেশ এবং সকল প্রাচীন পন্থী বুযর্গান তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবেন। নিছক শর্ত পূরণ করার জন্যে তরবারী ব্যবহার করা হবে কিন্তু আসলে সমুদয় কাজকর্ম বরকত এবং রূহানী শক্তিতে সমাধা করা হবে। ফুঁক-ফাঁক এবং অযিফা ইত্যাদির মাধ্যমে যুদ্ধ জয় করা হতে থাকবে। যে কাফেরের ওপর ইমাম মাহদীর নযর পড়বে, সে তৎক্ষণাৎ ছটফট করতে করতে প্রাণত্যাগ করবে। নিছক বদদোয়াতে ট্যাংক, বোমারু বিমান বিকল হয়ে পড়বে।

মাহদী সম্পর্কে গ্রন্থকারের ধারণা

ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ঐরূপ যেমন বর্ণনা করা হল। কিন্তু আমি যা বুঝেছি তা বিলকুল এর বিপরীত। আমার মনে হয় আগমনকারী তাঁর যুগের নেতা হবেন। যুগের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর তাঁর গবেষণামূলক দূরদর্শিতা থাকবে। জীবনের যাবতীয় জটিল সমস্যাবলী তিনি উপলব্ধি করবেন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তামূলক রাষ্ট্র, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামরিক কলাকৌশলের দিক দিয়ে গোটা দুনিয়ার ওপর তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করবেন। তাঁর যুগের সকল অভিনবত্বের শীর্ষে তিনি আরোহণ করবেন। আমার আশংকা হয় যে, তাঁর নতুনত্বের বিরুদ্ধে মৌলভী ও সূফী সাহেবান হৈচৈ শুরু করবেন। আমি এটাও মনে করি না যে, দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষ থেকে একেবারে ভিন্ন ধরনের হবেন যে, তাঁকে দেখলেই চিনে ফেলা যাবে। উপরন্তু এটাও আমি মনে করি না যে, নিজেকে মাহদী বলে তিনি ঘোষণা করবেন। সম্ভবত তার নিজেরও জানা থাকবে না যে, তিনি প্রতিশ্রুত মাহদী। এমনও হতে পারে যে, তাঁর মৃত্যুর পর দুনিয়াবাসী জানতে পারবে যে, নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠাতা তিনিই ছিলেন, যাঁর সুসংবাদ জানান হয়েছিল।

মাহদী হওয়াটা দাবী করার বস্তু নয়

পূর্বে ইঙ্গিত করেছি যে, নবী ছাড়া অন্য কারও এমন পদমর্যাদা নেই যে, দাবী করে কাজের সূচনা করবেন। নবী ছাড়া অন্য কেউ জানতেও পারেন না যে, কোন্ কাজের জন্যে

তাঁকে নিয়োজিত করা হয়েছে। মাহদী হওয়াটা দাবী করার জিনিস নয়, করে দেখিয়ে যাওয়ার জিনিস। এ ধরনের দাবী যারা করেন এবং যারা তাদের ওপর ঈমান আনেন, উভয়েই আমার মতে ইলমের স্বল্পতা এবং মনের নীচতার প্রমাণ দেন।

মাহদীর কাজের ধরন

মাহদীর কাজের ধরন সম্পর্কে আমার যে ধারণা তা এসব ভদ্রলোকের ধারণা থেকে আলাদা। এ কাজের জন্যে কাশ্‌ফ, কারামাত, ইলহাম, চিল্লা, মুরাকাবা, মুশাহাদা প্রভৃতির কোনো স্থান আছে বলে আমার চোখে পড়ে না। আমি মনে করি কোনো বিপ্লবী নেতাকে যেমন দুনিয়ায় বিরাট সংগ্রাম-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, তেমনি মাহদীকেও হতে হবে। তিনি খাঁটি ইসলামের ভিত্তিতে একটা নতুন চিন্তার ক্ষেত্র বা পথ (School of Thought) সৃষ্টি করবেন। মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করবেন। একটা বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলবেন যা একসাথে তামাদ্দুনিকও হবে এবং রাজনৈতিকও। জাহিলিয়াত তার সমগ্র শক্তি দিয়ে তা নির্মূল করার চেষ্টা করবে কিন্তু অবশেষে তিনি জাহেলী শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে একটা শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবেন! তার মধ্যে একদিকে সঞ্চারিত ইসলামের প্রাণশক্তি এবং অপরদিকে বৈজ্ঞানিক উন্নতি চরমে পৌঁছুবে। যেমন হাদীসে এরশাদ করা হয়েছে, তাঁর শাসনব্যবস্থায় আসমানবাসীও সন্তুষ্ট হবে এবং দুনিয়াবাসীও। আসমান প্রাণ খুলে তার বরকতসমূহ বর্ষণ করতে থাকবে এবং যমীন তাঁর গর্ভ থেকে সকল সম্পদ বাইরে নিক্ষেপ করবে।[২৪২]

হযরত মসীহ (আ)-এর আগমন সম্পর্কে নবীর ভবিষ্যদ্বাণী

এতদসম্পর্কিত হাদীসমূহ

١ـ عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنذير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ـ(بخارى كتاب احاديث الانبياء باب نزول عيسى بن مريم ـ مسلم باب بيان نزول عيسى ـ ترمزى ابواب الفتن ـ باب فى نزول عيسى ـ مسند احد مرويات ابى هريرة رضـ)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) বলেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, ইবনে মরিয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তোমাদের নিকটে অবতীর্ণ হবেন। অতপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর ধ্বংস করবেন*

* ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা এবং শূকর ধ্বংস করার অর্থ এই যে, খৃস্টবাদ একটা স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে শেষ হয়ে যাবে। খৃস্টান ধর্মের গোটা এমারত এ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, খোদা তাঁর একমাত্র পুত্রকে (হযরত ঈসা) ক্রুশবিদ্ধ করে অভিশাপের মৃত্যুদান করেন—যার ফলে মানব জাতির পাপের কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যায়। নবীগণের উম্মতের মধ্যে খৃস্টানদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা শুধু আকীদা-বিশ্বাস নিয়েই সন্তুষ্ট রইল এবং গোটা শরীয়াত প্রত্যাখ্যান করল। এমনকি তারা শূকরকে পর্যন্ত হালাল করে ফেলল যা সকল নবীগণের শরীয়াতেই হারাম ছিল। হযরত ঈসা (আ) পুনরায় আগমন করে যখন স্বয়ং ঘোষণা করবেন, "আমি খোদার পুত্রও নই এবং কারও গুনাহর কাফফারাও হইনি, তখন খৃস্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের আর কোনো বুনিয়াদই অবশিষ্ট থাকবে না। এরূপ যখন তিনি বলবেন যে, না তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্যে শূকর হালাল করেছেন, আর না তাদেরকে শরীয়াতের বাধানিষেধ থেকে মুক্ত করেছেন, তখন খৃস্টীয় ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও শেষ হয়ে যাবে।

এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। অন্য একটি বর্ণনায় 'যুদ্ধের' স্থলে 'জিযিয়া' শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ জিযিয়া রহিত করবেন।* তারপর ধন-সম্পদের এতো আধিক্য হবে যে, তা গ্রহণ করার কেউ থাকবে না। তখন খোদার জন্যে একটা সেজদা করা সমগ্র দুনিয়া থেকে উৎকৃষ্টতর হবে।"–(বুখারী, মুসলিম তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ)

অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর এ শব্দগুলো পাওয়া যায় ঃ

٢۔ لاتقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم -

"হযরত ঈসা (আ) নাযিল না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। তারপর ওপরে বর্ণিত কথাগুলো আছে।"–(বুখারী, ইবনে মাজাহ)

٣۔ عن ابی هريرة رضـ ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم (بخاری كتاب احديث الانبياء باب نزول عيسى ۔ مسلم بيان نزول عيسى مسند احمد مرويات ابی هريرة رضـ)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী (সা) বলেছেন, তোমরা তখন কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়াম অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের নেতা তখন তোমাদের মধ্য থেকেই হবেন ?"**–(বুখারী, মুসনাদে আহমদ)

٤۔ عن ابی هريرة رضـ ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحوا الصليب وتجمع له الصلو ويعطى المال حتى لايقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها او يعتمر او يجعهما (مسند احمد، سلسله مرويات ابی هريرة رضـ ۔ مسلم كتاب الحج ۔ باب جواز التمتع فی الحج والقران)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, ঈসা ইবনে মরিয়াম নাযিল হবেন। অতপর তিনি শূকর নিহত করে ফেলবেন এবং ক্রুশ নির্মূল করবেন। তাঁর জন্যে নামায জমা করা হবে এবং তিনি এত অর্থ বিতরণ করবেন যে, গ্রহণ করার লোক থাকবে না। তিনি খেরাজ বন্ধ করে দেবেন এবং রাওহা*** নামক স্থানে অবস্থান করে হজ্ব অথবা ওমরা করবেন অথবা উভয়টি করবেন।"**** [রাবীর স্মরণ নেই যে, নবী (সা) কোন্ কথা বলেছিলেন]।–(মুসনাদে আহমদ, মুসলিম)

٥۔ عن ابی هريرة رضـ (بعد ذكر خروج الدجال) فبينما هم بعدون للقتال يسوون الصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسى ابی مريم فامهم فاذا رآه عدو اللّه يذوب

* অন্য কথায় তার অর্থ এই যে, সে সময়ে সব মিল্লাত ও গোষ্ঠীর মতানৈক্য শেষ করে সকলে একই মিল্লাতের শামিল হয়ে যাবে। তার ফলে না যুদ্ধ হবে, আর না কারও ওপর জিযিয়া আরোপ করার প্রয়োজন হবে। পরবর্তী ৫নং এবং ১৫নং হাদীসেও এ কথা আছে।

** অর্থাৎ নামাযে হযরত ঈসা (আ) ইমামতি করবেন না। বরং পূর্ব থেকে যিনি মুসলমানদের ইমাম থাকবেন তাঁর পেছনেই তিনি নামায পড়বেন।

*** 'রাওহা' মদীনা থেকে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান।

**** প্রকাশ থাকে যে, এ যুগে যে ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ)-এর সাদৃশ বলা হয়েছে, তিনি জীবনে না হজ্ব করেছেন, না ওমরাহ।

كما يذوب الملح فى الماء فلوتركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله اللّه بيده فيريهم دمه فى حربته (مشكوة كتاب الفتن باب الملاحم بحواله مسلم)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দাজ্জাল আবির্ভাবের উল্লেখ করার পর নবী (সা) বলেছেন, মুসলমানগণ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং নামাযের জন্যে কাতারবন্দী হওয়ার পর তকবীর দেয়া হতে থাকবে, এমন সময় ঈসা ইবনে মরিয়াম নাযিল হবেন এবং নামাযে মুসলমানদের ইমামতি করবেন। আল্লাহর দুশমন (অর্থাৎ দাজ্জাল) তাঁকে দেখামাত্র গলে যেতে থাকবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি হযরত ঈসা (আ) তাকে ঐ অবস্থায় থাকতে দেন তো সে গলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাতে দাজ্জালকে নিহত করাবেন এবং তিনি তাঁর অস্ত্রে তার খুন মুসলমানদেরকে দেখাবেন।"–(মিশকাত, মুসলিমের বরাতসহ)

٦ـ عن ابى هريرة رضـ ان النبى صلى اللّه عليه وسلم قال ليس بينى وبينه نبى (يعنى عيسى) وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض بين ممصرتين كان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك اللّه فى زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث فى الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون (ابو داؤد كتاب الملاحم باب خروج الدجال مسند احمد مرويات ابى هريرة رضـ)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) বলেছেন, আমি এবং তাঁর (অর্থাৎ হযরত ঈসা) মাঝখানে কোনো নবী নেই। আর তিনি নাযিল হবেন। অতএব যখন তোমরা তাঁকে দেখবে তখন তাঁকে চিনে নিও। তিনি হবেন মধ্যম আকৃতির লোক। লাল ও সাদা মিশ্রিত রং হবে তাঁর। দু'টি হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করে থাকবেন। তাঁর মাথার চুল এমন হবে যেন পানি টপকিয়ে পড়ছে। অথচ তাঁর শরীর ভেজা হবে না। তিনি ইসলামের জন্যে লোকের সাথে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ছিন্নভিন্ন করবেন। শূকর ধ্বংস করবেন। জিযিয়া রহিত করবেন। আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ছাড়া অন্য সব মতবাদপন্থী মিল্লাত নির্মূল করবেন। তিনি দাজ্জালকে নিহত করবেন। তিনি চল্লিশ বছর দুনিয়ায় অবস্থান করবেন। অতপর তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায পড়বে।"–(আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

٧ـ عن جابر بن عبد اللّه قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ..... فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول اميرهم تعالى فصل فيقول لاان بعضكم على بعض امراء تكرمة اللّه هذه الامة ـ(مسلم، بيان نزول عيسى ابن مريم ـ مسند احمد بسلسله مرويات جابر بن عبد اللّه)

"হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) বলেছেন, ... তারপর ঈসা ইবনে মরিয়াম নাযিল হবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন,

আসুন নামায পড়িয়ে দিন। তিনি বলবেন, না। তোমরা স্বয়ং একে অপরের আমীর।* আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতকে যে সম্মান দান করেছেন তা লক্ষ্য করেই তিনি ঐরূপ জবাব দেবেন।"–(মুসলিম, মুনাসাদে আহমদ)

٨۔ عن جابر بن عبد اللّه (فی قصة ابن صیاد) فقال عمر بن الخطاب ائذن لی فاقتله یارسول اللّه فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم ان یکون هو فلست صاحبه ان صاحبه عیسی ابن مریم علیه الصلوة والسلام وان لایکن فلیس لك ان تقتل رجلا من اهل العهد ۔ (مشکوت کتاب الفتن باب قصة ابن صیاد بحواله شرح السنة بغوی)

"হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) ইবনে সাইয়াদের ফেৎনা প্রসঙ্গে বলেন যে, হযরত ওমর (রা) তখন আরজ করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে কতল করি। তার জবাবে নবী (সা) বললেন, এ যদি সে ব্যক্তিই হয় (অর্থাৎ দাজ্জাল) তাহলে তার হত্যাকারী তুমি নও। বরং ঈসা ইবনে মরিয়াম তাকে হত্যা করবেন। আর যদি সে সেই ব্যক্তি না হয়, তাহলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (অর্থাৎ যিম্মী) লোকদের কাউকে হত্যা করার অধিকার তোমার নেই।"–(মিশকাত, শরহুস সুন্নাহ-বাগাবী এর বরাতসহ)।

٩۔ عن جابر بن عبد اللّه (فی قصة الدجال) فاذا هم بعیسی ابن مریم علیه السلام فتقام الصلوة فیقال له تقدم یاروح اللّه فیقول لیتقدم امامکم فلیصل بکم ۔ فاذا صلی صلوة الصبح خرجوا الیه قال فحین یری الکذاب ینماث کما ینماث الملح فی الماء فیمشی الیه فیقتله حتی ان الشجر والحجر ینادی یاروح اللّه هذا الیهودی فلا یترك ممن کان یتبعه احدا الاقتله ۔(مسند احمد بسلسله روایات حابر بن عبد اللّه رضـ)

"দাজ্জালের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ বলেন, নবী (সা) বলেছেন ..... সে সময়ে হযরত ঈসা (আ) হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে এসে পড়বেন। নামাযের জন্যে লোক দাঁড়াবে এবং তাঁকে বলা হবে, হে রুহুল্লাহ! সামনে যান। কিন্তু তিনি বলবেন, না। বরং তোমাদের ইমামেরই সামনে যাওয়া উচিত এবং তিনিই নামায পড়িয়ে দিন। অতপর সকালের নামায শেষ করে লোক দাজ্জালের মুকাবিলার জন্যে বেরিয়ে পড়বে। নবী বলেন, সেই মিথ্যাবাদী যখন হযরত ঈসা (আ)-কে দেখতে পাবে তখন গলতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। হযরত ঈসা তার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে কতল করবেন। তখন অবস্থা এমন হবে যে, গাছপালা এবং পাহাড়-পর্বত চিৎকার করবে, হে রুহুল্লাহ! এ ইহুদী আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। দাজ্জালের অনুসারীদের মধ্যে এমন কেউ থাকবে না যাকে হযরত ঈসা (আ) কতল করবেন না।"–(মুসনাদে আহমদ)

١٠۔ عن النواس بن سمعان (فی قصة الدجال) فبینما هو کذالك اذ بعث اللّه المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقی دمشق بین مهر وذتین واضعا کفیه علی

* অর্থাৎ তোমাদের আমীর তোমাদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত।

اجنحة ملكين اذا طأ طأ رأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الامات ونفسه ينتهى الى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله (مسلم ذكر الدجال - ابو داؤد كتاب الملاحم باب خروج الدجال - ترمزى ابوب الفتن باب فى فتنة الدجال - ابن ماجه كتاب الفتن باب فتنة الدجال)

"হযরত নাওয়াস বিন সাময়ান কেলাবী দাজ্জালের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ... দাজ্জাল যখন এসব করতে থাকবে আল্লাহ তায়ালা মাসিহ-বিন-মরিয়ামকে পাঠাবেন। তিনি দামেশকের পূর্বাঞ্চলে সাদা মিনারের ধারে হলুদ রঙের দু'টি কাপড় পরিধান করে দু' ফেরেশতার বাহুতে হাত রেখে নামবেন। যখন তিনি মাথা নাড়বেন, তখন মনে হবে যেন টপটপ করে পানি পড়ছে। যখন মাথা তুলবেন তখন পানির ফোঁটা-গুলোকে মুক্তার মত ঝকমক করতে দেখা যাবে। তাঁর নিঃশ্বাস তাঁর দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত প্রবাহিত হবে এবং যে কাফেরের ওপর তা পড়বে সে আর বেঁচে থাকবে না। তারপর মরিয়াম পুত্র দাজ্জালকে ধাওয়া করে লুদ* ফটকের ওপর ধরে ফেলবেন এবং হত্যা করবেন ?"-(মুসলিম, আবু দাউদ, তিরিমিযি, ইবনে মাজাহ)

١١- عن عبد اللّه بن عمرو قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يخرج الدجال فى امتى فيمكث اربعين (لاادرى اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما) فيبعث اللّه عيسى ابن مريم كانه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة -(مسلم ذكر الدجال)

"আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দাজ্জাল আমার উম্মতের মধ্য থেকে বের হবে এবং চল্লিশ, (আমি জানি না চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর)** থাকবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা ঈসা বিন মরিয়ামকে পাঠাবেন। তাঁকে ওরওয়া বিন মাসউদের (এক সাহাবীর) মতো দেখাবে। তিনি দাজ্জালের পেছনে ধাওয়া করে তাকে হত্যা করবেন। তারপর সাত বছর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, দু'জন লোকের মধ্যেও কোনো শত্রুতা হবে না।"-(মুসলিম)

١٢- عن حذيفة بن اسيد الغفارى قال اطلع النبى صلى اللّه عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ماتذكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وياجوج وماجوج وثلثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذالك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم (مسلم كتاب الفتن واشراط الساعة - ابو داؤد كتاب الملاحم باب امارات الساعة)

"হুযায়ফা বিন আসিদ আল গিফারী (রা) বলেন, একবার নবী পাক (সা) আমাদের মধ্যে তশরিফ আনলেন। আমরা তখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম। তিনি

* প্রকাশ থাকে যে, ফিলিস্তিনে ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী তেলআবিবের কয়েক মাইল দূরে 'লূদ' অবস্থিত। ইহুদীরা সেখানে বিরাট বিমান ঘাটি তৈরি করেছে।

** এ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'সের নিজের কথা।

বললেন, কি কথা হচ্ছে ? বললাম, আমরা কেয়ামতের বিষয় আলোচনা করছি। নবী (সা) বললেন, কেয়ামত কিছুতেই হবে না যতক্ষণ না দশটি আলামত জাহির হয়। তারপর তিনি বলেন, দশটি আলামত এই—(১) ধুঁয়া, (২) দাজ্জাল, (৩) দাব্বাতুল আরদ, (৪) পশ্চিমাকাশ থেকে সুর্যোদয়, (৫) ঈসা বিন মরিয়ামের অবতরণ, (৬) ইয়াজুজ-মাজুজ, (৭) তিনটি বড় বড় ভূমিধস–একটি পূর্বে, (৮) একটি পশ্চিমে, (৯) একটি আরবে, সবশেষে (১০) একটি বিরাট আগুন যা ইয়েমেন থেকে উঠবে এবং লোকদেরকে তাড়িয়ে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে।"–(মুসলিম, আবু দাউদ)

١٣- عن ثوبان مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن النبى صلى اللّه عليه وسلم- عصابتان من امتى احرزهما اللّه تعالى من النار- عصابة تغزوا الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام (نسائى كتاب الجهاد- مسند احمد بسلسله روايات ثوبان)

"নবী পাক (সা)-এর মুক্ত করা গোলাম সাওবান বলেন ঃ নবী বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি সৈন্যদল এমন যাদেরকে আল্লাহ দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। একদল হিন্দুস্তানের ওপর হামলা চালাবে এবং অন্য দল ঈসা বিন মরিয়ামের সাথে থাকবে।"

١٤- عن مجمع ابن جارية قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد -(مسند احمد- ترمذى ابواب الفتن)

"মুজাম্মে বিন জারিয়া আনসারী বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, মরিয়াম পুত্র দাজ্জালকে লুদ ফটকে হত্যা করবে।"–(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি)

١٥- عن ابى امامة الباهلى (فى حديث طويل فى ذكر الدجال) فبينما امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسى ابن مريم فرجع ذالك الامام ينكص يمشى قهقراى ليتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراء ه الدجال ومعه سبعون الف يهودى كلهم ذوسيف محلى وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح فى الماء وينطلق هربا ويقول عيسى ان لى فيك ضربة لن تسبقنى بها فيدركه عند باب اللد الشرقى هيهزم اللّه اليهود ..... وتملا الارض من المسلم كما يملاء الاناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا اللّه تعالى- (ابن ماجه كتاب الفتن باب فتنة الدجال)

"আবু উমামা বাহেলী এক দীর্ঘ হাদীসে দাজ্জালের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ঠিক যখন মুসলমানদের ইমাম সকালের নামায পড়াবার জন্যে সামনে অগ্রসর হবেন, ঈসা বিন মরিয়াম এমন সময়ে সেখানে নেমে আসবেন। ইমাম পেছনে হটে যাবেন যাতে করে হযরত ঈসা সামনে অগ্রসর হতে পারেন কিন্তু ঈসা (আ) তাঁর দু' বাহুর মাঝখানে

হাত রেখে বলবেন, না আপনি পড়ান। কারণ আপনার জন্যেই এ নামায দাঁড়িয়ে গেছে। অতএব তিনিই (পূর্বের ইমাম) নামায পড়াবেন। তারপর ঈসা (আ) বলবেন, দরজা খুলুন। দরজা খোলা হবে এবং দেখতে পাওয়া যাবে সত্তর হাজার সশস্ত্র ইহুদীদের সাথে দাজ্জাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে মাত্রই হযরত ঈসার ওপর তার নজর পড়বে সে গলতে শুরু করবে লবণ যেমন পানিতে গলে। সে তখন পালাতে থাকবে। ঈসা (আ) বলবেন, আমার হাতে তোর এমন মার রয়েছে যে বাঁচতে পারবি না। অতপর তিনি তাকে লুদের পূর্ব দরজার ওপর ধরে ফেলবেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদেরকে পরাজিত করিয়ে দেবে.....এবং দুনিয়া মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ হবে যেমন পাত্র পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। তখন গোটা দুনিয়ার কালেমা এক হবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাসত্ব-আনুগত্য করা হবে না।"-(ইবনে মাজাহ)

١٦- عن عثمان بن ابى العاص قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول ... وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند صلوة الفجر فيقول له اميرهم ياروح اللّه تقدم صل - فيقول هذه الامة بعضهم امراء على بعض فيتقدم اميرهم فيصلى فاذا قضى صلوته اخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فاذا يراه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين شندوبته فيقتله وينهزم اصحابه ليس يومئذ شئ يوارى منهم احدا حتى ان الشجر ليقول يامؤمن هذا كافر ويقول الحجر يامؤمن هذا كافر -(مسند احمد - طبرانى - حاكم)

"ওসমান বিন আবিল আস্ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, ... এবং ঈসা বিন মরিয়াম (আ) ফজরের সময় নেমে আসবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, হে রুহুল্লাহ! আপনি নামায পড়ান। তিনি বলবেন, এ উম্মতের লোক স্বয়ং একে অপরের আমীর। তখন মুসলমানদের আমীর সামনে গিয়ে নামায পড়াবেন। নামায শেষে ঈসা (আ) তাঁর অস্ত্র নিয়ে দাজ্জালের দিকে ধাবিত হবেন। সে যখন তাঁকে দেখবে তখন সীসার মতো গলতে থাকবে। ঈসা (আ) তাঁর অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যা করবেন। তার সাথী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু কোথাও তার আশ্রয় মিলবে না। গাছপালা চিৎকার করে বলবে, হে মুমিন ! কাফের এখানে। পাথর বলবে, হে মু'মিন ! কাফের এখানে।"-(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, হাকেম)

١٧- عن سمرة بن جندب عن النبى صلى اللّه عليه وسلم (فى حديث طويل) فيصبح فيهم عيسى ابن مريم فيهزمه اللّه وجنوده حتى ان اجذم الحائط واصل الشجر لينادى يامؤمن هذا كافر يستتربى فتعال اقتله -(مسند احمد - حاكم)

"সামুরাহ বিন জুন্দুব (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, অতপর সকাল বেলা ঈসা বিন মরিয়াম মুসলমানদের মধ্যে এসে পড়বেন। আল্লাহ দাজ্জাল এবং তার সৈন্য-সামন্তকে পরাজিত করবেন। এমনকি দেয়াল এবং গাছের মূল চিৎকার করে বলবে, হে মুমিন! কাফের আমার পেছনে লুকিয়ে আছে, আসুন তাকে মেরে ফেলুন।"

-(মুসনাদে আহমদ, হাকেম)

١٨ـ عن عمران بن حصين ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لاتزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين على من ناؤاهم حتى ياتى امر اللّه تبارك وتعالى وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ـ(مسند احمد)

"ইমরান বিন হাসীন (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একদল থাকবে যারা হকের ওপর অবিচল থাকবে এবং বিরোধীদের জন্যে অসহনীয় হবে। অতপর মহান আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত এসে যাবে এবং ঈসা বিন মরিয়াম নাযিল হবেন।"–(মুসনাদে আহমদ)

١٩ـ عن عائشة (فى قصة الدجال) فينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم بمكث عيسى عليه السلام فى الارض اربعين سنة اماما عادلا وحكما مقسطا ـ(مسند احمد)

"হযরত আয়েশা (রা) দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে বলেন, ঈসা (আ) নাযিল হবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতপর তিনি দুনিয়ায় চল্লিশ বছর একজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে অবস্থান করবেন।"–(মুসনাদে আহমদ)

٢٠ـ عن سفينة مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (فى قصة الدجال) فينزل عيسى عليه السلام فيقتله اللّه تعالى عند عقبة افيق ـ(مسند احمد)

"নবী পাক (সা)-এর মুক্ত করা গোলাম শাফিনাহ (দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে) বর্ণনা করেন, তারপর ঈসা (আ) নাযিল হবেন এবং আল্লাহ তায়ালা দাজ্জালকে আফিকের* ঘাঁটির সন্নিকটে ধ্বংস করবেন।"–(মুসনাদে আহমদ)

٢١ـ عن حذيفة (فى ذكر الدجال) فلما قاموا يصلون نزل عيسى ابن مريم امامهم فصلى بهم فلما انصرف قال هكذا فرجوا بينى وبين عدو اللّه ..... ويسلط اللّه عليهم المسلمين فيقتلونهم حتى ان الشجر والحجر لينادى ياعبد اللّه ياعبد الرحمن يامسلم هذا اليهودى فاقتلهم فيفنيهم اللّه تعالى ويظهر المسلمون فيكسرون الصلب ويقتلون الخنزير ويضعون الجزية ـ(مستدرك حاكم)

"হযরত হোযায়ফা (রা) দাজ্জাল প্রসঙ্গে বলেন, ... তারপর মুসলমানরা যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াবেন তখন তাঁদের চোখের সামনে ঈসা বিন মরিয়াম নেমে আসবেন। তিনি মুসলমানদেরকে নামায পড়াবেন। সালাম ফেরার পর লোকদেরকে বলবেন, আমার এবং খোদার ঐ দুশমনের মাঝখান থেকে সরে যান। আল্লাহ দাজ্জাল এবং তার সাথীদের ওপরে মুসলমানদেরকে বিজয়ী করবেন। মুসলমানগণ তাদেরকে নিপাত করতে থাকবে। এমনকি গাছ এবং পাথর চিৎকার করে বলবে, হে আবদুল্লাহ, হে আবদুর রহমান, হে মুসলমান, এই যে এক ইহুদী—একে মেরে ফেলুন। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে নির্মূল করবেন। মুসলমান জয়ী হবে, ক্রুশ বিধ্বস্ত হবে, শূকর ধ্বংস হবে এবং জিযিয়া রহিত করা হবে।"

* আফিক—যার বর্তমান নাম 'কায়েক'—সিরিয়া ও ইসরাঈল সীমান্তে অবস্থিত সিরিয়ার শেষ শহর। তার সামনে পশ্চিম দিকে কয়েক মাইল দূরে তাবারিয়া নামে একটি ঝিল আছে যার থেকে জর্দান নদী বেরিয়েছে। তার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটা ঢালু পথ দেড়-দু' হাজার ফুট গভীরে এমন এক স্থানে পৌঁছেছে যেখান থেকে তারাবিয়ার মধ্য হতে জর্দান নদী বেরুচ্ছে। এ পাহাড়ী পথকে আকাবায়ে আফিক বা আফিক ঘাঁটি বলে।

[মুস্তাদরেক হাকেম, মুসলিমেও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার ফতহুল বারিতে, (৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ) এ হাদীসকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

এ মোট একুশটি হাদীস চৌদ্দজন সাহাবী থেকে অতি নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এসব ছাড়া যদিও আরও বহু হাদীসে এ প্রসঙ্গ এসেছে, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেগুলো উদ্ধৃত করা হয়নি। সনদের দিক দিয়ে যেগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, শুধু সেগুলো এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

মসীহ (আ)-এর প্রতিরূপ হওয়ার ধারণা ভ্রান্ত

যাঁরাই এ হাদীসগুলো অধ্যয়ন করবেন, তাঁরা স্বয়ং দেখতে পাবেন যে, এসবের মধ্যে কোনো 'প্রতিশ্রুত মসীহ' অথবা 'মসীহের প্রতিরূপ' অথবা 'মসীহের আত্মপ্রকাশ' প্রভৃতির আদতেই কোনো উল্লেখ নেই। না এ বিষয়ের কোনো অবকাশ আছে যে, এ যুগে কোনো বাপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে কোনো ব্যক্তি এ দাবী করতে পারে, "আমিই সেই মসীহ যার ভবিষ্যদ্বাণী শেষ নবী (সা) করেছিলেন।" এ হাদীসগুলো সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সেই ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছে যিনি আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে বিনা বাপে হযরত মরিয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২৪৩]

দাজ্জাল ও তার আবির্ভাব

দাজ্জালের আবির্ভাবের সময়কাল নির্দিষ্ট নেই

দাজ্জাল সম্পর্কে যত হাদীস নবী (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তার বিষয়বস্তুর ওপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী পাক (সা)-কে এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তা শুধু এতটুকু পর্যন্ত যে, এক বড় জালেম দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। তার এ সংজ্ঞা হবে সে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। কিন্তু নবীকে এ কথা বলা হয়নি যে, কখন সে আবির্ভূত হবে, কোথায় হবে এবং সে কি তার জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেছে, না পরবর্তী কোনো সময়ে জন্মগ্রহণ করবে।

নবী (সা)-এর বিভিন্ন অনুমান

এ বিষয়ে নবী (সা) থেকে যেসব কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার বিষয়বস্তুর গরমিল এবং তাঁর বাচন-ভঙ্গিতে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি এসব কথা অহীর ভিত্তিতে নয় বরং অনুমান করে বলেছেন। কখনও তিনি এ ধারণা পোষণ করেছেন যে, দাজ্জাল খোরাশান থেকে বেরুবে, কখনও বলেছেন ইস্পাহান থেকে। আবার কখনও বলেছেন সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে। যে ইহুদী বালক সম্ভবত দ্বিতীয় বা তৃতীয় হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করে, তার সম্পর্কে এ সন্দেহ পোষণ করেন যে, সম্ভবত এ-ই দাজ্জাল হবে। শেষ একটি বর্ণনায় আছে যে, নবম হিজরীতে ফিলিস্তিনের একজন খৃষ্টান পাদ্রী তামিমদারী এসে ইসলাম কবুল করে এবং নবীর কাছে একটা কাহিনী বর্ণনা করে। তা এই যে, সে একবার সমুদ্র ভ্রমণে (সম্ভবত রোম সাগর অথবা আরব সাগর) এক জনবসতিহীন দ্বীপে পৌছে। সেখানে একটি অদ্ভুত লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সে বলে যে, সে স্বয়ং দাজ্জাল। নবী (সা) তার এ বর্ণনা ভুল মনে করার কোনো কারণ দেখলেন না কিন্তু তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, "তার কথা মত দাজ্জাল রোম সাগর অথবা আরব সাগরে আছে বলতে হয় কিন্তু আমার ধারণা সে পূর্বদিক থেকে বেরুবে।"

নবী পাকের এরশাদের দু'টো অংশ

এসব বিভিন্ন বর্ণনার ওপর সামগ্রিকভাবে যদি কেউ দৃষ্টিপাত করেন এবং তিনি যদি হাদীস শাস্ত্র এবং দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত থাকেন, তাহলে তাঁর এটা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, এ ব্যাপারে নবী পাক (সা)-এর কথাগুলো দু'অংশে বিভক্ত।

প্রথম অংশ এই যে, দাজ্জালের আবির্ভাব অবশ্যই হবে, তার এই সংজ্ঞা হবে এবং সে ফেৎনা সৃষ্টি করবে। এ একেবারে অতি নিশ্চিত সংবাদ যা রসূল (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন। এ বিষয়ে বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোনো গরমিল নেই।

দ্বিতীয় অংশের আলাদা মর্যাদা

দ্বিতীয় অংশ এই যে, দাজ্জাল কোথায় এবং কখন আবির্ভূত হবে এবং সে ব্যক্তি কে ? এ সম্পর্কে বর্ণনা শুধু বিভিন্ন ধরনেরই নয়, বরং তার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে এবং অনুমান-ভিত্তিক শব্দ প্রয়োগও করা হয়েছে। যেমন ধরুন, ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে নবী (সা) হযরত ওমরকে বলছেন, দাজ্জাল যদি এই হয় তাহলে তার হত্যাকারী তুমি নও, আর যদি সে তা না হয় তাহলে একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যিম্মীকে হত্যা করার অধিকার তোমার নেই। অথবা যেমন এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন, সে যদি আমার জীবদ্দশায় এসে পড়ে তাহলে আমি তার মুকাবিলা করব। আর আমার পরে এলে আমার প্রভু তো প্রত্যেক মুমিনের সমর্থক ও সাহায্যকারী।

এ দ্বিতীয় অংশের দ্বীনি এবং মৌলিক মর্যাদা তা নয় এবং হতে পারে না যা প্রথম অংশের। যে ব্যক্তি এ অংশের সকল খুঁটিনাটি বিষয় ইসলামী আকায়েদের মধ্যে শামিল করে সে ভুল করে, বরং তার প্রত্যেক অংশের সত্যতার দাবী করাও ঠিক নয়। ইবনে সাইয়াদের প্রতি নবীর সন্দেহ হয়েছিল এবং তিনি মনে করেছিলেন সম্ভবত সে-ই দাজ্জাল। হযরত ওমর তো কসম খেয়েই বললেন যে, সে-ই দাজ্জাল কিন্তু সে মুসলমান হল, হারামাইনে বাস করল, ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল এবং মুসলমানগণ তার জানাযার নামায পড়ল। এখন বলুন, আজ পর্যন্ত ইবনে সাইয়াদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করার কোন্ অবকাশটা রইল ? তামিমদারীর বর্ণনা সে সময়ে প্রায় সত্য বলে মনে করা হয়েছিল। তামিমদারী সাড়ে তেরশ' বছর আগে যাকে বন্দী অবস্থায় দেখেছিল, এ সুদীর্ঘকালের মধ্যে তার আবির্ভূত না হওয়া কি এ কথা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তার দাজ্জাল হওয়ার যে সংবাদ তামিমদারীকে দিয়েছিল তা সত্য ছিল না ? নবী পাকের যামানায়ই তার এ সন্দেহ ছিল যে, হয়ত তাঁর জীবদ্দশাতেই অথবা তাঁর অনতিকাল পরেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে, সাড়ে তেরশ' বছর অতীত হয়ে গেল এবং এখন পর্যন্ত দাজ্জাল এল না এখন এসব কিছু ইসলামী আকায়েদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তা নকল ও বর্ণনা করা না ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব আর না হাদীসেরই সঠিক জ্ঞান বলা যেতে পারে। আমি আগেই বলেছি যে, এ ধরনের ব্যাপার-সমূহে যদি কোনো কথা নবীর আন্দাজ-অনুমান অথবা আশংকা অনুযায়ী বাস্তবে কার্যকর না হয়, তাহলে তা নবুয়াতের মর্যাদার জন্যে কিছুতেই হানিকর হয় না। এতে নবীর নিষ্পাপ হওয়ার ধারণার ওপরও কোনো আঘাত আসে না। আর এসব বিষয়ের ওপর ঈমান আনার জন্যে শরীয়াতও আমাদেরকে বাধ্য করেনি। এ মৌলিক তত্ত্ব নবী (সা) তার খেজুর গাছের জোড়া সংক্রান্ত হাদীসটিতে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৪৪]

নবীর নিজস্ব ব্যাখ্যা থেকে পথনির্দেশ

নবীর কোন্ কথা তাঁর ধারণাপ্রসূত, কোন্‌টি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত এবং কোন্‌টি খোদা প্রদত্তজ্ঞানের ভিত্তিতে তা অনেক সময়ে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে। আবার অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেও তা জানা যায়। যেমন দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসটির কথাই ধরা যাক। এতে নবীর নিজস্ব ব্যাখ্যায় জানা যায় যে, দাজ্জাল আবির্ভাবের স্থান, কাল এবং তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জ্ঞান তাকে দেয়া হয়নি। ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ এতখানি প্রকট ছিল যে, তাঁর সামনেই হযরত ওমর (রা) কসম করে তাকে দাজ্জাল বলে ফেললেন। নবী তার প্রতিবাদ করেননি কিন্তু হযরত ওমর যখন তাকে কতল করার অনুমতি চাইলেন তখন নবী (সা) বললেন ঃ

ان يكنه فلن تسلط عليه وان لم يكنه فلا خيرلك فى قتله -

"যদি সে দাজ্জালই হয় তাহলে তাকে তুমি আয়ত্তে আনতে পারবে না। আর যদি সে তা না হয়, তার হত্যায় তোমার কোনো মঙ্গল নেই।"–(মুসলিম, দাজ্জাল প্রসঙ্গ)

আর এক হাদীসে নবী (সা) দাজ্জালের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ

ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم

"সে যদি আমার জীবদ্দশায় বের হয় তাহলে আমি তার মুকাবিলা করব। আর যদি আমার অবর্তমানে বের হয় তাহলে প্রত্যেকে তার নিজের পক্ষ থেকে তার মুকাবিলা করবে। আল্লাহ আমার পরে প্রত্যেক মুসলমানের রক্ষক।"–(মুসলিম, দাজ্জাল প্রসঙ্গ)

তামিমদারী তার সামুদ্রিক ভ্রমণকালে দাজ্জালের সাথে সাক্ষাতের কাহিনী যখন নবী (সা)-কে শুনাল, তখন তিনি তা স্বীকার করেও নেননি অথবা মিথ্যাও মনে করেননি। বরং বললেন ঃ اعجبنى حديث تميم انه وافق الذى كنت احدثكم عند "তামিমের বর্ণনা আমার ভাল লেগেছে। আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে যেসব কথা বলি তার সাথে এর মিল আছে।" তারপর নবী (সা) কথা আর একটু বাড়িয়ে বলেন ঃ الا انه فى بحر الشام او بحر اليمن لابل من قبل المشرق "না বরং সে শাম সাগর অথবা ইয়েমেনের সাগরে আছে। না, বরং পূর্বদিকে।" এসব বর্ণনা স্বয়ং তাদের তাৎপর্য পরিষ্কার করে দিচ্ছে।[২৪৫]

আম্মার বিন ইয়াসেরের হত্যার ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত আম্মার (রা) সম্পর্কে নবী পাক (সা)-এর নিম্নোক্ত ইরশাদ সাহাবীদের মধ্যে সর্বজনবিদিত ছিল এবং অনেক সাহাবী তা নবীর মুখেই শুনেছেন ঃ تقتلك الفئة الباغية "তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল কতল করবে।"–[মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী, তাবারানী, বায়হাকি, মুসনাদে আবু দাউদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থগুলোতে হযরত আবু সাইদ খুদরী, আবু কাতাদাহ আনসারী, উম্মে সালমা, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস, আবু হুরায়রা, ওসমান বিন আফফান, হুযায়ফাহ, আবু আইয়ুব, আবু রাফে, খুযায়মাহ বিন সাবেত, আমর বিন আস, আবুল ইউসর, আম্মার বিন আসের (রা আনহুম) এবং অন্যান্য অনেক সাহাবী থেকে এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইবনে সা'দও তাবাকাতে কয়েক সূত্রে এটা নকল করেছেন।]

ইবনে আবদুল বরর্ আল ইস্তিয়াবে লিখেছেন যে, নবী (সা) থেকে এ কথা পরম্পরা ক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, আম্মার বিন ইয়াসীর (রা)-কে বিদ্রোহী দল কতল করবে এবং এ বিশুদ্ধতম হাদীসগুলোর মধ্যে একটি।[২৪৬]

কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার দশটি আলামত

মুসলিম বিন হুযায়ফাহ বিন আসিদ আল-গিফারী থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীপাক (সা)-এর ইরশাদ হচ্ছে ঃ কেয়ামত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এ দশটি আলামত দেখতে পাবে—ধুয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিকে থেকে সূর্যোদয়, ঈসা বিন মরিয়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব, তিনটি বড় বড় ভূমিধস (Land Slide) প্রথমটি পূর্বে, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে এবং তৃতীয়টি আরবে। সর্বশেষে এক ভয়াবহ আগুন উঠে মানুষকে হাশরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে (অর্থাৎ তারপরই কেয়ামত হবে)। আর একটি হাদীসে ইয়াজুজ-মাজুজের উৎপাত প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ করে নবী (সা) বলেন, সে সময় কেয়ামত এতটা নিকটবর্তী হবে যেমন আসন্ন প্রসবা নারী যে বলতে পারে না কোন্ মুহূর্তে তার সন্তান প্রসব হবে রাতে না দিনে।[২৪৭]

كا الحامل المتم لايدرى اهلها حتى تفجوهم بولدها ليلا او نهار

অধ্যায় ঃ ১২

কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের তাত্ত্বিক অসাধুতা

[ইসলাম, কুরআন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন চরিতের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের এই প্রাচ্যবিশারদগণ যে রচনাসমূহ তৈরী করেছে, তার মধ্যে অসংখ্য আজেবাজে এবং অযৌক্তিক কথা জুড়ে দিয়েছে। যেগুলোকে গবেষণার সুন্দর নামের আড়ালে প্রচারও করা হয়েছে। এই নামকাওয়াস্তে গবেষণার আওতায় উইলিয়াম মূরের ন্যায় সংকীর্ণমনা ইসলাম বিদ্বেষী লেখক থেকে আরম্ভ করে মন্টোগোমারী ওয়াটের ন্যায় মধ্যমপন্থী লেখকের লেখায় পর্যন্ত নবী (সা) এবং ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের হাস্যকর কথা পাওয়া যায়। যে সম্পর্কে নিরপেক্ষ মেযাজের পাঠকের দৃষ্টিতে প্রাচ্যবিদদের সকল জ্ঞান-গবেষণা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এ সমস্ত ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা কর্মের প্রথম লক্ষ্য ছিল ক্রুসেডের যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট মন-মানসিকতার অধীনে খৃস্টানদেরকে ইসলামের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্যে সংকীর্ণ জাতীয়তার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে আড়াল সৃষ্টি করা। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদেরকে, ইসলামের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া এবং তাদেরকে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা। এসব সত্ত্বেও প্রাচ্য বিশারদগণ আমাদের আধুনিক শ্রেণীর জন্যে এক শতাব্দীকাল ধরে ইসলাম ও নবী (সা)-এর জীবন-চরিত সম্পর্কে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আর ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকেরা এদের লেখা পড়ে পড়ে এমন এমন সন্দেহের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে এবং এমন এমন আপত্তি নিজেদের দ্বীনের বিরুদ্ধে খোদ নিজেরাই তুলেছে যে, প্রত্যেক সত্যানুরাগীর জন্যে এর মধ্যে তাজ্জব বনে যাওয়া এবং এ থেকে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

এই গ্রন্থের সম্মানিত লেখক এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে ইসলামের ভাষ্যকার হিসেবে ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের কাজ করেছেন এর মধ্যে কোথাও কোথাও প্রাচ্যবিদগণের লেখার মধ্যে আপত্তি তোলা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সত্যকে বিকৃতকারী এ সকল গবেষকদের ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করা ব্যতিরেকে মুসলিম জাতির আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের সঠিক উৎস পর্যন্ত পৌছানো সম্ভবপর নয়।

অতএব নবী (সা)-এর জীবন-চরিত রচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ লেখক নিজস্ব লেখার মধ্যে যেখানে যেখানে প্রাচ্যবিদগণের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করেছেন এবং এর মধ্যে যতদুর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, এর প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুসমূহ অধ্যয়ন করার প্রাক্কালে পাঠকবর্গ যেন এদিকে খেয়াল রাখেন যে, প্রাচ্যবিদগণ ইসলাম এবং নবী (সা) সম্পর্কে যে ভুল করেছেন এবং নানা ধরনের ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন, ঐগুলোর সবকিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ লেখক করেননি। কেননা শুধুমাত্র প্রাচ্যবিদগণের সমস্ত রচনাকে বিষয়বস্তু করে কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আথবা প্রবন্ধ রচনা করা হয়নি। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় স্থানে সুযোগ-সুবিধা মত আলোচনা করা হয়েছে। রসূল (সা)-এর জীবনী সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের আরও অসংখ্য আপত্তির জবাব বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যদিও আপত্তিকারকদের ভাস্য তুলে ধরা হয়নি।

এখানে এ কথা সুস্পষ্ট করে দেয়া জরুরী যে, এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ সমস্যা আমাদের জন্যে খুবই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, এটা গ্রন্থের কোন্ অংশে সন্নিবেশিত হবে। চিন্তা-ভাবনার পরে আমরা এটাকেও মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। কেননা এ খণ্ডের অন্যান্য প্রবন্ধসমূহের এই গুরুত্ব রয়েছে যে, নবীর জীবন-চরিত্রকে বুঝার জন্যে এর অধ্যয়ন একান্ত জরুরী, সে ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদগণের লেখার ওপরে এ নিবন্দের অধ্যয়ন দ্বারা ঐ সমস্ত বাধাসমূহ অপসারণ করবে যা সীরাতকে বুঝবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাপক অর্থবোধক। শুধুমাত্র কয়েকটি বাক্যের এই অনুচ্ছেদকে এ জন্যে আলাদা করা হয়েছে যাতে বিজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টির মধ্যে আসে।-(সংকলকদ্বয়)]

প্রাচ্যবিদগণের অযৌক্তিক কর্মপদ্ধতি

এসব অসৎ প্রকৃতির লোক কোনো গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের পূর্বে নিজেই সিদ্ধান্ত করে নেয়, কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোনো গ্রন্থ বলে স্বীকার করা চলবে না। অতএব কোথাও না কোথাও থেকে দলিল-প্রমাণ তালাশ করে এনে তারা বলে যে, নবী মুহাম্মদ (সা) কুরআনের নাম করে যেসব কথা বলেছেন তা অমুক অমুক স্থান থেকে চুরি করা প্রবন্ধ ও তথ্যাবলী বৈ কিছু না। এ তত্ত্বানুসন্ধান পদ্ধতিতে তারা এতটা নির্লজ্জতার সাথে শঠতার প্রশ্রয় নিয়ে সারা দুনিয়া মাথায় তুলে নেয় যে, তা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘৃণার সঞ্চার হয় এবং লোককে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, এরই নাম যদি জ্ঞান-গবেষণা হয় তাহলে অভিসম্পাত সে জ্ঞানের ওপর এবং অভিসম্পাত সে গবেষণার ওপর।

সন্ন্যাসী বাহিরার কাহিনী

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ نِ افْتَرٰهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ج فَقَدْ جَاۤءُوْ
ظُلْمًا وَّزُوْرًا ○ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا○قُلْ
اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا○

"যারা নবী (সা)-এর কথা শুনতে অস্বীকার করেছে তারা বলে যে, এ ফুরকান একটা মনগড়া জিনিস—এ ব্যক্তি নিজে এটা বানিয়েছে এবং অন্যকিছু লোক এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে। তারা যা বলছে তা বিরাট যুলুম এবং মিথ্যা। তারা বলে যে, এ প্রাচীন লোকের লিখিত জিনিস যা এ ব্যক্তি নকল করিয়ে নেয় এবং সকাল-সন্ধ্যায় তা শুনান হয়। হে মুহাম্মদ ! তাদেরকে বল, একে নাযিল করেছেন এমন এক সত্তা যিনি আসমান ও যমীনের রহস্য জানেন। আসলে তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৪-৬)

এ হল সেই অভিযোগ যা এ যুগের প্রাচ্যবিদগণ কুরআনের বিরুদ্ধে উত্থাপন করে থাকে।

নবী (সা)-এর জাতি অভিযোগ করেনি কেন?

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নবী (সা)-এর সমসাময়িক দুশমনদের মধ্যে কেউ এ কথা বলেনি, "তুমি ছোটবেলায় যখন সন্ন্যাসী বাহিরার সাক্ষাৎ করেছিলে তখন এসব কিছু তার কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলে।" তারা এ কথাও বলেছি, "তুমি যৌবনকালে যখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাতায়াত করতে তখন তুমি সে সময়ে খৃস্টান পাদরি-সন্ন্যাসী ও ইহুদী রিব্বীদের নিকটে এসব জ্ঞান অর্জন করেছিলে।" তারা এসব কথা এজন্যে বলেনি যে, এসব ভ্রমণের আগাগোড়া অবস্থা তাদের জানা ছিল। এ ভ্রমণ তাঁর একাকী হয়নি বরং আপন কাফেলার সাথে হয়েছে। তাদের জানা ছিল যে, যদি কারও নিকট থেকে কিছু শিখে আসার অভিযোগ তারা করে তাহলে তাদের নিজ শহরেরই শত শত লোক তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলবে। তাছাড়া মক্কার প্রতিটি সাধারণ মানুষ তাদেরকে বলত, "এ লোক যদি বার-তের বছর বয়সেই বাহিরার নিকট থেকে এসব জ্ঞানলাভ করেছিল, তাহলে সে তো আর বাইরে কোথাও বসবাস করত না বরং আমাদের মধ্যেই বসবাস করত। তাহলে কি কারণ থাকতে পারে যে, তার চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তার এসব জ্ঞান গোপন রাখা হয়েছিল এবং এ সময়ের মধ্যে তার মুখ থেকে একটি শব্দও এমন বেরুল না যে, তার মধ্যে এ ধরনের কোনো জ্ঞান আছে?"

এটাই ছিল মূল কারণ যার জন্যে মক্কার কাফেরগণ এত বড় সাংঘাতিক মিথ্যা কথা বলতে সাহস করেনি। এ কাজটা হয়ত তারা পরবর্তীকালের অধিকতর নির্লজ্জ লোকদের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছিল।

মক্কার কাফেরদের অভিযোগ কি ছিল?

তারা যেসব কথা বলত তা নবুয়াত-পূর্বকাল সম্পর্কে নয়, বরং নবুয়াতের দাওয়াত দেয়ার কাল সম্পর্কে। আরা বলত, "এ লোক নিরক্ষর। স্বয়ং লেখাপড়া করে কোনো জ্ঞান লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আগে তো কিছুই শিক্ষা করেননি। আজ তাঁর মুখ থেকে যেসব কথা বেরুচ্ছে বিগত চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তার কোনোটিই তাঁর জানা ছিল না। তাহলে এখন এসব জ্ঞান তাঁর কোথা থেকে আসছে ? তাঁর জ্ঞানের উৎস তাহলে নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী লোকের বই-পুস্তক হবে। রাতের বেলায় সেসব বইয়ের উদ্ধৃতি গোপনে তরজমা এবং নকল করান হচ্ছে। এগুলো কারও দ্বারা তিনি পড়িয়ে নেন এবং মনে করে রেখে দিনের বেলায় আমাদেরকে শুনাচ্ছেন।"

কিছু বর্ণনা সূত্রে জানতে পারা যায় যে, তারা এ ব্যাপারে কিছু লোকের নামও করত যারা আহলে কিতাব ছিল, লেখাপড়া জানত এবং মক্কায় বাস করত। তাদের নাম-আদ্দাস (হুয়াইতিব বিন আবদুল উয্যার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস), ইয়াসার (আলা বিন আল হাযরামীর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস) এবং যাবর (আমের বিন রাবিয়ার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস)।

বাহ্যত বেশ গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ মনে হয়। অহীর দাবী পত্যাখ্যান করার জন্যে জ্ঞানের উৎসকে চিহ্নিত করে দেয়ার চেয়ে আর কোন্ অভিযোগ এত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ? কিন্তু মানুষ একনজরেই অবাক হয়ে পড়ে যে, এ অভিযোগের জবাবে কোনো দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়নি। বরং এ কথা বলেই প্রসঙ্গ শেষ করে দেয়া হচ্ছে যে, সত্যের ওপর সুস্পষ্ট অবিচার করা হচ্ছে। মিথ্যার ঝড় সৃষ্টি করা হচ্ছে। এত সেই খোদার বাণী যিনি আসমান ও যমীনের রহস্য অবগত আছেন।

এটা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, চরম বিরোধিতার পরিবেশে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ করা হচ্ছে আর তাচ্ছিল্যের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে? সত্যিই কি তাদের অভিযোগ এতখানি গুরুত্বহীন ছিল যে, তার জবাবে শুধু মিথ্যা এবং অবিচার বলাই যথেষ্ট ছিল ? তাহলে এর কারণই বা কি যে, এ সংক্ষিপ্ত জবাবের পর জনসাধারণ কোনো বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট জবাব দাবী করেনি, নও-মুসলিমদের মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেকও হয়নি, আর বিরোধীদের মধ্যেও কেউ এ কথা বলতে সাহস করেনি, "দেখলে আমাদের এ বিরাট অভিযোগের জবাব দেয়ার মুরদ হল না বলে শুধু 'মিথ্যা ও অবিচার' বলে এড়িয়ে যাওয়া হল ?"

যে পরিবেশে ইসলাম বিরোধিরা এ অভিযোগ উত্থাপন করেছিল সেখান থেকেই আমরা এর সমাধান পেয়ে যাচ্ছি।

[এ সমাধানের জন্যে গ্রন্থকার নিম্নের পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন।-(সংকলকদ্বয়]

প্রথম পর্যালোচনা

যেসব জালেম একটি একটি করে মুসলমানদের ওপর মারধর করে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলত এবং যাদের সম্পর্কে তারা বলত যে, পুরাতন বই-পুস্তকের অনুবাদ করে করে তারা নবী মুহাম্মদ (সা)-কে মুখস্থ করিয়ে দিত, তাদের এবং নবীর বাড়ীতে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে সেসব মালপত্র বের করে এনে জনসাধারণকে দেখান তাদের পক্ষে মাটেই কষ্টকর ছিল না। এ গোপন কাজ চলাকালেই তাদের ওপর হামলা চালিয়ে

লোকজন ডেকে তারা বলতে পারত, "দেখ দেখ এখানে নবুয়াতের প্রস্তুতি চলছে।" যারা হযরত বেলাল (রা)-কে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর শায়িত রাখতে পারত, কোনো আইন-কানুনই তাদের কাজের কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না এবং এরূপ করে তারা নবুয়াতে মুহাম্মদীর 'আশংকা' চিরতরে নির্মূল করতে পারত কিন্তু তারা শুধু মৌখিক অভিযোগ প্রতিবাদই করত এবং এক দিনের জন্যেও তারা উপরোক্ত সিদ্ধান্তকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

দ্বিতীয় পর্যালোচনা

অনুবাদ করে শুনানোর ব্যাপারে তারা যেসব লোকের নাম করত, তারা কোনো বাইরের লোক ছিল না বরং মক্কা শহরেরই অধিবাসী ছিল। তাদের যোগ্যতাও কারও কাছে গোপন ছিল না। সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই লক্ষ্য করত যে, নবী মুহাম্মদ (সা) যা পেশ করেছেন তা কোন্ উচ্চ স্তরের জিনিস, তা কত উচ্চাঙ্গের ভাষা, কত মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য, বাণী কত শক্তিশালী এবং চিন্তাধারা ও বক্তব্য কত উচ্চস্তরের। আর তারা কোন্ স্তরের লোক যাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ (সা) তাদের কাছ থেকেই এসব শিখে আসছেন। এ কারণে কেউ তাদের অভিযোগের প্রতি কোনো গুরুত্বই দেয়নি। প্রত্যেকেই মনে করত যে, এ ধরনের অভিযোগ করে তারা মনের ঝাল মিটাচ্ছে। আর যারা এসব লোক সম্পর্কে কিছু জানত না তারা অন্তত এটুকু চিন্তা তো করতে পারত যে, এসব লোকের যদি এতটাই যোগ্যতা থাকত তাহলে তারা নিজেদেরই প্রদীপ কেন জ্বালাল না ? অপরের প্রদীপে তেল সরবরাহ করার তাদের কি প্রয়োজন ছিল ? আর তাও এমন সংগোপনে যে এ কাজের সুখ্যাতির কোনো অংশও তাদের ভাগ্যে জুটবে না ?

তৃতীয় পর্যালোচনা

এ ব্যাপারে যেসব মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের নাম করা হচ্ছিল তারা তো বহিরাগত ছিল না। আরবের উপজাতীয় জীবনে কোনো ব্যক্তিই কোনো না কোনো শক্তিশালী গোত্রের সহযোগিতা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারত না। মুক্ত হওয়ার পরও সে দাস তার পূর্বতন প্রভুর তত্ত্বাবধানেই থাকত। তার প্রভুর সমর্থনই সমাজে তার জীবন ধারণের সম্বল ছিল। এখন কথা এই যে, নবী মুহাম্মদ (সা) যদি এসব মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের বদৌলতেই (মায়াযাল্লাহ) একটা মিথ্যা নবুয়াতের দোকান চালিয়ে থাকেন, তাহলে এসব লোক তো কোনো আন্তরিকতার সাথে ও সদুদ্দেশ্যে এ ষড়যন্ত্রে নবীর অংশীদার হতে পারত না। শেষ পর্যন্ত তারা এ ব্যক্তির আন্তরিক সহকর্মী ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল কি করে হতে পারত যিনি রাতের বেলায় তাদের কাছে কিছু শিখে এসে দিনের বেলা সকলের সামনে এ কথা বলে বেড়াতেন যে, খোদার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অহী নাযিল হয়েছে এ জন্যে কোনো প্রলোভন অথবা স্বার্থের জন্যেই এ কাজে তাদের সহযোগিতা সম্ভব ছিল কিন্তু কোন্ বিবেকবান ব্যক্তি এ কথা চিন্তা করতে পারে যে, এসব লোক নিজেদের অভিভাবককে অসন্তুষ্ট করে এ ষড়যন্ত্রে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর অংশীদার হয়েছিল ? যে ব্যক্তি ছিলেন গোটা জাতির কাছে অভিশপ্ত ও ধিকৃত এবং গোটা জাতির শত্রুতার শিকার, কোন্ প্রলোভনে এ লোকগুলো তাঁর সাথে মিলিত হয়েছিল ? এ বিপন্ন লোকটি থেকে কোন্ স্বার্থসিদ্ধির আশায় তারা তাদের অভিভাবক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষতিটা স্বীকার করে নিয়েছিল ? তারপর এটাও চিন্তা করার বিষয় যে, মারধর করে তাদের কাছ থেকে ষড়যন্ত্রের স্বীকারোক্তি করে নেয়ার

সুযোগও তো এসব অভিভাবকদের ছিল। তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার কেন করেনি এবং গোটা জাতি কেন ঐসব দাস থেকে এ স্বীকারোক্তি করায়নি যে, তাদের কাছে শিখে নিয়েই এ ব্যক্তি নবুয়াতের দোকান জমজমাট করেছিল ?

চতুর্থ পর্যালোচনা

সবচেয়ে বড় মজার কথা এই যে, তারা সকলেই নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি এমন অনুপম ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করে যেমন পোষণ করতেন সাহাবায়ে কেরাম (রা)। এটা কি সম্ভব যে, ভুয়া এবং ষড়যন্ত্রমূলক নবুয়াতের (মায়াযাল্লাহ) ওপর শুধু ঈমানই আনল না, বরং গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে ঈমান আনল ঐসব লোক যারা তাঁর ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিল ? আর মনে করুন যদি তা সম্ভবও হত তাহলে ঈমানদারদের দলে নিশ্চয়ই তাদের বিশেষ মর্যাদা হত। এ কি করে সম্ভব ছিল যে, নবুয়াতের ব্যবসা চলবে আদ্দাস, ইয়াসার এবং যাবরের বদৌলতে, আর নবী (সা)-এর দক্ষিণ হস্ত থাকবেন আবুবকর (রা), ওমর (রা) এবং আবু ওবায়দাহ (রা) ?

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদি কিছু লোকের সাহায্যেই রাতের বেলা বসে বসে এ ব্যবসার উপকরণাদি তৈরী করা হত তাহলে যায়েদ বিন হারেসা (রা), আলী ইবনে আবু তালেব (রা), আবুবকর সিদ্দীক (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীর কাছে এ কথা কি করে গোপন থাকত যারা দিন-রাত ছায়ার মত নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে থাকতেন ?

এ অভিযোগের মধ্যে যদি সত্যের লেশমাত্রও থাকত তাহলে এসব লোকের নবীর ওপর আন্তরিকতার সাথে ঈমান আনা কি করে সম্ভব হত এবং নবীর সহযোগিতা করতে গিয়ে সকল প্রকার বিপদ ও ক্ষতি তারা কি করে বরদাশত করত ?

এসব অভিযোগ যাদেরই কানে যেত তারা এর কোনোই মূল্য দিত না। এ জন্যে এটাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ মনে করে তার জবাব দেয়ার জন্যে কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। বরং উল্লেখ করা হয়েছিল এ কথা বলার জন্যে যে, এরা কতটা অন্ধ হয়ে সত্যের বিরোধিতা করত এবং কতখানি মিথ্যাচারণ ও অবিচারের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।[২৪৮]

কুরআনের তিনটি কাহিনী আলোচনা

প্রাচ্যবিদগণ কুরআনের তিনটি কাহিনীর তত্ত্বাবধান করে এ অভিযোগ করেছেন যে, নবী মুহাম্মদ (সা) তথ্যগুলো অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করে নিজের পক্ষ থেকে পেশ করেছেন।

এসব প্রাচ্যবিদগণের অভিযোগ-আপত্তি বর্ণনা করার পূর্বে ঐসব কাহিনী জেনে রাখা দরকার। নতুবা সামনের আলোচনা বুঝতে কষ্ট হবে।-(সংকলকদ্বয়)

এক ঃ হযরত মূসা (আ)-এর নদীসঙ্গম ভ্রমণ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰـهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُـغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ۝

"(তাদেরকে ঐ কাহিনী শুনিয়ে দাও) যখন মূসা (আ) তাঁর খাদেমকে বললেন, আমি আমার সফর শেষ করব না যতক্ষণ না দু'টি নদীর সঙ্গমস্থলে পৌছব। নতুবা দীর্ঘকাল ধরে আমি চলতেই থাকব।"-(সূরা আল কাহফ ঃ ৬০)

এ পর্যায়ে এ কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল, কাফের এবং মুসলমান উভয়কেই একটা নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করা। তাহলো এই যে, বাহ্যত দুনিয়াতে যা কিছু হতে দেখা যায়, তার থেকে বিলকুল একটা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা যে গূঢ় রহস্য সামনে রেখে কাজ করেন তা দর্শকের চোখে ধরা পড়ে না। যালেমদের ক্রমোন্নতি হওয়া এবং নিরপরাধ লোকের দুঃখ-কষ্ট হওয়া, পাপিষ্ট লোকের ওপর সম্পদের বারিধারা বর্ষিত হওয়া এবং সৎকর্মশীলদের বিপদের সম্মুখীন হওয়া, পাপাচারীদের আরাম-আয়েশ উপভোগ এবং ধর্মপরায়ণদের দুরাবস্থা—এ এমন এক দৃশ্য যা প্রতিদিন মানুষের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়। মানুষ এসবের রহস্য জানে না বলে সাধারণত মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এমনকি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। যালেম-অবিশ্বাসী তার থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছে যে, দুনিয়াটা একটা নৈরাজ্যের লীলাক্ষেত্র। এর কোনো মালিক বা রাজা-বাদশাহ নেই। থাকলেও সে অকর্মণ্য। এখানে যে যা খুশী তাই করে। জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। যে মুমিন সে এসব দেখে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তার ঈমান নড়বড়ে হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কর্ম রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে কিছু আলোকচ্ছটা দেখিয়ে দিলেন যাতে করে তিনি বুঝতে পারেন যে, দুনিয়ার দিবারাত্র যা কিছু হচ্ছে তা কিভাবে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে হচ্ছে। আর কিভাবে ঘটনাপুঞ্জের বাহ্যদিকটা তার আভ্যন্তরীণ দিক থেকে আলাদা ধরনের।

কাহিনীর বিশদ বিবরণ

হযরত মূসা (আ)-এর এ ঘটনা কখন এবং কোথায় ঘটেছিল তার কোনো ব্যাখ্যা কুরআনে নেই। অবশ্য হাদীসে আওফীর একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ইবনে আব্বাসের একটা উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, এ ঘটনা সে সময়ে ঘটেছিল যখন হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের ধ্বংসের পর মিসরে তাঁর জাতিকে পুনর্বাসিত করেছিলেন কিন্তু বুখারী এবং অন্যান্য গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের যে জোরদার বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা ওপরের বর্ণনা

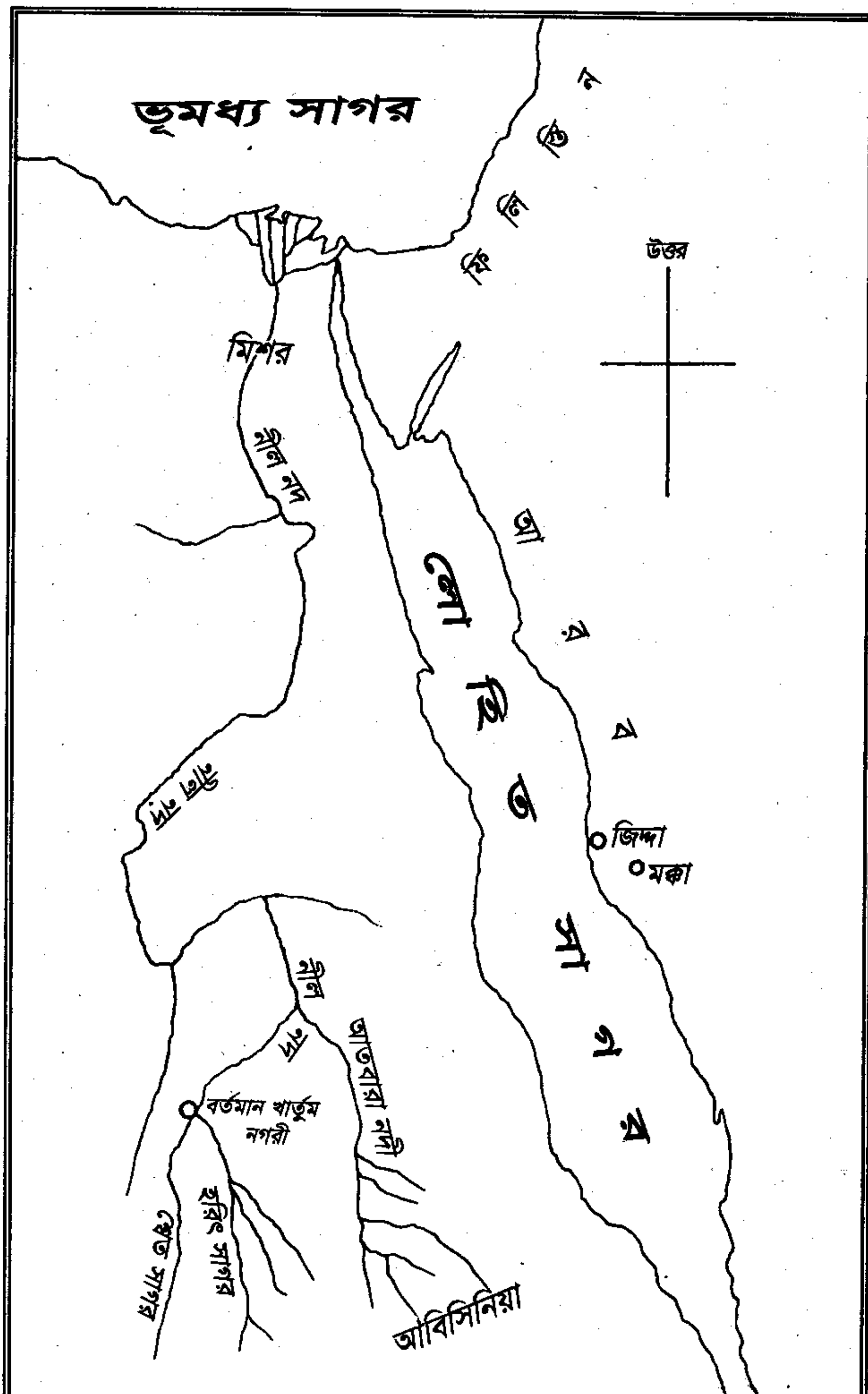

হযরত মূসা ও খিজির (আ)-এর কিস্সা সংক্রান্ত মানচিত্র

সমর্থন করে না। অন্য কোনো সূত্রেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) মিসরে কোন্ সময় অবস্থান করেছিলেন। বরং কুরআন সুস্পষ্ট করে বলে যে, মিসর থেকে বহির্গমনের পর তাঁর গোটা জীবন সাইনা এবং তাইমা উপত্যকায় অতিবাহিত হয়েছে। এ জন্যে এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য আমরা যখন এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণের প্রতি লক্ষ্য করি তখন দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি এই যে, হযরত মূসা (আ)-কে তাঁর নবুয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে এসব পর্যবেক্ষণ করান হয়েছিল। কারণ নবুয়াতের প্রারম্ভেই নবীগণের এ ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় এই যে, হযরত মূসা (আ)-এর এ ধরনের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন সে সময়ে হয়েছিল যখন বনী ইসরাঈল মিসরে ঠিক সেই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল—যেমন মুসলমানগণ মক্কায় হয়েছিলেন। আমাদের ধারণা এ দু'টি কারণেই (প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন) এ ঘটনা ঐ সময়ে ঘটেছিল যখন মিসরে বনী ইসরাঈলের ওপর ফেরাউনের যুলুম-নিষ্পেষণ চলছিল এবং কুরাইশ সর্দারদের মত ফেরাউন এবং তার সভাসদবৃন্দ তাদের ওপর কোনো শাস্তি না আসার কারণে মনে করেছিল যে, তাদের ওপরে এমন কেউ নেই যে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ঠিক তেমনি মক্কার মজলুম মুসলমানদের মত মিসরের মজলুম মুসলমান অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, "হে খোদা ! এসব যালেমদের জন্যে সুখ-সম্পদ এবং আমাদের জন্যে বিপদ মসিবত আর কত দিন ?" এমনকি মূসা (আ) পর্যন্ত বলে উঠলেন ঃ

رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيۡتَ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَاَهٗ زِيۡنَةً وَّاَمۡوَالًا فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِكَ

"হে পরোয়ারদেগার! তুমি ফেরাউন এবং তার সভাসদগণকে পার্থিবজীবনে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এবং ধন-সম্পদ দিয়ে ভূষিত করেছ। হে খোদা! তা কি এ জন্যে করেছ যে, তারা দুনিয়াকে পথভ্রষ্ট করবে ?"

আমার এ ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে এ কথা মনে করা যেতে পারে যে, সম্ভবত হযরত মূসা (আ)-এর এ সফর সুদান অভিমুখে ছিল এবং দু' নদীর সঙ্গমস্থল বলতে সে স্থানকে বুঝায়, যেখানে বর্তমান খার্তুম শহরের সন্নিকট নীল নদের দু'টি শাখা ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে।

তালমুদের বর্ণনা

বাইবেল এ ঘটনার ব্যাপারে একেবারে নীরব। অবশ্য তালমুদে এ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এ ঘটনাকে মূসা (আ)-এর পরিবর্তে রাব্বি ইয়াহ্হানান বিন লাবীর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। বর্ণনায় এরূপ আছে যে, এ ঘটনা যখন ঘটে তখন উক্ত রাব্বি হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সাথে ছিলেন যাঁকে জীবিতাবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়ার পর ফেরেশতাদের সাথে শামিল করা হয়। তারপর তাঁকে দুনিয়ার পরিচালনার কাজে নিয়োগ করা হয়।

(The Talmud Selections By H. Polano, pp 313-16).

সম্ভবত মিসর থেকে বহির্গমনের আগের ঘটনাগুলোর মত এ ঘটনাটিও বনী ইসরাঈলের বই-পুস্তকে সঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি এবং কয়েক শতক পরে কাহিনীর

অংশবিশেষ তারা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে জুড়ে দিয়েছে। তালমুদের এ বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ বলে ফেললেন যে, এখানে মূসা বলতে নবী হযরত মূসা (আ) নন অন্য কোনো মূসা হবে কিন্তু না তালমুদের প্রতিটি বর্ণনাকে সঠিক ইতিহাস বলে গণ্য করা যায়, আর না এ ধারণা করার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে যে কুরআনে কোনো এক অজ্ঞাত মূসার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে। আবার যখন নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোতে হযরত ওবাই বিন কায়াবের বর্ণনায় দেখা যায় যে, স্বয়ং নবী করীম (সা) এ কাহিনীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মূসা বলতে বনি ইসরাঈলের নবী হযরত মূসা (আ)-কেই বুঝিয়েছেন, তখন কোনো মুসলমানের জন্যে তালমুদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাচ্যবিদগণ নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী কুরআনের এ কাহিনীরও উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন এবং তিনটি ঘটনা চিহ্নিত করে বলেছেন যে, নবী মুহাম্মদ (সা) এসব থেকে নকল করেই এ কাহিনী তৈরী করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, তাঁর ওপরে এ অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। তিনটির মধ্যে একটি হল গিলগামিশ কাহিনী, দ্বিতীয়টি সুরইয়ানীর সেকেন্দরনামা এবং তৃতীয়টি ওপরে বর্ণিত ইহুদীদের বর্ণনা।

প্রাচ্যবিদদের জেরা করার জন্যে চারটি প্রশ্ন

তাদের নিকটে নিম্নের মাত্র চারটি প্রশ্নের জবাব তলব করলেই তাদের বিদ্বেষাত্মক অপপ্রচারের মুখোস খুলে যাবে ঃ

এক ঃ আপনাদের কাছে এর কি দলিল-প্রমাণ আছে যে, কুরআনের সাথে মিলে যায় এমন কিছু কথা দু' চারটি প্রাচীন গ্রন্থে দেখেই আপনারা দাবী করে বসছেন যে কুরআনের বর্ণনা এগুলো থেকে নেয়া হয়েছে ?

দুই ঃ বিভিন্ন ভাষায় লিখিত যত বই-পুস্তককে আপনারা কুরআনের কাহিনী ও বর্ণনার উৎস বলে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোর তালিকা তৈরী করলে একটা লাইব্রেরীর তালিকায় পরিণত হবে। এ ধরনের কোনো লাইব্রেরী তখন মক্কায় ছিল ? তারপর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকগণ কি বসে বসে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যে উপকরণ সরবরাহ করছিল ? যদি তা না হয় এবং নবুয়াতের পূর্বে নবী মুহাম্মদ (সা) যে আরবের বাইরে দু' তিনটি সফর করেছেন তার ওপর নির্ভর করেই যদি আপনারা এমন বলে থাকেন তাহলে প্রশ্ন এই যে, ব্যবসা উপলক্ষে ঐসব সফরে তিনি কতগুলো লাইব্রেরী নকল বা মুখস্থ করে এসেছিলেন ? আর নবুয়াত ঘোষণার একদিন পূর্বে পর্যন্ত তাঁর কথাবার্তায় ঐসব জ্ঞান লাভের কোনো ইঙ্গিত যে পাওয়া যায়নি, তারই বা কারণ কি ?

তিন ঃ মক্কার কাফের, ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ, আপনাদেরই মতো অনুসন্ধান করছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সা) এ কথাগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসছেন। তিনি যে চুরি করা কথা বলছিলেন এটা তাঁর সমসাময়িকদের ধরতে না পারার কি কারণ ছিল ? তাদেরকে তো বারবার চ্যালেঞ্জ করে বলা হচ্ছিল যে, এ কুরআন খোদার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। অহী ছাড়া এর অন্য কোনো উৎস নেই। এ কথা বলা হচ্ছিল, "তোমরা যদি তাকে মানুষেরই কথা বলছ, তাহলে প্রমাণ করে দেখাও যে মানুষ এমন কথা বলতে পারে।" এ চ্যালেঞ্জ নবী (সা)-এর সমসাময়িক দুশমনদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু তারা এমন একটি

উৎসও চিহ্নিত করতে পারেনি সেখান থেকে কুরআন উৎসারিত হওয়ার কথা কোনো বিবেকসম্পন্ন লোকের বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, সন্দেহও পোষণ করতে পারত।

এখন প্রশ্ন এই যে, সমসাময়িক লোকেরা এ তত্ত্ব উদঘাটনে ব্যর্থ হল কেন এবং তের-চৌদ্দশ' বছর পর আজ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীগণ এ ব্যাপারে এ সাফল্য লাভ করলেন কি করে?

চার ঃ শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, এ সম্ভাবনাও তো আছে যে, কুরআন আল্লাহর অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং সে অতীত যুগের সেসব ঘটনার সঠিক খবর দেয় যা কয়েক শতকে মৌখিক বর্ণনার আকারে বিকৃত হয়ে মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং গালগল্পে পরিণত হয়েছে। কোন্ যুক্তিসঙ্গত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া হল? কেন এই একটি মাত্র সম্ভাবনাকেই আলোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ভিত্তি বানান হল যে, কুরআনের কাহিনী রচনা করা হয়েছে ঐসব ঘটনা থেকেই যা মৌখিক বর্ণনার আকারে গালগল্প হিসেবে লোকের কাছে বিদ্যমান? ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং শত্রুতা ব্যতীত এর অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে কি?

এ প্রশ্নগুলোর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে, প্রাচ্যবিদগণ 'জ্ঞানার্জনের' নামে যা কিছু উপস্থাপিত করেছেন—তা প্রকৃতপক্ষে কোনো জ্ঞানান্বেষণকারী লক্ষ্যণীয় নয়।[২৪৭]

দুই ঃ ফেরাউনের মূসা (আ)-কে হত্যা করার সংকল্প

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ج (المؤمن : ٢٦)

"একদিন ফেরাউন তার সভাসদগণকে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করছি এবং সে তার খোদাকে ডেকে দেখুক।"-(সূরা মু'মিন ঃ ২৬)।

এ আয়াত থেকে ৪৫ আয়াত পর্যন্ত যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যা তারা বিলকুল ভুলে বসে আছে। বাইবেল এবং তালমুদে এ ঘটনার কোনোই উল্লেখ নেই। তাদের অন্যান্য বর্ণনাতেও এর কোনো নাম-নিশানা পাওয়া যায় না। একমাত্র কুরআনের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়া জানতে পেরেছে যে, ফেরাউন এবং মূসা (আ)-এর দ্বন্দ্ব চলাকালে এ ঘটনা ঘটেছিল।

সত্যের দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাহিনীর গুরুত্ব

ইসলাম এবং কুরআনের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ পোষণ করে না এমন প্রতিটি মানুষ এ কাহিনী পাঠ করলে অবশ্যই অনুভব করবে যে, ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাহিনী অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটা ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে, হযরত মূসা (আ)-এর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রচার এবং তাঁর দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে স্বয়ং ফেরাউনের পরিষদগণের মধ্যে কেউ মনে মনে ঈমান এনে থাকবে এবং মূসা (আ)-কে হত্যা করার জন্যে ফেরাউনকে উদ্যত দেখে তারা নীরব থাকতে পারেনি। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদগণ জ্ঞান ও তত্ত্বানুসন্ধানের গালভরা দাবী করা সত্ত্বেও অন্ধ বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে যে কুরআনের সুস্পষ্ট সত্যতাকে ঢাকার চেষ্টা করছেন তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম গ্রন্থে 'মূসা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার এ কাহিনী সম্পর্কে বলেন ঃ "ফেরাউনের দরবারের জনৈক মুসলমান মূসা (আ)-কে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।"–কুরআনের এ কাহিনী সুস্পষ্ট নয় (সূরা ৪০ ঃ আয়াত ২৮)। হাগ্গাদায় বর্ণিত কাহিনীর সাথে কি আমরা এর তুলনা করব যেখানে বলা হয়েছে যে, হিথ্রো ফেরাউনের দরবারে ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের পরামর্শ দিয়েছিল ?

তত্ত্বানুসন্ধানের দাবীদারদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি

তত্ত্বানুসন্ধানের দাবীদারগণ যেন এটা একেবারে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন যে, কুরআনের প্রতিটি কথার ভুল ধরতেই হবে। কুরআনের কোনো কথার ভুল ধরার কোনো ভিত্তি যদি পাওয়া না যায় তাহলে অন্তত এতটুকু বিভ্রান্তি তো ছড়াতে হবে যে, কথাটা পরিষ্কার নয়। অতপর পাঠকদের মনে ক্রমশ এ সন্দেহের সৃষ্টি করতে হবে যে, মূসা (আ)-এর জন্মের পূর্বে হাগ্গাদায় হিথ্রোর যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা কোথাও থেকে নবী মুহাম্মদ (সা) শুনে নিয়েছেন এবং তা এরূপ আকারে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এ হচ্ছে জ্ঞানানুসন্ধানের ধরন যা এসব লোক ইসলাম, কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে অবলম্বন করেছেন।[২৫০]

তিন ঃ আসহাবে কাহাফের কাহিনী গুহায় অবস্থানকাল সম্পর্কে প্রতিবাদ

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ এ ঘটনাকে আসহাবে কাহাফের কাহিনীর অনুরূপ বলে মেনে নিতে এ জন্যে অস্বীকার করেন যে, কুরআনে তাদের গুহায় অবস্থানের মুদ্দৎকাল তিনশ' নয় বছর বলা হয়েছে কিন্তু এ সূরার ২৫নং টীকায় আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে, ২৫ আয়াতে আসহাবে কাহাফের মুদ্দৎকাল যে তিনশ' এবং তিনশ' নয় বছর বলা হয়েছে তা আমাদের ধারণা মতে লোকের উক্তি—আল্লাহ তায়ালার উক্তি নয়। তার প্রমাণ এই যে, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলছেন ঃ "বল, আল্লাহই ভাল জানেন তারা কতকাল গুহায় অবস্থান করেছিল।" আল্লাহ নিজে যদি তিনশ' নয় বছরের কথা উল্লেখ করতেন তাহলে এ কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। এ যুক্তিতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন যে, এ আল্লাহ তায়ালার উক্তি নয়, বরং মানুষের উক্তি।

গীবনের ধৃষ্টতা

সুরিয়ানী বর্ণনা এবং কুরআনের বর্ণনার মধ্যে কিছু ছোটখাট মতপার্থক্য আছে যার ভিত্তিতে গীবন নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর 'অজ্ঞতার' অভিযোগ আরোপ করেছেন। অথচ যে বর্ণনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি এতটা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি স্বয়ং জানেন যে, এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি এ ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মৌখিক বর্ণনা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছতে তার মধ্যে কিছু না কিছু গরমিল হয়েই থাকে। এ ধরনের বর্ণনা সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং তার কোনো অংশে মতবিরোধ হওয়া কুরআনেরই ভুল, এ কথা ঐসব হঠকারী লোকেরই শোভা পায় যারা ধর্মীয় বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে জ্ঞান-বিবেকের সাধারণ দাবী উপেক্ষা করে।

ঈসায়ী লেখকদের সাক্ষ্য

এ কাহিনীর প্রাচীনতম সাক্ষ্য পাওয়া যায় সিরিয়ায় জেমস সরোজী নামক জনৈক খৃস্টান পাদ্রীর উপদেশবাণী থেকে যা সুরিয়ানী ভাষায় লিপিবদ্ধ। এ ব্যক্তি গুহাবাসীদের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ৪৫২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৭৪ খৃস্টাব্দের নিকটবর্তীকালে তাঁর এ উপদেশবাণী রচনা করেন। এ উপদেশবাণীতে তিনি এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন। এ সুরিয়ানী বর্ননাই একদিকে প্রাথমিক যুগের তাফসীরকারকদের হস্তগত হয় যা ইবনে জারীর তাবারী বিভিন্ন সূত্রে তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃত করেছন। অন্যদিকে এ বর্ণনা ইউরোপবাসীরও হস্তগত হয় এবং তা গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয় এবং তার ভাষ্য প্রকাশিত হয়। গীবন তাঁর 'রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থের ত্রিবিংশ অধ্যায়ে 'সাতজন নিদ্রিত ব্যক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে উপরোক্ত সূত্র থেকে এ কাহিনীর যে বিবরণ দিয়েছেন তা আমাদের তাফসীরকারদের বর্ণনার সাথে এতটা মিলে যায় যে, মনে হয় উভয় কাহিনী একই উৎস থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে শাসকের অত্যাচার -উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আসহাবে কাহাফ গিরি-গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন আমাদের তাফসীরকারগণ তার নাম দাকইয়ানুস বা দামযুস বলেন। আর গীবন বলেন, তার নাম ছিল কায়সার ডেসিয়াস (Decius) যে ২৪৯ খৃঃ থেকে ২৫১ খৃঃ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের শাসক ছিল এবং হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের ওপরে নির্যাতন করার জন্যে তার শাসনকাল কলংকিত ছিল। যে শহরে এ ঘটনা ঘটে আমাদের তাফসীরকারগণ তার নাম এফসুস বলেছেন। আর গীবন বলেছেন এফসিস (Ephesus)। এ ছিল এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত রোমীয়দের বিরাট শহর ও পোতাশ্রয়। তার ভগ্নাবশেষ বর্তমান তুরস্কের স্মার্না শহরের ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দক্ষিণে এখনও দেখা যায়। অতপর যে শাসকের রাজত্বকালে আসহাবে কাহাফ ঘুম থেকে জাগরিত হন, আমাদের তাফসীরকারগণের মতে তার নাম ছিল তিনযুসিস এবং গীবনের মতে কায়সার দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস (Theodosius)। সে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার পর ৪০৮ খৃঃ থেকে ৪৫০ খৃঃ পর্যন্ত রোমের কায়সার ছিল দু'টি বর্ণনার সাদৃশ্য এতখানি ছিল যে, গুহাবাসী জাগরিত হবার পর যাকে খাদ্য ক্রয়ের জন্যে বাজারে পাঠান হয়েছিল তার নাম তাফসীরকারগণ ইয়ামলিখা বলেন এবং গীবন বলেন ইযামলিখাস (Jamblichus)।

দু'টি ভিন্নমুখী বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য

কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ দু'টি বর্ণনার একই রকম যার সারসংক্ষেপ এই যে, কায়সার, ডেসিয়াসের শাসনকালে যখন ঈসায়ীদের ওপর ভয়ানক নির্যাতন চলছিল, তখন এ সাতজন যুবক একটি গিরি-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। অতপর কায়সার থিওডোসিয়াসের রাজত্বের ৩৮তম বছরে (অর্থাৎ ৪৪৫ খৃঃ অথবা ৪৪৬ খৃঃ) তারা ঘুম থেকে জাগরিত হয়। এ সময়ে গোটা রোমীয় সাম্রাজ্য হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী হয়ে পড়েছিল। এ হিসেবে তাদের গুহায় অবস্থানকাল দাঁড়ায় প্রায় ১৯৬ বছর।[২৫১]

নির্দেশিকা

(১)	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান	২য় খণ্ড পৃঃ ১৭৭-৭৮
(২)	তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা	
(৩)	তাফহীমুল কুরআন,	সূরা আরাফ, টীকা ১৩৫
(৪)	তাফহীমাত	১ম খণ্ড পৃঃ ৯-১৭
(৫)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা নাহল, টীকা ৯
(৬)	–ঐ–	সূরা নাহল, টীকা ১০
(৭)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১৪
(৮)	–ঐ–	সূরা ত্বা-হা, টীকা ২৩
(৯)	দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি)	পৃঃ ৩৯-৫২
(১০)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা বাকারা, টীকা ২৩
(১১)	দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি)	পৃঃ ৫২-৫৫
(১২)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা ইউনুস, টীকা ৭৪
(১৩)	তাহরিকে আযাদীয়ে হিন্দ আওর মুসলমান (উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান)	২য় খণ্ড পৃঃ ১০৫-১০৬
(১৪)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা আলে ইমরান, টীকা ৪৮
(১৫)	–ঐ–	সূরা নিসা, টীকা ২০৮
(১৬)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৯৪
(১৭)	–ঐ–	সূরা তাওবা, টীকা ৩২
(১৮)	–ঐ–	সূরা আরাফ, টীকা ৪৪
(১৯)	–ঐ–	–ঐ––ঐ–
(২০)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৮৮
(২১)	–ঐ–	সূরা কাসাস, টীকা ৬৬
(২২)	–ঐ–	সূরা নিসা, টীকা ৯৪
(২৩)	–ঐ–	সূরা কাহাফ, টীকা ৯৪
(২৪)	–ঐ–	সূরা আলে ইমরান, টীকা ১৭
(২৫)	–ঐ–	সূরা আম্বিয়া, টীকা ৯১
(২৬)	রাসায়েল ও মাসায়েল	১ম খণ্ড পৃঃ ২৫-২৭
(২৭)	–ঐ–	–ঐ–পৃঃ ৩৪-৩৬
(২৮)	তাফহীমুল কুরআন,	সূরা তাহরিম, ভূমিকা
(২৯)	–ঐ–	সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১
(৩০)	–ঐ–	সূরা ইউসুফ, টীকা ৬৬
(৩১)	–ঐ–	সূরা আম্বিয়া, টীকা ৪৯
(৩২)	–ঐ–	সূরা হুদ, টীকা ৫০
(৩৩)	–ঐ–	সূরা ইউসুফ, টীকা ২২
(৩৪)	–ঐ–	সূরা আম্বিয়া, টীকা ৭০
(৩৫)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৮৭
(৩৬)	–ঐ–	সূরা নিসা, টীকা ২০৪
(৩৭)	–ঐ–	সূরা শূরা, টীকা ১
(৩৮)	–ঐ–	সূরা নাহল, টীকা ৫৬
(৩৯)	–ঐ–	সূরা শূরা, টীকা ৮১
(৪০)	রাসায়েল ও মাসায়েল	২য় খণ্ড পৃঃ ৩৪৮-৫১
(৪১)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা সাফফাত, টীকা ৬০
(৪২)	–ঐ–	সূরা নাহল, টীকা ৫৬
(৪৩)	–ঐ–	সূরা কাসাস, টীকা ১০

(৪৪)	–ঐ–	সূরা নিসা, টীকা ২০৪
(৪৫)	–ঐ–	সূরা ইউনুস, টীকা ২০
(৪৬)	–ঐ–	সূরা হুদ, টীকা ১৩
(৪৭)	–ঐ–	সূরা শূরা, টীকা ৮৩
(৪৮)	সিয়াসী মসলা আওর উসকে সিয়াসী দ্বীনি আওর তামাদ্দুনী পাহলু	পৃঃ ২৪৭-৫০
(৪৯)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা ইউনূস, টীকা ২১
(৫০)	–ঐ–	সূরা কাসাস, টীকা ৬৪
(৫১)	–ঐ–	সূরা রাআদ, টীকা ৩১
(৫২)	–ঐ–	সূরা হজ্ব, টীকা ১১০
(৫৩)	–ঐ–	সূরা হুদ, টীকা ৩৪
(৫৪)	–ঐ–	সূরা নাহল, টীকা ৩
(৫৫)	–ঐ–	সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৩
(৫৬)	–ঐ–	সূরা শূরা, টীকা ৮৩
(৫৭)	–ঐ–	সূরা আনআম, টীকা ৬১
(৫৮)	–ঐ–	সূরা শূরা, টীকা ২৫
(৫৯)	–ঐ–	সূরা সাজদা, টীকা ৫
(৬০)	–ঐ–	সূরা ফাতের, টীকা ৭১
(৬১)	–ঐ–	সূরা বাইয়েনাহ, টীকা ৩
(৬২)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৬
(৬৩)	–ঐ–	–ঐ–ভূমিকা
(৬৪)	দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি)	পৃঃ ৫৭-৬০
(৬৫)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা যুখরুফ, টীকা ৪
(৬৬)	তাফহীমাত	১ম খণ্ড পৃঃ ২৩৮-৫৫
(৬৭)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা আন্‌কাবুত, টীকা ৯১
(৬৮)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৮৮
(৬৯)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৮৯
(৭০)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৯১
(৭১)	–ঐ–	সূরা ইউনূস, টীকা ২১
(৭২)	–ঐ–	সূরা শূরা, টীকা ৮৪
(৭৩)	–ঐ–	সূরা কাসাস, টীকা ১০৯
(৭৪)	–ঐ–	সূরা বাইয়েনাহ, টীকা ৪
(৭৫)	–ঐ–	সূরা সাজদাহ, টীকা ১
(৭৬)	–ঐ–	সূরা সাফ, টীকা ৭
(৭৭)	–ঐ–	সূরা আ'রাফ, টীকা ১১৩
(৭৮)	–ঐ–	সূরা সাফ, টীকা ৮
(৭৯)	রেডিও বক্তৃতা	পৃঃ ১৩-১৯
(৮০)	–ঐ–	পৃঃ ২৮-৩৮
(৮১)	রাসায়েল ও মাসায়ল, ৩য় খণ্ড	পৃঃ ১৪৯
(৮২)	দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি)	পৃঃ ৫৫-৫৭, ৭১-৭২
(৮৩)	–ঐ–	পৃঃ ৭২-৭৫
(৮৪)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা সাবা, টীকা ৪৭
(৮৫)	–ঐ–	সূরা ফাতির, টীকা ৪৪-৪৫
(৮৬)	–ঐ–	সূরা আম্বিয়া, টীকা ১০০
(৮৭)	–ঐ–	সূরা ইউনূস, টীকা ৫৫
(৮৮)	–ঐ–	সূরা ফুরকান, টীকা ৬৬
(৮৯)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৪

(৯০)	–ঐ–	সূরা আম্বিয়া, টীকা ১
(৯১)	–ঐ–	সূরা আলে ইমরান, টীকা ৬৯
(৯২)	–ঐ–	সূরা আ'রাফ, টীকা ২৮
(৯৩)	–ঐ–	সূরা আহযাব, টীকা ১৫
(৯৪)	–ঐ–	সূরা ইউনূস, টীকা ২৩
(৯৫)	রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ড	পৃঃ ৩২১-২৯
(৯৬)	–ঐ ২য় খণ্ড	পৃঃ ৩২৯-৩৩৫
(৯৭)	–ঐ– ১ম খণ্ড	পৃঃ ৩০-৩২
(৯৮)	–ঐ–	–ঐ– পরিশিষ্ট
(৯৯)	রাসায়েল ও মাসায়েল ৩য় খণ্ড	পৃঃ ১৬৪-৬৭
(১০০)	–ঐ–	–ঐ– পৃঃ ১৫১-৫৪
(১০১)	–ঐ–	–ঐ– পৃঃ ১৫৪-৫৭
(১০২)	–ঐ–	–ঐ– পৃঃ ১৫৭-৬২
(১০৩)	তাফহীমাত (সংক্ষিপ্তসার) ১ম খণ্ড	পৃঃ ১৫৮-১৬২
(১০৪)	–ঐ–	–ঐ– পৃঃ ৯৮-১১৩
(১০৫)	তাফহীমাত	১ম খণ্ড পৃঃ ২৮৮-৩১৭
(১০৬)	–ঐ–	–ঐ–পৃঃ ২৭৩-৮১
(১০৭)	সুন্নাত কি আইনী হায়সিয়াত	পৃঃ ৭৪-৭৮
	তাফহীমুল কুরআন	সূরা নাহল, টীকা ৪০
(১০৮)	সুন্নাত কি আইনী হায়সিয়াত	পৃঃ ৭৮-৮৫
(১০৯)	ইসলামী রিসালাত	পৃঃ ৪৬৫-৬৬
(১১০)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা নিসা, টীকা ৮৯
(১১১)	–ঐ–	সূরা কিয়ামাহ, টীকা ১৩
(১১২)	সুন্নাত কি আইনী হায়সিয়াত	পৃঃ ৯৩-৯৫
(১১৩)	–ঐ–	পৃঃ ১২১
(১১৪)	–ঐ–	পৃঃ ১২১-১২৫
(১১৫)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা জুমুআ, টীক ১৪
(১১৬)	–ঐ–	সূরা আলাক, টীকা ১০
(১১৭)	–ঐ–	সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৭
(১১৮)	–ঐ–	সূরা ফুরকান, টীকা ১৪-১৬
(১১৯)	–ঐ–	সূরা আনআম, টীকা ৩১
(১২০)	–ঐ–	সূরা নাহল, টীকা ৪০
(১২১)	–ঐ–	সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৮
(১২২)	–ঐ–	সূলা আ'রাফ, টীকা ১০
(১২৩)	–ঐ–	সূরা হুদ, টীকা ৩৭
(১২৪)	–ঐ–	সূরা মুমিনুন, টীকা ২৬
(১২৫)	–ঐ–	সূরা হুদ, টীকা ৩১
(১২৬)	–ঐ–	সূরা মুমিনুন, টীকা ২৬
(১২৭)	–ঐ–	সূরা ইবরাহীম, টীকা ২১
(১২৮)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১৯
(১২৯)	–ঐ–	সূরা ইয়াসীন, টীকা ১১
		বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৭
(১৩০)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৯৫
(১৩১)	–ঐ–	সূরা ইউসুফ, টীকা ৭৯
(১৩২)	–ঐ–	সূরা আনআম, টীকা ৩২
(১৩৩)	–ঐ–	সূরা রাআদ, টীকা ৫৬
(১৩৪)	–ঐ–	সূরা হা-মীম আস সাজদাহ, টীকা ১৯

(১৩৫)	–ঐ–	সূরা যুখরুফ, টীকা ৩০
(১৩৬)	–ঐ–	সূরা ফুরকান, টীকা ১৪
(১৩৭)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ২৯
(১৩৮)	–ঐ–	সূরা আম্বিয়া, টীকা ৯
(১৩৯)	তাহরিকে আযাদিয়ে হিন্দ আওর মুসলমান (উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান)	১ম খণ্ড পৃঃ ১০৯-১১৫
(১৪০)	দ্বীনে হক	পৃঃ ৩-৩৮
(১৪১)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা হুদ, টীকা ৯৭
(১৪২)	–ঐ–	–ঐ– টীকা ৬৯
(১৪৩)	তাজদীদ ওয়া এহইয়ায়ে দ্বীন	পৃঃ ১৩-৩৪
(১৪৪)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা শূরা, টীকা ২০ সূরা ইউসুফ, টীকা ৬০ সূরা যুমার, টীকা ৩
	কুরআন কি চার বুনিয়াদী ইসতিলাহে (কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা)	পৃঃ ১২৯-৪৩, ৫২-৫৬
(১৪৫)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা আরাফ, টীকা ৮৭
(১৪৬)	–ঐ–	সূরা কাহাফ, টীকা ২৩
(১৪৭)	–ঐ–	সূরা আনকাবুত, টীকা ২২
(১৪৮)	–ঐ–	সূরা আরাফ, টীকা ৫৮
(১৪৯)	–ঐ–	সূরা বাকারাহ, টীকা ২৯৩-৯৫
(১৫০)	–ঐ–	সূরা সা'দ, টীকা ৪৩
(১৫১)	–ঐ–	সূরা মুমিনুন, টীকা ৩৯
(১৫২)	–ঐ–	সূরা আরাফ, টীকা ৯০
(১৫৩)	–ঐ–	–ঐ– টীকা ৯৪
(১৫৪)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৯৫
(১৫৫)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৯৬
(১৫৬)	–ঐ–	সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৩
(১৫৭)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১১৫
(১৫৮)	–ঐ–	সূরা ত্বা-হা, টীকা ৫৩
(১৫৯)	–ঐ–	সূরা শুয়ারা, টীকা ৪৭
(১৬০)	–ঐ–	সূরা ত্বা-হা টীকা ৫৯
(১৬১)	–ঐ–	সূরা নামল, টীকা ২১
(১৬২)	–ঐ–	সূরা মুমিনুন, টীকা ৪৩
(১৬৩)	–ঐ–	সূরা মরিয়াম, টীকা ১৬
(১৬৪)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১৭
(১৬৫)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১৯ (ক)
(১৬৬)	–ঐ––	ঐ–টীকা ২০
(১৬৭)	–ঐ––	ঐ– টীকা ২০(ক)
(১৬৮)	–ঐ	–ঐ– টীকা ২১
(১৬৯)	–ঐ–	সূরা আরাফ, টীকা ১৫১-১৫২
(১৭০)	–ঐ	সূরা আনআম, টীকা ২৩
(১৭১)	–ঐ–	সূরা ত্বা-হা, টীকা ১১৬
(১৭২)	–ঐ–	সূরা আনকাবুত, টীকা ৮৮
(১৭৩)	–ঐ	–ঐ–টীকা ৯১
(১৭৪)	–ঐ–	সূরা রাআদ, টীকা ৪৭
(১৭৫)	–ঐ–	সূরা শূয়ারা, টীকা ৩

(১৭৬)	–ঐ–	–ঐ– টীকা ৫
(১৭৭)	–ঐ–	সূরা কামার, টীকা ১
(১৭৮)	–ঐ–	সূরা মুদ্দাসসির, টীকা ৩৬ সূরা বাকারা টীকা ২৮১
(১৭৯)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ২৮২
(১৮০)	–ঐ–	সূরা আনআম, টীকা ৩৩
(১৮১)	–ঐ–	সূরা ইউনুস, টীকা ২৪
(১৮২)	–ঐ–	সূরা মুমিন, টীকা ৩২
(১৮৩)	–ঐ–	সূরা মরিয়াম, টীকা ৫২
(১৮৪)	–ঐ–	সূরা ত্বা-হা টীকা ৮৫-৮৬
(১৮৫)	–ঐ–	সূরা কাওসার, টীকা ১
(১৮৬)	–ঐ–	সূরা নাবা, টীকা ২৫
(১৮৭)	–ঐ–	সূরা আম্বিয়া, টীকা ২৭
(১৮৮)	–ঐ–	সূরা সাবা টীকা ৪০
(১৮৯)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৪১
(১৯০)	–ঐ–	সূরা দুখান টীকা ৩৭
(১৯১)	–ঐ–	সূরা হুদ, টীকা ৮৪
(১৯২)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১০৬
(১৯৩)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১০৬
(১৯৪)	–ঐ–	সূরা নাহল, টীকা ৬৪
(১৯৫)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৭৯
(১৯৬)	–ঐ–	সূরা হজ্জ, টীকা ১২৪-২৫
(১৯৭)	–ঐ–	সূরা যুমার, টীকা ৬২
(১৯৮)	–ঐ–	সূরা নাজম, টীকা ২১
(১৯৯)	–ঐ–	সূরা রাআদ, টীকা ১৯
(২০০)	–ঐ–	সূরা মুনাফেকুন, টীকা ১৩
(২০১)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১৪
(২০২)	রাসায়েল ও মাসায়েল, ২য় খণ্ড	পৃঃ ৩২৯-৫০
(২০৩)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা দোহা, টীকা ৪
(২০৪)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৫
(২০৫)	–ঐ–	সূরা জুমুআ, টীকা ৬
(২০৬)	–ঐ–	সূরা দোহা, ভূমিকা
(২০৭)	–ঐ–	সূরা আলাম নাশারাহ টীকা ২
(২০৮)	–ঐ–	–ঐ– টীকা ৩
(২০৯)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১
(২১০)	–ঐ–	সূরা কাওসার, ভূমিকা
(২১১)	–ঐ–	সূরা কাওসার, টীকা ৪
(২১২)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ৩
(২১৩)	–ঐ–	–ঐ–টীকা ১
(২১৪)	–ঐ–	সূরা লাহাব, টীকা ১
(২১৫)	–ঐ–	সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ৮১
(২১৬)	–ঐ–	সূরা কামার, টীকা ২৪
(২১৭)	–ঐ–	সূরা সাফফাত, টীকা ৯৪
(২১৮)	–ঐ–	সূরা সা'দ, টীকা ১২
(২১৯)	–ঐ–	সূরা হা-মীম আস সাজদাহ, টীকা ৭০
(২২০)	–ঐ–	সূরা কাসাস, টীকা ১০৮
(২২১)	–ঐ–	সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ৯৮

www.icsbook.info